ঋজুদা সমগ্র ১

বুদ্ধদেব গুহ

Corvus (Pintu Das)

The social Sweeper

A Member of pathager.net

Against All Dirty Activity

ঋজুদা সমগ্র ১

ঋজুদা সমগ্র ১

www.pathagar.net

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৩ থেকে **পঞ্চম মুদ্রণ** নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ১১২০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০০৩ **মুদ্রণ সংখ্যা** ৩০০০

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
© বুদ্ধদেব গুহ

ISBN 81-7215-209-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০০.০০

ডঃ কৌশিক লাহিড়ী,
কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

অ্যালবিনো
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে
ঋজুদার সঙ্গে সূফ্‌কর-এ
ঋভুর শ্রাবণ
গুগুনোগুম্বারের দেশে
টাঁড় বাঘোয়া
নিনিকুমারীর বাঘ
বনবিবির বনে
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
মউলির রাত
রুআহা

সবিনয় নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে "দাদা"দের এক বিশেষ স্থান আছে। ঠিক শিশু সাহিত্যে বলা যায় না, কিশোর সাহিত্যেই এই "দাদা"রা বহুদিন হলো আসর জাঁকিয়ে আছেন। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্রর "ঘনাদা" এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "টেনিদা"। দাদা না হলেও সব দাদার বড় দাদা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী।

এই সব দাদারা যে অসামান্য দাদা তা আমরা আমাদের শৈশব এবং কৈশোরের দিন থেকেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্বীকার করে আসছি। পরিণত বয়সে পৌঁছেও আজও তাঁদের ভুলতে পারিনি। সেই দাদারা সত্যিই অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁদের তুলনাতে এখনকার অন্য দাদারা বেশ নিষ্প্রভই বলা চলে।

ঋজুদার প্রথম বই "ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে" আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় উনিনশো তিয়াত্তরের বৈশাখে। দাম ছিল চার টাকা মাত্র। এবং আপাতত শেষ বই "ঋজুদার সঙ্গে সুফ্‌করে" বেরিয়েছে মাস ছয়েক আগে। ঋজুদার প্রত্যেকটি বইই আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ঋজুদার যত বই লিখব তা এঁদেরই দেব এমন ইচ্ছা আছে কারণ 'ঋজুদা'র অবস্থান একটি বাড়িতেই হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

"ঋজুদা" চরিত্রটি প্রথমে উদ্ভাবিত হয় বাংলা-ভাষা-ভাষী কিশোরদের মনে প্রকৃতি-প্রেম, পাখ-পাখালী, গাছ-গাছালি এবং আমাদের বিরাট, বৈচিত্রময় এবং সুন্দর এই দেশের সাধারণ গ্রামীণ এবং পাহাড়-বনে বসবাসকারী মানুষদের সম্বন্ধে উৎসাহ ও ভালোবাসা জাগাবার জন্যই। এই সব মানুষেরাই আসল ভারতীয়। শহর-বাসী ইংরিজি-শিক্ষিত, উচ্চমন্য, লোভী, ইতর আমরা সেই ভারতবর্ষের কেউই নই। নিজের দেশকে না জানলে, দেশের মানুষদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম না হলে সেই কিশোরেরা বিদেশকেই পরম গন্তব্য বলে জানে। এবং মানেও। এই মানসিকতা নিয়ে কোনো দেশই প্রকৃতার্থে বড় হতে পারে না। আর কিশোররাই তো দেশের ভবিষ্যৎ!

কিশোরদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের, সাহসের, শুভ-অশুভের, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার মতো মানসিকতা যাতে অনবধানেই গড়ে উঠতে পারে ঋজুদার গল্পগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তেমন এক মহৎ অনুপ্রেরণাও ভিতরে প্রথম দিন থেকেই কাজ যে করেনি এমনও নয়। তবে উদ্দেশ্য সাধু হলেই তো তা সফল হয় না সব সময়ে! গন্তব্যে পৌঁছতে চাওয়া আর পৌঁছনো তো সমার্থক নয়! পৌঁছতে পেরেছি কী পারিনি তার বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকারাই। যদি একটিও কিশোর বা কিশোরী

ঋজুদার গল্প পড়ে পৃথিবীর বন-জঙ্গল, বন্য-প্রাণী, ফুল-পাখি প্রজাপতিকে ভালবেসে থাকে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মানুষের মন ও চরিত্রের উপর প্রকৃতির শুভ প্রভাব যে কতখানি হতে পারে সেই সম্বন্ধে একটুও অবহিত হয়ে থাকে ; তবেই জানব যে আমার প্রয়াস অসফল হয়নি।

বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করলেই কেউ "লেখক" হয়ে উঠতে পারেন না। "লেখক" হতে পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে প্রতি মাসে বিদেশ ভ্রমণ করারও কোনোই প্রয়োজন নেই। অলেখক তাতেও লেখক হয়ে ওঠেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে, আমাদের বাংলার একজন "সামান্য" "স্কুল শিক্ষক" বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে অসামান্য সাহিত্য রচনা করে গেছেন কিশোরদের জন্য, বাংলার ইছামতির পাশে ব্যারাকপুরে বসে, তার সঙ্গে তুলনীয় খুব বেশি সাহিত্য আছে বলে তো মনে হয় না।

আমি সশরীরে আফ্রিকাতে গেছি। আমি ছাড়াও সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আরো কেউ কেউও হয়তো গেছেন কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউই কি "চাঁদের পাহাড়" অথবা "মরণের ডঙ্কা বাজে" লিখতে পারব ? যিনি পারেন, তিনি আপনিই পারেন।

আফ্রিকার রুয়েজারী রেঞ্জে সত্যি সত্যি একটি পাহাড় আছে যার নাম "মাউন্টেইন অব দ্যা মুন"। "চাঁদের পাহাড়" নামে একটি শৃঙ্গ আছে। এই অধম যখন "মাউন্ট কিলিমানজারো" অথবা "মাউন্টেইন অব দ্যা মুন"-এর সামনে অপার বিস্ময় ও সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তখন মাথা নীচু করে মনে মনে প্রণাম করেছি অদেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জেনেছি, "লেখা" কাকে বলে। জেনেছি, তাঁর তুলনায় আমার ক্ষুদ্রতার পরিমাপ।

একজন সামান্য লেখক হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক লেখকের শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন এবং মানসিকতা তাঁর পাঠকদের মধ্যে অনবধানে সঞ্চারিত হয়ে যায়ই ! অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় একজন অভিনেতা উচ্চমানের অভিনয় করলে তাঁর সহ-অভিনেতার অভিনয়ের মানও সঙ্গে সঙ্গেই উন্নত হয়ে যায়, তেমনই লেখকের শিক্ষা, তাঁর প্রেক্ষিত, তাঁর ভাষা এবং তাঁর বক্তব্যর মান যদি উঁচুমাপের হয় তবে নিজেদের অজানিতেই পাঠকদেরও মানসিকতার উন্নতি ঘটে, রুচি পরিশীলিত হয় ; জীবন-দর্শনও অনবধানে পাল্টে যায়। উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যদি পাঠকদের খুশি করার জন্য তাঁদের মানসিক সমতাতে তাঁর লেখালেখিকে নামিয়ে আনতেন তবে পুরো বাঙালি জাতির এইরকম সার্বিক আত্মিক উন্নতি হতো না।

"ঋজুদা সমগ্র"র প্রথম খণ্ডে চারটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে। "গুগুনোগুম্বারের দেশে", "অ্যালবিনো" "রুআহা" এবং "নিনিকুমারীর বাঘ"।

"গুগুনোগুম্বার" আফ্রিকার একটি উপজাতির রূপকথায় বর্ণিত দেবতা। এই উপন্যাসের পটভূমি পূর্ব-আফ্রিকার পৃথিবী-বিখ্যাত "সেরেঙ্গেটি প্লেইনস"। এত বড় তৃণভূমি এবং "কুডু" আর "গরিলা" ছাড়া আফ্রিকার প্রায় সব জীবজন্তুরই এমন অবাধ বিচরণভূমি পৃথিবীতে নেই-ই বললে চলে। এই সেরেঙ্গেটি আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের প্রিয় শিকার-ভূমি ছিল।

"গুগুনোগুম্বারের দেশে"-তে ঋজুদার আফ্রিকান সঙ্গী "ভুষুণ্ডা" বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে আর রুদ্রকে প্রায় মৃত্যুর মুখেই দিগন্তহীন, পথচিহ্নহীন সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর মধ্যে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। রুদ্র কোনোক্রমে আহত ঋজুদাকে হায়নাদের হাত থেকে

বাঁচায়। তারপর সারা দিন অপেক্ষমান রক্তমাংসলোলুপ এক ঝাঁক শকুনদের হাত থেকেও বাঁচায়, যারা জীবিতাবস্থাতেই ঋজুদার মাংস খুবলে খাবার চেষ্টাতে ছিল। তারপর গভীর রাতে, আহত, অজ্ঞান ঋজুদা ও ক্লান্তিজনিত ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন-দেখা রুদ্রকে ঘিরে ফেলে একদল সাত-ফিট লম্বা মাসাই যোদ্ধা, "ইলমোরান"রা। পরে এক মাসাই সর্দার, "নাইরোবী" সর্দারের দেওয়া হলুদ গোলাকৃতি পাথরটা রুদ্র তাদের দেখাতেই তারা ঋজুদাকে তাদের বর্শার সঙ্গে তাদের পরিধেয় লালরঙা, হাতে-বোনা কম্বল বেঁধে নিয়েস্ট্রেচার মতো করে তার উপরে ঋজুদাকে শুইয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে তাকে কাঁধে নিয়ে তাদের "ক্রাল"-এ নিয়ে যায়।

ঋজুদা সুস্থ হবার পরে সেখান থেকে ফিরে আসে কলকাতাতে ঋজুদা—রুদ্র। রুদ্রই, বলতে গেলে, ঋজুদাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে সেবারে আফ্রিকা থেকে।

শরীর সুস্থ হয়েছে যদিও কিন্তু কোথাও গিয়ে একটু হাওয়া বদলে আসা দরকার যখন ঠিক তখনই বিহারের হাজারীবাগের কাছেই "মুলিমালোঁয়া" যাওয়া হয়ে উঠলো ওদের। পালিটাওয়া আর গীমারিয়ার মাঝামাঝি জায়গাটি। যাওয়া হলো, মুলিমাঁলোয়ার রাজা বিযেনদেও সিং-এর সনির্বন্ধ অনুরোধে। একটি "অ্যালবিনো" বাঘ বেরিয়েছিল তাঁরই জমিদারীতে। তাই সেই দুষ্প্রাপ্য, শ্বেতী-হওয়া অ্যালবিনো বাঘটিকে শিকার করার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি ঋজুদাকে এবং সেই সুবাদেই ওদের মুলিমাঁলোয়াতে যাওয়া সেবারে। সেখানে গিয়ে রুদ্র আর ঋজুদা বুক-হিমকরা গা-ছমছম এক রহস্যর মধ্যে পড়ে গেলো। "অ্যালবিনো"র সেই রহস্য ভেদ নিয়েই "অ্যালবিনো" উপন্যাস।

"অ্যালবিনো"ই আমার দ্বিতীয় গোয়েন্দা উপন্যাস। প্রথমটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলুর পটভূমিতে বড়দের জন্য লেখা "ওয়াইকিকি"। হাওয়াই থেকে ফিরে আসার পরই লিখি ঐ উপন্যাস। আমার কলমে আদৌ গোয়েন্দা উপন্যাস আসে কিনা সে সম্বন্ধে কিশোরদের জন্য লেখা "অ্যালবিনো" এবং বড়দের জন্য লেখা (ওটি অ্যাডাল্টদের জন্য, ছোটদের জন্য আদৌ নয়) "ওয়াইকিকি" পড়ে পাঠক-পাঠিকারা যদি তাঁদের মতামত জানান তবে বাধিত হব। তবে এমন ইচ্ছা পোষণ করি যে, প্রতি বছরই পুজোর সময় বা বইমেলার আগে একটি করে ঋজুদা-উপাখ্যান সরাসরি লিখে কোনো প্রকাশকের মাধ্যমে প্রকাশ করব।

"মুলিমাঁলোয়া" থেকে ফিরে আসার পর ঋজুদার কাছে খবর এলো যে বিশ্বাসঘাতক ভুষুণ্ডাকে নাকি পূর্ব-আফ্রিকার তানজানিয়ার (আগের জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা) আরুশা শহরে দেখা গেছে।

বদলা নেবার জন্য তানজানিয়াতে যাওয়া স্থির করলো ঋজুদা। ওখানে যাবার পরে ঘটনাপ্রবাহ তাদের নিয়ে পৌঁছে দিল "রুআহাতে"। "রুআহা" নামক একটি নদী আছে পূর্ব-আফ্রিকাতে এবং সেই নদীর নামেই একটি ন্যাশনাল-পার্কও আছে। সেই পার্কের মধ্যেই ভুষুণ্ডা এবং তাদের দলের সঙ্গে চললো ঋজুদারুদ্রদের চোর-পুলিশ খেলা। এবং তারপর রীতিমত যুদ্ধ।

এ পর্যন্ত ঋজুদার সব অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী ছিল রুদ্র একাই। "বনবিবির বনেতে" অবশ্য সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। ঋজুদার বহুদিনের খিদমদগার গদাধরদার বাবাকে যে মানুষখেকো বাঘে খেয়ে ফেলেছিল তাকেই মারতে ওরা সুন্দরবনে যায়। রুদ্রই মারে সেই বাঘটিকে।

কিন্তু এবারে তাদের সঙ্গী হলো একটি মেয়ে। তিতির। মডার্ন হাইস্কুলের ক্লাস

নাইনের ছাত্রী। তুখোর মেয়ে। পড়াশুনোতে, বিতর্কে, উজ্জ্বল। আগ্নেয়াস্ত্র চালানোতে বিশেষ পারদর্শী।অনেক ভাষা-ভাষী তিতিরকে ঋজুদার গল্পে আনাতে আমার কিশোরী পাঠিকারা বেজায় খুশি হয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে অগণ্য চিঠি পাই।

"রুআহা" পর্বে ভুষুণ্ডা অ্যান্ড কোম্পানিকে শায়েস্তা করে ওরা তিনজনে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ওড়িশা থেকে ডাক এলো ঋজুদার।

"সাম্বপানি" নামের একটি এককালীন দেশীয় করদ রাজ্যের ছোট রাজকুমারী, নিনিকুমারী ; একটি বাঘকে গুলি করে আহত করেন। সেই বাঘ পরে এক বিভীষিকাময় নরখাদকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অগণ্য মানুষ খেতে থাকে সে বহুবছর ধরে। তাকে কোনো শিকারীই মারতে না পারায় কলকাতার ঋজু বোসের ডাক পড়ে। যেতে রাজী হয় ঋজুদা। কিন্তু এই অভিযানে তিতিরের সঙ্গে নতুন একজন সঙ্গী জুটলো রুদ্ররই বন্ধু মিস্টার ভটকাই। বিচিত্রবীর্য, উত্তর কলকাতার এক ফাজিল ছেলে ভটকাইকে একবার সঙ্গে নেওয়ার জন্য রুদ্র অবশ্য বহুদিন থেকেই উমেদারী করে যাচ্ছিলো ঋজুদার কাছে। এমনকি "রুআহা" অভিযানের রোমাঞ্চকর সমাপ্তির পরেই রুদ্র সেই পটভূমিতেই দাঁড়িয়ে ঋজুদাকে, যাকে এখনকার কিশোর-কিশোরীদের টার্মিনোলজিতে "সেন্টু" দেওয়া বলে, তাই দিয়ে বলেছিলো : "একটা কথা দাও ঋজুদা, প্রমিস ; যে, এরপরের বার আমরা যখন কোথাও যাব তখন আমাদের সঙ্গে কিন্তু ভটকাইকেও নিয়ে যেতে হবে।"

আফ্রিকার পটভূমিতে যেসব লেখা লিখেছি তাতে অফ্রিকান গন্ধ ও পরিবেশ যাতে সঠিকভাবে ফুটে ওঠে সেইজন্যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও নানারকম পড়াশুনোও করতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে সোয়াহিলি ভাষাটাও শিখতে হয়েছিলো একটু-আধটু। মাসাইদের ভাষা, যার নাম "মা-আ"—তারও অল্প-স্বল্প।

আফ্রিকার পটভূমিতে একটি ভ্রমণোপন্যাস লিখেছি, "পঞ্চম প্রবাস"। আর খুব উঁচু, ঠাণ্ডা, হিম-পাহাড়ে এবং বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বসবাসকারী যাযাবর, গো-চারক, কাঁচা-রক্ত, কাঁচা-দুধ, এবং কাঁচা-মাংস খাওয়া দুঃসাহসী "মাসাই"রা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে তাদের সম্বন্ধেও অনেক পড়াশোনা করে একটি নৃতত্ত্বমূলক লেখা লিখেছিলাম, "ইলমোরাণদের দেশে"।

যদি কোনো পাঠক-পাঠিকার "ঋজুদা-সমগ্র" ভালো লাগে তবে তাঁরা আফ্রিকার পটভূমিতে লেখা "পঞ্চম প্রবাস" এবং "ইলমোরাণদের দেশে" পড়ে দেখতে পারেন। ঐ দুটি বইয়েরই প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

আশা করি "ঋজুদা সমগ্র"র প্রথম খণ্ড আমার কিশোর-কিশোরী পাঠক-পাঠিকা এবং তাদের বাড়ির প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে।এবং যদি লাগে, তবে এই লেখকের কাছে তাই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

কোনো পাঠক-পাঠিকা যদি কোনো ব্যাপারে যোগাযোগ করতে চান বা তাঁদের ভালোলাগা-মন্দলাগা জানাতে চান তবে পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬, কলকাতা-৭০০০১৯ এই ঠিকানাতে চিঠি লিখতে পারেন।

ইতি—বিনত লেখক

সূচী

গুগুনোগুম্বারের দেশে ১৫
অ্যাল্‌বিনো ৭৯
রুআহা ১৬৯
নিনিকুমারীর বাঘ ২৭৩

গ্রন্থ-পরিচয় ৩৪৯

গুগুনোগুম্বারের দেশে

www.pathagar.net

আমরা। পথ। হারিয়েছি।

কথা তিনটে কেটে কেটে, ওজন করে করে, থেমে থেমে, যেন নিজের মনেই বলল ঋজুদা।

আমরা একটা কোপির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোপি হল এক ধরনের পাহাড়। তখন ভর-দুপুর। সামনে দূরদিগন্তে কতগুলো ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া গাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া আর কোনো বড় গাছ বা পাহাড় বা অন্য কিছুই নেই। বিরাট দলে জেব্রারা চরে বেড়াচ্ছে বাঁ দিকে। ডান দিকে একদল থমসনস গ্যাজেল। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভুষুণ্ডা আর টেডি মহম্মদ মাথা নিচু করে ল্যাব্রাডার গান-ডগের মতো মাটি শুঁকে-শুঁকে পথের গন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে হাজার-হাজার মাইল সাভানা ঘাসের রাজ্যে। নীচে আমাদের ছাইরঙা ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িটা ট্রেলারের মধ্যে তাঁবু এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সমেত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কোপির ছায়ায়।

আমি ঋজুদার মুখের দিকে চাইলাম।

খাকি, গোর্খা টুপিটা খুলে ফেলেছে ঋজুদা। মাথার চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে। দাঁতে-ধরা পাইপ থেকে পোড়া তামাকের মিষ্টি গন্ধভরা ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে পেছনে। কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমি মনে-মনে একটু-আগে-শোনা ঋজুদার কথা ক'টি আবৃত্তি করলাম।

আমরা। পথ। হারিয়েছি।

এবং করেই, ঐ সামান্য তিনটি কথার ভয়াবহতা প্রথমবার বুঝতে পারলাম।

ঋজুদা আফ্রিকাতে আমাকে আনতে চায়নি। মা-বাবারও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। সব আমারই দোষ। আমিই নাছোড়বান্দা হয়ে ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরে এসেছি।

ভুষুণ্ডা আর টেডি আস্তে-আস্তে ফিরে আসছে আবার গাড়ির দিকে। ঋজুদা ওদের ফিরে আসতে দেখে কোপি থেকে নীচে নামতে লাগল। আমিও পিছন-পিছন নামলাম। আমরা যখন ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ওরাও ফিরে এল। ওদের মুখ শুকনো। মুখে ওরা কিছুই বলল না।

ঋজুদা গাড়ির পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে, বনেটের উপর বিছিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার উপর। পড়েই, আমাকে বলল, "দ্যাখ তো রুদ্র, ট্রেলারের এবং জীপের পেছনে সবসুদ্ধু ক'টা জেরিক্যান আছে আমাদের। আর এঞ্জিনের সুইচ টিপে দ্যাখ গাড়ির ট্যাঙ্কে আর কত পেট্রল আছে।"

আমি পেট্রলের হিসেব করতে লাগলাম। ঋজুদা ম্যাপ দেখতে লাগল। তেলের অবস্থা দেখে, জেরিক্যান গুনে, হিসেব করে বললাম, "হাজার কিমি যাওয়ার মতো তেল আছে আর।"

ঋজুদা বলল, "বলিস কী রে ? তাহলে তো অনেকই তেল আছে !"

তারপরই, ঐ অবস্থাতে ও আমার দিকে ফিরে বলল, "আর তোর তেল ? ফুরোয়নি তো এখনও ?"

আমি ফ্যাকাসে মুখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম, "মোটেই না। আমার তেল অত সহজে ফুরোয় না।"

আমি বুঝলাম, ঋজুদা আমাকে সাহস দিচ্ছে। আসলে আমি জানি যে, আফ্রিকার এই তেরো হাজার বর্গকিমির সাভানা ঘাস-বনে পথ-হারানো আমাদের পক্ষে মোটে হাজার মাইল যাওয়ার মতো তেল থাকা মোটেই ভরসার কথা নয়।

ঋজুদার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ভুষুণ্ডা মাটিতে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল। টেডি পেছনের গাড়ির মাডগার্ডে হেলান দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঋজুদা বলল, "লেটস্ গো।"

আমি বললাম, "কোন দিকে ?"

ঋজুদা বলল, "ডিউ নর্থ।"

তারপর গাড়ির বাঁ দিকের দরজা খুলে উঠতে-উঠতে বলল, "তুই-ই চালা। আমি একটু পাইপ খেয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই।"

ভুষুণ্ডা আর টেডি পেছনে বসল।

সুইচ টিপে গীয়ারে দিলাম গাড়ি। তারপর একটু লাফাতে-লাফাতে হলুদ সোনালি হাঁটু সমান ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ঋজুদাকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন। সেরেঙ্গেটির ঘাসবন ও গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যেসব চোরা-শিকারীরা আছে তাদের সম্বন্ধে একটি পেপার সাবমিট করতে হবে ঋজুদাকে। এই অভিযানের সব খরচ জুগিয়েছেন সোসাইটি। পূর্ব আফ্রিকার তান্‌জানিয়ান সরকার ঋজুদাকে সবরকম স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজেদের প্রয়োজন এবং প্রাণরক্ষার জন্যে আমরা যে-কোনো জানোয়ার শিকার করতে পারব। চোরা-শিকারীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণসংশয় হয় তবে আমরা তাদের উপর গুলিও চালাতে পারি। তার জন্যে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কিন্তু এর মধ্যে কথা একটাই। সমুদ্রে যেমন একা নৌকো, এই ঘাসের সমুদ্রেও তেমনই একা আমরা, একেবারেই একা।

বোম্বে থেকে প্লেনে ডার-এস-সালামে এসেছিলাম, সেশেলস্ আইল্যাণ্ডস্ হয়ে। তারপর ডার-এস-সালাম থেকে কিলিম্যানজারো এয়ারপোর্টে। মাউন্ট কিলিম্যানজারোর কাছের সেই এয়ারপোর্ট থেকে ছোট প্লেনে করে এসে পৌঁছেছিলাম সেরোনারাতে। সেখানেই আমাদের জন্যে এই ল্যান্ড-রোভার, মালপত্র এবং ভুষুণ্ডা ও টেডি অপেক্ষা করছিল। তিনমাস আগে আরুশাতে এসে ঋজুদা ভুষুণ্ডা ও টেডিকে ইন্টারভ্যু করে মালপত্রের লিস্ট বানিয়ে ওখানে দিয়ে এসেছিল। ওরা দুজনই ল্যাণ্ড-রোভারটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে আরুশা থেকে লেক মনিয়ারা এবং গোরোংগোরো হয়ে, সেরোনারাতে।

মোটে দশদিন বয়স হয়েছে আমাদের এই অভিযানের। গোলমালটা ভুষুণ্ডাই করেছে। ওরই ভুল নির্দেশে গত কদিনে আমরা ক্রমাগত আড়াই হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি বৃত্তেই ঘুরে বেড়িয়েছি। চোরা-শিকারীদের সঙ্গে একবারও মোলাকাত হয়নি, কিন্তু একটি হাতির দল আমাদের খুবই বিপদে ফেলেছিল। যা পেট্রল ছিল তাতে আমাদের গোরোংগোরোতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল সহজেই—অভিযানের পর্ব শেষ করে। ওখানে পেট্রল স্টেশান আছে। যে পথ ধরে ট্যুরিস্টরা যান, স্বাভাবিক কারণেই সেই পথে আমরা যাইনি। কারণ চোরা শিকারীরা ঐ পথের ধারেকাছেও থাকে না ; বা আসে না। ট্যুরিস্টরা যে-পথে যান সেও সেই রকমই। ধু-ধু, হাজার-হাজার মাইল ঘাসবনে একটি সরু ছাইরঙা ফিতের মতো পথ চলে গেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা তাতেও না গিয়ে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে ম্যাপ দেখে এবং ভুষুণ্ডা ও টেডির সাহায্যে গাড়ি চালাচ্ছি।

ভুষুণ্ডা চিরদিন এই সাভানা রাজ্যেই শিকারীদের কুলির কাজ করেছে। পায়ে হেঁটে মাসের পর মাস এই ঘাসবনে কাটিয়েছে প্রতি বছর। এইসব অঞ্চল নিজের হাতের রেখার মতোই জানা ওর। অথচ আশ্চর্য ! ভুষুণ্ডাই এ-রকম ভুল করল !

কম্পাসের কাঁটাতে চোখ রেখে স্টীয়ারিং সোজা করে শক্ত হাতে ধরে অ্যাকসিলারেটরে সমান চাপ রেখে চালাচ্ছি আমি। তিরিশ মাইলের বেশি গতি নেই। বেশি জোরে চালানোতে বিপদ আছে। হঠাৎ ওয়ার্ট-হগদের গর্তে পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই ওয়ার্ট-হগগুলো অদ্ভুত জানোয়ার ! অনেকটা আমাদের দেশের শুয়োরের মতো দেখতে। কিন্তু অন্যরকম। ওরা যখন দৌড়োয়, ওদের লেজগুলো তখন উঁচু হয়ে থাকে আর লেজের ডগার কালো চুলগুলো পতাকার মতো ওড়ে। ওরা মাটিতে দাঁত দিয়ে বড়-বড় গর্ত করে এবং তার মধ্যেই থাকে—ঐ গর্তে শেয়াল ও হায়নারাও আস্তানা গাড়ে মাঝে মাঝে। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে ও-রকম গর্ত আছে আগে থাকতে বোঝা যায় না—তাই খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়।

কেউ কোনো কথা বলছে না। গাড়ি চলছে, পিছনে ধুলোর হালকা মেঘ উড়িয়ে। এখানের ধুলো আমাদের দেশের ধুলোর মতো মিষ্টি নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত নানারকম ধাতব পদার্থ মিশে আছে মনে হয় এইসব জায়গার ধুলোয়। ধুলোর রঙও কেমন লালচে-কালচে সিমেন্টের মতো। ভীষণ ভারী। নাকে কানে ঢুকলে জ্বালা করতে থাকে।

গাড়ির দুদিকেই নানারকম জানোয়ার ও পাখি দেখা যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে। কত যে জানোয়ার তার হিসেব করতে বসলে হাজার পেরিয়ে লক্ষে পৌঁছনো কঠিন নয়। দলে দলে থমসনস গ্যাজেল, গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপী, এলাণ্ড, জেব্রা, ওয়াইল্ড-বীস্ট। চুপি-চুপি শেয়াল। রাতের বেলায় বুক-হিম-করা-হাসির হায়না। কোথাও বা একলা সেক্রেটারি বার্ড মাথার ঝাঁকড়া পালকের টুপি নাড়িয়ে বিজ্ঞের মতো একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথাও ম্যারাবু সারস। কোথাও একা বা দোকা উটপাখি বাঁই-বাঁই করে লম্বা-লম্বা ন্যাড়া পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে। জিরাফগুলো এমন করে দৌড়োয় যে, দেখলে হাসি পায়। মনে হয় ওদের পাগুলো বুঝি হাঁটু থেকে খুলে বেরিয়ে যাবে যখন-তখন।

প্রথম দু-তিন দিন অত-সব জানোয়ার দেখে আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে যে, যেন চিরদিন আমি আফ্রিকাতেই ছিলাম। জানোয়ার দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেল। সিংহও দেখেছি পাঁচবার এই ক'দিনে দিনের বেলা। উদ্‌লা মাঠে। তারাও

একা নয় ; সপরিবারে। আমাদের দিকে অবাক চোখে দূর থেকে চেয়ে থেকেছে।

ঋজুদা বলল, "কত কিলোমিটার এলি রে ?"

আমি গাড়ির মিটার দেখে বললাম, "সত্তর কিলোমিটার।"

ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, "দু'ঘন্টায় !" তারপর নিজের মনেই বলল, "নট ব্যাড।"

এদিকে সূর্য আস্তে-আস্তে পশ্চিমে হেলছে। এখানে গাছগাছালি নেই, তাই ছায়া দেখে বেলা বোঝা যায় না।

দূরদিগন্তে হঠাৎ একটি নীল পাহাড়ের রেখা ফুটে উঠল।

টেডি বিড়বিড় করে বলল, "মারিয়াবো। মারিয়াবো।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "পোলে পোলে : পোলে সানা।"

ঋজুদা বলল, "পোলে পোলে কেন ? কী হল টেডি ?"

সোয়াহিলি ভাষায় 'পোলে পোলে'র বাংলা মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে।

টেডি বলল, "মাসাইরা থাকে ঐ পাহাড়ের নীচে। ওদিকে যেতে সাবধান। ওয়াণ্ডারাবোরাও চলে আসে মাঝে মাঝে।"

ভুষুণ্ডার চোয়াল শক্ত। ও কথা বলছিল না কোনো।

ওদের দুজনের মধ্যে ভুষুণ্ডা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে, কম কথা বলে ; টেডির চেয়ে ভাল ইংরিজিতে বাতচিত্ চালায় আমাদের সঙ্গে। টেডির চেয়ে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও। টেডির স্বভাবটা ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু সে সাড়ে ছ'ফিট লম্বা। ওর হাতের আঙুলগুলো কলার কাঁদির মতো। আর ভুষুণ্ডা বেঁটেখাটো, কার্পেটের মতো ঘন ঠাসবুনুনির কোঁকড়া চুল মাথায়। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর জিনের প্যান্টের পকেট থেকে বের করে সিগারেট খায়। টেডি সিগারেট খায় না ; নস্যি নেয়। ওর সেই নস্যি আবার মাঝে-মাঝে হাওয়াতে উড়ে এসে আমাদের নাকে আচমকা পড়ে দারুণ হাঁচায়।

পরশু দিন একটা থমসনস গ্যাজেলের বাচ্চাকে শেয়ালের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমরা। তাকে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রেখেছি। শুধু মুখটা বের করে সে চকচকে চোখে চেয়ে থাকে। হরিণ-ছানাটার নাম রেখেছি আমি কারিব্যু। সোয়াহিলি ভাষায় কারিব্যু মানে স্বাগতম্। সেই ছোট্ট হরিণটা বেদম হাঁচতে শুরু করে দিলে হঠাৎ।

ঋজুদা পিছন ফিরে টেডিকে বলল, "টেডি, তোমার নস্যি ওর নাকে গেছে। হাঁচতে-হাঁচতে মরার চেয়ে হায়নার হাতে মরা কারিব্যুর পক্ষে অনেক সুখের ছিল।"

টেডি ঋজুদার কথায় হেসে উঠে বাচ্চাটাকে আদর করে বলল, "নুজরি, নুজরি।"

মানে, ভালই আছে, ভালই আছে ; কিছুই হয়নি ওর।

তারপরই বলে উঠল, "কোনো মরাই সুখের নয় বানা। সে হেঁচেই মরো, আর নেচেই মরো। এই যেমন আমাদের এখানের ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরা।"

ওর কথা শুনে ঋজুদা হেসে উঠল। আফ্রিকার এই ঘাসের সমুদ্রে পথ হারিয়ে যাওয়ার পরও এত হাসি আসছে কী করে ঋজুদার তা ঋজুদাই জানে। তাছাড়া, এই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরা ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেই।

সেরেঙ্গেটিতে খুব সেৎসি মাছি। বড় বড় কালো কালো মাছি। আমাকে পরশু একটা কামড়েছিল। অসহ্য লাগে কামড়ালে। কলকাতার একশোটা মশা একেবারে কামড়ালেও বোধহয় অমন লাগত না।

এই সেৎসি মাছির কামড়ে এক রকমের অসুখ হয় আফ্রিকাতে। তাকে ওরা সোয়াহিলিতে বলে নাগানা। ইংরিজিতে বলে ইয়ালো-ফিভার। রুগীর খুব জ্বর হয়,

শরীর হলুদ হয়ে যায়, মাথার গোলমাল দেখা দেয়, আর রুগী পড়ে-পড়ে শুধুই ঘুমোয়। তাই এই অসুখের আরেক নাম স্লিপিং-সিক্‌নেস। অনেকরকম সেৎসি মাছি আছে এখানে। সব মাছি কামড়ালেই যে এই অসুখ হবে এমন নয়, কিন্তু কামড়াবার আগে তাদের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেখানোর কথা বলা তো যায় না মাছিদের।

এই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরার অসুখকে টেডিরা যমের মতো ভয় পায়।

ঋজুদা আর আমিও আফ্রিকাতে আসবার আগে খিদিরপুরে গিয়ে ইয়ালো-ফিভারের প্রতিষেধক ইনজেকশান নিয়ে এসেছিলাম। ভীষণ লেগেছিল তখন। কিন্তু সেৎসি মাছি যখন সত্যি-সত্যি কামড়াল তখন মনে হয়েছিল যে, ইনজেকশানের ব্যথা কিছুই নয়।

উচ্চারণ সেৎসি যদিও, কিন্তু বানানটা গোলমেলে। ইংরিজি বানান হচ্ছে Tsetse।

আসলে, এখানে এসে অবধি দেখছি বানান নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল। গোরোংগোরো বলছে উচ্চারণের সময়, কিন্তু বানান লিখছে NGORONGORO। সোয়াহিলি শব্দের উচ্চারণে প্রথম অক্ষর যেখানে-সেখানে লোপাট হয়ে যাচ্ছে ; যেন তারা বেওয়ারিশ।

এইসব ভাবতে-ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঋজুদা আমার স্টীয়ারিং ধরা হাতের ওপরে হাত ছোঁয়াল। ব্রেকে পা দিলাম। ঐ মারিয়াবো পাহাড়শ্রেণীর সামনে এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মানুষ আছে ? ঘাসবনে আগুনও লাগতে পারে। কিন্তু বনে আগুন লাগার ধোঁয়া অন্যরকম হয়। জায়গাটা মাইল দশেক দূরে।

ঋজুদা বলল, "গাড়ি থামা।"

বললাম, "এগোব না আর ?"

ঋজুদা বলল, "গাধা !"

ভাগ্যিস ভুষুণ্ডা আর টেডি বাংলা জানে না।

আমি বললাম, "এগোবে না কেন ?"

ঋজুদা বলল, "পাহাড়ের কাছ থেকে আমাদের গাড়ি সহজেই দেখতে পাবে ওরা। ওই সেরেঙ্গেটিতে আইনত কোনো মানুষের থাকার কথা নয়। যারা ওখানে উনুন ধরিয়েছে বা অন্য কিছুর জন্যে আগুন জ্বেলেছে তারা নিশ্চয়ই আইন মানে না। আমরা ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধের অন্ধকারও নেমে আসবে। আজ এখানেই ক্যাম্প করা যাক। আসন্ন রাতে এগোনো ঠিক হবে না।"

নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "তুই কী বলিস রুদ্র ?"

আমি বললাম, "ওরা আমাদের দেখেই যদি থাকে, তাহলেও তো রাতের বেলা আক্রমণ করতে পারে।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "রুদ্রবাবু একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে যেন !"

আমি বললাম, "ভয় নয়, সাবধানতার কথা বলছি।"

ঋজুদা বলল, "দেখে থাকতেও পারে, না-ও দেখে থাকতে পারে। তবে যদি দেখে থাকে, তাহলেও আক্রমণও করতে পারে। এবং সেই জন্যে রাতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে ; পালা করে পাহারা দিতে হবে। আক্রমণ করতে গেলে তাদেরও তো এই দশ মাইল ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে। তাই পাহাড় থেকে এই দূরেই তাঁবু ফেলতে চাই। এলে তাদের দূর থেকে দেখা যাবে।

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

তারপর ঋজুদা আর টেডি নীচের ঘাস পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল।

আমি আর ভুষুণ্ডা চায়ের জল বসিয়ে দিলাম স্টোভে। এখানে খুব সাবধানে

আগুন-টাগুন জ্বালতে হয়। যখন-তখন ঘাসে আগুন লেগে যেতে পারে।

তাঁবু খাটাতে-খাটাতে ঋজুদা বলল, "চা-ই কর রুদ্র। রাতে বরং খাওয়া যাবে।"

তারপর বলল, "তুই প্রথম রাতে জাগবি, না শেষ রাতে?"

আমি বললাম, "একবার ঘুমিয়ে পড়ল ঠাণ্ডাতে মাঝরাতে ঘুম ছাড়ে না চোখ। আমি প্রথম রাতে জাগি; তুমি শেষ রাতে।"

তারপর শুধোলাম, "কটা অবধি জাগব আমি?"

ঋজুদা বলল, "বারোটা অবধি জাগিস। খেয়েদেয়ে আমরা তো নটার মধ্যেই শুয়ে পড়ব সব শেষ করে। নটা থেকে বারোটা, তিন ঘন্টা ঘুমুলেই বাকি রাত জাগতে পারব আমি। রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার। তাকে কি বেশি কষ্ট দেওয়া যায়! অনার্ড গেস্ট। ক্যাল্‌কেশিয়ান মাখনবাবু!"

আমি বললাম, "ঋজুদা! অনেক বছর আগেও আমাকে যা বলতে, এখনও তাইই বলবে এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

ঋজুদা বলল, "আলবত বলব, আজীবন বলব; তোর যখন আশি বছর বয়স হবে তখনও বলব, অবশ্য যদি তখন আমি বেঁচে থাকি!"

হঠাৎ-হঠাৎ এই সব কথায় আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়। ঋজুদার সঙ্গে গত কয়েক বছর বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এমনই দশা হয়েছে আমার যে, ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঋজুদা না থাকলে আমার কী হবে?

কলকাতায় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেখানে যে আকাশ দেখা যায় না। তারা, চাঁদ, সূর্য কিছুই দেখা যায় না। সেখানে কখন ভোর হয় কেউই খোঁজ রাখে না তার। সন্ধে, চুপিসারে দিগন্তে দিগন্তে আলোছায়ার কত দারুণ দারুণ ছবি এঁকে রোজ কেমন করে নিত্যনতুন হয়ে আসে, অথবা চলে-যাওয়া দিনের সঙ্গে ফিরে-আসা রাতের কোন্ আঙিনাতে কেমন করে দেখা হয় রোজ-রোজ, তার খবরও কেউই নেয় না। হাওয়ায় সেখানে ডিজেল আর কয়লার ধোঁয়া, সেখানে গাছ্ থেকে একটি পাতা খসে পড়ার যে সুস্পষ্ট আওয়াজ তা কেউই শোনে না, শুনতে পায় না; পায় না জানতে শিশিরের পায়ের শব্দ, দুপুরের একলা ভীরু পাখির চিকনগলার ডাক, অথবা ভোরের পাখিদের গানও শোনে না সেখানে কেউ। ফুলের গন্ধ পায় না নাকে। তাদের নাক, কান, চোখ সব অকেজো, অব্যবহৃত যন্ত্রের মতোই তারা মিছিমিছি বয়ে বেড়ায়। তাদের মন আটকে থাকে পাশের বাড়িতে, গলির মোড়ে, অফিসের ঘর অথবা রাস্তার ভিড়ে। দিগন্তরেখা কাকে বলে, বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি কী, উদারতা কোথায় অনুভব করা যায়—এসব কিছুরই খবর জানে না শহরের মানুষ। অথচ আমাদের সকলেরই হাতের কত কাছে এই সবই ছিল এবং আজও আছে তা ঋজুদা যদি এমন করে আমাকে হাতে ধরে না চেনাত, না বোঝাত, তাহলে বুঝতাম বা চিনতাম কি কখনও? ঋজুদাই তো হাত ধরে নিয়ে এসে এই আশ্চর্য আনন্দের, অনাবিল, সুন্দর, সুগন্ধি বনের কাকলিমুখর জগতে, প্রকৃতিমায়ের কোলে এনে বসিয়ে আমাকে আসল মজার উৎস, আসল আনন্দের ফোয়ারার খোঁজ দিয়েছে।

আমি যে ঋজুদার কাছ থেকে কী পেয়েছি তা আমার ক্লাসের কোনো বন্ধুই জানবে না। ভাবতেও পারে না ওরা। সেই কারণেই শুধু আমিই জানি, ঋজুদা কখনও "থাকব না" বললে কেন আমার এত পাগল-পাগল লাগে!

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে নিচু হয়ে সূর্যটা একটা বিরাট

কমলা-রঙা বলের মতো ঘাসের হলুদ দিগন্তকে কমলা আলোর বন্যায় ভাসিয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তারপরও বহুক্ষণ গাঢ় ও ফিকে গোলাপির আভা লেগে রইল আকাশময়।

ঘাস পরিষ্কার করে নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তারই চারপাশে বসেছি আমরা চারজনে। ভুষুণ্ডা আমাদের পথপ্রদর্শক, অন্য কাজ করতে বললে বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করে। আমরা বলিও না। টেডি রান্না চাপিয়েছে। আমি থমসন্স গ্যাজেলের বাচ্চাটাকে কোলে করে বসে আছি। ওর গলার কাছের শেয়ালের কামড়ের ঘা এখনও শুকোয়নি। খুব ভাল করে লাল মার্কুরিওক্রোম লাগিয়ে দিয়েছিল টেডি।

ঋজুদা যখন আরুশাতে এসেছিল তখন ওর একজন আফ্রিকান বন্ধু একটা মীরশ্যাম্ পাইপ উপহার দিয়েছিলেন। আরুশাতে একটি কোম্পানি আছে, তারা মীরশ্যাম্ কাদা দিয়ে পাইপ, অ্যাশট্রে, ফুলদানি ইত্যাদি বানায়। মীরশ্যাম্ আসলে সমুদ্রের এক বিশেষ রকম কাদা। এ দিয়ে তৈরি পাইপের রঙ বদলাতে থাকে খাওয়ার সময়, আগুনের তাপের সঙ্গে সঙ্গে। অর্গানিন ব্ল্যাকউড্-এর লেখা শিকারের বইয়ে প্রথম এই মীরশ্যাম্ পাইপের কথা পড়ি আমি।

টেডি সকলের জন্যে একটিই পদ রান্না করেছে। খিচুড়ির মতো। কিন্তু ঠিক আমাদের খিচুড়ির মতো নয়। ওরা সোয়াহিলি ভাষায় বলে, উগালি। ভুট্টার দানার মধ্যে গ্রান্টস্ গ্যাজেলের মাংস দিয়ে সেই উগালি রান্না হচ্ছে। দারুণ গন্ধ ছেড়েছে। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। একটি গ্রান্টস গ্যাজেল ও একটি থম্সন্স গ্যাজেল শিকার করে আমরা তাদের মাংস স্মোকড় করে নিয়েছি। ট্রেলারের মধ্যে বস্তা করে রাখা আছে সে-মাংস।

পাইপের তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে হাওয়ায় আর মীরশ্যাম্ পাইপের রঙ-বদলানো দেখছি। ভুষুণ্ডা ম্যাপটা খুলে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলছে। মাঝে-মাঝে সোয়াহিলিতেও বলছে। এখানে আসার আগেই ঋজুদা সোয়াহিলি শিখে নিয়েছে মোটামুটি। আমাকেও একটা বই দিয়েছিল, কিন্তু কয়েকটা শব্দ ছাড়া বেশি শিখিনি আমি। বড় খটমট শব্দগুলো। জাম্বো মানে হ্যালো, সিম্বা মানে সিংহ, টেম্বো মানে হাতি, চুই মানে লেপার্ড। কারো সঙ্গে দেখা হলে ইংরিজিতে যেমন আমরা বলি হ্যালো বা আমেরিকান-ইংরিজিতে হাই! সোয়াহিলিতে সেই সম্বোধনকে বলে জাম্বো! আমি যদি কাউকে বলি জাম্বো, সে উত্তরে বলবে সিজাম্বো।

শীত বেশ বেশি। যদিও এখন জুলাই মাস, কিন্তু আফ্রিকাতে এখন শীতকাল। হাজার-হাজার মাইল ঘাসবনের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে হু-হু করে। আমার উইণ্ড-চিটারের কলারের কোনাটা পত্পত্ করে উড়ছে। ঋজুদার জার্কিনের বুকপকেট থেকে টোবাকোর পাউচটা উঁকি মারছে আর ডানদিকের নীচের পকেটের মধ্যে পয়েন্ট থ্রি কোল্ট পিস্তলটা পোঁটলা হয়ে আছে।

কথাবার্তা শুনে মনে হল, ভুষুণ্ডার আপত্তি আছে ভীষণ মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যেতে। ও বলছে, ওদিকে চোরা-শিকারীদের এত বড় আস্তানা আছে এবং ওদের কাছে এতরকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে যে, আমাদের ওরা গুলিতে ভেজে নিয়ে খেয়ে ফেলবে বেমালুম।

ঋজুদা জেদ করছে, আজ রাতে কোনো ঘটনা না ঘটলে কাল সকালে আমরা ওদিকেই যাব।

ঋজুদার সিদ্ধান্তে ভুষুণ্ডা বেশ অসন্তুষ্ট হল। যে-লোক গাইডের কথা না শুনে নিজের মতেই চলে, তার গাইডের দরকার কী? এই কথা বলল ভুষুণ্ডা বেশ জোর গলায়।

তার উত্তরে ঋজুদা বলল, “যে গাইড সেরেঙ্গেটির মধ্যে রাস্তা ও দিক হারিয়ে ফেলে তেমন গাইড থাকা-না-থাকা সমান।”

ঋজুদা কখনও এমন করে কথা বলে না কাউকে। তাই অবাক হলাম। তারপর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ঋজুদা ভুষুণ্ডাকে বলল, “ইচ্ছে করলে, যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনোদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো।”

এই কথা শুনে আমি ভয়ও পেলাম, চমকে উঠলাম।

ভুষুণ্ডা ঠাণ্ডা চোখে ঋজুদার দিকে চাইল।

ঋজুদা ভুষুণ্ডার চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে, ভুষুণ্ডার চোখে নিজের চোখ দিয়ে এক বালতি বরফ জল ঢেলে দিল।

ব্যাপার বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। এসে বিদেশ-বিভুঁই, হাজার-হাজার মাইল জনমানবহীন হিংস্র জানোয়ারে, নানারকম দুর্দান্ত উপজাতিতে এবং সাংঘাতিক সব চোরা-শিকারীতে ভরা আফ্রিকার বন-জঙ্গলে স্থানীয় গাইড ছাড়া আমরা কী করে চলব তা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। গাইড থাকতেও পথ হারালাম। আর গাইড না থাকলে যে কী হবে। এদিকে তেলও বেশি নেই সঙ্গে। তেল ফুরোলে তো গাড়ি ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু কোনদিকে যাব? হাজার-হাজার মাইল তো আর পায়ে হেঁটে যেতে পারব না। খাওয়ার জলের অভাবে তো এমনিতেই মরে যাব, খাবারের অভাবে যদি না-ও মরি।

ঋজুদাকে বললাম, “ঋজুদা, তুমি রেগে গেছ, কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ভেবে দ্যাখো।”

ঋজুদা বলল, “খুব ভাল হচ্ছে। তুই পাকামি না করে রান্নার কতদূর দ্যাখ। দরকার হলে টেডিকে সাহায্য কর একটু।”

আমি চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, সাহায্য আর কী করব? রাঁধছে তো শুধু উগালি। তাও প্রায় হয়ে এসেছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। ভুষুণ্ডা গাড়িতেই শোয়। টেডি ভীষণ লম্বা বলে গাড়িতে শুতে পারে না। ছোট তাঁবুটাতে শোয় ও। আমি আর ঋজুদা শুই বড় তাঁবুটাতে। আজ আমি শোব না এখন। পাহারা দিতে হবে। তাই রাইফেলে গুলি ভরে, টুপি পরে আমি তাঁবুর বাইরে আগুনের পাশে ক্যাম্প-চেয়ারে বসলাম। বাইরে যদি শীত বেশি লাগে, তবে মাঝে-মাঝে ল্যান্ড-রোভারের সামনের সীটেও গিয়ে বসব।

ঋজুদা বলল, “কিছু দেখতে পেলে আমাকে ডাকিস। আর ঠিক রাত বারোটাতে তুলে দিস আমাকে।”

বললাম, “আচ্ছা।”

ঋজুদা পরদা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমি ক্যাম্পচেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধু পা-দুটো লম্বা করে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেডি মহম্মদের নাক-ডাকার আওয়াজ সেই প্রায়-নিস্তব্ধ রাতের ঘাসবনে বিকট হয়ে উঠল। সেই ডাকের কী আরোহণ অবরোহণ, কত গমক আর গিটকিরি। টেপ-রেকর্ডার আছে সঙ্গে, কিন্তু তাতে টেডির নাক-ডাকার আওয়াজ টেপ করলে ঋজুদা মার লাগাবে। তাঁবুর মধ্যে, পিস্তলের গুলি খুলে আবার পিস্তল কক্ করার শব্দ শুনলাম। রি-লোড করে পিস্তল কক্ করল ঋজুদা, তার শব্দ শুনলাম। রোজ শোবার সময় মাথার বালিশের নীচে পিস্তলটাকে রাখে ঋজুদা। আর সারাদিন জার্কিনের

কোটের পকেটে।

গাড়ির মধ্যে ভুষুণ্ডা ঘুমুচ্ছে। কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে নড়াচড়ার উসখুস আওয়াজ।

আধ ঘন্টা পর শুধু টেডির নাকডাকার আওয়াজ ছাড়া অন্য আর কোনো আওয়াজই রইল না।

একটু পরে আগুনটা ফিসফিস করে কী যেন বলে নিভে গেল। কাঠের না যে, অনেকক্ষণ জ্বলবে। কটন ওয়েস্ট-এর সঙ্গে পোড়া মবিল মিশিয়ে তার সঙ্গে টুকিটাকি ও ঘাসটাস ফেলে আগুন করা হয়েছিল। কাল থেকে আগুন জ্বালারও কিছু রইল না। সঙ্গে কোরোসিনের স্টোভ আছে অবশ্য, তাতেই রান্না হবে।

উপরে তারাভরা আকাশ। এখন একটু চাঁদও উঠেছে। হাওয়াটা আরও জোর হয়েছে। হঠাৎ পিছন দিক থেকে হাঃ হাঃ হাঃ করে বুকের ভিতরে চমক তুলে হায়না ডেকে উঠল। তারপর ঘাসের মধ্যে খসখস করে তাদের এদিকে এগিয়ে আসবার শব্দ পেলাম।

কারিব্যুর ঘা-টা এখনও পুরো শুকোয়নি। হয়তো রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকবে হায়নাগুলো। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা ওদের দিকে ফেললাম। ওরা কিছুক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

হঠাৎ কী একটা জন্তু উড়তে-উড়তে, লাফাতে-লাফাতে এদিকে আসতে লাগল। জানোয়ারটা ছোট। কী জন্তু যে, তা বুঝতে পারলাম না। সামনে থেকে টর্চ ফেললাম। দেখলাম লোমওয়ালা একটা জানোয়ার—আমাদের দেশের বড় হিমালয়ান কাঠবিড়ালির মতো অনেকটা—গায়ের রঙ যদিও অন্যরকম। আর যেই সেই জানোয়ারটা আমাদের তাঁবুকে পাশে রেখে, তাঁবু দেখে ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে সরে যেতে গেল তখন পাশ থেকে আলো ফেলতেই চোখ জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে। কিন্তু একটা চোখ। অথচ যখন সামনাসামনি আলো ফেলেছিলাম তখন একবারও জ্বলেনি চোখ দুটো। কী জন্তু কে জানে? কাল জিজ্ঞেস করতে হবে ঋজুদাকে। এমন কিছু আমাদের দেশের জঙ্গলে দেখিনি, আফ্রিকাতে আছে বলে পড়িওনি।

উড়ে-যাওয়া জন্তুটা যে-দিকে মিলিয়ে গেল সেই দিকে চেয়েছিলাম, এমন সময় দূর থেকে বারবার সিংহের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই পায়ে-পায়ে জোর খুরের শব্দ তুলে ওয়াইল্ড্ বীস্টদের বিরাট একটি দল তাঁবুর দুশো গজের মধ্যে দিয়ে শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ উড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। সিংহের দল বোধহয় তাড়া করেছে ওদের।

ঠাণ্ডা লাগছিল বেশ। গিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের দরজা খুলে বসলাম। ভুষুণ্ডা গাঢ় ঘুমে আছে মনে হল। কোনো সাড়াশব্দই নেই।

মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে-থাকতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে যাব কটা বাজে, এমন সময় মনে হল, মারিয়াবো পাহাড়ের দিক থেকে কী একটা জানোয়ার আসছে এদিকে। একলা জানোয়ারটা বেশ কাছে এসে গেছে। তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে খুব ভাল করে তাকালাম ওদিকে।

আশ্চর্য। জানোয়ার তো নয়। মনে হচ্ছে মানুষ। দুবার চোখ কচলে নিলাম। পৃথিবীর মানুষ এ-রকম হয়? কী লম্বা! প্রায় সাত ফিটের মতো হবে। চলে আসছে

সোজা হয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে অদ্ভুত পোশাক তার। হাতে একটা বিরাট লম্বা লাঠি।

টর্চ ফেলব কি-না ভাবলাম একবার। তারপর ভাবলাম, ঋজুদাকে ডাকি। আরেকবার ভাবলাম, ঘড়িটা দেখি কটা বেজেছে ; কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কে যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। এই কি তবে টেডির উন্‌কুলুকুলু ? সেদিন রাতে টেডি আমাকে এই গল্প বলেছিল।

লোকটি যখন আরো কাছে এসে গেছে তখন কানের কাছে হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে বলল, "মাসাই চীফ্। গ্রেট ট্রাবল্। শূট্ হিম্। কিল হিম্।"

এক পলকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, ভুষুণ্ডা গাড়ির ভিতরে সোজা শক্ত হয়ে বসে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ঐদিকেই তাকিয়ে আছে।

রাইফেলটা কাঁধে তুললাম। কাঁধে তুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। তারপরে রাইফেল স্টেডি পজিশানে ধরে ট্রিগারের দিকে হাত বাড়ালাম। ঠিক সেই অবস্থাতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, মানুষটা অন্য মহাদেশের অজানা ভাষা-বলা কোনো অদ্ভুত মানুষ বটে, বিকট দেখতে বটে, কিন্তু সে তো আমার কোনো ক্ষতি করেনি। সে চোরা-শিকারী কি না, তাও জানি না। ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে গুলি করে মারতে পারব কি আমি ? আমার হাত কাঁপবে না ?

ভুষুণ্ডা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "য়্যু ডোন্ট কিল, হি কিল য়্যু !"

আমি ট্রিগারে হাত ছোঁওয়ালাম।

ততক্ষণে মানুষটা প্রায় এসে গেছে। সে সোজা আমারই দিকে আসছে।

কী সাহস ! এই রাতে, এইরকম হিংস্র-জানোয়ারে ভরা রাতে একা-একা শুধু একটা লাঠি হাতে দূর থেকে হেঁটে আসার কথা ভেবেই আমার শরীর খারাপ লাগতে লাগল। লোকটা দেখতে পেয়েছে যে, তার বুক লক্ষ করে আমি রাইফেল তুলেছি। তবু তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। পৃথিবীর কোনো মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে এমন কথা বোধহয় তার ভাবনারও বাইরে।

তবে ? লোকটা কি পৃথিবীর মানুষ নয় ? উন্‌কুলুকুলু ?

এ কী ! লোকটা যে এসে গেল ! লালচে-কালো ভারী মোটা কাপড়ের পোশাক, লুঙ্গির মতো অনেকটা ; বুকের কাছে গিঁট দিয়ে বাঁধা। আরেক খণ্ড ঐরকম কাপড় চাদরের মতো জড়ানো বুকে কাঁধে। ডান হাতে ওটা লাঠি নয়, একটা বর্শা, তার সাত ফিট মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু হয়ে আছে। কোমরে বাঁধা আছে একটা প্রকাণ্ড দা। গলায়, কানে, অদ্ভুত সব বড় বড় রঙিন পাথরের আর হাড়ের গয়না। চাঁদের ফিকে আলোতেও তার মুখ আর কপালের রঙিন আঁকিবুঁকি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাইফেল ধরেই আছি, লোকটাও এগিয়েই আসছে, আসছে ; এসে গেল।

ভুষুণ্ডা গাড়ির ভিতর থেকে আবার চাপা গলায় বলল, "কিল হিম, য়্যু ফুলিশ বয়।"

আমাকে বয় বলতেই রেগে গিয়ে যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। আর হুঁশ ফিরে পেয়েই, যেই ট্রিগার টানতে যাব, তার আগেই লোকটা আমার রাইফেলটাকে ঠিক মাঝখানে তার দারুণ লম্বা মিশকালো হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ফেলে ডান দিকে ঠেলে তুলে সরিয়ে দিল। আর সেই অবস্থাতেই, নলের মুখ থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে গুলিটা বেরিয়ে গেল আধো-অন্ধকারে। রাইফেলের গুলির সেই আওয়াজ শূন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল হু-হু হাওয়ার সঙ্গে হাঃ হাঃ হাঃ করে, যেন আমাকেই ঠাট্টা করে।

লোকটা রাইফেলের নলটা ধরেই ছিল। নলটা ঐ অবস্থাতেই ধরে থেকে আমার চোখে

সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কী ভয়াবহ্ জ্বলন্ত দৃষ্টি। কীরকম খোদাই করা কালো মুখ!

তারপরই, এক ঝটকায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এমন সময় ঋজুদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা ডান কাঁধের সামনে তুলে বলল, "জাম্বো!"

লোকটাও বলল, "জাম্বো!"

বলেই পিচিক করে, প্রায় আমার মুখের উপরেই, একগাদা থুতু ফেলল।

তারপর কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বরে ছোট্ট ছোট্ট শব্দে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সেই ভাষা সোয়াহিলি নয়। হয়তো মাসাইদের ভাষা।

ঋজুদা তাকে ক্যাম্প-চেয়ার পেতে বসাল। তারপর তাঁবুর ভিতরে গিয়ে এক টিন কনডেন্স্ড মিল্ক আর একটা আয়না এনে মাসাই চীফ্‌কে উপহার দিল। কাউকে উপহার দেবে বলে, নতুন চকচকে আয়না যে ঋজুদা সঙ্গে করে আনতে পারে আফ্রিকার বনেও, তা আমার জানার কথা ছিল না।

এমন সময় মারিয়াবো পাহাড় যেদিকে, সেই দিক থেকে বহু লোকের গলার চিৎকার এবং দ্রিদিম, দ্রিদিম, দ্রিদিম্ গম্ভীর, গায়ে কাঁটা দেওয়া মাদলের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। লোকগুলো মাঝে মাঝে একসঙ্গে বুক-কাঁপানো চিৎকার করে উঠছিল।

ঋজুদা এসে আমাকে বলল, "তুই একটা ইডিয়ট। আমাকে ডাকলি না কেন? কে তোকে গুলি করতে বলল? দ্যাখ্ তো এখন কী কাণ্ড বাধালি!"

তারপরই বলল, "এক্ষুনি ক্ষমা চাই তুই মাসাই-সর্দারের কাছে। ওরা আমাদের বন্ধু; শত্রু নয়।"

হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। আমরা এই কজন আর ওরা কত লোক। ওরা বর্শা দিয়েই সিংহ শিকার করে শুনেছি, তার উপর বিষাক্ত তীরও আছে ওদের। আমার তলপেট গুড়গুড় করছিল ভয়ে। দূরের মাদলের শব্দে আর চিৎকারে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে, হাত-জোড় করে ক্ষমা চাইলাম আমি।

ঋজুদা কী যেন বলল মাসাই-সর্দারকে। শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করল। এবং সর্দার সঙ্গে-সঙ্গে আরেকবার পিচিক করে থুতু ফেলে একটু থুতু নিজের ডান হাতের তেলোতে নিয়ে দু'হাতের পাতা ভাল করে ভিজিয়ে আমার মুখটাকে দু'হাত দিয়ে ধরল। আমার মনে হল, সিংহের মুখে নেংটি ইঁদুর পড়েছে। আমার মুখটা দু'হাতে ধরা অবস্থাতেই সর্দার আমার মাথার ঠিক মধ্যিখানে আবার সশব্দে থুতু ফেলল। কী দুর্গন্ধ! গা গুলিয়ে উঠল আমার। এর চেয়ে এদের তীর খেয়ে মরাও ভাল ছিল।

ঋজুদার উপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। একে তো হাঁটুগেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাওয়াল, তারপর থুতু খাওয়াল। এখন থুতু দিয়ে চান করাল।

ততক্ষণে ভুষুণ্ডা এবং টেডি মহম্মদও চলে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারে দিগন্তে অসংখ্য মশাল জ্বেলে রংবেরং-এর ঢাল পালক-লাগানো বল্লম হাতে শয়ে শয়ে মাসাইরা এগিয়ে আসছে আমাদের তাঁবুর দিকে।

ওদের আসতে দেখেই ঋজুদার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সর্দার ল্যাণ্ড-রোভারের বনেটের উপরে উঠে দাঁড়াল সাবধানে। টর্চ দিয়ে আকাশে আলো ফেলে-ফেলে সেই আগন্তুক লোকদের যেন কী ইশারা করল। তারপর ডান হাত তুলে বলল, "মারিয়াবো, সিরিঙ্গেট, মিগুংগা; নীয়ারাবোরো।"

বলেই, পিচিক করে আরেকবার থুতু ফেলে এক লাফ দিয়ে গাড়ির বনেট থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক লোকগুলো দূর থেকেই হৈ-চৈ করতে করতে ফিরে যেতে লাগল, যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে। কী সব বলতে বলতে।

ঋজুদা আমাকে বলল, "রুদ্র, এখানে তো স্নানের জল নেই। আমার হ্যাভারস্যাকে বড় এক শিশি ওডিকোলন আছে। বুকে মাথায় মেখে শুয়ে পড় গিয়ে। তোর আর থাকতে হবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।"

মুখ নিচু করে রাইফেলটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ওডিকোলনের শিশি উপুড় করেও কিছুই সুরাহা হল না। সেই দুর্গন্ধ আরো বেড়েই গেল।

শুনেছিলাম, মাসাইরা নাকি শুধু রক্ত আর দুধ খেয়ে থাকে। তাই বোধহয় ওদের থুতুতে এ-রকম দুর্গন্ধ।

উত্তেজনায় ও দুর্গন্ধে ঘুম আসছিল না, তবুও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঋজুদা কোনোদিনও আমাকে ইডিয়ট বলেনি। আজই প্রথম বলল। কিন্তু এতই ভয় পেয়েছিলাম আর উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, এত বড় অপমানটাও সর্দারের থুতুর সঙ্গে হজম করে ফেললাম।

শুয়ে শুয়ে সর্দারের মুখটা মনে করছিলাম। ঋজুদা বলেছিল, মাসাই চীফ-এর নাম নাইরোবি সর্দার।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঋজুদা নিজেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলেছে। কণ্ডেন্সড মিল্ক জলে গুলে, গরম করে নাইরোবি সর্দারকে আদর করে খেতে দিল। সঙ্গে ওয়াইল্ডবীস্টের রোস্ট।

সর্দার শুধুই দুধ খেল, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঐ টিনের দুধ তার মোটেই ভাল ঠেকল না।

সর্দার বলল, "আমরা কাঁচা দুধ খাই, আর রক্ত খাই টাটকা। তোমরা যখন যাচ্ছই আমাদের ওখানে, তখন তোমাদেরও খাওয়াব।"

বলে কী রে? কাল থুতু মেখেছি মুখে-মাথায়, আজ আবার কাঁচা রক্ত খেতে হবে! ঋজুদার সঙ্গে আফ্রিকাতে না এলেই ভাল হত!

ভুষুণ্ডা, দেখলাম, একটু দূরে-দূরেই থাকছে। কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। যদিও এই অঞ্চলের সব ভাষা ভালই জানে। ঋজুদা যে ওর সাহায্য ছাড়াই মাসাই-সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে সে-কথা ও বোধহয় আগে বুঝতে পারেনি। সে কথা বুঝে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না ভুষুণ্ডা। ঋজুদাকে এখনও বলাই হয়নি যে, আমাকে "ফুলিশ বয়" বলে, কাল ভুষুণ্ডাই গুলি করতে বলেছিল। নইলে আমি সর্দারের দিকে রাইফেল তুলতামই না।

টেডি খুব কাজ-কর্ম করছে। নাইরোবি সর্দার দয়া করে টেডিকে একটু নস্যি দিল। আমাদের কাছে একটু, কিন্তু টেডি আর সর্দারের নাক যত বড় তাদের নাকের ফুটোটাও তত বড়। একশো গ্রাম করে নস্যি দিব্যি ঢুকে গেল এক-এক নাকে। যেটুকু উড়ে এল হাওয়ায় তাতেই হাঁচতে লাগল ঋজুদা। আমিও।

খাওয়া-দাওয়া হতেই তাঁবু-টাবু সব হাতে-হাতে উঠিয়ে ফেললাম আমরা। মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম।

ঋজুদা বলল, "চল্‌, আমরা এখন নাইরোবি সর্দারের গ্রামে যাব। ওর সঙ্গে দেখা না-হলে আমরা জলের অভাবে নিশ্চয়ই মারা যেতাম। পথও খুঁজে পেতাম না। আমাদের যিনি গাইড, ভু-বাবু, তার ভূগোলের জ্ঞান মনে হচ্ছে তোরই মতো। কী করে গাইড হল কে জানে?"

আমি বললাম, "জানো তো, কাল রাতে ভুষুণ্ডাই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিল সর্দারকে।"

ঋজুদা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভাবল, তারপর বলল, "হয়তো ভয় পেয়েছিল। ভুল করেছিল ভুষুণ্ডা।"

তারপর বলল, "এখন ও নিয়ে আর আলোচনা করিস না। ভুষুণ্ডা শুনতে পাবে।"

আমি বললাম, "শুনতে পেলেই বা কী? এখানে বাংলাই তো সকলের কাছে হিব্রু-ল্যাটিন। বাংলাতে আমরা যা খুশি তাই বলতে পারি।"

ঋজুদা বলল, "কারেক্ট।"

তারপর বলল, "তবে পুরোপুরিই বাংলা বলিস—আর্ধেক ইংরিজি, আর্ধেক বাংলার খিচুড়ি নয়। ইংরিজি বুঝে যাবে ও।"

বললাম, "আচ্ছা।"

সবাই গাড়িতে উঠলাম। নাইরোবি সর্দারি বনেটের উপরই বসল, দু'হাত দিয়ে দু'দিক ধরে। সে এতই লম্বা-চওড়া যে, ভিতরে আঁটল না। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ঋজুদা, উইন্ডস্ক্রীন ভরে আছে লাল পোশাকের, নস্যি-কালো, নাইরোবি সর্দারি।

কী করে যে গাড়ি চালাবে ঋজুদা জানি না। অবশ্য এখানে পথ দেখার কিছু নেই। দেখলাম, ঋজুদা ডানদিকের জানালা দিয়ে মুখ বের করে গাড়ি স্টার্ট করল।

গাড়িতে আমরা সকলেই চুপচাপ। উইন্ডস্ক্রীনটা একটু উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাওয়া আসার জন্যে। বনেটের উপর সর্দারি বসে থাকায় খুবই আস্তে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল—জোরে চালালে আমাদের গাড়ির তলাতেই পড়ে মারা যাবে সর্দারি, তখন আর দেখতে হবে না—কাল রাতের মতো ড্রিদিম ড্রিদিম হুলা হুলা সব দৌড়ে আসবে।

আমি বললাম, "আমরা যে রাস্তা ভুলে গেছি, আমাদের ঠিক রাস্তা বাতলে দেবে কে? সর্দারি?"

ঋজুদা বলল, "হ্যাঁ। তা নয়তো আর যাচ্ছি কেন? তাছাড়া, তেলের সঙ্গে জলও কমে এসেছে আমাদের। পাহাড়ের ঝর্না থেকে জল ভরে নেব। আবারও যে রাস্তা ভুল হবে না বা অন্য কোনো বিপদ হবে না তা কে বলতে পারে?"

ঋজুদাকে শুধোলাম, "নাইরোবি তো একটা শহরের নাম। কেনিয়াতে না শহরটা? শুনেছি, খুব সুন্দর শহর। তাই না? তবে সেই শহরের নামে এই সর্দারের নাম হল কী করে?"

ঋজুদা বলল, "মাসাই ভাষাতে, নাইরোবি কথাটার মানে হচ্ছে 'খুব ঠাণ্ডা'। নাইরোবি শহরটা আমাদের দার্জিলিঙের মতো। খুব ঠাণ্ডা, পাহাড়ি শহর। একসময় ওখানে মাসাইরাই থাকত। জার্মানি আর ইংরেজদের দেশের মতো আবহাওয়া বলে সেই সাদা চামড়ার বিদেশীরা ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু নামটা এখনও নাইরোবিই রয়ে গেছে।"

"তা তো হল। কিন্তু সর্দারের নাম নাইরোবি কেন?" আমি বললাম।

"কী জানি? হয়তো মেজাজ খুব ঠাণ্ডা বলে। নইলে, তুই গুলি চালিয়ে দেওয়ার

পরও আমাদের ক্ষমা করার কথা ছিল না।”

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, “আচ্ছা, অত কাছ থেকে তুই মিস্ করলি কী করে ? তোর হাত তো মোটামুটি ভালই। অবশ্য ভাগ্যিস মিস্ করেছিলি, নইলে আর কাউকে বেঁচে ফিরতে হত না।”

আমি বললাম, “সত্যিই মানুষটা সর্দার। ভয় কাকে বলে জানে না। মাথাও দারুণ ঠাণ্ডা। রাইফেল ওর বুকের দিকে এইম্ করে ধরেছিলাম, তবুও ডোন্টকেয়ার করে সোজা হেঁটে এল আমারই দিকে—যেন আমার রাইফেলটা খেলনা রাইফেল, তারপর রাইফেলের নলটাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল। ঘাবড়ে গিয়েই আমি ট্রিগার টিপে ফেলেছিলাম।”

ঋজুদা বলল, “চমৎকার। দারুণ লোককেই পাহারাদার রেখেছিলাম আমি।”

আমি বললাম, “তোমার ভু-বাবু যে ক্রমাগত আমাকে বলে যাচ্ছিলেন, মারো, মারো, ওকে মেরে ফেলো। ওকে না মারলে আমরা সকলে মরব।”

ঋজুদা চুপ করে থাকল। কোনো কথা বলল না।

এদিকে সর্দার আরেকবার নস্যি নিল বনেটে বসা অবস্থাতেই। আর উইন্ডস্ক্রীন যে তুলে রাখা হয়েছিল তার ফাঁক দিয়ে নস্যি উড়ে এল হাওয়ার সঙ্গে। কী বিকট গন্ধ আর কী কড়া নস্যি রে বাবা ! হাঁচতে হাঁচতে আমার চোখে জল এসে গেল।

ঋজুদা আর টেডি হাসতে লাগল আমার অবস্থা দেখে।

দূর থেকে মাসাই গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল মারিয়াবো পাহাড়ের নীচে। গোল-গোল বিরাট সব খড়ের ঘর। খড়ে ছাওয়া বিরাট গোয়াল। এখন ফাঁকা। মেয়েরাও দারুণ লম্বা। সকলেই নানারকম পাথর ও হাড়ের গয়না পরেছে। ওদের গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি, পোশাক সকলেরই হাতে-বোনা লাল গরম কাপড়ের, প্রায় কম্বলের মতো। কাঠের তৈরি বালতি ও নানারকম পাত্র দিয়ে ওরা কাজ-কর্ম করছে। অল্প ক'জন পুরুষ আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, “ঐ যে গোল ঘরগুলো দেখছিস, ওগুলোকে বলে বোমা।”

“বোমা !” আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, “হ্যাঁ। আর ঐ গোয়ালঘরগুলোর নাম, ক্রাল।”

ল্যাণ্ড-রোভার থামতেই জলের পাত্রগুলো নামিয়ে দেওয়া হল। টেডি গ্রামের মাসাইদের সঙ্গে চলে গেল ঝর্নার দিকে।

আমরা নামতেই আমাদের বিরাট-বিরাট পেঁপে আর কলা খেতে দিল ওরা। তারপর একটা কালো বাছুরকে ধরে নিয়ে এল। তার গলার শিরাতে দড়ি পরিয়ে দিয়ে একটুকরো কাঠ দিয়ে টার্নিকেট করে একটা শিরাকে একজন ফুলিয়ে দিল। তখন অন্যজন একটা ছোট তীর মারল কাছ থেকে—অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল ফোয়ারার মতো ! আরেকজন একটা কাঠের জামবাটিতে সেই রক্ত ধরতে লাগল। বাটিটা ভরে গেল, একজন গিয়ে মাটি থেকে একমুঠো ধুলো তুলে থুতু দিয়ে সেই ধুলো তীরের সূক্ষ্ম ফুটোতে ঘষে দিল। তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল শিরাটাকে ভিতরে। চামড়াতে ঢেকে গেল সঙ্গে সঙ্গে শিরাটা, রক্তও বন্ধ হয়ে গেল। বাছুরটা লাফাতে-লাফাতে খোঁয়াড়ে চলে গেল। প্রাণে না মেরেও দারুণ কায়দায় ওর রক্ত বের করে নিল এরা।

কিন্তু আমি বোধহয় প্রাণে বাঁচলাম না। সেই কাঠের বাটিতে ফেনা-ওঠা তাজা রক্ত এনে একটা লোক সামনেই দাঁড়াল। আমি বয়সে সবচেয়ে ছোট বলে আদর করে

আমাকেই সবচেয়ে আগে খেতে দিল। অন্য একজন লোক দু'হাতের পাতায় থুতু ফেলে ভাল করে ঘষে সেই পাত্রটিকে সসম্মানে হাতে নিয়ে এসে ইঙ্গিতে চুমুক দিতে বলল।

আমি ইতস্তত করছিলাম। ভুষুণ্ডা বলল, "না খেলে এরা অপমানিত হবে এবং দাওয়ের এক কোপে তোমার মুণ্ডু শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।"

ঋজুদাও ভুষুণ্ডার কথায় মাথা নাড়ল।

আর কথা না-বাড়িয়ে আমি বাটিতে চুমুক দিলাম। ফেনা-ওঠা টাটকা বাছুরের রক্ত। এক চুমুকে খেয়ে দেখলাম যে, তখনও বেঁচে আছি। মনে হল আমিও যেন ওদেরই মতো লম্বা হয়ে গেলাম, গায়ে জোর বেড়ে গেল অনেক। কিন্তু, ভীষণ বমি পাচ্ছিল।

আমার পর ঋজুদা, আর ভুষুণ্ডাও খেল। টেডি জল নিয়ে আসেনি এখনও। সময় লাগবে। তাই ওকে খেতে হল না। বেঁচে গেল!

নাইরোবি সর্দার উবু হয়ে মাটিতে বসে মাটির উপরেই একটা তীর দিয়ে এঁকে এঁকে ঋজুদাকে রাস্তা বোঝাতে লাগল। ভুষুণ্ডা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার জিনের ট্রাউজারের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল। ঋজুদা কম্পাস বের করে একটা সাদা কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে কী-সব লিখতে লাগল।

যে লোকটি আমাকে রক্ত খাওয়াল তার সঙ্গে একটু ভাব করার ইচ্ছে হল। ভুষুণ্ডাকে বললাম, আমাকে সাহায্য করতে। ভুষুণ্ডা ভাঙা-ভাঙা মাসাইতে ওকে নাম জিজ্ঞেস করল।

লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলে কয়েকটা শব্দ করল পরপর।

ভুষুণ্ডা হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও।

বললাম, "হাসির কী হল?"

ভুষুণ্ডা বলল, "ও এখন পুরনো নামটা বদলে ফেলেছে, কিন্তু নতুন নাম এখনও রাখেনি। কাল রাখবে। নতুন নাম কী হবে ঠিক করেনি। আজ ভেবে ঠিক করবে।"

আমি বললাম, "কী ঠাট্টা করছ ভুষুণ্ডা। নাম আবার নতুন-পুরনো হয় নাকি?"

ভুষুণ্ডা বলল, "ঠাট্টা? না, না, ঠাট্টা নয়। তুমি বানাকে জিজ্ঞেস করো, বানা জানে।" বলে, ঋজুদাকে দেখাল।

তারপর বলল, "মাসাইরা, ইচ্ছেমতো নিজেদের নাম বদলায়, জামাকাপড় পাল্টাবার মতো। একটা নাম পুরনো হয়ে গেলেই সেটা বাতিল করে মনোমতো নতুন নামে ডাকে নিজেকে।"

আমি বললাম, "ওরা তো সাপের মতো। খোলস বদলায়।"

ভুষুণ্ডা কোমর দুলিয়ে ওর হাঁটুর নীচে নেমে আসা দুটি লম্বা-লম্বা হাত দুলিয়ে কলার মতো চওড়া চোয়ালের ধবধবে সাদা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হিক-হিক করে হেসে উঠল। বলল, "জব্বর বলেছ, জব্বর বলেছ!"

মাসাইরা সাপের মতোই, খোলস বদলায়, নাম বদলায়।

আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর নাম নিয়ে বড় দুঃখ। ওর দাদু নাম দিয়েছিলেন ব্যোম্‌শংকর। তা ওর একেবারেই পছন্দ নয়। ও মাসাই হলে কেমন সহজে নামটা পাল্টে ফেলতে পারত!

দূর থেকে টেডিকে আসতে দেখা গেল। ওরা চার-পাঁচজন জল বয়ে নিয়ে আসছে ড্রামে এবং চামড়ার ছাগলে। পেছনে পেছনে একপাল ছেলেমেয়ে এবং কয়েকটা ছাগল।

ছাগল দেখে আমার কারিব্যুর কথা মনে হল। কারিব্যুকে একটু দুধ খাইয়ে নেওয়া যায়। টেডির সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের একজনকে বলে ভুষুণ্ডা একটা ছাগলকে ধরে কারিব্যুকে তার দুধ খাওয়াতে গেল। কারিব্যুর আপত্তি তো ছিলই, তার উপরে সেই পাজি ছাগলিটা পাগলির মতো এক লাথি মেরে দিল কারিব্যুর গায়ে।

ঋজুদা বলল, "তুই বাচ্চাটাকে মেরেই ফেলবি দেখছি। আমরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছি তাতে ওকে বাঁচানো এমনিতেই মুশকিল হবে। তার চেয়ে তুই সর্দারকে প্রেজেন্ট করে যা, ওদের ক্রালে থাকবে। অন্যান্য গোরু-বাছুরের সঙ্গে দিব্যি বড় হয়ে উঠবে কারিব্যু।"

আমি বললাম, "ছাগলের দুধ খাচ্ছে না যে ও!"

ঋজুদা বলল, "সকালে তুই পলতে করে অত কন্ডেন্সড মিল্ক খাওয়ালি, তাই পেট ভরা। খিদে পেলে খুবই খাবে।"

আমি আর টেডি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। তারপর নাইরোবি সর্দারের হাতে দিলাম কারিব্যুকে। ওর পিঠের ঘা-টা তখনও লাল হয়ে ছিল। ভাল হয়ে উঠলেও ওর পিঠে গভীর দাগ থেকে যাবে। থম্‌সনস গ্যাজেলদের গায়ের রঙ ভারী সুন্দর—হালকা বাদামি—তার উপর কালো ডোরা, তলপেটটা সাদা। ওর পিঠের ঐ দাগ বিচ্ছিরি দেখাবে ও বড় হলে।

নাইরোবি সর্দারের কথায় কোথা থেকে একজন দৌড়ে এসে কীসব পাতা-টাতা বেটে এনে কারিব্যুর ঘায়ে লাগিয়ে দিল। সর্দার বলল, "কারিব্যু এখন থেকে আমাদের গোরু-বাছুরের সঙ্গেই চরে বেড়াবে।"

ঋজুদা বলল, "এবার আমরা উঠব।"

সর্দার বলল, "দাঁড়াও।" বলে, ঋজুদার হাতে একটা গোল হলুদ পাথর দিল। বলল, "কখনও প্রয়োজন হলে কোনো মাসাইকে এই পাথরটি দেখালে সে তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। এটাকে সাবধানে রেখো।"

সর্দার এবং অন্যান্যরা সার বেঁধে দাঁড়াল। আমরা সকলে হাত তুলে ওদের ধন্যবাদ জানালাম। বাচ্চারা ভিড় করে গাড়িটা দেখছিল। মনে হল, ওরা কখনও গাড়ি দেখেনি আগে। রওয়ানা হবার আগে, দু'হাতে আমার মুখটা আদর করে ধরে পিচিক করে আমার মাথায় থুতু দিল সর্দার।

আমি গদগদ ভাব দেখিয়ে হাসলাম।

ঋজুদা বিড় বিড় করে বলল, "তোকে যা পছন্দ করেছে সর্দার, হয়তো জামাই-ই করবে। রাজি না হলেই মুণ্ডু কাটা যাবে কিন্তু।"

ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেলাম।

স্টীয়ারিং-এ আমিই বসলাম এবারে। ঋজুদা পাশে বসল ম্যাপটা হাঁটুতে ছড়িয়ে। ভুষুণ্ডা ঋজুদার পিছনে বসে ঋজুদার কাঁধের উপর দিয়ে ম্যাপটা দেখছিল। বুঝতে পেরে ঋজুদা বলল, "ম্যাপটা ভাল করে বুঝে নাও ভুষুণ্ডা। এর পরেও রাস্তা ভুল হলে কিন্তু তোমার নামে সেরোনারাতে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।" বলে, ম্যাপটাকে হাতে নিল।

ট্রেলারে জলের ড্রামের সঙ্গে পেট্রলের জেরিক্যানের ঠোকাঠুকি লেগে টংটং শব্দ হচ্ছিল। ঋজুদা গাড়ি থামাতে বলে নিজে নামল। নেমে টেডিকে বকল। ওরকম করে রেখেছে বলে। তারপর আমিও নেমে ঋজুদা ও টেডির সঙ্গে হাত লাগিয়ে, সব ঠিকঠাক করে রেখে আবার বেঁধে-ছেঁদে নিলাম। ভুষুণ্ডা ম্যাপ দেখছিল। নামল না।

ঋজুদার কথামতো কম্পাসের কাঁটা দেখে চালিয়ে মাইল দশেক আসার পর যেন একটা পায়ে-চলা পথের মতো দেখা গেল ঘাসের মধ্যে মধ্যে। সবসময় যে ব্যবহার করা হয় এমন নয়। তবে ঘাসের চেহারা, রঙ আর আশেপাশের চিহ্ন দেখে মনে হয় এইখান দিয়ে মাঝে-মাঝে মানুষ পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে।

ঋজুদা বলল, ঐ পথের চিহ্নকে দু'চাকার মধ্যে রেখে গাড়ি চালাতে।

সেই মতোই চালাতে লাগলাম।

একটু আগে একদল বুনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারা প্রথমে গাড়ির দিকে দৌড়ে এসেছিল। পরে, কী ভেবে আবার ফিরে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে এমন হিংস্র জানোয়ার আর নেই। আমাদের দেশেও নেই।

আজ অন্য কোনো জানোয়ারই দেখলাম না মারিয়াবো থেকে রওনা হবার পর। বুনো কুকুর যে অঞ্চলে থাকে সেখান থেকে অন্য সব জানোয়ার পালিয়ে যায় শুনেছিলাম। মনে হল, সেই কারণেই বোধহয় কোনো জানোয়ারের টিকি দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বুঁউউউ আওয়াজ করে একটা সেৎসী মাছি উড়ে এল জানালার ফাঁক দিয়ে। ভুষুণ্ডা সেৎসীকে দারুণ ভয় পায়। ভয় টেডিও পায় তবে ভুষুণ্ডার মতো নয়।

ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠে মাছিটাকে যার যার টুপি দিয়ে ধরার এবং মারার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। মাছিটা ঠক করে এসে উইন্ডস্ক্রীনে পড়ে, ডানা দুটো নাড়তে লাগল। সেৎসী মাছি যে কী জোরে ডানা নাড়ে এবং একটা ডানার উপর দিয়ে অন্য ডানাটা কীভাবে ঘুরোয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঋজুদা গোর্খা টুপি দিয়ে এক বাড়ি মারতেই মাছিটা নীচে পড়ল।

আমি বললাম, "এবারে তোমরা শান্ত হয়ে বোসো। সেৎসী মরেছে।"

"মরেছে ? সেৎসী, অত সহজে ?"

বলেই, টেডি হেসে উঠল। বলল, "সেৎসী মাছির দশটা জীবন। একটা নয়।" বলেই, আমার আর ঋজুদার মধ্য দিয়ে ঝুঁকে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা মাছিটাকে তুলে নিয়ে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করল টেনে। তারপর বলল, "এইবার বলা চলে যে, বাবু মরেছেন। এর এক সেকেন্ড আগেও বলা যেত না যে মরেছেন। এঁরা সহজ জিনিস নন।"

ঋজুদা আর আমি হাসলাম। মুণ্ডু-ছেঁড়া সেৎসী-হাতে টেডির বক্তৃতা শুনে।

ঋজুদা বলল, "আজ রাত থেকে কিন্তু আমরা খুবই বিপজ্জনক এলাকাতে থাকব। এখানে ওয়াণ্ডারাবো শিকারীরা থাকে। সামনে একটা ছোট্ট লেক আছে। ম্যাপে এই লেকের হদিস নেই। খুব ছোট্ট সোডা লেক। তার চারপাশে লেরাই জঙ্গল। ওয়াণ্ডারাবো শিকারীরা ঐ জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং শিকার করে। প্রতি শীতে ওরা হাতি গণ্ডার এবং অন্যান্য জানোয়ার মারতে আসে। নাইরোবি সর্দার ওদের কথা বলেছে আমাকে।

আমি বললাম, "ওয়াণ্ডারাবো কী দিয়ে হাতি মারে ? হেভি রাইফেল্‌স ওরা পায় কোথায় ?"

ঋজুদা বলল, "রাইফেল দিয়ে তো মারে না, মারে ছোট্ট-ছোট্ট বিষ-মাখানো তীর দিয়ে !"

"ঐ বিষ কোথায় পায় ওরা ?"

ঋজুদা বলল, "তুই কখনও জলপাই গাছ দেখেছিস ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ আমার মামা-বাড়ির বাগানেই তো ছিল।'

"জঙ্গলের মধ্যে জলপাইয়ের মতো একরকমের গাছ হয়। এই জাতের সব গাছই যে বিষাক্ত হয় এমন নয়। কিছু-কিছু গাছের এই বিষ থাকে। গাছগুলোকে দেখতে শুকিয়ে-যাওয়া জলপাই গাছের মতো। এদের বটানিকাল নাম অ্যাপোকানথেরা ফ্রিস্টিওরাম। জংলি ওয়াণ্ডারাবোরা ঐ গাছের নীচে পিঁপড়ে, কি ইঁদুর না কাঠবেড়ালিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে, বিষ আছে। তারপর সেই গাছের ডাল আর শেকড়গুলো সেদ্ধ করে ক্বাথ বানিয়ে, ঘন করে তাই বিক্রি করে দেয় ওরা চোরা শিকারীদের কাছে। এই গাছে লাল গোল-গোল ফল হয়। তা দিয়ে খুব ভাল জ্যামও তৈরি হয়। জানিস ? জ্যাম তো তোর প্রিয়।"

হঠাৎ ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, "সাবধান, সাবধান !"

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, একটা বিরাট দু'খড়্গ গণ্ডার জোরে ছুটে আসছে, ডান দিক থেকে আমাদের গাড়ি লক্ষ করে। গাড়ির পেছনে ট্রেলার থাকায় খুব একটা জোরে গাড়ি চালানো যায় না। গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচার মতো জোরে তো নয়ই। গণ্ডারটার কী হল, কে জানে। কোথা থেকে যে হঠাৎ উদয় হল তাও আশ্চর্য! ঘাসের মধ্যে কি শুয়ে ছিল ?

ঋজুদাকে রীতিমত চিন্তিত দেখাল। আবার বলল, "সাবধান রুদ্র, খুব সাবধান।"

গণ্ডারটার তখনও পাঁচশো গজ দূরে ছিল।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি নেমে রাইফেলটা তুলে, ভয় দেখাবার জন্যেই চার-পা-তুলে-ছুটে-আসা গণ্ডারটার পায়ের সামনে মাটিতে একটা গুলি করল। ধুলোঘাস সব ছিটকে উঠল, কিন্তু গণ্ডার ভয় পেল না।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বলল, "গাড়ির মুখটা ওর দিকে ঘোরা তো। শিগগির।"

আমি স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে, খুব জোরে এঞ্জিনকে রেস্ করালাম আর যত জোরে পারি ডাবল-হর্ন একসঙ্গে বাজিয়ে দিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে চললাম। এত দিনের মধ্যে এই প্রথম হর্ন বাজালাম গাড়ির। গণ্ডারটা তো জোরে দৌড়ে আসছিলই, আমিও ঐ দিকে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা আর গণ্ডারটা একেবারে মুখোমুখি এসে গেল। উইন্ডস্ক্রীন তুলে, তার ফাঁক দিয়ে রাইফেল বের করে ঋজুদা তৈরি হয়ে ছিল। নিজেদের বাঁচাতে হলেই একান্ত গুলি করবে, নইলে নয়।

আমিও যেমন ধুলো উড়িয়ে হঠাৎ ব্রেক করে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম, গণ্ডারটাও তার গাব্দাগোব্দা খুরের পায়ের ব্রেক কষিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কান দুটো খাড়া, নাকের উপর পর-পর দুটো খড়্গ, গায়ের চামড়া দেখে মনে হয় যেন কোনো স্থপতি কালচে-লালচে পাথর খোদাই করে থাকে-থাকে তৈরি করেছেন তাকে। তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। আগে হর্ন বাজিয়েছিলাম, এঞ্জিন রেস্ করেছিলাম, এখন শুধু অ্যাকসিলারেটরে পা ছুঁইয়ে এঞ্জিন স্টার্টে রাখলাম।

ঋজুদা রাইফেলের ফ্রন্টসাইটের মধ্যে চোখ লাগিয়ে রাইফেলটা ধরে আছে গণ্ডারটার কপাল তাক করে। সকলে চুপ, স্তব্ধ ; কী হয় কী হয় ভাব।

ঠিক সেই সময় টেডি হঠাৎ বলে উঠল, "একটু নস্যি দিয়ে দেব ওর নাকে ? নস্যি নাকে গেলেই সঙ্গে-সঙ্গে পালাবে ব্যাটা।" বলেই বাঁ হাতের তেলোতে তার চ্যাপ্টা কৌটো থেকে নস্যি ঢেলে, আমার আর ঋজুদার মধ্যের ফাঁক দিয়ে গলে উইন্ডস্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে,

শরীরের অর্ধেকটা সড়াত করে বের করে গণ্ডারের নাক লক্ষ করে হাতের তেলোতে ফুঁ দিতে গেল।

কিন্তু ওর কোমরের বেল্ট ধরে, এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঋজুদা বলল, "টেডি !"

টেডি টানের চোটে পিছিয়ে এল।

ঋজুদা গম্ভীর গলায় বলল, "ঐ দ্যাখো।"

বলতেই, গণ্ডারটা আস্তে-আস্তে ঘুরে আমাদের দিকে পিছন ফিরল। পিছন ফিরতেই দেখি লেজটা তুলে আছে গণ্ডারটা, আর তার ঠিক লেজের নীচে একটা এক-ফুটের মতো লম্বা তীর গাঁথা।

গণ্ডারটা আমাদের সকলের চোখের সামনে কয়েক পা হেঁটে গেল উল্টোদিকে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়েই ধপ্ করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

আমরা গাড়ি ছেড়ে সকলেই নামলাম। টেডি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, "ওয়াণ্ডারাবো। ওয়াণ্ডারাবো।"

অতবড় একটা জানোয়ার, কত তার গায়ে জোর, তাকে ওয়াণ্ডারাবো শিকারী তার শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গাতে বিষতীর মেরে ঘায়েল করেছে।"

টেডি গিয়ে গণ্ডারটার সামনে দাঁড়াতেই, সে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু তারপরই শেষবারের মতো শুয়ে পড়ল ধুলো উড়িয়ে।

গণ্ডারটার ওজন আমাদের ল্যাণ্ড-রোভারটার চেয়েও বেশি হবে। তার খড়্গ কেটে বিক্রি করলে, সেই খড়্গ গুঁড়ো করে কারা কোন্ ওষুধ বানাবে—তাই তাকে মরতে হল এক-আকাশ রোদ আর হাওয়ার মধ্যে।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা সকলে চুপ করে থাকলাম। হয়তো না-জেনেই, মরে-যাওয়া গণ্ডারটাকে সম্মান জানাবার জন্যে।

টেডি বলল, "ওয়াণ্ডারাবোরা কাছেই আছে। এই তীর বেশিক্ষণ আগে ছোঁড়েনি।" বলেই, উঠে গিয়ে গণ্ডারটার চারপাশে ঘুরে ভাল করে বুঝে নিয়ে বাঁ হাতে গণ্ডারের লেজটা তুলে, ডান হাত দিয়ে একটানে তীরটা বের করে নিয়ে এল।

ঋজুদা সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে একটা টেস্ট-টিউবে তীরের গায়ে লাগা বিষমাখা রক্ত রেখে, টিউবটাকে তুলোয় জড়িয়ে একটা বাক্সে রাখল সেটাকে।

গণ্ডারটা ওখানেই পড়ে রইল। ওয়াণ্ডারাবো শিকারীরা ওকে খুঁজে পাবে হয়তো। না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া, খুঁজে পেলেও তারা গাড়ির চাকার দাগ দেখে ভয় পেয়ে এদিকে হয়তো না-ও আসতে পারে। ওরা না এলে, শকুনরা আসবে। প্রথমে চোখ দুটো ঠুকরে খাবে। তারপর রোদে, হাওয়ায় গণ্ডারের ঐ শক্ত চামড়াও গলে যাবে একদিন। দিনে রাতে শকুনের, শেয়ালের আর হায়নার ভোজ হবে এখানে।

আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। ভুষুণ্ডা বলল, "এখানেই কাছাকাছি আমরা আজ ক্যাম্প করে থাকলে ওয়াণ্ডারাবোদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। গণ্ডার যখন মেরেইছে, তখন তার খড়্গ না-কেটে তারা ফিরে যাবে না নিশ্চয়ই। তারা পায়ের দাগ দেখে-দেখে এখানে এসে পৌঁছবেই।"

ঋজুদা কী একটু ভাবল। তারপর বলল, "নাঃ থাক। আমরা এগিয়ে যাব।"

টেডি এক-নাক নস্যি নিল গণ্ডারটার পিঠের উপর থেবড়ে বসে।

ঋজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল, "রুদ্র, ওই রাইফেলটা গণ্ডারের গায়ে শুইয়ে রেখে পোজ দিয়ে দাঁড়া, আমি একটা ছবি তুলি তোর। ছবির নীচে লিখে দেব : মারি তো গণ্ডার, লুটি

তো ভাণ্ডার। কী বলিস ?”

আমি বললাম, “মোটেই না।”

ঋজুদা বলল, “এখনও ভেবে দ্যাখ, একটা দারুণ চান্স ছিল কিন্তু কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের গুল মারবার। ছবি থাকলে তো আর তাদের বিশ্বাস না-করে উপায় নেই ?”

আমি বললাম, “ছবি তুলে দাও, তবে খালি হাতে। এই বেচারি গণ্ডারটার একটা ছবি থাকুক আমার কাছে।”

ভুষুণ্ডা সিগারেটে টান লাগিয়ে ঋজুদাকে বলল, “এইখানেই ক্যাম্প করার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখলে পারতেন !”

ঋজুদা বলল, “দেখেছি ভেবে। চলো, এগিয়েই যাই।”

ভুষুণ্ডা গররাজি গলায় বলল, “আপনি যা বলবেন।”

গণ্ডারটাকে ওখানে ফেলে রেখেই আবার রওনা হলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ভেবেছিলাম, অজানা কোনো কারণে আর ভুষুণ্ডার মধ্যে কেমন যেন বনিবনার অভাব হচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না আমার।

ঘন্টা-দেড়েক গাড়ি চালাবার পর দূরে লেরাই জঙ্গলের আভাস ফুটে উঠল। এদিকে সেৎসী মাছি বেশি। কিন্তু লেরাই জঙ্গল দেখতে খুব ভাল। এই অ্যাকাসিয়া গাছগুলোর গা আর ডালপালা একটা মিষ্টি হলদে-সবুজ রঙের হয়। মনে হয়, শ্যাওলা পড়েছে। কিন্তু তা নয়, গাছের রঙই ও-রকম। সোয়াহিলিতে বড় বড় হাত-ছড়ানো অ্যাকাসিয়া গাছগুলোকে বলে মিগুংগা। আর হলুদ মিগুংগা হলে বলে লেরাই। লেরাই-জঙ্গল জলের কাছাকাছি হয়। তাই যেখানেই লেরাই-জঙ্গল থাকে, তার আশেপাশে অন্যান্য নানারকম জঙ্গলও থাকে। জন্তু-জানোয়ারের ভিড়ও থাকে। অ্যাকাসিয়া অনেক রকমের হয়। ঋজুদা বলছিল। ছাতার মতো অ্যাকাসিয়াগুলোকে বলে আমব্রেলা অ্যাকাসিয়া। তাছাড়া আছে অ্যাকাসিয়া টরটিলিস। গাম্মিফ্লোরা। অ্যাকাসিয়া অ্যাবিসিনিকা। অ্যালবিজিয়া বলে একরকমের গাছ আছে, পাঁচদিন আগে দেখেছিলাম, সেগুলোর পাতাগুলোই কাঁটার মতো। ওয়েট-আ-বিট থর্ন নামেও একরকমের কাঁটাগাছ হয় এখানে।

দুপুরের খাওয়ার জন্যে কোথাও থামিনি আমরা।

বিকেল চারটে নাগাদ লেরাই-জঙ্গলের কোলে পৌঁছে গেলাম। ঋজুদা গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দূরের লেকটাকে দেখল। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেদিকে। এ-রকম কোনো কিছুই দেখিনি এর আগে। লেকটার আশপাশের ডাঙা অদ্ভুত নীলচে ও ছাই-রঙা। জল নেই বেশি, কিন্তু জল যেখানে আছে সেইদিকেও তাকানো যায় না, জলের ঠিক কাছাকাছি এমন উজ্জ্বল চকচকে কাচের মতো কোনো জিনিসের আস্তরণ পড়ে রয়েছে যে চোখ চাওয়া যায় না। চোখে ধাঁধা লাগে। মনে হয়, বরফ পড়েছে বুঝি।

তাঁবু খাটিয়ে টেডি রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। আমি আর ঋজুদা জায়গাটা ভাল করে দেখার জন্যে বেরোলাম।

ঋজুদা বলল, “রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নে।”

ভুষুণ্ডা বলল, “আমি কি সঙ্গে যাব ?”

ঋজুদা বলল, “না। তুমি তার চেয়ে বরং টেডির কাছেই থাকো। বন্দুক রেখো হাতের কাছে।”

তাঁবু থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

হঠাৎ সামনে পথের বাঁকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চমৎকার কারুকাজ-করা শিংওয়ালা খয়েরি-রঙা একদল হরিণ দেখলাম। এই হরিণ কখনও দেখিনি আফ্রিকাতে আসার পর। দিনের শেষ রোদ পশ্চিম থেকে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়েছে হরিণগুলোর গায়ে। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই হরিণগুলোর চমক ভাঙল। ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা লাফাতে-লাফাতে চলে গেল পুবের অন্ধকারে। ওরা যখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, ওরা যেন উড়ে যাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, "এদের নাম ইম্পালা।"

এই ইম্পালা। কত পড়েছি এদের কথা।

গতকাল রাতে যে ছোট জানোয়ারটা উড়ে-লাফিয়ে চলছিল, যার চোখ জ্বলেনি সামনে থেকে, কিন্তু পাশ থেকে একটা চোখ টর্চের আলোয় জ্বলেছিল, সেই জানোয়ারটা কী জানোয়ার তা ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঋজুদা তার বিবরণ জানল আমার কাছ থেকে। তারপর হেসে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি। ওগুলো হচ্ছে লাফানো-খরগোশ। আসলে কিন্তু ওড়ে না, এমন করে লাফায়, যেমন এই ইম্পালারাও লাফায়, যেন মনে হয় উড়েই যাচ্ছে। আমাদের দেশে ফ্লাইং-স্কুইরেল আছে, কিন্তু সে-কাঠবিড়ালি সত্যিই ওড়ে। লাফানি-খরগোশ শুধু লাফায়ই। আর ঐ আরেকটা মজা। ওদের চোখে এমন কোনো ব্যাপার আছে যে, সামনে থেকে অন্ধকারে আলো ফেললে একটা চোখও জ্বলে না। অথচ পাশ থেকে ফেলে সেই পাশের চোখটা জ্বলে ওঠে। এইরকম খরগোশ শুধু এখানেই দেখা যায়।"

আমরা যখন হাঁটছিলাম, তখন এদিক-ওদিকে মাটিতে, ভাল করে নজর করে যাচ্ছিলাম। শুধু জংলি জানোয়ার নয়, তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হিংস্র ওয়াণ্ডারাবো শিকারীরা এ জঙ্গলে আছে। আড়াল থেকে একটি বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়ে দেবে, ব্যস্-স্—টলে পড়ে যেতে হবে। গণ্ডারটার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, তাই বেঁচে ছিল অনেকক্ষণ। মানুষদের মারলে সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।

একটা ঝাঁকড়া ওয়েট-আ-বিট থর্ন গাছের নীচে ছোট্ট একটি বাদামি হরিণছানা দাঁড়িয়ে ছিল। ঋজুদা দেখতে পায়নি। আমি ঋজুদার হাতে হাত দিয়ে ঐদিকে দেখালাম। ফিসফিস করে বললাম, "দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর হরিণছানাটা।"

ঋজুদা ভাল করে দেখে বলল, "এটা হরিণছানা নয় রে, এ এক জাতের হরিণ। ওরা বড় হয়েও ঐটুকুই থাকে। ওড়িশা জঙ্গলে কতবার তো মাউস-ডিয়ার দেখেছিস। এগুলো ঐরকমই। এদের নাম ডিক্-ডিক্। এই জাতের হরিণ কেবল আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়।"

মনে-মনে উচ্চারণ করলাম দু'বার। ডিক্-ডিক্। কী সুন্দর নামটা।

আলো পড়ে আসছিল। ঋজুদা বলল, "এখন আর দেরি না-করাই ভাল। তাঁবু থেকে মাইলখানেক চলে এসেছি। চল, এখন ফিরে যাই। কাল আমরা চান করব লেকে এসে, কী বল?"

আমি বললাম, "দারুণ হবে।" শেষ চান করেছিলাম সেরোনারাতে। কত্ত দিন আগে।

আমরা ফেরবার সময় অন্য রাস্তায় এলাম। এ-রাস্তাটাও লোকের পাশ দিয়েই গেছে,

তবে আমরা আরো গভীরে গভীরে। সামনেই একটা বাঁক। বাঁকের মুখটাতে আসতেই আমার মনে হল একটা লোক যেন পথ থেকে জঙ্গলে সরে গেল। ঋজুদা পশ্চিমে তাকিয়ে দারুণ আফ্রিকান সূর্যাস্ত দেখছিল, অ্যাকাসিয়া গাছের পটভূমিতে লাল হওয়া আকাশে।

হঠাৎ ঋজুদা মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কোনো মানুষ জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তুই শব্দ পাচ্ছিস ?"

আমি কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

যেখান থেকে লোকটাকে সরে যেতে দেখেছিলাম, সেইখানে এসে পৌঁছতেই নরম মাটিতে তার পায়ের দাগ দেখা গেল। প্রকাণ্ড দুটি পায়ের ছাপ। ছাপের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পথের বাঁ দিকে কোনো জিনিসকে লক্ষ করছিল।

বাঁ দিকে মুখ তুলতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "লোকটা যেদিকে গেছে সেইদিকে তুই রাইফেল তুলে রেডি হয়ে খুব সাবধানে দ্যাখ। কিছু দেখতে পেলেই আমাকে বলিস।"

আমি ঐদিকটা দেখছি।

একটু পর ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "দ্যাখ রুদ্র, এদিকে দ্যাখ।"

ঋজুদার কথামতো ঐদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পথ থেকে হাতদশেক উপরে একটা মিগুংগা গাছের দুটো ডালের মাঝখানে রক্তাক্ত ইম্পালা হরিণের আধখানা শরীর ঝুলছে। আর সেই গাছের উপরেই, অন্য দুটি ডাল যেখানে মিলেছে সেইখানে পথের দিকে পিছন ফিরে বসে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ, তার মুখে সেই হরিণের মাংস। চিতাটার পিঠে একটা তীর গেঁথে আছে।

আমরা আর-একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। চিতাটা ততক্ষণে মরে গেছে। কিন্তু মরে গেলেও গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে না। এমনভাবে দুটি ডালের মাঝখানে তার শরীর আটকে আছে যে, পড়ে যাবেও না।

আমি বললাম, "লোকটা যদি আমাদের দেখে থাকে ?"

ঋজুদা বলল, "তুই তো দেখেছিস এক ঝলক। কেমন দেখতে বল তো ?"

আমি বললাম, "দারুণ লম্বা, সবুজ আর লাল ছোপ-ছোপ কাঙ্গার মতো লুঙ্গি পরা, গায়ে সবুজ চাদর, হাতে তীর-ধনুক।"

ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে গেছিল, বলল, "তোকে দেখেছিল ?"

বললাম, "মনে হয় না। ও বোধহয় এমনিতেই দৌড়ে চলে যাচ্ছিল।"

ঋজুদা বলল, "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি আয়। আর কথাবার্তা বলিস না।"

আমরা যখন তাঁবুর কাছে এলাম তখন অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। তার সঙ্গে শীতটাও। টেডি খুব বড় করে আগুন জ্বেলেছে। এখানে শুকনো কাঠকুটোর অভাব নেই কোনো। আগুনের আভায় চারদিক লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন টেডির কফি তৈরি। বিস্কুট আর কফি দিল ও আমাদের। রান্নাও চড়িয়ে দিয়েছে। আজও উগালি।

ভুষুণ্ডাকে কিন্তু দেখা গেল না কোথাও। ঋজুদা জিজ্ঞেস করাতে টেডি বলল, "সে তো আপনাদের পিছনে-পিছনে গেল। কেন, দেখা হয়নি ?"

কিছুক্ষণ পর একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এবং তারও কিছুক্ষণ পর দুটি বড় বড় ফেজেন্ট হাতে ঝুলিয়ে এল ভুষুণ্ডা। এসে বলল, "ওয়াইল্ডবীস্ট আর গ্রান্টস গ্যাজেল খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছিল। তাই আনলাম। এক্ষুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি, রোস্ট করবে টেডি।"

ঋজুদা বলল, "ভুষুণ্ডা, তুমি ভালভাবেই জানো যে, এখানে চোরা-শিকারীরা আছে, তবুও তুমি গুলি করলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে? এটা কি শিকার করার সময়, না জায়গা? গুলির শব্দ শুনলেই তো ওরা সব সরে যাবে, সাবধান হয়ে যাবে। তাতে তো আমাদেরই বিপদ। এ-কথা কি তোমাকে শেখাতে হবে? তুমি এসব জানো না তা তো নয়!"

ভুষুণ্ডা লজ্জিত হয়ে বলল, "সরি। আমি অতটা ভাবিনি। আপনাদের খাওয়ার যাতে কষ্ট না হয় সেই ভেবেই মেরেছিলাম।"

ঋজুদা বলল, "আফ্রিকার বন-বাদাড়ে এত কষ্ট করে আমরা খাওয়ার সুখ করতে আসিনি। আমাদের দেশে আমরা ভাল-মন্দ খেতে পাই। সেরোনারাতে, গোরোংগোরোতে অথবা ডার-এস-সালাম বা আরুশাতে গেলেও খেতে পাব। ভবিষ্যতে তুমি এসব কোরো না। তাছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ বিশেষ কারণে। আমাদের খাওয়ার কষ্ট নিয়ে তোমার চিন্তা না-করলেও চলবে।"

তারপরই কথা ঘুরিয়ে ঋজুদা বলল, "এসো তো দেখি, এই জঙ্গলের আর লেকের একটা ম্যাপ বানিয়ে ফেলি দুজনে আগুনের পাশে বসে।"

ভুষুণ্ডা ছুরি হাতে করে উবু হয়ে বসে ফেজেন্ট দুটোর পালক ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল, "কী হবে ম্যাপ দিয়ে? এই জঙ্গল আমার মুখস্থ। কাল আমি চোরা-শিকারীদের ডেরায় নিয়ে যাব আপনাদের। একেবারে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব। তাহলেই তো হল। তবে খুব সাবধানে যাবেন। তীর মারতে ওদের সময় লাগে না।"

ঋজুদা একাই ম্যাপ বানাতে বসে গেল, কফি খেতে খেতে।

তারপর ভুষুণ্ডার দিকে চেয়ে বলল, "ওয়াণ্ডারাবোদের ভয় আমাকে দেখিও না। কোনো-কিছুর ভয়ই দেখিও না।"

ভুষুণ্ডা যেন একটু অবাক হল। তারপর ঋজুদাকে বলল, "আপনার সাহস সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই কোনো। আপনার মতো সাহসী লোক কমই আছে।"

ঋজুদা চুপ করে গেল।

ভুষুণ্ডার কথাটাতে, মনে হল, একটু ঠাট্টা মেশানো ছিল।

কফিটা শেষ করেই ঋজুদা বলল, "কাল পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকব।"

ভুষুণ্ডা মুখ না-ঘুরিয়েই বলল, "তাই-ই হবে। কাল ওয়াণ্ডারাবোদের সঙ্গে মোলাকাত হবে আপনার।"

ঋজুদা বলল, "ক্যাম্পে থাকবে টেডি। লাঞ্চ বানিয়ে রাখবে সকলের জন্যে।"

টেডি বলল, "সে কী? আমিও সঙ্গে যাব। আমিও যাব।"

ঋজুদা মুখ নিচু করে কম্পাস আর কাগজ-পেনসিল নিয়ে কাজ করতে করতে বলল, "আমি যেমন বলেছি, তেমনই করবে। আমার কথা অমান্য করবে না কেউ। বুঝেছ?"

টেডি মুখ নিচু করে বলল, "বুঝেছি।"

ভুষুণ্ডা টেডির দিকে মুখটা একটু ফেরাল। আগুনের আভায় মনে হল, ভুষুণ্ডার মুখে এক অদ্ভুত হাসি লেগে আছে।

আমার, কেন জানি না, বড়ই অস্বস্তি লাগছে। কিছু একটা ঘটবে।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

তীর-খাওয়া গণ্ডারটা আর বড় চিতাবাঘটার কথা বার-বার মনে পড়ছিল আমার। আমার গায়ে তীর লাগলে কী হবে তাই-ই ভাবছিলাম। মানুষদের তীর মারলে কোথায় মারে ওয়াণ্ডারাবোরা ? যে-কোনো জায়গাতে মারলেই হল। রক্তের সঙ্গে তীরের ফলার যোগাযোগ ঘটলেই কাজ শেষ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হবে। ওদের তীরগুলো কিন্তু ছোট। ছ' ইঞ্চি থেকে এক ফুট।

একবার মনে হল, কেন যে বাহাদুরি করতে এলাম এই আফ্রিকাতে ! না এলেই ভাল হত !

টেডি আজ আগুনের পাশে বসে ফেজেন্টের রোস্ট বানাতে-বানাতে পিগমিদের গল্প বলছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ ওরা। গভীর জঙ্গলে পাতার কুঁড়েতে থাকে। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার জঙ্গলে পিগমিদের সঙ্গে টেডি ছিল অনেকদিন এক জার্মান সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে। পিগমিদের সবচেয়ে বড় দেবতা খনভাম-এর কথা বলছিল ও।

তাঁবুর বাইরে লেকের দিক থেকে ও জঙ্গলের গভীর থেকে নানা অচেনা জন্তু-জানোয়ার এবং রাত-চরা পাখিদের ডাক ভেসে আসছিল। তারা আমার অচেনা বলেই ভয় করছিল। আমাদের দেশে হলে এইরকম ভয় করত না। কাছেই লেক আছে বলে এখানে ঠাণ্ডাও অনেক বেশি। কম্বলটা ভাল করে গুঁজে নিলাম পিঠের নীচে।

টেডি বলছিল প্রতিদিন যখন সূর্য মরে যায়, তখন খনভাম একটা বিরাট থলের মধ্যে তারাদের টুকরো-টাকরাগুলো সব ভরে নেন, তারপর সেই তারাদের টুকরোগুলো নিভে যাওয়া সূর্যের মধ্যে ছুঁড়ে দেন, যাতে সূর্য পরদিন ভোরে আবার জ্বলে ওঠে তার নিজের সমস্ত স্বাভাবিক উত্তাপের সঙ্গে।

খনভাম আসলে একজন শিকারী। শিকারী পরিচয়টাই তাঁর আসল পরিচয়। বিরাট-দুটো সাপকে বেঁধে তাঁর ধনুক তৈরি করেছিলেন তিনি। বৃষ্টি-শেষে যখন আকাশে রামধনু দেখি আমরা—আসলে সেটা রামধনু নয়, খনভামের ধনুক। পৃথিবীর মানুষদের কাছে খনভাম কোনো ছোট জানোয়ারের রূপ ধরে দেখা দেন, নয়তো হাতি হয়ে। আকাশে যে বাজের শব্দ শুনি আমরা, সেটাও বাজ নয়। খনভাম কথা বললে ঐরকম আওয়াজ হয়। খনভামের গলার স্বরই বাজপড়ার শব্দ।

দারুণ লাগছিল আমার। কিন্তু আগুনের পাশে বসে টেডির গল্প শুনতে-শুনতে আমার গা-ছমছমও করছিল। কঙ্গো উপত্যকার অন্ধকার গভীর জঙ্গল, যেখানে গোরিলারা থাকে, খনভামও থাকেন, সেখানেই যেন চলে গেছিলাম।

খনভামের চেলা আছেন অনেক। তাঁরা সব নানা দৈত্যদানো। সন্ধের পর পিগমিদের পাতার কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বসে আজকের রাতের মতোই এইসব দৈত্য-দানোর গল্প করত পিগমিদের সঙ্গে টেডি, তার সাহেবের জন্যে রান্না করতে করতে। এখন যেমন আমাদের জন্যে করছে।

একরকমের দানো আছেন, তাঁর নাম গুগুনোগুম্বার। তিনি কেবল আস্ত-আস্ত গিলে খান ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের। আরেকজন বামন-দানো আছেন, তাঁর নাম ওগরিগাওয়া বিবিকাওয়া। তিনি সাপের বা অন্য কোনো সরীসৃপের মূর্তি ধরে দেখা দেন।

তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পখাটে শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছি। বাইরে আগুনটা পুটপাট করে জ্বলছে। একরকমের পোকা উড়ছে অন্ধকারে আশ্চর্য একটানা মৃদু ঝরঝর শব্দ করে। মনে হচ্ছে, যেন দূরে ঝর্না বইছে কোনো। আকাশে একটু চাঁদ উঠেছে। ফিকে চাঁদের আলো তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। দরজাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। ঋজুদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। টেডি একা শুয়েছে অন্য তাঁবুতে। ভুষুণ্ডা গাড়ির কাচটাচ বন্ধ করে। যেমন রোজ শোয়।

হঠাৎ খুবই কাছ থেকে একটা সিংহ ডেকে উঠল দড়াম করে। তারপরই শুরু হল সাংঘাতিক কাণ্ড। চারদিক থেকে প্রায় গোটা আটেক সিংহ তাঁবু দুটোকে ঘিরে প্রচণ্ড হুমহাম শুরু করে দিল। ট্রেলারের উপরে ত্রিপল-ঢাকা গ্রান্টস গ্যাজেল আর ওয়াইল্ডবীস্ট-এর স্মোক করা মাংস ছিল। সেগুলোর গন্ধ পেয়ে ওরা ট্রেলারের উপর চড়ে বসল। ওদের থাবাতে চচ্চড় শব্দ করে ট্রেলারের উপরের ত্রিপল ছিঁড়ে গেল শুনতে পেলাম। চতুর্দিকে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন করতে-করতে, আমাদের আর তাদের মধ্যে তাঁবুর পাতলা পর্দা শুধু। বেচারি টেডি কি বেঁচে আছে? না সিংহরা তাকে খেয়েই ফেলল? কিন্তু টেডির কাছে তো বন্দুক আছে, সে গুলি করছে না কেন? চেঁচামেচিতে ঋজুদার ঘুম চটে গেল। সত্যি। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোয় ঋজুদা।

আমি ভাবলাম, ঋজুদা উঠে আমাকেও উঠিয়ে নিয়ে সিংহ মারবে এবং তাড়াবে। এবং এই ফাঁকে কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের প্রথম সিংহ-শিকার হয়ে যাবে! কিন্তু ঋজুদা উঠে বোতল থেকে একটু জল খেল, তারপর আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "ব্যাটারা বড় জ্বালাচ্ছে তো।" বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি হাঁ করে একবার ঋজুদার দিকে তাকিয়ে তারপর ক্যাম্পকটে সোজা হয়ে উঠে বসে, আবার হাঁ করে তাঁবুর ফাঁক-করা দরজা দিয়ে সজাগ চোখে চেয়ে রইলাম।

একটা প্রকাণ্ড সিংহের মাথা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম। এ কী? সে যে তাঁবুর ভিতরে কী আছে তা ঠাহর করে দেখছে ভিতরে উঁকি মেরে। মানুষের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরে আমি সেইদিকেই চেয়ে রইলাম। কিন্তু সিংহটা সরছেই না। থাবা গেড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে হেঁড়ে মাথাটা তাঁবুর দরজায় লাগিয়ে রেখে দেখছে আমাকে।

সেই চাউনি আর সহ্য করতে না পেরে আমি পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেললাম। আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগল আলো পড়ে। আর ঠিক সেই সময় 'মর, হতভাগা' বলে, ঋজুদা তার এক পাটি চটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে সোজা সিংহটার নাক লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল।

নাকের উপর সোজা গিয়ে লাগল চটিটা। আমার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল। রাইফেল-ধরা হাত ঘেমে উঠল। কিন্তু সিংহরাজ ফোঁয়াও করে একটা ছোট্ট হঠাৎ-আওয়াজ করেই পরক্ষণেই ক্রমাগত হুঁয়াও হুঁয়াও করে ডাকতে ডাকতে সরে গেল।

কতক্ষণ যে ওরা ছিল জানি না। শেষকালে সিংহের ডাকের মধ্যেই, মানে ডাক শুনতে শুনতেই, ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। আমার চারপাশে পাঁচ-দশ হাতের মধ্যে এক ডজন সিংহকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে যে কেউ তাঁবুর মধ্যে নির্বিকারে ঘুমোতে পারবে একথা আগে কল্পনাও করতে পারিনি। ধন্য ঋজুদা।

ঘুম ভাঙল শয়ে-শয়ে স্টার্লিং পাখিদের কিচিরমিচিরে। লেকের পশ্চিমদিক থেকে ফ্লেমিংগোদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ফ্লেমিংগো ছাড়া লেকে আর কোনো

পাখি ছিল না। কাল বিকেলেই লক্ষ করেছিলাম।

এই স্টার্লিং পাখিগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। উজ্জ্বল নীল, গাঢ় কমলা আর সাদায় মেশা ছোট-ছোট মুঠি-ভরা পাখি। ওরা যেখানেই থাকে, সেখানটাই সরগরম করে রাখে। আমাদের দেশের ময়নার মতো ওরাও খুব নকলবাজ। অন্য যে-কোনো পাখির এবং মানুষের গলার স্বর হুবহু নকল করে ওরা। তাই আফ্রিকাতে অনেকেই বাড়িতে পোষেন এই সুন্দর পাখি।

টেডি বলল, "গুটেন মর্গেন।"

এদিকে জার্মানদের দাপট বেশি ছিল বলে এরা সকলেই ভাঙা-ভাঙা ইংরিজির মতো জার্মানও জানে। গুটেন মর্গেন হচ্ছে জার্মান গুড মর্নিং।

আমি বললাম, "গুটেন্ মর্গেন্, তুমি বেঁচে আছো?"

টেডি হেসে বলল, "প্রায় মরে যাবারই অবস্থা হয়েছিল কাল সিম্বাদের জন্যে। রাইফেলধারীরা তো দিব্যি ঘুমোলে। আমার কাছে একটা শটগান। তা দিয়ে ক'টা সিম্বা মারব? আমার পুরো নস্যির কৌটোটা কাল শেষই হয়ে গেছে। হাতের তেলোতে নস্যি রেখে তাঁবুর দরজা-জানলা দিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে সব নস্যিই শেষ। এখন কী যে করব জানি না।"

ঋজুদা বলল, "কোনো চিন্তা নেই। আমার পাইপের ট্যোব্যাকো গুঁড়ো করে এই লেকের সোডা কৃস্টাল নিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নাও, দারুণ নস্যি হয়ে যাবে। তুমি জানো তো, সবচেয়ে ভাল নস্যি বানাতে এইসব সোডা লেকের কদর কতখানি?"

তারপরই আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, "পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি রুদ্র। এখন গল্প করার সময় নেই। ভুষুণ্ডা তৈরি হয়ে নাও।"

ভুষুণ্ডা তার টুপির ব্যাণ্ডে কতগুলো নীলচে জংলি ফুল লাগাচ্ছিল। বলল, "আমি তৈরিই আছি।"

দেখতে-দেখতে টেডি আমাদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিল। ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুটের উপর কালকের ভুষুণ্ডার মারা ফেজেন্টের লিভার সাজিয়ে সঙ্গে নাইরোবি-সর্দারের-দেওয়া মারিয়াবো-পাহাড়ের ইয়া-ইয়া মোটা কলা। তারপর কফি।

ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজে। আমরা সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডাইরি, নোট-বই, ক্যামেরা, টেলিফোটো লেন্স, রাইফেল, জলের বোতল, দূরবিন—এইসব চাপাল ঋজুদা আমার ঘাড়ে। নিজের ঘাড়েও অবশ্য কম জিনিস উঠল না। হেভি ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা টেডির হেপাজতে রেখে দিল ঋজুদা। লাইট থার্টি ও সিক্স ম্যান্‌লিকার শুনার রাইফেলটা পিঠের স্লিং-এ ঝুলিয়ে নিয়েছে। আমার হাতে দিয়েছে শট্গান। ভুষুণ্ডাকে দিয়েছে খাওয়ার হ্যাভারস্যাক্ আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

আমরা রওনা হলাম। সিংগল ফর্মেশানে। টেডি হাত নেড়ে টা-টা করল।

যেতে যেতে ঋজুদাকে ঠাট্টা করে বললাম, "প্রেজেন্ট-ট্রেজেন্টস নিয়েছ তো? দেবে না ওদের?"

ঋজুদা ঠাট্টা না-করে বলল, "ওদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই দেব। প্রথম দেখা হবে, আর উপহার দেব না। এ কি একটা কথা হল?"

আমি বললাম, "তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা নয়, অনেক পুরনো দেখা, তাদের জন্যেও তো কিছু প্রেজেন্ট আনতে পারতে।"

ঋজুদা বলল, "তারা কারা ?"
বললাম, "এই যেমন আমি !"
ঋজুদা গম্ভীর মুখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দারুণ একটা চকোলেট দিল আমাকে।
আমি বললাম, "এটা কী ? পেলে কোথায় ? এরকম তো কলকাতায় কখনও দেখিনি।"
ঋজুদা বলল, "দেখবার তো কথা নয়। এটা সুইটজারল্যান্ডে তৈরি। তোরই জন্যে ডার-এস-সালামে কিনেছিলাম। ছেলেমানুষ !"
"ঋজুদা !"
ঋজুদা বলল, "আহা। রাগ করিস কেন ? পুরোটা না-হয় না-ই খেলি। অর্ধেকটা আমায় দে।"
আমি চকোলেটটাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে, আর দু'ভাগ ঋজুদা আর ভুষুণ্ডাকে দিলাম। ঋজুদা নিজের ভাগটা একেবারেই মুখে পুরে দিল। কিন্তু ভুষুণ্ডা বলল, ও খাবে না। ফেরত দিল আমাকে।
অসভ্য ! আমার খুব রাগ হল। আমিও মাসাই হলে ওর ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতাম এতক্ষণে। বেঁচে গেল জোর।
আমরা তখনো একটু ফাঁকায়-ফাঁকায় চলেছি। ঋজুদাকে বললাম, "তুমি তো উপহার নিয়ে যাচ্ছ ওদের জন্যে। নাইরোবি সর্দারিকেও তো উপহার দিলে। ওয়াণ্ডারাবোরা যদি তোমাকে বিষের তীর উপহার দেয় ?"
ঋজুদা হাসল। বলল, "আমরা গান্ধী-চৈতন্যের দেশের লোক। ওরা তীর মারলেও, আমরা ভালবাসবই।"
আমি হেসে বললাম, "তোমাকে কিছুই বিশ্বাস নেই। সারারাত ভয়ে আমার ঘুম হল না, চারদিকে সিংহরা হুড়ুম-দাড়ুম করে বেড়াল আর তারই মধ্যে তুমি কী করে যে বেমালুম ঘুমোলে তা তুমিই জানো। তার উপর অতবড় একটা সিংহকে কেউ যে রাবারের চটি ছুঁড়ে মারতে পারে তা কোনো লোকে বিশ্বাস করবে ?"
ঋজুদা বলল, "রুদ্র, তুই বড্ড কথা বলছিস। একদম চুপচাপ। সারা রাস্তাতে আর একটাও কথা বললে বিপদ হবে। এত বকবক করিস কেন ?"
ভুষুণ্ডা, মনে হল, মুখ টিপে হাসল।
আমার রাগ হল। কিন্তু চুপ করে গেলাম। বাইরের লোকের সামনে ঋজুদা এমন করে প্রেস্টিজ পাংচার করে দেয় যখন-তখন যে, বলার নয়। ভীষণ খারাপ।
আমাকে কথা বলার জন্যে বকেই, নিজেই সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আঃ, সামনে চেয়ে দ্যাখ, কী সুন্দর দৃশ্য।"
আমি দেখলাম। কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। কথা বলব না আর।
ভুষুণ্ডা আগে-আগে চলেছে। লেকটাকে পাশে রেখে, কোনাকুনি তার পাড় বেয়ে পেরিয়ে এলাম আমরা। এই সব লেক পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর সোডিয়ামের জন্যে বিখ্যাত। ঋজুদা বলছিল, সোডার সোয়াহিল। নাম হচ্ছে মাগাডি। মাগাডি নামেই কেনিয়াতে খুব বড় একটা সোডা লেক আছে। সেরোনারার কাছে একটা ছোট লেক আছে এরকম। তার নাম লেক লাগাজা।
আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একদল বেবুন আমাদের দেখে দাঁতমুখ বের করে, বিশ্রী মুখভঙ্গি করে, চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চারতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা

জিরাফ লেরাই গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মগডালের পাতা খাচ্ছিল, আমাদের দেখতে পেয়েই ছুট লাগাল ল্যাগব্যাগ করতে-করতে। একটু পরেই একটা ডিকডিক দৌড়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। কালকের ডিকডিকটাও হতে পারে। ডিকডিক নাকি খুব বেশি দেখা যায় না। ঋজুদা কালকে বলছিল।

ভুষুণ্ডা বড়-বড় পা ফেলে মুখ নিচু করে আগে-আগে চলেছে। ভুষুণ্ডার পিছনে ঋজুদা। তার পিছনে আমি।

ঋজুদা অর্ডার দিয়েছে, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনটা ভাল করে দেখতে। কিন্তু ঘাড়ের উপর এত মালপত্র যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছি না। মনে হচ্ছে, স্পণ্ডিলাইটিস হয়েছে। একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। আমার পুরো পিছন দিকটাই মালপত্র ঢাকা। পায়ে অ্যাঙ্কল বুট। হাঁটুর ঠিক পিছনে না মারলে তীর কোথাওই আমার লাগবে না। ঋজুদা জেনেশুনেই আমাকে এই বর্ম পরিয়ে পিছনে দিয়েছে কি-না, কে জানে ?

একটা ঢালু জায়গা পেরোতেই আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। এবারে সত্যিই ভয় করছে। আধ ঘন্টাখানেক চলেছি আমরা, এমন সময় সামনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম।

ঋজুদা আমার দিকে তাকাল। আমি ঋজুদার দিকে।

তারপর বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম। ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

ভুষুণ্ডা ধোঁয়া দেখে কিছু বলবে, ভেবেছিল ঋজুদা। কিন্তু ভুষুণ্ডা কিছুই না বলে সেই ধোঁয়ার দিকেই এগিয়ে চলল এঁকেবেঁকে। ভুষুণ্ডার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একেই বলে সাহস। হাতে বন্দুক রাইফেল থাকলে তো অনেক বীরত্বই দেখানো যায়।

ভুষুণ্ডা সত্যিই যে কত ভাল গাইড তা এবারে বোঝা যাচ্ছে ! কী সহজে ও চলেছে। দোমড়ানো ঘাস, ভাঙা গাছের ডাল, ছেঁড়া পাতা—এই সবের চিহ্ন দেখে ও লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে এঁকে-বেঁকে। মাঝে-মাঝে পিছিয়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে গিয়ে নতুন পথ ধরছে। আমরা ওকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছি। এবারে জঙ্গল আরও গভীর। বড়-বড় লতা। ফুল ধরেছে তাতে।

হঠাৎ ভুষুণ্ডা দু'হাত দু'দিকে কাঁধের সমান্তরালে ছড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "পোলে, পোলে।"

ঋজুদা বাঁ হাতটা উপরে তুলে পিছনে-আসা আমার উদ্দেশে বলল, "পোলে, পোলে।"

আমি চলার গতি আস্তে করলাম।

এই পরিবেশে ঋজুদাও যেন ইংরেজি বাংলা সব ভুলে গেছে। নইলে ভুষুণ্ডার মতো নিজেও 'পোলে, পোলে' বলত না।

ভুষুণ্ডা আর ঋজুদা আমার থেকে হাত-দশেক সামনে ছিল। ওরা দুজন ফিসফিস করে কী বলাবলি করল। তারপর ইশারাতে আমাকে ডাকল।

এগিয়ে যেতেই ভুষুণ্ডা আবার এগিয়ে গিয়েই একটা উৎরাইতে নামতে লাগল। একটু নামতেই নাকে পচাগন্ধ এল আর সেই গন্ধ আসার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম সামনেই ধোঁয়া উড়ছে গাছপালার আড়ালে।

তারপরই যা দেখলাম, তার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলাম না। সে-রকম কিছু যেন

কখনও কাউকে দেখতে না হয়।

কতকগুলো পাশাপাশি কুঁড়েঘর, খড়ের। তার সামনে একটা বড় আগুন তখনও জ্বলছে। তিরতির করে একটা নদী বয়ে চলেছে। সেই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। ঘরগুলোর সামনে বড় বড় কাঠের খোঁটার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে প্রায় একশো জানোয়ারের রক্তমাংস লেগে-থাকা চামড়া ঝুলছে। তার মধ্যে জেব্রা, ওয়াইল্ডবীস্ট, ইম্পালা, গ্রান্টস ও থমসনস গ্যাজেল, এলান্ড, টোপি, বুশবাক, ওয়াটার বাক, বুনো মোষ—সবকিছুর চামড়াই আছে। সমস্ত জায়গাটা রক্তে-মাংসে বমি-ওঠা দুর্গন্ধে যেন নরক হয়ে আছে একেবারে।

আমরা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম গাছ-গাছালির আড়াল থেকে। আগুনটা নিশ্চয়ই কাল রাতের। এখন নিভে এসেছে। একজনকেও দেখা গেল না ওখানে। ওরা সারারাত কাজ করে এখন বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

রাইফেলটা তাক করে ঋজুদা এবারে আগে গেল। তারপর ভুষুণ্ডা। ভুষুণ্ডার পেছনে আমি।

ঋজুদা আমাকে ডেকে বলল, "তুই বন্দুক তৈরি রেখে বাঁ দিকে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। আমরা জায়গামতো গিয়ে দাঁড়ালে ভুষুণ্ডা তুমি এইখান থেকে জোরে-জোরে কথা বলবে।"

ওয়াণ্ডারাবোদের ডেরায় এসে খালি হাতে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার। কিন্তু ভুষুণ্ডা একটুও ভয় পেল না। আমার মনে হল ঋজুদা যেন চাইছে ভুষুণ্ডার বিপদ ঘটুক!

আমরা সরে দাঁড়াতেই ভুষুণ্ডা অজানা ভাষায় জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। আমার মনে হল মেশিনগান থেকে গুলি ছুটছে ট্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-ট্যা-র‍্যা করে। কী অদ্ভুত ভাষা রে বাবা!

কিন্তু তবুও ঐ কুঁড়েঘর থেকে কেউই বেরোল না। যখন একজনও বেরোল না, তখন ঋজুদা হাত দিয়ে ইশারা করল আমাকে। আমরা দুজনে রাইফেল ও বন্দুক তৈরি রেখে আস্তে আস্তে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে দু'দিক থেকে এগিয়ে গেলাম। ভুষুণ্ডা আমাদের আগে-আগে ডোন্ট-কেয়ারভাবে খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের মালপত্র সব আগুনের পাশে নামিয়ে রেখে নিভু-নিভু আগুনের মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর আগুনের পাশেই ফেলে-রাখা একটা বিরাট তালগাছের গুঁড়িতে বসে আরামে সিগারেট টানতে টানতে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে পিছন ফিরে আমাদের দেখতে লাগল।

তখনও যখন কাউকে দেখা গেল না, তখন আমরা মধ্যে সাবধানে সামনের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকলাম। কুঁড়ের মধ্যে বস্তা-বস্তা নুন, ফিটকিরি, নানারকম ছুরি ও বড় বড় অনেক লোহার তারের গোলা দেখতে পেলাম।

ঋজুদা বলল, "লাইন। এগুলোকে স্নেয়ার বলে। তারের ফাঁদ। এই তার বেঁধে রাখে জানোয়ারদের যাতায়াতের পথে জালের মতো। একসঙ্গে অনেক জানোয়ারকে ধরতে পারে এবং মারতে পারে এরা এমন করে।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়?"

"সব পালিয়েছে। কাল রাতে ভু-বাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই বোধহয় ওরা বুঝেছিল।"

আমি বললাম, "পালিয়ে যাবে কোথায়? চলো, আমরা ফিরে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের

ধাওয়া করি। এই জঙ্গল পেরিয়ে তো ওদের ফাঁকা জায়গা দিয়ে অনেকটাই যেতে হবে। তারপরে না-হয় আবার জঙ্গল পাবে।"

ঋজুদা বলল, "তা ঠিক। কিন্তু আমরা তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। ওদের ধরতেও আসিনি। এসেছি ওদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। এই কুঁড়েঘরগুলো ভাল করে খুঁজলে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে। কয়েকদিন ভুষুণ্ডা না হয় গাড়ির কাছেই তাঁবুতে থাকবে। টেডিকে এখানে ডেকে আনাব। তারপর দিন-কয়েক এখানে ওদের থাকার রকম-সকম দেখব। তাতে ওরা কোন পথ দিয়ে আসে যায়, কী কী জানোয়ার বেশি মারে, কেমন করে মারে, কেমন করে চামড়া শুকোয়, কী খায় ওরা, কেমন ভাবে থাকে, কীভাবে টন-টন স্মোকড-করা মাংস পাচারই বা করে বিক্রির জন্যে—এসব জানতে পারব।"

ভুষুণ্ডা সিগারেট খেতে খেতে বলল, "পাখিরা উড়ে গেছে"

ঋজুদা বলল, "তাই তো দেখছি।"

বাঁদিকের কোনায় একটা বড় ঘর ছিল। তার মধ্যে ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, বিরাট-বিরাট হাতির দাঁত শোয়ানো আছে মাটিতে। হাতির লেজের চুল কেটে গোছ করে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো হাতির পা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে মাংস কুরে বের করে তার মধ্যে ঘাস পুরে রেখেছে।

আমি বললাম, "ঈস্স।"

ঋজুদা বলল, "হাতির লেজের চুল দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয়। আর পা দিয়ে হয় মোড়া বা টেবিল। দাঁত দিয়ে তো অনেক কিছুই হয়। বল তো ঐ দাঁতটার দাম কত হবে আন্দাজ?"

আমি বললাম, "দশ হাজার টাকা?"

ঋজুদা বলল, "কম করে দু'লাখ টাকা।"

"দু'লাখ! বলো কী?"

"হ্যাঁ। কম করে।" তারপরেই বলল, "কী বুঝলি? বুঝলি কিছু?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। দু'লাখ।"

ঋজুদা বলল, "তা নয়। এতগুলো দাঁত ওরা এভাবে ছেড়ে যাবে না। ওরা আসলে চলে যায়নি। আশেপাশেই আছে হয়তো। আমাদের দেখছে আড়াল থেকে। এখানে কম করে দশ-বারো লাখ টাকার হাতির দাঁতই আছে শুধু। অন্য চামড়া-টামড়ার কথা ছেড়ে দে। ওরা নিশ্চয়ই যায়নি। খুব হুঁশিয়ার রুদ্র। এক মিনিটও অসাবধান হবি না। তাছাড়া, এই ভুষুণ্ডাকে আমার কেমন যেন লাগছে। প্রথম দিন থেকেই। কী যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি আর ঋজুদা ঐ বড় কুঁড়েটা থেকে মাথা নিচু করে বেরোব, ঠিক সেই সময় খট করে কী একটা জিনিস এসে লাগল। ঘরের খুঁটিতে।

তাকিয়ে দেখি, একটা লম্বা তীর। আর তার পিছনের পালকের কাছে এক টুকরো শুকনো সাদাটে তালপাতা বাঁধা। ঋজুদা তাড়াতাড়ি তালপাতাটা একটানে খুলে নিয়ে পড়ল। পড়েই, আমার হাতে দিয়েই, আমার হাত ধরে ঘরটার ভিতর দিকে সরে এল।

দেখলাম, তালপাতার টুকরোটার উপরে কোনো গাছের ডাল বা আঙুল রক্তে ভিজিয়ে কেউ বিচ্ছিরি হাতের লেখাতে এবড়ো-খেবড়ো করে ইংরেজিতে লিখেছে: SURRENDER OR DIE।

আমি বললাম, "বেরোব এখান থেকে ?"

ঋজুদা বলল, "একদম নয়।"

আমার বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছিল। বললাম, "দু'হাত উপরে তুলে বেরোব ? সারেণ্ডার করবে ?"

ঋজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে নিল একটু, তারপর বলল, "তোর লজ্জা করল না ওকথা বলতে ?"

তারপরই বলল, "ভুষুণ্ডাকে দেখতে পাচ্ছিস ? নিচু হয়ে দ্যাখ তো।"

নিচু হয়ে দেখলাম। ভুষুণ্ডা যেখানে বসে ছিল, সেখানে নেই তো। বললাম, "না। দেখতে তো পাচ্ছি না।"

"হুম্‌ম্‌ !" ঋজুদা বলল।

ঘরটার মুখের ডান দিক থেকে—যাতে আমাদের রাইফেল বন্দুকের সামনে না পড়তে হয়, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন লোক জোরে-জোরে চারটে উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করল।

ঋজুদা তার উত্তরে ঐরকমই উদ্ভট উচ্চারণ করেই যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল, সেইদিকে রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে খড়ের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। দিয়েই আমাকে বলল, "তুই ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনেও গুলি কর থেমে-থেমে খড়ের দেওয়ালের এপাশ থেকে।"

বলেই, পাইপের আগুনটা ঢেলে দিল খড়ের দেওয়ালের উপর। দেখতে-দেখতে ঘরটাতে আগুন ধরে গেল।

আমি বললাম, "ঋজুদা, কী করছ ? আমরা পুড়ে মরব ?"

ঋজুদা বলল, "দারুণ ধোঁয়াতে ঢেকে গেলেই আমরা বাঁচতে পারব ওদের বিষের তীরের হাত থেকে। নইলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।" এইটুকু বলেই, ঋজুদাও ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল বাইরের দিক লক্ষ করে। গুলির তোড়ে খোলা দরজার সামনে এসে যে কেউ আমাদের তীর মারবে সে-উপায় ছিল না ওদের।

এদিকে এমনই ধোঁয়া হয়ে গেছে ভিতরে যে, নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। চালেও আগুন লাগো-লাগো। চালে আগুন লাগলে আগুন চাপা পড়েই মরতে হবে। আর উপায় নেই।

আমি ভেবেছিলাম, ঋজুদা পেছন দিয়ে খড়ের দেওয়াল ফাঁক করে পালাবে। কিন্তু তা না করে এই ঘরের লাগোয়া যে ঘর আছে সেই দিকের দেওয়ালের খড়ে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ফুটো করল। আমিও টেনে-টেনে খড় সরালাম। আগুনে চড়চড় করে খড় পোড়ার শব্দ হু হু হাওয়ায় শোনা যাচ্ছিল। সামনে থেকে কারা যেন খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে। চারদিকে এত তাপ আর ধোঁয়া যে আমরাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের লোকেরাও নিশ্চয়ই পাচ্ছে না।

দেওয়ালটা ফুটো হতেই ঋজুদা ফুটো দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ল। আমিও পিছন-পিছন। ঐ ঘরেও তখন আগুন লেগে গেছিল। ঋজুদা দৌড়ে গিয়ে আবার সেই ঘরের দেওয়াল অমনি করে ফুটো করতে-করতে আমাকে লাইটারটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এই ঘরের চারদিকের দেওয়ালে আগুন লাগিয়ে দে।" আমরা যখন সেই ঘর পেরিয়ে তার পাশের ঘরে ঢুকলাম তখন দু'নম্বর ঘরটাও দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। এমনি

করে সমস্ত জায়গাটা জতুগৃহের মতো জ্বলছে। আগুনে-পোড়া নানা মাংস ও চামড়ার উৎকট গন্ধে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট শ্মশানে এসে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়ে ঐ শেষ ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল ঋজুদা। ধোঁয়াতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আমাদের। কাশিও পাচ্ছিল ভীষণ। ভয়ে কাশতে পারছিলাম না। কোন দিকে যাব আমরা ভাবছি, ঠিক সেই সময় দুটো লোক তীরধনুক হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল প্রথম কুঁড়েটার দিকে, যেখানে হাতির দাঁত ছিল। তারপর কী মনে করে ওরা আবার দৌড়ে ফিরে এল, বোধহয় ভেবেছিল, আমরা ঐ প্রথম কুঁড়েটার পিছন দিকেই বেরোব। অথবা আগুনে ঝলসে গেছি। এবারও লোকগুলো আমাদের দেখতে পায়নি—আমরা দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে ছিলাম—তাছাড়া ওখানে যে থাকতে পারি আমরা তা ওদের ধারণারও বাইরে ছিল। কিন্তু দুটো লোকের মধ্যে পিছনের লোকটা পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, বাঁ দিকে তাকাল আমাদের মুখে। কুচকুচে কালো, মোটা-মোটা ঠোঁটে, গুঁড়িগুঁড়ি চুলে লোকটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ও ধনুকটা আমাদের দিকে ঘোরাল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বন্দুক থেকে, যেন আমার অজান্তেই গুলি বেরিয়ে গেল। বোধহয় এল-জি ভরা ছিল। গুলি আর দেখাদেখির সময় ছিল না। যে গুলি পাচ্ছিলাম তাই-ই ভরছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। চার হাত দূর থেকে বুকে অ্যালফাম্যাক্স-এর এল-জি খেয়ে লোকটা পড়ে গেল। হাতের ধনুক-তীর হাতেই রইল।

আমি গুলি করতে-না-করতেই ঋজুদা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্য লোকটাকে গুলি করল রাইফেল দিয়ে। সে ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তীরটা গিয়ে লাগল ঋজুদার গায়ে নয়, আমার গুলি-খেয়ে-পড়ে-যাওয়া লোকটারই গায়ে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকটার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল ; ঠোঁটটা নড়ল, কপালে ঘাম ভরে এল। আমি খুনী। মানুষ মারলাম আমি। এক্ষুনি একজন মানুষকে মেরে ফেললাম।

ঋজুদা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই বলল, "দৌড়ো। ওরা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে হয়তো।"

দৌড়তে-দৌড়তে ভাবছিলাম যে, হয়তো শুনতে পায়নি ওরা—আগুনের জন্যে যা শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে, আর যা ধোঁয়া। ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখতেও পায়নি।

আমরা দৌড়তে-দৌড়তে এসে লেকের পাশে পৌঁছলাম, কিন্তু ফাঁকা জায়গায় না বেরিয়ে লেরাই জঙ্গলের নীচে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম। লেকটা পেরিয়ে একটু গিয়েই আমাদের তাঁবু। টেডি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে একা একা অপেক্ষা করছে সেখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। আজও উগালি ? দুস্‌স।

আমি ফিসফিস করে ঋজুদাকে বললাম, "ভুষুণ্ডাকে খালি হাতে আনা আমাদের উচিত হয়নি। ওরা বোধহয় ভুষুণ্ডাকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে।"

ঋজুদা বলল, "বোধহয় না। দেখাই যাক।" তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "খুব সময়মতো গুলিটা করেছিলি তুই। লোকটা ধনুকের ছিলাতে টান দিয়েছিল, আর এক সেকেন্ড দেরি হলে... ওয়েল-ডান্।"

আমি বললাম, "ঈস্‌স, মানুষ মারলাম।"

ঋজুদা বলল, "শখ করে তো আর মারিসনি। তাছাড়া ওরা জঘন্য অপরাধ করছে।

আমাদের মেরেও তো ফেলত একটু হলে। না মারলে, আমরা নিজেরাই মরতাম। করার তো কিছু ছিল না।"

ওখানে বসে-বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পিছনে বহুদূরে জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে কালো ধোয়ার কুণ্ডলী আর ভস্মীভূত রেড-ওট্ ঘাস উড়ছে আকাশে। ফ্লেমিংগোগুলো তাদের শরীরের গোলাপি ছায়া ফেলে জলে, অদ্ভুত উদাস স্বরে ডাকছে। জলের উপরে তাদের গলার স্বর ভেসে যাচ্ছে অনেক দূর অবধি।

আমি বললাম, "ওরা যেই জানবে যে আমরা ওদের দুজনকে মেরে পালিয়ে গেছি তখন প্রতিশোধ নিতে তাঁবুতে যাবে না তো! আমাদের মেরে নিশ্চিত হবে হয়তো ওরা।"

ঋজুদা বলল, "অত সাহস হবে না। এ যাত্রা ওরা হয়তো পালিয়েই যাবে। যারা নিজেরা অন্যায় করে এবং জানে যে তারা অন্যায় করছে, তাদের মেরুদণ্ডে জোর থাকে না। সাহসের অভাব হয় ওদের। যে কারণে বড়-বড় যুদ্ধেও দেখা যায় যে, অনেক বেশি বলশালী হয়েও যে-দেশ অন্যায় করে তারা হেরে যায় যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে সেই দেশের সৈন্যদের মনের জোরের কাছে। অন্যায় যারা করে, তারা একটা জায়গায়, একটা সময়ে পৌঁছে ভীরু হয়ে যায়ই। মানুষ অন্য সকলকেই ঠকাতে পারে, পারে না কেবল নিজের বিবেককে। যদি সে মানুষ হয়।"

আমরা ওখানে প্রায় দু'ঘন্টা চুপ করে বসে রইলাম। লেকের অন্য পাশে যে পথটা তাঁবুর দিকে গেছে তা দিয়ে একদল এলাণ্ড আর টোপি এন্টেলোপ চলে গেল। এই টোপিগুলো বেশ বড় হয়। আমাদের দেশের শম্বরের মতো, তবে শিং বড় হয় না। শরীরের সঙ্গে যেখানে পা মিলেছে সেখানটা কেমন নীল রঙের হয়—আর শরীরটা খয়েরি। এলাণ্ড-ও বেশ বড় হয়।

তারা চলে যাবার পর একটা মস্তবড় বেবুন-পরিবার চলে গেল কিরখির করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। কিন্তু কোনো মানুষকেই দেখা গেল না। এদিকে বেলা অনেক হয়েছে। কী করে যে এত সময় কেটে গেল বোঝাই গেল না। এতক্ষণ ঋজুদাও পাইপ খায়নি, পাছে ওয়াণ্ডারাবোরা ধোঁয়া দেখতে পায়।

আমরা এবার উঠে সাবধানে এগোলাম। আস্তে-আস্তে সমস্ত পথটা পেরোলাম। লেকটা পেরিয়ে এলাম, আবার লেরাই জঙ্গল, তারপর দূর থেকে তাঁবুটা দেখা গেল। এবারে পুরো তাঁবুটাই দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে আগুনের উপর বাসন ছড়ানো আছে। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। টেডি বোধহয় খাবার গরম করবে আমরা ফিরলে।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, "ল্যাণ্ড-রোভার?"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম! কোথায় গেল? আমাদের ট্রেলারসুদ্ধু ল্যাণ্ড-রোভার?"

ঋজুদার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "যা ভেবেছিলাম।" তারপরই বলল, "চাবিটা তুই নিজের কাছে রাখিসনি? কাল তো তুই-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলি!"

আমি বললাম, "আমাদের কাছেই তো ছিল। কাল সন্ধেবেলায় ভুষুণ্ডা চেয়ে নিয়েছিল। ড্রাইভিং সীট-এর দরজা বাইরে থেকে লক্ করে শোবে বলে—যাতে সিংহ-টিংহ এলে ভয় না থাকে। সিংহ ত' এসেওছিল রাতে।"

ঋজুদা এবারে দৌড়তে লাগল তাঁবুর দিকে। আমিও পিছনে পিছনে।

আমি ডাকলাম, "টেডি, টেডি!"

টেডিও কি ভুষুণ্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে ? কত ভাল টেডি ! কত সুন্দর গল্প বলবে বলেছিল আমাকে ও আজ রাতে !

টেডি বাইরে কোথাওই নেই। তাঁবুর ভিতরেও নেই ; আমাদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দেখলাম, কারা যেন সব লণ্ডভণ্ড করেছে। ঋজুদার কাগজপত্র, অন্যান্য জিনিস, আমাদের বন্দুক-রাইফেলের গুলি যা তাঁবুতে ছিল সবই নিয়ে গেছে তারা। ঋজুদার ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা পর্যন্ত। আমাদের খাবার-দাবার, বন্দুক, রাইফেলের গুলির বাক্স, পেট্রল, আরও সমস্ত জিনিসপত্র যা ট্রেলারের ভিতরে রাখা ছিল সবই গেছে ট্রেলারের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, "রাইফেল নিয়েছে বটে, কিন্তু লক্‌টা আমার কাছে। ও দিয়ে গুলি ছুঁড়তে পারবে না।"

কিন্তু টেডি ? টেডি কোথায় গেল ? টেডিও কি আমাদের শত্রুপক্ষ ? ঋজুদা এত বোকা ! যখন ওদের ইন্টারভ্যু করে আরুশাতে এসে তিন মাস আগে সিলেক্ট করে তখন ওদের সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবরও নেয়নি ?

আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁবুর পিছনে যেতেই, আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল। টেডি হাত-পা ছড়িয়ে আছে। যেন তার কিছুই হয়নি। যেন ও ঘুমোচ্ছে। শুধু একটা ছোট্ট তীর গেঁথে রয়েছে ওর গলাতে।

ঋজুদা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বলল, "ভুষুণ্ডা !"

বলেই, তাঁবুর সামনে এসে নিচু হয়ে ধুলোর মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল। নিজের মনেই বলল, "ঠিক।"

আমি বললাম, "কী ?"

ঋজুদা বলল, "ভুষুণ্ডা টেডিকে মেরে ফেলার পর ওয়াণ্ডারাবোরা ওর সংকেতে এখানে আসে। তারপর ল্যাণ্ড-রোভার ও ট্রেলারে চড়ে ভুষুণ্ডার সঙ্গে পালিয়ে যায়। কয়েকজনকে রেখে যায় হয়তো আমাদের শেষ করে মালপত্র নিয়ে হাঁটা-পথে যাওয়ার জন্যে।

"কী সাংঘাতিক। এখন আমার কী করব ঋজুদা ?" আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললাম !

ঋজুদা বলল, "দাঁড়া। দাঁড়া। ভয় পাস না। কিন্তু আগে টেডিকে কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে রাতে হায়না আর শেয়ালে বেচারাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু এখানের মাটি যে খুব শক্ত !"

আমি আর ঋজুদা টেডিকে বয়ে নিয়ে গেলাম লেকের কাছে। তাঁবুর খোঁটা গাড়বার শাবল দিয়ে আমরা দুজনে মিলে কয়েক ঘন্টা ধরে একটা বড় গর্ত করলাম। তারপর টেডিকে তার মধ্যে শুইয়ে, জঙ্গল থেকে অনেক ফুল তুলে এনে উপরে ছড়িয়ে দিলাম। আমরা যখন টেডিকে কবর দিচ্ছিলাম তখন ওয়াণ্ডারাবোদের আর কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।

পশ্চিমাকাশে একটা দারুণ গোলাপি রঙ ছড়িয়ে গেছিল। রঙটা কাল খুব খুশির মনে হয়েছিল। আজ মনে হল বড় দুঃখের।

একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে ঋজুদা লিখল, টেডি মহম্মদ, আমাদের বিশ্বস্ত, আমুদে, সাহসী বন্ধু, এইখানে শুয়ে আছে। তার নীচে লিখল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি—অপারেশন : ওয়াণ্ডারাবো ওয়ান। তারও নীচে তারিখ দিয়ে লিখে দিল, ঋজু

বোস অ্যাণ্ড রুদ্র রায়চৌধুরী।

আমি ভাবছিলাম, আমাদের বন্ধু টেডি এখানেই শুয়ে থাকবে। শীতের শিশির পড়বে ওর কবরের উপর। স্টার্লিং পাখিরা কিচিরমিচির করে গান গাইবে কানের কাছে। নরম পায়ে ডিকডিক হরিণ হেঁটে যাবে। বর্ষাকালে ফিসফিস করে বৃষ্টি আলতো করে হাত ছোঁয়াবে ওর গায়ে। রামধনু-হাতে খনভাম্ এসে দেখে যাবেন টেডিকে। বাজ পড়ার শব্দ হয়ে কথা বলবেন টেডির সঙ্গে। হয়তো কোনো গাঢ় অন্ধকার রাতে গুগুনোগুম্বার অথবা ওগ্‌রিগাওয়া বিবিকাওয়া চুপিসারে কোনো কুচকুচে কালো লোমশ জানোয়ারের মূর্তি ধরে এসে টেডির কবরের কাছে থাবা গেড়ে বসে ওকে পাহারা দেবেন।

পশ্চিমে অল্প ক'টি অ্যাকাসিয়া গাছের পাহারায়, ধু-ধু দিগন্তের উপরে সূর্য হারিয়ে গেল আজ। টেডিও হারিয়ে গেল। চিরদিনের মতো।

আমার চোখ জলে ভরে এল।

কাল রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। ঘুমোবার সাহসও হয়নি। ঋজুদা ম্যাপ নিয়ে আঁকিবুঁকি করেছিল তাঁবুর সামনে বসে, আর বই পড়েছিল। আমাকে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে বলেছিল বটে, কিন্তু একটু করে শুয়েছি আর ঋজুদার কাছে এসে বসেছি বারবার আগুনের সামনে।

কাল রাতেও সিংহগুলো এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু দূর দিয়ে চলে গেছিল। ওরা বোধহয় কোনো বড় জানোয়ার, মোষ অথবা টোপি মেরে থাকবে। বেশ শান্ত-সভ্য ছিল সে-রাতে। আমাদের কাল কিছুই খাওয়া হয়নি। খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। আজ সকালে জিনিসপত্র হাতড়ে বিস্কুটের টিন বেরুল। সেই বিস্কুট আর কফি খেলাম আমরা।

আমি বললাম, "কী হবে ঋজুদা! চলো আমরা মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যাই নাইরোবি সর্দারের গ্রামে। তাও তো এখান থেকে ষাট সত্তর মাইল কম করে। জলও তো সব ট্রেলারেই ছিল। জল পাব কী করে? তার চেয়ে চলো ফিরে যাই।"

ঋজুদা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "এখানে আমরা কেন এসেছিলাম?"

আমি ঋজুদার চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেলাম। মুখ নিচু করে বললাম, "তা ঠিক!"

ঋজুদা বলল, "ভুলে যাস্ না রুদ্র যে, তুই মানুষ! মানুষ মনের জোরে কী না পারে, কী না করতে পারে? একা একা পালতোলা নৌকোতে মানুষ সমুদ্র পেরোয়নি? মরুভূমি পেরোয়নি পায়ে হেঁটে? এইসব জায়গায় যখন প্রথম ইংরেজ ও জার্মান পর্যটকরা আসেন, শিকারীরা আসেন, বিজ্ঞানীরা আসেন, তাঁরা কি গাড়ি করে এসেছিলেন? এই অঞ্চলেই একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রাহক একা-একা প্রজাপতি খুঁজতে এসে রিফট্‌ভ্যালিতে মানুষের হাড় কুড়িয়ে পেয়ে ফিরে গিয়ে বার্লিন মিউজিয়ামে জমা করেন। তার থেকে আবিষ্কার হয় ওলডুভাই গর্জ-এর। ডঃ লিকি সস্ত্রীক এসে বছরের পর বছর এইরকমই জায়গায়, তাঁবু খাটিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি চালান সেখানে। আবিষ্কৃত হয় কত নতুন তথ্য, কত কী জানতে পারেন।"

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, "রুদ্র, তুই না অ্যাডভেঞ্চারের লোভে প্রায় জোর করেই আমার সঙ্গে এসেছিলি আফ্রিকায়? এরই মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটে গেল! তোর বয়সি গুজরাটি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি ছেলেরা বিদেশ-বিভুঁইতে একা একা ব্যবসা করতে চলে আসে। দেখলি তো ডার-এস্-সালাম-এ, আরুশাতে কত ভারতীয় ব্যবসা করছে।

তার মধ্যে বাঙালি দেখলি একজনও ?"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুই তাহলে আমার সঙ্গে এলি কেন ? আমি তো এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছি।"

ঋজুদার হাঁটুতে হাত দিলাম। বললাম, "আমাকে ক্ষমা করো। বলো, আমরা এখন কী করব ?"

ঋজুদা আমার হাতে হাত রেখে বলল, "আমরা এখন জীপের চাকার দাগ ধরে এগোব। প্রথমত, ওরা কোথায় যায় তা দেখতে চাই আমি। আমি যে কাজে এসেছি তার জন্যে ওদের চলাচলের পথ জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, ওরা ট্রেলারটা কিছুদূর গিয়েই ছেড়ে দেবে। কারণ ট্রেলার নিয়ে জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না। ট্রেলারটা পেলে আমরা মালপত্র পেয়ে যাব। ঐসব মাল ওরা ভয়ে নেবে না— পাছে চোরাই মাল সন্দেহে পুলিস ওদের ধরে।"

আমি বললাম, "তুমি কি পায়ে হেঁটে ওদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে ?"

ঋজুদা বলল, "তা পারব, যদিও সময় লাগবে। তাছাড়া ভুষুণ্ডার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। আসলে ও তো কর্মচারী। এই যে সব লোক দেখছিস, এই সব নানা চোরা-শিকারীর দল, ভুষুণ্ডার মতো অর্ধশিক্ষিত লোকেরা, সব এক বিরাট দলের মধ্যে আছে। এই সব দলকে চালায় খুব ধনী ব্যবসায়ীরা। তাদের অন্য ব্যবসার আড়ালে এটাও তাদের একটা লাভের ব্যবসা। আমি যে কাজে এসেছি, তা সফল হলে, অনেক রাঘববোয়ালের মাথা ধরে টান পড়বে। তাই তারা আগেভাগেই বুদ্ধি করে ভুষুণ্ডাকে আমার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ভূত আর ঝাড়বে কী করে বল্ ওঝা ? ভুষুণ্ডা একা-লোক নয়। ও এক বিরাট চক্রের একটি যন্ত্র মাত্র। ও তো সামান্য চাকর। আমার দরকার ভুষুণ্ডার মালিকদের। ফয়সালা তাদেরই সঙ্গে। তবে ভুষুণ্ডার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে টেডির কারণে। টেডির মৃত্যুর প্রতিশোধ এই আফ্রিকার জঙ্গলেই আমি নেব।"

আমি বললাম, "চলো তাহলে, আর দেরি কেন ?"

ঋজুদা উঠল। দুজনের হ্যাভারস্যাকে যা-যা অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া যায় তা ভরে নিয়ে, দুজনের কাঁধে দুটি জলের ছাগল উঠিয়ে ভাল করে বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পিছনে পড়ে রইল তাঁবু দুটো—আমাদের ক্যাম্প-কট্, বিছানা, জুতো জামা, অনেক কিছু জিনিস, যা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর পড়ে রইল টেডি, চিরদিনের জন্যেই পড়ে রইল।

ল্যাণ্ড-রোভার আর ট্রেলারের চাকার দাগ দেখে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। মাইল দুয়েক আসার পর পিছনের সব-কিছু ধু-ধু মাঠের রোদের তাপে আর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন আমরা আবার ঘাসের সমুদ্রে এসে পড়লাম। কম্পাসই সম্বল এখন। আর সূর্য। এই সাভানা। পৃথিবীর এক ভৌগোলিক আশ্চর্য।

সারাদিনে হেঁটে আমরা কত মাইল এলাম বলা মুশকিল, কিন্তু আমরা এখনও ল্যাণ্ড-রোভারের চাকার দাগ হারাইনি। মাঝে একবার গোলমাল হয়ে গেছিল দুপুরের দিকে। তারপর ঋজুদা আবার খুঁজে পেয়েছিল। যেদিকে চোখ যায় শুধু ধু-ধু হলুদ ঘাসের প্রান্তর। একটাও গাছ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, মানুষ নেই—শুধু জানোয়ারের মেলা। সেৎসী মাছির জন্যে এখানে মাসাইরাও বিশেষ গরু চরাতে পারে না। বসবাস করতে পারে না রাইফেল-বন্দুকধারী মানুষও। এমনই সাংঘাতিক এই মৃত্যুবাহী মাছিরা।

সন্ধের আগে-আগে আমরা কিছুটা ঘাস পরিষ্কার করে জিনিসপত্র নামিয়ে বসলাম। এক টিন ককটেল সসেজ বেরোল। কফি এখনও আছে। কফি আর সসেজ খেয়ে, হ্যাভারস্যাকে মাথা দিয়ে রাইফেল পাশে রেখে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে। পাশাপাশি! রাতে ভাল ঠাণ্ডা পড়বে।

আস্তে-আস্তে তারারা ফুটে উঠল। কাল থেকে আজ চাঁদের জোর বেশি। দিনভর হেঁটে দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। ঋজুদা তো কাল রাতে একটুও ঘুমোয়নি। তাই দুজনেই শুতে না শুতেই ঘুমোলাম।

মাঝরাতে কী যেন একটা শব্দে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি! হঠাৎ হাজার-হাজার খুরের জোর শব্দে ঘুম-চোখে উঠে বসে দেখি, ঋজুদা আমাদের দুজনেরই পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দুটো জ্বালিয়ে রেখেছে সামনে। আর সেই আলোতে দূরে দেখা যাচ্ছে হাজার-হাজার জানোয়ার জোরে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে প্রচণ্ড শব্দে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে।

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, কী ব্যাপার?

কিন্তু আমার গলার স্বর গলার মধ্যেই মরে গেল। এত আওয়াজ।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ ধরে যে ওরা দৌড়ে গেল তার হিসেব করতে পারলাম না। শব্দ থামলে দেখা গেল, ধুলোর মেঘে আকাশের চাঁদ-তারা সব ঢেকে যাওয়ার যোগাড়।

ঋজুদা বলল, "আশ্চর্য। এই সময় তো মাইগ্রেশানের সময় নয়। ওরা এমন করে দৌড়ে গেল কেন? কোনো আগ্নেয়গিরি কি জেগে উঠল? নিশ্চয়ই কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটবে। নইলে এ-রকম হত না!"

কত হাজার জানোয়ার যে ছিল বলতে পারব না। লক্ষও হতে পারে। জেব্রা, ওয়াইল্ডবীস্ট আর গ্যাজেলস্।

ঋজুদা বলল, "আমরা এতক্ষণে কিমা হয়ে মিশে যেতাম ওদের পায়ে-পায়ে। দূর থেকে শব্দ শুনে উঠে পড়ে ভাগ্যিস দুটো টর্চ একসঙ্গে জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লেগেছিলাম। তাতেই সামনে যারা আসছিল তারা দয়া করে পথ একটু পালটাল। নইলে পুরো দলটাই আমাদের উপর দিয়ে চলে যেত।

আমি বললাম, "ঋজুদা। ল্যাণ্ড-রোভারের চাকার দাগ তো আর দেখা যাবে না। ওরা বোধহয় কয়েক মাইল জায়গা একেবারে সাদা করে দিয়ে গেছে পায়ে-পায়ে। তাই না?"

ঋজুদা বলল, "ঠিক বলেছিস তো। আমার তো খেয়ালই হয়নি!"

বললাম, "এখন কী করবে তবে?"

ঋজুদা বলল, "ঘুমুব। নে, শুয়ে পড়। আর মনে কর, তোদের বাড়ির দক্ষিণের ঘরে, গ্রিল-দেওয়া জানালার পাশে ডানলোপিলোর বিছানায় ধবধবে সাদা চাদরে ঘুমিয়ে আছিস। ঠিক ছ'টার সময় জনার্দন ট্রেতে করে ফলের রস এনে বলবে, ওঠো গো দাদাবাবু! আর কত ঘুমোবে?"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "তুমিও সেইরকম ভাবো।"

বলে, দুজনেই শুয়ে পড়লাম।

ভোর হল শকুনের চিৎকারে। আমাদের চারধারে বড় বড় বিশ্রী দেখতে লাল-মাথা প্রায় একশো শকুন উড়ছে, বসছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাঁটছে। আমরা কি মরে গেছি? নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলাম, না তো! দিব্যি নিশ্বাস পড়ছে। ঋজুদা দেখলাম ছবি তুলছে শকুনগুলোর।

আমি উঠে বসতেই ঋজুদা বলল, "আশ্চর্য। এরা কি আমাদের মড়া ভাবল ! ব্যাপারটা কী বল তো ?"

আমার মনে পড়ল টেডি বলেছিল একটা প্রবাদের কথা। শকুন যদি কোনো জীবন্ত মানুষের তিন দিকে ঘিরে থাকে তাহলে সে মানুষ তিন দিনের মধ্যে মরে যায়। শকুনগুলো আমাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে।

ঋজুদাকে এই কথা বলতেই সে বলল, "তোর লেখাপড়া শেখা বৃথা হয়েছে।"

বলেই, গুলিভরা শট্‌গানটা তুলে নিয়ে দুমদাম করে দুদিকে দুটো গুলি করে দিল। দুটো শকুন উল্টে পড়ল। অন্য শকুনগুলো সঙ্গে-সঙ্গে বিচ্ছিরি চিৎকার করে উড়ে গেল।

ঋজুদা বলল, "চল তো এই ভাগাড় থেকে পালাই।" বলে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলল। পিছন-পিছন আমি।

আমরা একটু দূরে গিয়ে, ঘাস পরিষ্কার করে, খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় দেখি অন্য শকুনগুলো ঐ দুটো মরা শকুনকে খেতে লেগেছে।

ঋজুদা সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "এদের দেখে আমার মানুষদের কথা মনে পড়ছে। সংসারে কিছু-কিছু মানুষ আছে, যারা এই শকুনগুলোর মতো।"

আমি বিস্কুটের টিন বের করলাম। নাইরোবি সর্দারের দেওয়া দুটো কলা ছিল। মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, সব ভুলে গেছি। জল কোথায় ? খাওয়ার জলই যেটুকু আছে তাতে ক'দিন চলবে ঠিক নেই। ঋজুদাকে কলা ও বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে কফির জল চড়ালাম, কফির খালি টিনে।

ঋজুদা বাইনাকুলারটাকে তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। আমি খেতে-খেতে ফুটন্ত জলের দিকে লক্ষ রাখলাম।

হঠাৎ ঋজুদা বাইনাকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে দ্যাখ্ তো, রুদ্র। কিছু দেখতে পাস কি না ?"

ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। জাইস্-এর বাইনাকুলার। খুবই পাওয়ারফুল। তাতে দেখলাম দূরদিগন্তের একটি জায়গায় একটু সবুজ-সবুজ ভাব—যেন জঙ্গল আছে, আর তার ঠিক সামনে একটা ল্যাণ্ড-রোভার ট্রেলার সুদ্ধু !

বাইনাকুলারটা নামিয়ে খালি চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না।

ঋজুদা বলল, "কী দেখলি ?"

আমি বললাম, "দেখলাম।"

ঋজুদা বলল, "তবে এবার খেয়েদেয়ে চল্। যাওয়া যাক।"

খাওয়া শেষ করে আমরা আবার মালপত্র কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম।

ট্রেলারটা ভুষুণ্ডা ছেড়ে যাচ্ছে ভেবেছিলাম। ঋজুদা তেমনই বলেছিল। কিন্তু জীপটাও যখন ট্রেলারের সঙ্গে আছে তখন ব্যাপারটা কী বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। ওরা কি তবে ওখানেই আছে ? গাড়ির কাছে ? নাকি গাড়ি এবং টেলার হজম করতে পারবে না বলে পথেই ফেলে গেছে।

একটু যেতেই হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। চারধারে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। ঋজুদা আকাশে তাকাতে বলল। তাকিয়ে দেখি, এক-এঞ্জিনের একটা সাদা আর হলুদ রঙের মোনোপ্লেন উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে রেখে তারা জামার কলারের নীচে ভাঁজ করে রাখা

লাল সিল্কের রুমালটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল। আমিও ক্যামেরা-মোড়া হলুদ কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকার মতো ওড়াতে লাগলাম হাওয়াতে। কিন্তু প্লেনটা আমাদের দেখতে পেল বলে মনে হল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনই উড়ে চলল। দেখতে-দেখতে একটি ছোট্ট হলুদ-সাদা পাখির মতো দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেনটা।

আমরা আবার মালপত্র তুলে নিয়ে এগোলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর খালি চোখেই গাড়িটাকে দেখা গেল দিগন্তে একটা গুবরে পোকার মতো। আমরা এগিয়ে চললাম। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর গাড়িটার কাছাকাছি এসে ঋজুদা বলল, "এবারে একসঙ্গে নয়। তুই বাঁ দিকে চলে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। গুলি ভরে নে তোর শটগানে। কোনো লোক দেখলেই গুলি চালাবি। ওদের তীর যতখানি দূরে পৌঁছতে পারে সেই দূরত্বে পৌঁছনোর অনেক আগেই গুলি চালাবি। আর কোনো খাতির নেই। কোনো রিস্ক নিবি না। খুব সাবধান। ওরা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাহলে একেবারে কাছে না-যাওয়া অবধি কিন্তু বুঝতেই পারবি না।"

সুতরাং খু-উ-ব সাবধান!

আমরা ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ঋজুদা আরেকদার বাইনাকুলার দিয়ে ভাল করে দেখে নিল, গাড়িটা এবং তার চারপাশ।

তারপর বলল, "গুড লাক্, রুদ্র।"

আমরা দুজনে দু'দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশ দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগল। যখন আমি গাড়িটা থেকে দুশো গজ দূরে তখন আমার দিকে লক্ষ করে গাড়ির দিক থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ল। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। গাদা-বন্দুকের গুলি। আমার সামনে পড়ল গুলিটা। ধুলো উড়ে গেল। আমি গুলি করার আগেই ঋজুদার রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। আমি দৌড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম এবার। আমার শটগান-এর এফেক্টিভ রেঞ্জ একশো গজ। তার চেয়ে বেশি দূর থেকে গুলি করে লাভ নেই। আরও একবার গুলি হল। এবার দেখতে পেলাম, দুজন লোক একজন লোককে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। ঐ লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই ঋজুদার গুলি লেগেছে। আমি এবারে গুলি করলাম এল-জি দিয়ে। দুটো লোকের মধ্যে একটা লোক পড়ে গেল। তখন বাকি লোকটা তাকে ও অন্য লোকটিকে ফেলে খুব জোরে দৌড়ে পালাল। লোকটার দৌড়নোর ধরন ও জামাকাপড় দেখে মনে হল যে, সে ভুষুণ্ডা। আমার ভুলও হতে পারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি দৌড়চ্ছিল সে পিছনের নিবিড় জঙ্গলে পৌঁছে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমি আর ঋজুদা প্রায় এক সঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছলাম।

ঋজুদা ট্রেলারের উপর উঠে গাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল। তারপর মাটিতে শুয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে এগিয়ে এল। আমি ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় সাঁ করে একটা তীর ছুটে এল আমার দিকে। যে-লোকটা গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছিল সে-ই তীরটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু শুয়ে-শুয়ে ছোঁড়ার জন্যেই হোক, বা যে কারণেই হোক, তীরটা আমার মাথার অনেক উপরে দিয়ে চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার রাইফেলের গুলি লোকটাকে স্তব্ধ করে দিল। লোকটা একটু নড়ে উঠে পা দুটো টান-টান করে ছড়িয়ে দিল। তীরধনুক-ধরা হাত দুটো দু'দিকে আছড়ে পড়ল ঘাসের উপর।

আমরা গিয়ে লোক দুটোর কাছে দাঁড়ালাম। প্রথম লোকটি, যাকে বাকি দুজন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ততক্ষণে মরে গেছে। ঋজুদার রাইফেলের গুলি তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড়

করে দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটিও মারা যাবে এক্ষুনি। আমরা কাছে যেতেই বিড়বিড় করে কী বলল।

ঋজুদা ওয়াটার-বটল খুলে তার মুখে জল ঢেলে দিল। এক ঢোক খেল সে। তারপরই মুখটা বন্ধ হয়ে গেল, কষ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল, মাথাটা একপাশে এলিয়ে গেল। দুটি খোলা চোখ স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমার গা বমি-বমি লাগছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

ঋজুদা বলল, "বেচারিরা! ওরা কেউ নয়। যারা ওদের আড়ালে থাকে চিরদিন, তাদের মারতে পারলে তবেই হত।"

তাড়াতাড়ি ট্রেলারের উপরের দড়ি কেটে কয়েক টিন খাবার বের করে নিল ঋজুদা। পাইপের টোব্যাকো, দেশলাই এবং রাইফেল ও বন্দুকের গুলিও। তারপর বলল, "আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। চল রুদ্র।"

আমরা দৌড়ে চললাম যেদিকে ঐ লোকটা দৌড়ে গেছিল সেদিকে।

দৌড়তে-দৌড়তে আমি ঋজুদাকে শুধোলাম, "ভুষুণ্ডা?'

ঋজুদা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।. মুখে কোনো কথা বলল না।

জঙ্গলের কিনারাতে দৌড়ে যেতেই পরিষ্কার দেখা গেল একটা পায়ে-চলা পথ। আমরা সেই পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেইসময় কে যেন আবার গুলি করল অনেক দূর থেকে গাদা-বন্দুক দিয়ে। সিসের গুলিটা ঠক্ করে আমাদের একেবারে সামনে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে এসে আটকে না গেলে কী হত বলা যায় না।

আমরা শব্দ লক্ষ করে দৌড়লাম! পথ ছেড়ে।

কিন্তু শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে দৌড়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন-কী কারো পায়ের চিহ্নও নয়। তবে কি গাছ থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ল? ভুষুণ্ডা কি এই জঙ্গলে একা, না সঙ্গে আরো লোক আছে? কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই সামনে একটু দোলা-মতো জায়গা দেখলাম। সেখানে চাপ চাপ ঘাস হয়েছে সবুজ। বর্ষাকালে নিশ্চয়ই জলে ভরা থাকে জায়গাটা। সেই জায়গাটাতে নেমে গেল ঋজুদা, তারপর আমাকে ইশারাতে ডেকে নামতে বলল। সেই দোলার মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড বড় গাছ উঠেছে। ফিকাস্ গাছ। ঋজুদা আমাকে আগে উঠতে ইশারা করল, আমার পিছনে-পিছনে নিজে উঠল। আমরা কুড়ি ফুট মতো উঠে দুটি বড় ডাল দেখে পাশাপাশি বসলাম। ঐ মালপত্র নিয়ে গাছে ওঠা সহজ কথা নয়। কিন্তু আমাদের তো সবই গেছে—এখন এই সবেধন নীলমণি যা আছে তা খোয়ালে বাঁচাই মুশকিল হবে। তাই এগুলোকে কাঁধছাড়া করা যাচ্ছে না এক মুহূর্তও।

কারো মুখে কথা নেই কোনো। আমরা দুজনে দু'দিকে দেখছি। হঠাৎ নীচের সবুজ দোলা থেকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন শিস দিল। এত জোরে হল শব্দটা যে, মনে হলো কোনো গাড়ির টায়ার পাংচার হল বুঝি।

ঋজুদা চমকে উঠল। মনে হল, একটু ভয়ও পেল। ভয় পেতে তাকে বড় একটা দেখিনি। পরমুহূর্তেই বলল, "তোর কাছে এক নম্বর কি দু'নম্বর শট্‌স আছে?"

আমি হ্যাভারস্যাকে হাত ঢুকিয়ে বের করলাম একটা দু'নম্বর গুলি।

ঋজুদা বলল, "তোর বন্দুকের ডান ব্যারেলে ভরে রাখ। এক্ষুনি।"

ডান ব্যারেল থেকে এল-জি বের করে শট্‌স ভরে নিলাম। ঠিক সেই সময় আবার শব্দটা হল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পর সেই শব্দটা দূরে, জঙ্গলের গভীরে শুনলাম। আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "গুলি আবার বদলে নিয়ে বোস।"

ঐ গাছে বসেই লক্ষ করলাম যে, আমাদের বাঁ দিকে, জঙ্গলের প্রায় গায়ে একটা প্রকাণ্ড কোপি আছে। বিরাট-বিরাট বড়-বড় কালো পাথর আর গুহায় ভরা টিলার মতো। এমন অদ্ভুত টিলা আমাদের দেশে দেখা যায় না।

আমি ঋজুদাকে ইশারাতে দেখালাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঐদিকে, তারপর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঋজুদার।

কী একটা ছোট কাঠবিড়ালির মতো জানোয়ার সামনের একটা গাছে উঠছিল, নামছিল। ছাই আর সবুজ-সাদা রঙ, ন্যাড়া মুখটা।

ঋজুদাকে দেখালাম ঐ দিকে। ঋজুদা বলল, "ওটা কাঠবিড়ালি নয়। একটা পাখি। ওদের নাম 'গো এওয়ে'। ওদের ডাক শুনলে মনে হয় বলছে, 'গো-এওয়ে, গো-এওয়ে'।

আমি বললাম, "ও তো তাহলে আমাদের চলে যেতে বলছে?"

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "আপাতত এখানেই শুয়ে ঘুমো। এত মোটা-মোটা ডাল। খাটের চেয়েও চওড়া। তবে দেখিস, নাক ডাকাস না যেন।"

দুপুরে কোনো আওয়াজ পেলাম না কারও। গাছের ডালে বসেই ক্যান্‌ড স্যামন খেলাম আমরা। আর জল।

আমার অধৈর্য লাগছিল। গাছের ডালে ঘন্টার পর ঘন্টা বাঁদরের মতো বসে থেকে কী লাভ?

এদিকে ভুষুণ্ডা কত মাইল ভিতরে চলে গেছে এতক্ষণে! ঋজুদা কী যে করে, কেন যে করে, সে-সব আমার বোঝা ভার। মাঝে-মাঝে বিরক্তি লাগে। মুখে বলেও না কিছু যে, মতলবটা কী তার!

বিকেলে যখন আলো পড়ে এল তখন আস্তে-আস্তে আমরা গাছ থেকে নামলাম। ঋজুদা বলল, "একদম শব্দ করবি না। আর আলোও জ্বালাবি না।"

বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠে যদিও তখন অনেক আলো, বনের ভিতরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। নানা জাতের হরিণ, পাখি ও বেবুনের ডাকে জঙ্গল সরগরম। সেৎসী মাছির পাখার গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে বনাঞ্চা প্লেনের এঞ্জিনের শব্দের মতো।

ঋজুদা আস্তে-আস্তে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। কিন্তু যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম তা থেকে প্রায় তিন-চারশো গজ বাঁ দিক দিয়ে একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে চলেছি আমরা। সামনেই একটা নদী আছে। জলের কুলকুল শব্দ আসছে। আর-একটু এগোতেই খুব জোর হাপুস-হুপুস শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল, হাতির দল বোধহয় নদীতে নেমেছে। জলের কাছাকাছি এসে সামান্য আলোয় দেখলাম জলের মধ্যে এক-দেড় হাত লম্বা মতো কী কতগুলো লালচে-লালচে ফোলা-ফোলা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে আর মাঝে-মাঝে তাদের গা থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে।

এমন জিনিস আমাদের দেশে কখনও দেখিনি আমি। অবাক হয়ে জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম, ওগুলো কী জানোয়ার।

এমন সময় ঋজুদা আমার কাঁধে জোরে চাপ দিয়ে বলল, "এগিয়ে চল্। দাঁড়াস না।"

আমি ফিসফিস করে একেবারে ঋজুদার কানের সঙ্গে কান লাগিয়ে বললাম, "কী ? কুমির ?"

ঋজুদা বলল, "হিপোপটেমাস্ । জলহস্তী ! পালিয়ে চল্ ।"

আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে ভাবলাম, কত বড় জানোয়ার—অথচ সমস্ত শরীরটা জলে ডুবিয়ে শুধু নাকটা বের করে রয়েছে, যেমন কুমিরেরা করে। জলহস্তী উভচর জানোয়ার। তবে জল বেশি ভালবাসে।

আমরা জঙ্গল আর রেড্-ওট্ ঘাসের বনের সীমানাতে এসে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বসে পড়লাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "অন্ধকার হয়ে গেলে আমি একা গাড়ির কাছে যাব। চাবিটা গাড়িতেই লাগানো আছে দেখেছিলাম। তারপর হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে সোজা চলে যাব আস্তে আস্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভুষুণ্ডা পথের আশেপাশে কোনো গাছে বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে। ও জানে যে, আমরা গাড়ির লোভ ছাড়তে পারব না। সারা দিন ওকে খুঁজে না-পেয়ে আমরা ঠিক ফিরে যাব গাড়িতে। এবং হয়তো গাড়িতেই থাকব রাতে। অথবা গাড়ি নিয়েই চলে যাব একেবারে। যা পেট্রল আছে আমাদের, তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির কাছে মাসাইদের বস্তিতেও চলে যেতে পারব। একবার যদি বড় রাস্তায় উঠতে পারি, তাহলে অন্য গাড়ির দেখা পাবই। আর পেলে, সেরোনারাতে খবর চলে যাবে। তখন কোনো অসুবিধা হবে না আর। যে কারণে আমি যাচ্ছি তোকে এখানে একা রেখে, সেই কারণটা হচ্ছে এই যে, ভুষুণ্ডা গাড়ির কাছেও গিয়ে পৌঁছে থাকতে পারে দিনে-দিনেই। ও হয়তো গাড়ির মধ্যেই অপেক্ষা করছে। কারণ ও জানে যে, ও যা করেছে এতদিন, এবং টেডিকে অকারণে খুন করেছে—সেই সবের শাস্তি ওকে পেতেই হবে যদি আমার অথবা তোর দুজনের মধ্যে একজনও বেঁচে ফিরি। তাই ও আমাদের ছেড়ে পালাতে পারবে না। আমরা বেঁচে-ফেরা মানে ওর সর্বনাশ। ওদের পুরো দলেরই সর্বনাশ। ও বোধহয় ভেবেছিল, টেডি ছাড়া, গাড়ি ছাড়া আমরা সিংহ আর সেৎসীদের হাতে সেরেঙ্গটিতেই মরে যাব। আমরা যে পায়ে হেঁটে ওর পিছু নেব এমন কথা ও ভাবতেও পারেনি। ও এখন নানা কারণে মরিয়া হয়ে আছে। ও যদি গাড়িতেই গিয়ে থাকে, আমি নিজেই যেতে চাই। তোকে পাঠানো ঠিক হবে না।"

ঠিক এমন সময় আমাদের অনেক ডান দিকে তিন-চারজন লোকের উত্তেজিত গলা শুনলাম। তাদের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্ক লেগেছে। ওদের মধ্যেই কেউ বকা দেওয়াতে ওরা সব চুপ করে গেল।

ঋজুদা যেন কী ভাবল। তারপর বলল, "নাঃ। ওরা অনেকে আছে। তুইই যা রুদ্র। খুব সাবধানে অনেকখানি বাঁ দিকে গিয়ে আস্তে-আস্তে গাড়িতে পৌঁছবি। গাড়িতে যদি কাউকে দেখতে পাস তবে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাবি। আর কাউকে দেখতে না পেলে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা গাড়ি চালাবি। এক সেকেণ্ডও দেরি করবি না। তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে যাবি। একেবারে মাইল দশেক গিয়ে গাড়ি থামিয়ে, গাড়ির কাচ-টাচ সব বন্ধ করে, খাওয়া-দাওয়া করে গাড়িতেই বসে থাকবি। গাড়ির মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে রাখিস। যদি এরা আমাকে ঘায়েল করতে পারে, তবেই তোর কথা ভাববে।

আমি বললাম, "ঋজুদা, খুব সাবধান। তোমাকে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।"

ঋজুদা বলল, "যে কম্যাণ্ডার, তার কথা শুনতে হয়। গুড লাক্। বী আ ব্রেভ ম্যান। উ্য আর নো মোর আ বয়।"

আমি আস্তে আস্তে ভুতুড়ে চাঁদের আলোতে ভুতুড়ে ছায়ার মতো আড়াল ছেড়ে ঘাসবনে উঠে গেলাম। তারপর বাঁ দিকে আরও কিছুদূর চলে গিয়ে খুব আস্তে-আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। এত মেঘ যে কোন্ দিগন্তে লুকিয়ে ছিল কে জানে ? হয়তো খনভাম ভুষুণ্ডা আর তার সঙ্গীদের মিছিমিছি এত জানোয়ার মারার কারণে দারুণ চটে গিয়ে চাঁদকে ঢেকে দিলেন মেঘে যাতে আমাকে ওরা দেখতে না পায়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে ঋজুদাও ওদের আর দেখতে পাবে না। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ঠাণ্ডা-ভিজে হাওয়া বইতে লাগল আর মেঘের মধ্যে গুড়গুড় করে বাজের ডাক শোনা যেতে লাগল। খনভাম্ কথা বলছেন। এখন খনভামের গলার স্বর, টেডি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ? আমরা তোমার মৃত্যুর বদলা নিতে এসেছি।

আহা ! টেডি মানুষটা বড় সরল আর ধার্মিক ছিল।

কতক্ষণ পর আমি আন্দাজে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তা নিজেই জানি না। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় তাতে ভাল করে দেখে নিলাম দূর থেকে। কান খাড়া করে শুনলাম কোনো আওয়াজ পাই কি না। হায়নার দল এসে সেই মরা লোক দুটোকে খাচ্ছে। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হাঃ হাঃ হাঃ করে বুককাঁপানো হাসি হেসে উঠল।

কিন্তু নাঃ। হায়নার আওয়াজ ছাড়া কোনোই আওয়াজ নেই।

আফ্রিকার হায়নারা যে শুধু মরা মানুষ বা পশুর মাংসই খায়, তাই নয় ; তারা দল বেঁধে বুনো কুকুরদের মতো শিকারও করে। যদিও শিকারের কায়দাটা অন্যরকম। তাই আফ্রিকান হায়নারা সিংহের চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। খুব সাবধানে বন্দুকের ট্রিগার-গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে আস্তে-আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

গাড়ির দরজাটা আস্তে করে খুলে, দরজাটা বন্ধ না-করে লাগিয়ে রাখালাম। যাতে, শব্দ না হয় কোনো। তারপর অন্ধকারেই সুইচটার সঙ্গে চাবি আছে কি না হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম।

একবার খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকাল। ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালিয়ে তেল দেখলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তেল একেবারেই নেই। পিছনের জ্যারিকেনে হয়তো আছে, যদি-না ওরা তা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে ; কিন্তু এখন তো তেল থাকলেও ঢালা যাবে না ! ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালাবার পরই আমার খেয়াল হল যে, ওই আলোর সঙ্গে সাইড লাইটও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছিল বাইরে। ওরা তাহলে জেনে গেছে যে, গাড়িতে কেউ ঢুকেছে।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। ঠিক এমনি সময়ে গাড়ির নীচ থেকেই যেন সেই দুপুরে শোনা শব্দটা আবার শুনলাম, হিস্স্সস। যেন গাড়ির টায়ার পাংচার হল। আমি চমকে উঠলাম। বন্দুকটা শক্ত করে ধরলাম। জানোয়ারটা যে কী তা ঋজুদা একবারও বলেনি। দৈত্য-দানো নয় তো ! গুগুনোগুম্বার বা ওগরিকাওয়া বিবিকাওয়া কোনো আশ্চর্য জানোয়ারের রূপ ধরে আসেনি তো এই দুর্যোগের রাতে ?

এখন গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। জেরিক্যান থেকে তেল

ঢাললেও শব্দ হবে অনেক। কী করব বুঝতে না পেরে আমি সামনের উইন্ডস্ক্রীনের নবটা ঘুরিয়ে যাতে বন্দুকের নল বের করা যায় ততটুকু তুলে, চুপ করে বসে রইলাম। এবারে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছিল। একবার খুব জোর করে বিদ্যুৎ চমকাল। আর আমি মাথা নামানোর আগেই দেখলাম, চারজন লোক গাড়ির বেশ কাছে চলে এসেছে। ওরা দৌড়ে আসছে নিঃশব্দে।

বন্দুকের নলটা বাইরে বের করে বাঁ হাতের তেলোর উপরে রাখলাম ; যাতে শব্দ না হয়। ট্রিগার-গার্ডেও হাত ছুঁইয়ে রইলাম।

বিদ্যুতের আলোতে দেখেছিলাম যে, ওদের তিনজনের হাতে তীর-ধনুক ও একজনের হাতে বন্দুক আছে। ওদের দেখে হায়নাগুলো আবার ডেকে উঠল। কিন্তু ভোজ ছেড়ে নড়ল না।

ওরা আরও একটু কাছে আসুক, একেবারে সিওর রেঞ্জের মধ্যে, আমি ব্যারেল ঘুরিয়ে একসঙ্গে দুটি ব্যারেলই ফায়ার করব।

সাঁত করে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। একটা হায়না সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, বিষের তীর ছুঁড়ছে ওয়াণ্ডারাবোরা। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য হায়নাগুলো পড়ি-কি-মরি করে পালাল। লোকগুলো প্রায় এসে গেছে, ঠিক সেই সময় হিস্‌স্‌স্‌ শব্দটা আবার শুনলাম গাড়ির তলা থেকে। তারপরই কিছু বোঝার আগেই লোকগুলো চোঁ-চা দৌড় লাগাল যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। আর গাড়ির তলা থেকে একটা কিছু যেন ব্যালস্টিক মিসাইলের মতো গতি আর শব্দে লোকগুলোর দিকে ধেয়ে গেল।

কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

লোকগুলো ভয় পেয়ে শোরগোল করে উঠল। এবং অন্ধকারের মধ্যেও শব্দ শুনে মনে হল, যেন ওদের মধ্যে একজন ধুপ্‌ করে পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা কিন্তু দৌড়েই চলে যেতে লাগল। এদিকে আর এলই না। মিনিট দশেক পরেই গভীর বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে জঙ্গলের দিক থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ পেলাম। এবং তার একটু পরই একটা গাদা-বন্দুকের আওয়াজ। তারপরই সব চুপচাপ।

ঋজুদার কি কিছু হল?

আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা কাটল। ওদিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনি সময় হঠাৎ গাড়ির পিছন দিক থেকে হাতির ডাক শুনতে পেলাম, প্যাঁ-এ-এ-এ করে।

আমি মুখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার পিছনে স্লেট-কালো ভেজা আকাশের পটভূমিতে একটা ঘন কালো চলমান পাহাড়শ্রেণী এগিয়ে আসছে। ওদিকে গুলির শব্দের পর ঋজুদারও কোনো খবর নেই। এদিকে আমার এই অবস্থা! গাড়িটা যদি দুমড়ে মুচড়ে খেলনার মতো ভেঙে দিয়ে যায় তাতেও কিছু করার নেই। আমি ভয়ে আর পিছনে তাকালামই না। সামনে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। এই শট্‌গান দিয়ে হাতিদের সামনে কিছুই করার নেই। আমার সামনে গুলি খেয়ে মরা দু-দুটো মানুষ পড়ে আছে। তাদের ফুলে-ওঠা মৃতদেহ হায়নারা খেয়ে গেছে খুবলে খুবলে। আরেকটা মানুষ পড়ে গেছে আরো সামনে। সে কেন পড়ল, বেঁচে আছে কি না তাও জানি না। কী জিনিস যে গাড়ির তলা থেকে ছুটে গেল তাও অজানা। যে হিস্‌স্‌স্‌ শব্দ করেছিল, সেই কি?

জানোয়ারটা কী ? তাদেরই মধ্যে পড়ে আছে বিষ-তীর-খাওয়া একটা হায়না। আর পিছনে ছুটে আসছে হাতির দল।

আশ্চর্য ! হাতিগুলো গাড়িটাকে মধ্যে রেখে দু'পাশ দিয়ে আমার সামনে এল। সমস্ত দিক গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উইন্ডস্ক্রীনের সামনেই যে হাতিটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা একটা দাঁতাল। তার দাঁতটা এত বড় যে, গাড়ির ছাদটা সেই দাঁতের মাঝামাঝি পড়ছিল। নীচে প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছিল সেই দাঁত। আমার মনে হল, ঐ হাতিটা যে-কোনো চকমিলানো দোতলা বাড়ির সমান।

হাতির দল নানারকম শব্দ করছিল শুঁড় দিয়ে—ফোঁস-ফোঁস, ফোঁ ফাঁ করে। শুঁড় হেলাচ্ছিল, দোলাচ্ছিল। গাড়ির বনেট আর উইন্ডস্ক্রীন আর ট্রেলারের উপরে শুঁড় বোলাচ্ছিল। মিনিট দশেক তারা গাড়িটাকে এরকম করতে থাকল। ভাগ্যিস নাইরোবি সর্দারের কলা আর পেঁপে শেষ হয়ে গেছিল, নইলে মুশকিল ছিল আমার। ভুষুণ্ডা আর টেডির উগালির ভুট্টা ও আমাদের চালডালও সব তাঁবুতেই পড়ে আছে। ওসব খাবার যদি ট্রেলারে থাকত, তবে খুবই বিপদ হত।

এর পরই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল। হাতিগুলো ঐ লোকগুলোর মৃতদেহ দুটি শুঁড়ে তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল। করতে করতে ক্রমশই সামনের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যত দূরে যেতে লাগল গাড়ি থেকে, ততই তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে তাদের জলে-ভেজা যুদ্ধ-জাহাজের মত শরীরগুলো বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠছিল।

ঘটনার পর ঘটনাতে স্তম্ভিত মন্ত্রমুগ্ধ আমি ভাবছিলাম, এ সবই হয়তো খনভামের কীর্তি। নইলে কেন হাতিগুলো আমার কোনো ক্ষতি করল না। তার বদলে, যে-বীভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না, তারা সেই দৃশ্যও আমার চোখের সামনে থেকে শুঁড়ে-শুঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল কেন ?

গাড়ির মধ্যে বসে-বসে ঘুম পেয়ে গেল। এত বেশি উত্তেজিত ও ক্লান্ত ছিলাম যে, খিদের কথা মনেও এল না। ওয়াটার বট্‌ল থেকে একটু জল খেলাম, তারপর নিজের জীবনের, ঋজুদার জীবনের সব দায়িত্ব খনভাম-এর উপর চাপিয়ে দিয়ে পা-ছড়িয়ে, বন্দুকটার নল বাইরে করে বসে রইলাম, টুপিটা চেপে মাথায় বসিয়ে। গাড়ির ভিতরটাই এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে, ফ্রিজ-এর মধ্যে বসে আছি। বাইরে না জানি আজ কী ঠাণ্ডা ! ঋজুদা এখন কী করছে, বেঁচে আছে কি না কে জানে ? ঋজুদা যদি কাল সকালবেলাতে ফিরে না আসে, তাহলে আমি কী করব, কী কী করা উচিত—ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু ভাবতে হচ্ছিল।

এবারে পর-পর যেসব ঘটনা ঘটল, চোখের সামনে যত মৃত্যু ঘটতে দেখলাম, এবং আশ্চর্য—নিজেও ঘটালাম, এর পর ঋজুদা অথবা আমি মরে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই।

দেখতে-দেখতে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল। বনে-জঙ্গলে, নদীতে-পাহাড়ে সূর্য-আসা আর সূর্য-যাওয়া প্রতিদিনের যে কত বড় দুটি ঘটনা যাঁদের চোখ-কান আছে তাঁরাই জানেন। কত আশ্চর্য রঙের হোরি-খেলা, কত রাগ-রাগিনীর আলাপ, কত শিল্পীর তুলির আঁচড়, কত শান্ত নরম, আলতো গন্ধ—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে যিনি সব গায়কের গায়ক, সব শিল্পীর শিল্পী, সব সুগন্ধের গন্ধরাজ, তিনিই এই পৃথিবী-ঘরের বাতি নেভান,

বাতি জ্বালান। ঘরের বাইরে এলেই, দেশে এবং এই বিদেশেও তাঁকেই দেখি, দেখতে পাই। ঋজুদা যেমন আমাকে শিখিয়েছে, তেমনই আমি আকাশ বাতাস জল স্থল পাখি হরিণ মানুষ ফড়িং—এই সবের মধ্যেই তাঁকে দেখি।

ভোর হয়েছে কিন্তু সূর্য এখনও মেঘে ঢাকা। অন্ধকার কেটেছে প্রায় পনেরো মিনিট। ঋজুদা তবু এল না। এবার যা করার নিজেকেই বুদ্ধি করে করতে হবে। কম্যাণ্ডারের এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল।

গাড়ির দরজা খুলে চাবিটা পকেটে নিলাম। এই চাবি হাতছাড়া করাতেই ভুষুণ্ডা এমন একটা লং-রোপ্ পেয়ে গেছিল। লোডেড বন্দুক কাঁধে আবার জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলাম। কাল যেখান দিয়ে বেরিয়েছিলাম সেই দিকে। সাবধানে জঙ্গলের কিনারা, কিনারার আশেপাশের গাছ ইত্যাদি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল কতগুলো শকুন উড়ছে বসছে, কামড়া-কামড়ি করছে রেড-ওট ঘাসের বন যেখানে ঢালু হয়ে জঙ্গলে নেমেছে সেইখানে।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। কী দেখব কে জানে?

আর একটু এগোতেই দেখি, কালকে হাতিরা সেই মৃতদেহগুলিকে এখানে এনে ফেলেছে আর শকুনরা ভোজে লেগেছে, হায়নাদের পর।

তাড়াতাড়ি সরে এলাম। সরে আসার সময় লক্ষ করলাম যে, কালকে যে কোপিটা দেখেছিলাম তার উপরেও দুটো শকুন উড়ছে চক্রাকারে। ঐদিকে চেয়ে আমার মন যেন কেমন করে উঠল। এমনই করে। যাঁরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন, তাঁরা জানেন একেই বলে সিক্সথ্ সেন্স। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই; ব্যাখ্যা হয় না।

আমি আস্তে-আস্তে কোপির দিকেই চলতে লাগলাম। সামনের বনে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। মনে হচ্ছে, মৃত্যু হাত বুলিয়ে গেছে এর উপর। কতগুলো বেবুন চিৎকার করছে আর একদল ব্যাব্লার ও থ্র্যাশার সরগরম করে রেখেছে জঙ্গল, বৃষ্টি ধরে যাওয়ার আনন্দে।

কোপির নীচে পৌঁছেই আমি চমকে উঠলাম। চাপ-চাপ রক্ত পড়ে জমে রয়েছে পাথরের উপর। তারপর রক্তের ছড়া চলে গেছে ভিতরে। বৃষ্টিতে যা ধুয়ে গেছে তা গেছে খোলা জায়গায়। যা ধোয়নি তা জমে আছে।

রক্তের দাগ দেখে উপরে উঠতে লাগলাম। একটু গিয়েই, যে সার্ডিনের টিন খুলে আমরা কাল দুপুরে গাছের উপর বসে খেয়েছিলাম, সেই খালি টিনটা উল্টে পড়ে আছে দেখলাম। শকুনগুলো ঘুরে-ঘুরে উড়ছিল উপরে।

আমি বন্দুকটা সামনে ধরে, একটা বড় পাথরের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা! ঋজুদা।"

কোনো উত্তর পেলাম না। কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল ঋজুদা কি... ? নাকি ভুষুণ্ডাদের ডেরায় এসে পড়েছি আমি?

এমন সময় কারা যেন আসছে উপর থেকে শুনলাম। জুতো পায়েও নয়, খালি পায়েও নয়; যেন নূপুর পায়ে কারা নেমে আসছে। আরও ভয় পেয়ে গেলাম আমি। এ কী ব্যাপার। বন্দুকটা ওদের আসার পথে ধরে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময় পাঁচটা আফ্রিকান স্ট্রাইপড জ্যাকেল একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে নেমে এল উপর থেকে। ওদের পায়ের নখের শব্দ পাথরের উপর ঐরকম শোনাচ্ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়েই দুটো শেয়াল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল। পাছে গুলি

করলে শব্দ হয়, তাই ট্রিগার গার্ডে হাত রেখে ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিলাম ওদের। তাতেও কাজ না হলে গুলি করতে বাধ্য হতাম।

গ-র্-র্—গররর্ করতে করতে ওরা নেমে গিয়ে পাথরের আড়ালে যেখানে রক্ত জমে ছিল, সেইখানে হুড়োমুড়ি করে চাটতে লাগল।

আমি আরও এক ধাপ উঠে গিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা! তুমি সাড়া দাও। ঋজুদা!"

এমন সময় মনে হল কেউ বলল, "আমি! আয়।"

এত ক্ষীণ যে, ভাল করে শুনতে পেলাম না। মনে হল ভুল শুনলাম না তো!

আবারও যেন শুনলাম, "আয়—"

একপাশে ঘেঁষে, বন্দুক রেডি করেই, পাথরটা টপকে বাঁক নিলাম। নিয়েই...

ঋজুদার বাঁ পায়ে ঊরুর কাছে গুলি লেগেছে। গাদা বন্দুকের গুলি। বড় সীসার একটা তাল। পায়ের হাড় ভেঙে গেছে কি না কে জানে। রক্তে সারা জায়গাটা থকথক করছে। ঋজুদার ঠোঁট ফ্যাকাসে নীলচে। আমাকে দেখে আমার দিকে হাত তুলল। আমি হাতটা হাতে নিয়ে খুব করে ঘষে দিলাম। তারপর বললাম, "ভুষুণ্ডা?"

ঋজুদা ডান হাতটা তুলে হাতের পাতাটা নাড়ল।

ফার্স্ট-এইড বাক্সটা হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে ডেটল আর মারকিওক্রোমের শিশি আর তুলো বের করতে-করতে বললাম, "ডেড?"

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "পালিয়ে গেছে। আমি মিস্ করেছিলাম। এত অন্ধকার হয়ে গেল! মিস করলাম।"

"ভুষুণ্ডা কোথায়?" আমি শুধোলাম।

ঋজুদা বলল, "বোধহয় চলে গেছে। চলে না গেলে ও আমাকে শেষ করে যেত। ওর গুলিতে আমি যে পড়ে গেছি, তা ও দেখেছে।"

আমি যখন ঋজুদার ট্রাউজারটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে ঋজুদাকে ড্রেস করছিলাম, তখন ঋজুদা আমার এল-জি ভরা বন্দুকটা দু'হাতে ধরে পাথরের পথের দিকে চোখ রাখছিল।

আমি বললাম, "শেয়ালরা তোমাকে কিছু করেনি তো!"

"নাঃ। তুই না এলে করত হয়তো। শকুনরাও করত। ওরা ঠিক টের পায়।"

পা-টা একেবারে থেঁতলে গেছে গুলিতে। কত যে টিসু আর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে তা ভগবানই জানেন। আধঘন্টা লাগল ঋজুদাকে ড্রেস করতে। তারপর দুটো কোডোপাইরিন খাইয়ে বললাম, "ঋজুদা, তুমি এখানে থাকো। আমি গাড়িতে জেরিক্যান থেকে তেল ভরে, গাড়িটা কোপির যত কাছে আনতে পারি তত কাছে এনে তোমাকে তুলে নেব।"

ঋজুদা বলল, "ভুষুণ্ডা যদি চলে না গিয়ে থাকে তবে তো গাড়ির আওয়াজ শুনেই এসে তোকে মারবে।"

আমি বললাম, "এখন তো আর রাত নয়, দিন। আমি তোমার থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা নিয়ে যাচ্ছি। এখানে শর্ট রেঞ্জে বন্দুক অনেক বেশি এফেকটিভ। দু-ব্যারেল এল-জি পোরা থাকল। তুমি এটা বুকের উপর নিয়ে শুয়ে থাকো।"

ঋজুদার হ্যাভারস্যাকটাকে ঠিকঠাক করে বালিশের মতো করে দিলাম। তাতে একটু আরাম হল। তারপর রাইফেলের ম্যাগাজিন ভর্তি করে চেম্বারেও একটা গুলি ঠেলে দিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচে হাত রেখে আমি নেমে গেলাম।

নিজের অজান্তে আমার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল। না-ঘুমোবার জন্যে নয়, প্রতিহিংসায়। তারপরই চোখ দুটি ভিজে এল আমার। ঋজুদার সামনে পারিনি। ঋজুদা কষ্ট পেত।

এখন পরিষ্কার দিনের আলো। আজ সকালে ভুষুণ্ডা যদি পাঁচশো গজের মধ্যেও তার চেহারা একবার আমাকে দেখায় তাহলে অস্ট্রিয়ায় তৈরি এই ম্যানলিকার শুনার রাইফেলের সফ্ট-নোজ্‌ড গুলি তার বুকের পাঁজর চুরমার করে দেবে। ঋজুদার কাছে রাইফেল চালানো কতটুকু শিখেছি তার পরীক্ষা হবে আজ।

কোপি থেকে নামতে-নামতে দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম, "ভুষুণ্ডা! তোমার আজ শেষ দিন।"

ফাঁকায় বেরিয়ে আমি হরিণের মতো দৌড়ে যেতে লাগলাম গাড়ির দিকে। হরিণ যেমন কিছুটা দৌড়ে যায়, তারপর থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, আমিও সেরকম করছিলাম। অবশ্য শিকারী ঠিক ঐ থমকে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই হরিণকে গুলি করে। ভাবছিলাম, ভুষুণ্ডা যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে গুলি করে আমাকে আবার হরিণ না বানিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বন্দুকের ও তীরের পাল্লার বাইরে চলে গেলাম, তখন হেঁটে যেতে লাগলাম পিছনে তাকাতে তাকাতে।

রাইফেলটাকে গাড়ির বনেটের উপর শুইয়ে রেখে পিছনে গিয়ে দুটি জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললাম ট্যাঙ্কে। মাঝে-মাঝেই ঐদিকে দেখছিলাম। নাঃ। কোনো লোকজনই নেই।

রাইফেলটা ভিতরে তুলে নিয়ে, সুইচ টিপতেই গাড়ি কথা বলল। বড় মিষ্টি লাগল সেই কথা! তারপর গীয়ারে ফেলে এগিয়ে চললাম কোপিটার দিকে। কাছে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখলাম। ট্রেলার থাকলে গাড়ি ব্যাক করতে ভারী অসুবিধা হয়।

ভাল করে চারপাশ দেখে নিয়ে রাইফেল হাতে দৌড়ে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি, ঋজুদা নিজেই ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল মুখ।

আমি বললাম, "কী করছ? চলো, আমার কাঁধের নীচে তোমার পিঠটা লাগাও।" বলে, ঋজুদাকে কাঁধের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে নামতে লাগলাম। ঐ অবস্থাতেও ঋজুদা শট্‌গানটা দু'হাতে ধরে ব্যারেলটা সামনে করে রাখল।

কোপির নীচে এসে দেখলাম, নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

ঋজুদাকে গাড়ি অবধি নিয়ে বাঁ দিকের দরজা খুললাম। কিন্তু ঋজুদা বলল, "আমি তো বসতে পারব না ঐভাবে!"

"তবে? কোথায় বসলে সুবিধে হবে তোমার?"

ঋজুদা বলল, "আমি তো এখন একটা বোঝা। যার নিজের হাত-পায়ে জোর নেই, সে বোঝা ছাড়া কী? আমাকে ট্রেলারের উপর উঠিয়ে দে। টেলারে শুয়ে গেলেই যেতে পারব।"

আমি বললাম, "সে কী? ধুলো লাগবে, ঝাঁকুনি লাগবে। ঝাঁকুনিতে আরও রক্ত বেরোবে।"

ঋজুদা হাসবার চেষ্টা করল। বলল, "উপায় কী বল? নইলে তো আমাকে এখানে রেখে তোর একাই চলে যেতে হয়। এই ভাল, রোদ পোয়াতে-পোয়াতে,

ঘুমোতে-ঘুমোতে দিব্যি যাব।"

আমি পিছনের সীট খুলে তার গদি দুটো এনে ট্রেলারের মালপত্রের উপরে পেতে দিলাম। তারপর ঋজুদাকে যতখানি আরাম দেওয়া যায় দিয়ে গুলিভরা শট্‌গান, জলের বোতল, ব্রাণ্ডির বোতল, হ্যাভারস্যাক সব হাতের কাছে রেখে, রাইফেলটা নিয়ে আমি ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলাম।

গাড়ি স্টার্ট করে, একটু পরই টপ-গীয়ারে ফেলে দিলাম, যাতে তেল কম পোড়ে। কিন্তু ঋজুদার যাতে কম ঝাঁকুনি লাগে সেই জন্যে খুব সাবধানে আস্তেই চালাতে লাগলাম।

সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাসবন। এখন মেঘ কেটে গেছে। পনেরো ডিগ্রী ইস্ট এবং ডিউ সাউথ-এর বেয়ারিং নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। মাঝে-মাঝে কম্পাস ও ম্যাপ দেখছি।

জঙ্গলে এসে ল্যাণ্ড-রোভার বা জীপে বা গাড়িতে সামনের সীটে আমি একা এই প্রথম। হয় ঋজুদা চালায়, আমি পাশে বসি, নয় আমি চালাই, ঋজুদা পাশে বসে। আজ ঋজুদা ট্রেলারে শুয়ে আছে। খুব তাড়াতাড়ি কোনো ভাল হাসপাতালে ঋজুদাকে দেখাতে না পারলে গ্যাংগ্রিন সেট করে যাবে। পা-টা হয়তো কেটে বাদই দিতে হবে। কে জানে ? ঋজুদা, লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ভাবাই যায় না। ঋজুদাকে বাঁচানো যাবে না আর ?

আমি আর ভাবতে পারছিলাম না !

মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে ঋজুদার পা আবার ড্রেসিং করে দিলাম। ট্রেলারের ঝাঁকুনিতে বেশ রক্ত বের হচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না ঋজুদা, কিন্তু মুখের চেহারা দেখেই বুঝছি যে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। গায়ে হু-হু করছে জ্বর। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। ট্রেলারের উপর সবুজ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে তবুও আমার সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করতে ছাড়ছে না।

ম্যাপটা একবার দেখিয়ে নিলাম ভাল করে। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে কে আমাকে গাইড করবে !

ঋজুদা বলল, "ঠিকই যাচ্ছিস। আমরা তো আর তাঁবুগুলো কালেক্ট করতে আগের জায়গায় যাব না—সোজাই চলে যাব। যাতে গোরোংগোরো-সেরোনারার মেইন রাস্তাতে পড়তে পারি।"

তারপ বলল, "তাঁবুগুলো তুলতে মোট দশ মাইল মতো ঘোরা হত, কিন্তু ওখানে আমার অবস্থার কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও যাওয়া ঠিক নয়। ওয়াণ্ডারাবোরা যে আবার ওখানে ফিরে এসে ম্যাসাকার শুরু করেনি তা আমরা জানছি কী করে ?"

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও ঋজুদার পরিচর্যার জন্য থামলাম আর-একবার। ঋজুদার গায়ে জ্বর, তবু আমি চীজ দিয়ে চায়ের বিস্কুট, মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট আর ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম ওঁকে।

ট্রেলারের তলায় হেলান দিয়ে উদাস চোখে দূরে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হঠাৎ ঋজুদা গায়ে হাত দিয়ে বলল, "কী ভাবছিস ? আমি মরে যাব ? দূর বোকা ! আমি যখন মরব, তখন আমার সুন্দর দেশেই মরব। বিদেশে মরতে যাব কোন দুঃখে। তাছাড়া, এখন মরলে তো চলবে না আমার রুদ্র। ভুষুণ্ডার অ্যাকাউন্ট সেট্‌ল করতে আমাকে আবার আফ্রিকাতে আসতেই হবে। হয়তো এখানে নয়, অন্য কোনোখানে।

সেবার একেবারে একা-একা শুধু ভুষুণ্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই আসতে হবে। আফ্রিকার যে-প্রান্তেই সে থাক না কেন, খুঁজে বের করতেই হবে। তা যদি না পারি, তাহলে হেরে গিয়ে হেরে থেকে বেঁচে লাভ কী ? সে বাঁচা কি বাঁচা ?"

আমি বললাম, "সেবার আমাকে সঙ্গে আনবে তো ?"

ঋজুদা হাসল। বলল, "পরের কথা পরে। এখন ভাল করে খেয়ে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট কর। পা-টা যদি কেটে বাদই দিয়ে দেয়, তাহলে তো তোর উপর নির্ভর করতেই হবে। আর সেইজন্যেই কি মতলব করছিস যে, সাধের পা-টা আমার বাদই যাক ?"

আমি ঋজুদার পাইপটা ভাল করে পরিষ্কার করে ভরে লাইটারটা হাতের কাছে দিয়ে সামনে যেতে-যেতে বললাম, "আচ্ছা ঋজুদা, আমরা যখন কাল দুপুরে ঐ দোলামতো জায়গাটাতে বসেছিলাম তখন হিস্‌স্‌স্‌স্ করে খুব জোরে কী একটা জানোয়ার ডেকেছিল ? তুমি আমাকে গুলি বদলাতে বলেছিলে, মনে আছে ?"

ঋজুদা পাইপে আগুন জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, "আছে। ঐ আওয়াজের মতো ভয়ের জিনিস আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে খুব কমই আছে। এক ধরনের সাপ। প্রকাণ্ড বড়, আর বিষধর। নাম গাব্বুন ভাইপার। আমাদের দেশের শঙ্খচূড়ের চেয়েও মারাত্মক। যদি কাউকে কামড়াবে বলে ঠিক করে, তাহলে দু'মাইল যেতেও পিছপা হয় না। অনেকখানি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোবল মারে।"

আমার গা শিরশির করছিল, তখন মনে পড়েছিল যে, ঐ সাপকেই গাড়ির নীচে নিয়ে আমি কাল রাতে অতক্ষণ ছিলাম। ঋজুদাকে বললাম, কী করে সাপটা আমাকে বাঁচিয়েছিল আক্রমণকারীদের হাত থেকে।

ঋজুদা সব শুনে খুবই অবাক হল।

আমি স্টীয়ারিং-এ গিয়ে বসলাম।

এখন দু'পাশে আবার অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে থমসনস ও গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপি, ওয়াইল্ডবীস্ট, ওয়ার্টহগস, জেব্রা। জিরাফ আর উটপাখি কম।

খুব বড় একদল মোষের সঙ্গেও দেখা হল। আফ্রিকাতে বলে, 'ওয়াটার বাফেলো'। জলে-কাদায় ওয়ালোয়িং করে ওরা। সব দেশের মোষই করে। বিরাট দেখতে মোষগুলো—গায়ের রঙ বাদামি-কালো। মোটা মোটা ঘন লোম। তবে শিংগুলো আমাদের দেশের জংলি মোষের মতো অত ছড়ানো নয়।

মাঝে-মাঝে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছি। ঋজুদা ঠিক আছে কি না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাঁ হাতটা চোখের উপরে রেখে চোখ আড়াল করে ডান হাতে বন্দুকটার স্মল অব দ্যা বাট ধরে শুয়ে আছে ঋজুদা। খাওয়ার সময় জ্বরটা বেশ বেশি দেখেছিলাম। যে-চরিত্রের লোক ঋজুদা, যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নিজে মুখে একবারও বলবে না যে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। জ্বর আরো বেড়েছে।

বড় অসহায় লাগছে আমার। আজ সন্ধে অবধি গাড়ি চালানোর পর কাল কতখানি তেল অবশিষ্ট থাকবে জানি না। আর জেরিক্যান নেই। কী হল তা ভুষুণ্ডাই বলতে পারে। যে বেয়ারিং-এ যাচ্ছি তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরি আর সেরোনারার মধ্যের পথটার কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখন কী হবে, কে জানে ? ঋজুদাকে তাড়াতাড়ি কোনো হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোই যাবে না। আর কিছুক্ষণ পর থেকেই গ্যাংগ্রিন সেট করবে।

স্টীয়ারিং ধরে সোজা বসে আছি। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমে। কাল রাতে ঘুম

হয়নি—সামান্য তন্দ্রা এসেছিল শুধু শেষ রাতে। মারাত্মক ভুল। সেই তন্দ্রাকেই চিরঘুম করে দিতে পারত ভুষুণ্ডা। কী পাজি লোকটা। কে ভেবেছিল ও অমন চরিত্রের মানুষ? কেবলই ভুষুণ্ডার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আমার। আর টেডি? হ্যাঁ, টেডির মুখটাও। ওর মুখের উপর এখন অনেক মাটি!

ঘন্টাদুয়েক চলার পর একবার দাঁড়িয়ে পড়ে ঋজুদাকে দেখে নিলাম। চুপ করে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। কাছে গিয়ে বললাম, "কেমন আছ ঋজুদা?"

ঋজুদা চোখ খুলে হাসল একটু। বলল, "ফাইন।"

তারপরই বলল, "চল রুদ্র। জোরে চল। থামলি কেন?"

আমি দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলাম ঋজুদাকে। তারপর আবার স্টীয়ারিং-এ বসলাম। ভয়ে আমার তলপেট গুড়গুড় করতে লাগল। ঋজুদা একেবারেই ভাল নেই। নইলে আমাকে জোরে চলার কথা বলত না। পা-টার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চলার পর ঠক্ করে একটা আওয়াজ শুনলাম উইন্ডস্ক্রীনের বাইরে। তারপরই ভিতরে। দুটো সেৎসী মাছি ঢুকে পড়েছে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আমার টুপি দিয়ে ও দুটোকে মারতে যাব ঠিক এমন সময় পিছন থেকে ঋজুদার গলা শুনলাম যেন। যেন আমাকে ডাকছে!

তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে যেতেই ঋজুদা বলল, "রুদ্র, রুদ্র, তাড়াতাড়ি আয়—" বলেই উঠে বসার চেষ্টা করে পড়ে গেল।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। জানোয়ারের সঙ্গে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু এদের সঙ্গে আমি কী করে লড়ব? রক্তপিশাচ মাছিগুলো থিকথিক করছে ঋজুদার পায়ে। আর শুঁড় ঢুকিয়ে রক্ত টানছে।

আমাকে একটাই কামড়েছিল ঐ মাছি। যখন হুলটা ঢোকায়, তখন সাংঘাতিক লাগে, তারপর মনে হয়, কেউ সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত টানছে। কামড়াবার অনেকক্ষণ পর অবধি জায়গাটা জ্বালা করতে থাকে অসম্ভব। একটা মাছি! আর এখানে অগুনতি।

আমি পাগলের মতো করতে লাগলাম। হাত দিয়ে, টুপি দিয়ে যা পারি, তাই দিয়ে। কিন্তু ওরা ঠিকই বলেছিল, সেৎসীদের দশটা জীবন। আমাকেও কামড়াতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আমিও অজ্ঞান হয়ে যাব। আর ঋজুদার যে কী হচ্ছে তা সে নিজেও হয়তো জানে না।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গাড়ির পিছনের সীটে টেডির বিরাট মাপের ডিসপোজালের ওভারকোটটা পড়েছিল। দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এলাম। তারপর কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে, টুপি দিয়ে হাওয়া করতে-করতে ঋজুদাকে ওভারকোটটা দিয়ে ঢেকে দিলাম পুরো। ঢাকবার সময় লক্ষ করলাম, ঋজুদার চোখ বয়ে জল গড়াচ্ছে।

বললাম, "ঋজুদা, কেমন আছ?"

ঋজদু৷ প্রথমে উত্তর দিল না। তারপর অনেকক্ষণ পর, যেন অনেকদূর থেকে বলল, "ফাইন।"

তাড়াতাড়ি দু'হাত এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমি স্টীয়ারিংয়ে বসে যত জোরে গাড়ি যেতে পারে তত জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। ভয় ছিল, ঝাঁকুনিতে ঋজুদা ট্রেলার থেকে পড়ে না যায়। কী ভাবে যে গাড়ি চালাচ্ছি তা আমিই জানি। এত মাছি ঢুকে গেছে! কিন্তু ঐ মাছির এলাকা না পেরোলে আমরা এদের হাতেই মারা পড়ব।

আধ ঘন্টা জোরে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে থামলাম। প্রথমে গাড়ির মধ্যে যে ক'টা মাছি ঢুকে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাদের মারলাম। শুধু মারলামই না। এদের কামড়ে এতই যন্ত্রণা হয় যে, সত্যিই এদের মেরে ধড় থেকে মুণ্ডুটা টেনে আলাদা না করলে, মনে হয় প্রতিহিংসা ঠিকমতো নেওয়া হল না। এখন বুঝতে পারছি, কেন এই হাজার-হাজার মাইল ঘাসবন এমন জনমানবশূন্য। এখানকার জংলি জানোয়ারেরা আদিমকাল থেকে এখানে থাকতে থাকতে এই মাছিদের কামড়ে ইমিউন্ হয়ে গেছে। প্রকৃতিই ওদের এমন করে দিয়েছে, নইলে এখানে ওরা থাকত কী করে ?

দরজা খুলে নেমে আবার ঋজুদার কাছে গেলাম। বোধহয় জ্ঞান নেই। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বারবার ডাকলাম। অনেকক্ষণ পর যেন আমার নাম ধরে সাড়া দিল একবার।

আমি কী করব ? এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। এত জ্বরে ঋজুদা বাইরের ঠাণ্ডায় কী করে শোবে ?

সেদিনকার মতো ঐখানেই থাকব ঠিক করলাম। এখন যা-কিছু করার, সিদ্ধান্ত নেবার, সব আমাকেই করতে হবে।

ঋজুদার গা থেকে টেডির ওভারকোট সরিয়ে দিলাম। চারটে মাছি তখনও তার নীচে ছিল। রক্ত খেয়ে ফুলে বোলতার মতো হয়ে গেছে প্রায়। সেই চারটেকে মারা কঠিন হল না। নড়বার ক্ষমতা ছিল না ওদের। আমি জ্যান্ত অবস্থাতেই ওদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করলাম।

তারপর হাত ধুয়ে এসে ঋজুদার জন্যে খাবার বানাতে বসলাম। শক্ত কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এদিকে গরম কিছু দেব তারও উপায় নেই। না আছে সঙ্গে স্টোভ, না কোনো জ্বালানি। ট্রেলারের কোণ থেকে একটা প্যাকিং বাক্স বের করে সেটাকে ভেঙে ঘাস পরিষ্কার করে একটু আগুন করলাম। কফির জল চাপিয়ে, তার মধ্যে ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট দিয়ে দিলাম গোটা ছয়েক। সেগুলো গলে গেলে তার মধ্যে এক চামচ কফি দিলাম। দুধ ছিল না। আমার হ্যাভারস্যাকে যে ওষুধ-ব্র্যাণ্ডি ছিল তার চার চামচ ঢেলে দিলাম সেই মগে। তারপর ভাল নেড়ে ঋজুদার কাছে গিয়ে তার মাথাটা কোলে নিলাম। ঋজুদা অনেক কষ্টে চোখ খুলল। বললাম, "মাছিরা আর নেই। এবারে খেয়ে নাও।"

ঋজুদা হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানাল।

আমি ছাড়লাম না। বললাম, "খেতেই হবে।" জোর করে মগটাকে ঠোঁটের কাছে ধরলাম।

একটু-একটু করে চুমুক দিতে-দিতে ঋজুটা পুরোটা চোখ খুলল। খাওয়া শেষ হলে আমি তুলে বসালাম ঋজুদাকে। বললাম, "পাইপ খাবে না ? তুমি কতক্ষণ পাইপ খাওনি, ঐজন্যেই তো এত খারাপ লাগছে তোমার। যার যা অভ্যেস। আমি ভরে দেব ?"

ঋজুদা একটু হাসল। তারপর মাথা নাড়ল।

হ্যাভারস্যাকের পকেট থেকে পাইপটা বের করে নতুন তামাকে ভরে দিলাম।

কয়েক টান দিয়েই ঋজুদাকে অনেক স্বাভাবিক দেখাল। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে বসে বলল, "পা-টা একটু তুলে দে তো রুদ্র।"

তুলে দিলাম। ঋজুদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "জানিস, আমার বন্ধুরা বিয়ে করিনি বলে কত ভয় দেখিয়েছে। বলেছে—"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল ঋজুদার। তবু টেনে টেনে বলল, "বলেছে যে, আমাকে

দেখার কেউ নেই। থাকবে না।"

তারপর একটু পর বলল, "ওরা ভুল। একেবারে ভুল।

দম নিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ঋজুদা বলল, "রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, আত্মীয়তা দু'রকমের হয়। রক্তসূত্রের আর ব্যবহারিক সূত্রের। প্রথম আত্মীয়তার বাঁধনে কোনো বাহাদুরি নেই, চমক নেই। কেউ রাজার ছেলে, কেউ ভিখিরির মেয়ে। কিন্তু তোর-আমার আত্মীয়তার গর্ব আছে। তুই আমার জঙ্গলের বন্ধু। তুই আমার সেভিয়ার।"

একটু দম নিয়ে বলল, "বড় ভাল ছেলে রে তুই।" বলে, আমার চুল এলোমেলো করে দিল বাঁ হাত দিয়ে।

আমার চোখ জলে ভরে এল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

তারপর আমিও খেয়ে নিলাম ঐ কফি আর বিস্কুট। ঋজুদা কথা বলছিল দেখে আমার খুব ভাল লাগছিল। খাওয়ার পর টেডির বড় ওভারকোটটার কোনায় ট্রেলারের ত্রিপলের দড়ি বেঁধে তাঁবুর মতো ঋজুদার মাথার উপরে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে রাতে।

পশ্চিমাকাশে শেষ-সূর্যের গোলাপি মাখামাখি হয়ে ছিল। দুটি ম্যারাবুও সারস উড়ে যাচ্ছিল ডানা মেলে। হলুদ-মাথা বড় বড় কতগুলো ফেজেন্ট দৌড়ে যাচ্ছিল সিঙ্গল ফর্মেশানে দূর দিয়ে। আমাদের ডান দিক থেকে সিংহের ডাক ভেসে এল কয়েকবার।

আজও রাত জাগতে হবে। ঋজুদার পাশে ট্রেলারের উপর মাঝে-মাঝে শুয়ে নেব। অন্য সময় গাড়ির চারপাশে পায়চারি করব। ঋজুদার পায়ের এই রক্তের গন্ধ হয়তো অনেক জানোয়ারকে ডেকে আনবে। সকালবেলার শেয়ালগুলোর মতন। বোধহয় শুক্লা অষ্টমী কি নবমী, চাঁদটা ভালই উঠবে সন্ধের পরে।

সূর্য ডুবে যেতেই রাইফেল ও বন্দুকে গুলি ভরে হাতের কাছে ঠিক করে রেখে ঋজুদাকে কম্বল মুড়ে ভাল করে শুইয়ে দিলাম আরো দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে। আর কিছু দেবার মতো নেই। তার আগে পা-টা আবার ডেটল দিয়ে ধুইয়ে, ওষুধ লাগিয়ে দিলাম।

ঋজুদার এখন যা অবস্থা তাতে প্রয়োজন হলেও বন্দুক রাইফেল কিছুই ছুঁড়তে পারবে না। তাছাড়া একটু আগেই বন্দুক লোড করার সময় প্রথম জানতে পারলাম যে, গুলিও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক গুলি তাঁবু থেকে ভুষুণ্ডা এবং তার ওয়াণ্ডারাবো বন্ধুরা নিয়ে গেছিল। তাছাড়া আমরা তো আর শিকারে আসিনি। তাই খুব বেশি গুলি এবারে আনেওনি ঋজুদা।

বন্দুকের গুলি দু'ব্যারেলে দুটো পোরার পর আর চারটে আছে। আমার উইণ্ডচিটারের পকেটে রেখেছি সে কটাকে। আর থার্টি ও সিক্স রাইফেলের ম্যাগাজিনে ও ব্যারেলের দুটো গুলি বাদ দিয়ে আর আছে তিনটি গুলি। ফোর ফিফটি হান্ড্রেড রাইফেলটাকে ভুষুণ্ডা তাঁবু থেকে নিয়ে গেছিল কিন্তু ঋজুদা ওটা তাঁবুতে রেখে যাবার আগে তার লক্‌টা খুলে নিয়ে নিজের হ্যাভারস্যাকে রেখেছিল। খালি স্টক্ আর ব্যারেল নিয়ে গেলে তো গুলি ছুঁড়তে পারবে না। আর সে-কারণেই ঋজুদা এখনও বেঁচে আছে। ভুষুণ্ডার হাতে গাদা-বন্দুক না থেকে যদি ঐ রাইফেল থাকত তবে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে শকেই মরে যেত ঋজুদা।

অন্ধকার হয়ে আসতে আসতে-না-আসতেই চাঁদ উঠল। তারা ফুটল। সিংহগুলোর ডাক ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। এখন আর ওরা ডাকছে না, আস্তে-আস্তে এগিয়ে

আসছে এদিকে। সবসুদ্ধু গোটা সাতেক আছে। আরও কাছে আসতে দেখলাম দুটো সিংহ, দুটো সিংহী আর তিনটে বাচ্চা। একেবারে ছোট বাচ্চা নয়, মাস চারেকের হবে।

গুলি করলে আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া ওরা বিপদ না ঘটালে গুলি করবই বা কেন ? আমি একা। গুলি নেই বেশি। তারপর রাত। তাই রাইফেল না তুলে আমি বড় টর্চ দুটো ওদের দিকে ফেললাম। বণ্ড-এর টর্চ। পাঁচ ব্যাটারির। খুব সুন্দর আলো হয়।

সামনের সিংহী দুটো আলোতে থমকে দাঁড়াল। তারপর টর্চ দুটো নিয়ে আমি নাইরোবি সর্দার যেমন করেছিল গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে, তেমনি ট্রেলারের উপর দাঁড়িয়ে আলো নিয়ে মশালের মতো কাটাকুটি করতে লাগলাম উপরে-নীচে।

সিংহগুলো কিছুক্ষণ গরর্-গরর্ করে ফিরে গেল। আসলে ওরা ব্যাপারটা কী তাইই বোধহয় দেখতে এসেছিল। কেউ যদি ঘুম ভেঙে উঠে তার বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত গাছ হয়েছে দেখতে পায়, তো অবাক হবে না ? ওদেরই সেই অবস্থা। নিজেদের আদিগন্ত ঘাসবনে অদ্ভুত এই নতুন চাকা লাগানো জন্তুটা কী তাই বোধ করি ভাল করে দেখতে এসেছিল।

পেঁচা ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল ঘাস-ইঁদুরের খোঁজে। ঘাসের মধ্যে এদিক ওদিক সরসর, শিরশির আওয়াজ শুনতে লাগলাম। রাতের প্রাণীরা সব জেগেছে। সাপ, ইঁদুর, নানারকম পোকা, পেঁচা, খরগোশ। দূর দিয়ে একদল ওয়ার্ট-হগ মাটিতে ধপ-ধপ আওয়াজ করে দৌড়ে চলে গেল। চাঁদের আলো পরিষ্কার হলে দেখা গেল আমাদের সামনে অনেক দূরে মস্ত একটা ওয়াইল্ডবীস্টের দল চরে বেড়াচ্ছে।

বসে থাকতে-থাকতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। আচমকা ঘুম ভাঙতে, ঘড়িতে দেখি বারোটা বাজে। তার মানে বেশ ভালই ঘুমিয়েছিলাম, রাইফেল-বন্দুক পাশে থেকে। ভুষুণ্ডার লোকেরা এতদূরে পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার আসতে পারত। ঘুমোনো খুব অন্যায় হয়েছে। শিশির পড়েছে খুব। হলুদ ঘাসের সাভানা-সমুদ্রকে কুয়াশায় চাঁদের আলোয় শিশিরে মিলেমিশে মাঝ-রাতে কেমন নীলচে-নীলচে দেখাচ্ছে।

আমি ঋজুদার কপালে হাত দিলাম। জ্বর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কাল যদি আমরা রাস্তায় পৌঁছতে না পারি বা কোনো উপায় না হয় তাহলে ঋজুদাকে এখানেই রেখে যেতে হবে। ঋজুদাকে রেখে গেলেও আমি যে যেতে পারব, তারও কোনো স্থিরতা নেই। এই প্রসন্ন অথচ নিষ্ঠুর, তেরো হাজার বর্গমাইল ঘাসের মরুভূমিতে জলের অভাবে খাবারের অভাবে তিল-তিল করে শুকিয়ে মরে যাব। ভুষুণ্ডা। ভুষুণ্ডাই এর জন্যে দায়ী। ওকে, ভুষুণ্ডা ! দেখা হবে !

আমি ট্রেলার থেকে নেমে আবার একটু আগুন করলাম। ঠাণ্ডায় আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান দুটো আর নাকটা ঠাণ্ডায় এমন হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে কেউ বুঝি কেটেই নিয়ে গেছে।

আবার কফি বানিয়ে দুটো বিস্কুট গুঁড়ো করে, তাতে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ঋজুদাকে জাগিয়ে তুললাম।

ঋজুদা বলল, "কে ? গদাধর ? ভাল আছিস ? চিঠি যা এসেছে, আমাকে দে।"

আমি চমকে উঠলাম। ঋজুদা ভুল বকছে নাকি ? কলকাতায় তার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট যে দেখাশোনা করে, সেই বহুদিনের বিশ্বস্ত পুরনো লোক গদাধর। যার জন্যে আমরা বনবিবির বনে গেছিলাম, সে।

আমি বললাম, "ঋজুদা ! আমি ! আমি রুদ্র !"

"ও। রুদ্র। সেই গানটা শোনাবি একটু।"

"কোন্ গান ঋজুদা ?"

"সেই গানটা রে। 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,' তুই বড় ভাল গাস গানটা।"

আমি বললাম, "এইটা খেয়ে নাও ঋজুদা। অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে আগের বার খাওয়ার পরে।"

ঋজুদা প্রতিবাদ না-করে খেল। তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "রুদ্র, তুই আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাস না রে। মরেও যদি যাই, তাহলেও দেশে কিন্তু নিয়ে যাস আমাকে। আমাকে কবর দিতে বলিস আমাদের দেশের কোনো সুন্দর জঙ্গলে, আমারই প্রিয় কোনো জায়গায়। তুই তা সবই জানিস।"

আমি বললাম, "আঃ ঋজুদা ! পাইপ খাও। খাবে ?"

ঋজুদা মাথা নাড়ল। বলল, "না, ঘুমোব।"

আমি আর-একটা ঘুমের বড়ি দিলাম ঋজুদাকে। কম্বল ভাল করে গুঁজে দিলাম গলায়, ঘাড়ে। নাড়াতে গিয়ে দেখি, ফুলে শক্ত হয়ে গেছে পা-টা। আমার ঘুমটুম সব উবে গেল। জল চড়ানোই ছিল, তাই কফি খেলাম একটু। গা-টা গরম হল।

তারপর অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম রাইফেল কাঁধে গাড়ির চারদিকে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, এখন এনার্জি নষ্ট করা ঠিক নয়। কী যে লেখা আছে কপালে ভগবানই জানেন। হয়তো এনার্জির শেষ বিন্দুটুকুও প্রয়োজন হবে ভীষণভাবে।

ঋজুদার পাশে গিয়ে ট্রেলারে বসলাম। চারধারে নীলচে চাঁদের স্বপ্ন-স্বপ্ন আলো হলুদ ঘাসবনে ছড়িয়ে আছে। বসার আগে চারধার ভাল করে দেখে নিলাম। নাঃ, কিছুই নেই কোথাও।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠলাম। আঁ-আ-আ-আ করে এক সাংঘাতিক চিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি আমার প্রায় গায়ের উপরে কটা বিদঘুটে জানোয়ার বসে আছে আর ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে আর একটা। আর ট্রেলারের তিন পাশে কম করে আরও আট-দশটা জানোয়ার দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার সংবিৎ ফিরতেই বন্দুকটা তুলে নিয়ে, ব্যারেল দিয়ে, যে জানোয়ারটা ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে তাকে ঠেলা মারলাম—পাছে গুলি করলে গুলি ঋজুদারই গায়ে লাগে। ঠেলা মারতেই সে মাথা তুলল—সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথার সঙ্গে প্রায় ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করে দিলাম। হায়নাটা টাল সামলাতে না পেরে পিছন দিকে উলটে ট্রেলারের বাইরে পড়ে গেল। গুলির শব্দে আমার কাছেই যে হায়নাটা ছিল সে চমকে গিয়ে লাফ মারল নীচে। তাকেও গুলি করলাম অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে। সে-ও পড়ে গেল। কিন্তু কী সাংঘাতিক এই আফ্রিকান হায়নাগুলো, প্রায় বুনো কুকুরেরই মতো, চারধার থেকে লাফিয়ে ট্রেলারে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল একের পর এক।

বন্দুকের দু'ব্যারেলেই গুলি শেষ। এবার আমি থার্টি ও সিক্স রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রেলারের উপর উঠে দাঁড়ালাম, যাতে তিন দিকেই ভাল করে দেখা যায়। ওরা না গেলে ঋজুদার পায়ের দিকে যেতে পারছি না। হায়নার চোয়ালের মতো শক্ত চোয়াল কম জানোয়ারের আছে। হাঙরের মতো তারা হাড় কেটে নিতে পারে কামড়ে। ঋজুদার

গোড়ালির একটু উপরে কামড়েছিল হায়নাটা।

হায়নাগুলো লাফাচ্ছে আর ট্রেলারে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কা মারছে ট্রেলারে। ট্রেলারটা কেঁপে উঠছে বারবার।

প্রথমে কয়েকবার গুলি বাঁচাবার জন্যে আমি ব্যারেল দিয়েই বাড়ি মারলাম ওদের মুখে, মাথায়। কিন্তু সামলানো যাচ্ছে না। ওরা ক্রমাগত লাফাচ্ছে। ঋজুদার পায়ের রক্তের গন্ধ পেয়ে এসেছে ওরা। একটাকে ঠেকাই তো আর একটা উঠে পড়ে। যখন কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না, তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে লাগলাম। থার্টি ও সিক্স-এর বোল্ট খুলি, আর গুলি করি। দেখতে দেখতে ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। আমার মাথায় খুন চেপে গেছিল। মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা থাকে। সেই সীমা এরা পার করিয়ে দিয়েছিল। তখনও আরো দুটো হায়না আস্ত ছিল, তাদের বিক্রম তখনও কমেনি। মৃত সঙ্গীদের শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠতে কী মনে করে, তারা থেমে গিয়ে টাটকা রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সঙ্গীদেরই খেতে শুরু করল। ট্রেলারের চারধারে অনেকগুলো মরা হায়না, হাঁ করে পড়ে আছে। সে-দৃশ্য দেখা যায় না, ওদের গায়ের দুর্গন্ধে ওখানে টেঁকাও অসম্ভব। আমি এক লাফে ট্রেলার থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটাকে আধ মাইলটাক দূরে নিয়ে গেলাম। তারপর দৌড়ে নেমে গেলাম ঋজুদার কাছে।

ঋজুদা, আশ্চর্য, পাইপ খাচ্ছিল।

আমি যেতেই বলল, "কানের কাছে যা কালীপুজোর আওয়াজ করলি, তাতে তো ওয়েস্টার্ন ছবির হীরোরাও শুনলে লজ্জা পেত।"

ঋজুদা কথা বলছে দেখে খুব খুশি হয়ে আমি বললাম, "ধ্যুত।" তারপরই বললাম, "কতখানি কামড়েছে?"

ঋজুদা বলল, "মার্কুরিওক্রোম আর ডেটল লাগা। ব্যাটা মাংসই খুবলাতে গেছিল। ভাগ্যিস চেঁচিয়েছিলাম। বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তুই না উঠলে আমাকে জ্যান্তই খেত।"

আমি বললাম, "দেখি পা-টা দাও।"

ঋজুদা বলল, "একে কম্বল, তার পরে ফ্লানেলের ট্রাউজার, তার নীচে মোজা ; ব্যাটা সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। টর্চ দিয়ে দ্যাখ তো রুদ্র।"

আমি টর্চ দিয়ে দেখে ওষুধ আর ডেটল লাগিয়ে বললাম, "কলকাতায় ফিরে তোমার ডান পায়ের জন্যে একটা পুজো দিও।"

ঋজুদা হাসল। তারপর আমাকে শুধোল, "গুলি কতগুলো আছে?"

বললাম, "রাইফেলের গুলি তিনটে, বন্দুকের দুটো।"

"হুঁ। আমার ডান পকেট থেকে পিস্তলটা বের কর তো। এ-যাত্রায় আমার দ্বারা তোর আর কোনো সাহায্যই হবে না। পারলে আমি তো নিজেই গুলি করতে পারতাম হায়নাটাকে। আমি পারলাম না। পারি না..."

বলেই থেমে গেল।

আমার ভীষণ কষ্ট হল।

পিস্তলটা লোডেড ছিল। আটটা গুলি আছে এতে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলাম আমি। যে-কটা গুলি ছিল, বন্দুক এবং রাইফেলে লোড করে সেফটি ঠিক করে রাখলাম।

বললাম, "দেখো, আমি কিন্তু আর একটুও ঘুমোব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও এবারে সকাল অবধি।"

ঋজুদা ফিস ফিস করে বলল, "তুই তো কম ক্লান্ত নোস। ছেলেমানুষ।"

বলেই বলল, "সরি, উ আর নট। আই অ্যাপলোজাইজ।"

আমি হাসলাম। কাঁধে হাত রেখে বললাম, "ঘুমোও ঋজুদা।"

ভোর হল। বনে-জঙ্গলে ভোর মানেই দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার অবসান। আমি তাড়াতাড়ি ঋজুদার জন্যে শুধু একটু কফি করে দিলাম। খাবার সব শেষ।

ঋজুদা আমার দিকে একবার তাকাল কফির কাপটা হাতে নিয়ে। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু পারল না। দেখলাম জ্বরটা আবার বেড়েছে। প্রায় বেহুঁশ।

আমিও একটু কফি খেয়ে গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট করে, কম্পাস দেখে, বেয়ারিং ঠিক করে চললাম গাড়ি চালিয়ে। কোথায় যাচ্ছি জানি না, এই চলার শেষে কী আছে তাও জানি না। জানি না, বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারব কিনা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আজকের মধ্যে যদি ঋজুদাকে হাসপাতালে নেওয়া না যায়, তাহলে বাঁচানোই যাবে না আর।

সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ চোঁ চোঁ আওয়াজ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। তেল শেষ হল বোধহয়। মিটার সেই কথাই বলছে। গাড়ি থামিয়ে ট্রেলারে গেলাম। জেরিক্যান ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি জেরিক্যানের তলাটা ফুটো। কবে ফুটো হয়েছে, কেমন করে হয়েছে তা এখন জানার উপায় নেই। ভুষুণ্ডা ইচ্ছে করেই প্যাক করার সময় হয়তো খালি টিন ভরেছিল।

এখন আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর চলবে না। ট্রেলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। জেরিক্যানটা নামিয়ে দেখি একটা খুব বড় আগামা গিরগিটি দৌড়ে গেল পায়ের সামনে দিয়ে। এই গিরগিটিগুলো দারুণ দেখতে। নীল শরীর, লাল গলা, আর মাথাটাও খুব সুন্দর। টেডি আমাকে চিনিয়েছিল।

গাড়িটা থেমে থাকায় ঋজুদা বলল, "কী হল রুদ্র?"

আমি বললাম, "তেল শেষ হয়ে গেল ঋজুদা।"

"ওঃ।" ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, "তোমাকে একা রেখে আমি একটু দেখে আসব? দূরে যেন মনে হচ্ছে গরু চরছে।"

ঋজুদা বলল, "বাইনাকুলার দিয়ে ভাল করে দ্যাখ।"

বাইনাকুলার দিয়ে দেখে মনে হল, গরুই। আফ্রিকাতে তো নীল গাই নেই। দূর থেকে ভুলও হতে পারে। হয়তো কোনো হরিণ এখানকার বা বুনো মোষ। এখানের গরুদের রঙ লাল ও কালো। গায়ে লোমও অনেক।

ঋজুদা বলল, "সাবধানে যাবি। আমার জন্যে চিন্তা করিস না। জলের বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যা।"

আমি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে ঋজুদাকে দিয়ে দিলাম। বললাম, "একা থাকবে, সঙ্গে রাখো।"

ঋজুদা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিল।

কপালে হাত দিয়ে বললাম, “এখন কেমন আছ ?”

ঋজুদা হাসল কষ্ট করে। তারপর বলল, “ফাইন।”

ফাইনই বটে, ভাবলাম আমি। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে, জলের বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, যতই হাঁটছি ততই যেন গরুগুলো দূরে-দূরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য। তাছাড়া গরুদের কাছে কোনো রাখাল দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। গরুগুলো সত্যিই গরু না গুগুনোগুম্বার, বা ওগ্‌রিকাওয়া বিবিকাওয়া, তা বোঝা গেল না। সেই নির্জন, নিস্তব্ধ, হু-হু হাওয়া, ঘাস-বনে ভর-দুপুরে মনে নানান আজগুবি চিন্তা আসে। নিজেকে এত অসহায় লাগতে লাগল ঋজুদার কথা ভেবে যে, বলার নয়। বারোটা বাজে। আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার আর ট্রেলার দেখাই যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হল। সঙ্গে যদিও কম্পাস এনেছি তবু হারাবার ভয় করছে। এ যে সমুদ্র। বেরিয়েছিলাম পৌনে ন'টায়, সোয়া তিন ঘন্টা ক্রমাগত হেঁটেও গরুদের কাছে পৌঁছনো গেল না, কাউকে দেখাও গেল না। আশ্চর্য!

আমার গা ছমছম করতে লাগল। পিছু ফিরলাম আমি।

ক্লান্ত লাগছিল। তিনদিন হল বিশেষ কিছুই খাইনি। ঘুমও প্রায় নেই। শরীরে যেন জোর পাচ্ছি না আর। সবচেয়ে বড় কথা, মনটাও ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। তাহলে কি আমাকে আর ঋজুদাকে এইখানেই শকুন, শেয়াল আর হায়নার খাবার হয়ে থেকে যেতে হবে? পরে যদি কেউ এদিকে আসে তাহলে হয়তো আমাদের গাড়ি ল্যাণ্ড-রোভার আর কঙ্কাল দেখতে পেয়ে, গাড়ির কাগজপত্র নেড়ে-চেড়ে আমাদের কথা জানতে পারে! অবশ্য যদি হাতি কি গণ্ডার কি বুনোমানুষ ওগুলো অক্ষত রাখে।

আরও ঘন্টাখানেক হাঁটার পর দূর থেকে ট্রেলার সুদ্ধু ল্যাণ্ড-রোভারটাকে একটা ছোট্ট পোকার মতো মনে হচ্ছিল। আরও এগোবার পর দেখতে পেলাম কতগুলো পাখি গাড়িটার কাছে উড়ছে। ছোট-ছোট কালো পাখি।

আমি এবার বেশ জোরে যেতে লাগলাম। আরও ঘন্টাখানেক লাগবে পৌঁছতে। পাখিগুলো আস্তে-আস্তে বড় হতে লাগল। আরও কিছুদিন যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম সেগুলো শকুন।

শকুন? কী করছে অতগুলো শকুন ঋজুদার কাছে? ঋজুদা কি... ?

আমি যত জোরে পারি দৌড়তে লাগলাম। রাইফেলটা হাতে নিয়ে আর-একটু এগিয়েই আমি রাইফেলটা উপরে তুলে একটা গুলি করলাম। ভাবলাম, শব্দে যদি উড়ে পালায়।

টেডি বলেছিল, যদি জীবন্ত কোনো লোককে শকুন তিন দিকে ঘিরে থাকে, তবে সে মারা যায়। আমাকে আর ঋজুদাকে শকুনরা দু'দিন আগে চারদিকে ঘিরেছিল।

শকুনগুলো উপরে উঠে ঘুরতে লাগল। অনেকগুলো। তারপরই আবার নেমে এল নীচে। আর-একটু এগিয়েই আবার গুলি করলাম। কিন্তু এবারেও চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না একটাও।

কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ির ছাদে শকুন, ট্রেলারের উপর চার পাঁচটি শকুন এবং ট্রেলারের তিন পাশে দশ-বারোটা বিরাট বড়-বড় তীক্ষ্ণ ঠোঁট আর বিশ্রী গলার শকুন।

ওরা যেন ঝুঁকে পড়ে সকলে মিলে ঋজুদার নাড়ি দেখছে। নাড়ি থেমে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ঋজুদার উপর।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। আর সহ্য করতে না পেরে মাটিতে বসা একটা বড় শকুনের দিকে রাইফেল তুললাম। গুলিটা শকুনটাকে ছিটকে ফেলল কিছুটা দূরে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম। গাড়ি তো আর চলবে না। গাড়ির কাছে মরে পড়ে থাকলে আমাদেরই মুশকিল।

সঙ্গীর হাল এবং আমার রণমূর্তি দেখে বোধহয় একটু ভয় পেল ওরা। উড়ে গিয়ে সব জমায়েত হল মৃত সঙ্গীর কাছে।

কানের এত কাছে রাইফেলের আওয়াজেও উঠল না ঋজুদা। আমি দৌড়ে গিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা, ঋজুদা।"

ঋজুদা কথা বলল না কোনো। মুখের উপর চাপা দিয়ে রাখা টুপিটা সরিয়ে দেখলাম, চোখ বন্ধ। একেবারেই অজ্ঞান। গায়ে ভীষণ জ্বর।

রাইফেলের গুলি আর রইল না। এখন থাকার মধ্যে শট্‌গানের দুটো গুলি মাত্র। প্রয়োজন হলেও ঋজুদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না। আমি সত্যিই জানি না, এবার কী করব। আমার বড়ই ভয় করছে।

এদিকে বেলা পড়ে এসেছে। খিদে-তেষ্টা সবই পেয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুরই হুঁশ নেই।

আমার একার জন্যেই একটু জল গরম করে কফি করলাম, আর কিছুই নেই। কফি খেয়ে, লম্বা রাতের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। ঋজুদার একেবারেই জ্ঞান নেই। কিন্তু নাড়ি আছে। খুব অস্পষ্ট ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। কিছু খাওয়ানোই গেল না। ব্যাগ থেকে ব্র্যাণ্ডি-ওষুধটা নিয়ে একটু ঢেলে দিলাম জোর করে দাঁত ফাঁক করে। কিন্তু খেতে পারল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে দিলাম।

অন্ধকার হয়ে এল। তারা ফুটলো একে একে। চাঁদও উঠেছে সূর্য যাবার আগেই। আমি বসে আছি ট্রেলারের উপর। ভাবছিলাম রাইফেলের গুলিগুলো শকুনদের উপর নষ্ট করলাম মিছিমিছি। আজ রাতে যদি হায়নারা আসে? অথবা আরও হিংস্র কোনো জানোয়ার?

কাল রাতের কথা মনে হতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। আজ আর ঘুমোব না। ঘুমোলে হয়তো ঋজুদাকে টেনে নিয়েই চলে যাবে ওরা। যে করেই হোক আমাকে আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে।

রাত এগারোটা বাজল। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলাম, মাথায় টুপি দিয়ে। বড় শীত বাইরে, ঋজুদার গায়ে ভাল করে কম্বল মুড়ে দিয়েছি। মাথার উপরে টেডির ওভারকোটের তাঁবুও খাটিয়ে দিয়েছি। রক্তে, ধুলোয়, শিশিরে কম্বলটার অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছিল। তাই আমার কম্বলটা দিয়েছি আজ।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, ঋজুদা আমাদের বাড়ি এসেছে কলকাতায়। মা ঋজুদার জন্যে পাটিসাপ্‌টা পিঠে করেছেন, আর কড়াইশুঁটির চপ। মায়ের কী একটা কথায় ঋজুদা খুব হাসছে। মা-ও খুব হাসছেন। আমিও। মায়ের শোবার ঘরের আলোগুলো জ্বলছে। মা সোফাতে বসে, আমি আর ঋজুদা খাটে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছে ঋজুদা। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভীষণ ঘুমোচ্ছিলাম আমি। কে যেন আমার ঘুম ভাঙাল গায়ে হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে, হাতে-ধরা বন্দুকটা শক্ত করে ধরেই আমি চোখ খুললাম। দেখি, ট্রেলারের তিনপাশে পাঁচজন সাতফুট লম্বা মাসাই যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বল্লম ও কোমরে দা।

ওদের বলে মোরান।

আমি ঘোর কাটিয়ে বললাম, "জাম্বো!"

ওদের মধ্যে একজন বোধহয় সোয়াহিলী জানে। সে বলল, "সিজাম্বো!"

বলেই, সকলেই প্রায় একই সঙ্গে পিচিক্ পিচিক্ করে থুতু ফেলল। বর্শার সঙ্গে পা জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে বাংলায় বললাম, "এঁকে বাঁচাতে পারো ভাই?"

তারপর বোঝাবার জন্যে ঋজুদার পা-টা খুলে দেখালাম। পেটে হাত দিয়ে বললাম খাবারও নেই।

ওরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। আবার পিচিক পিচিক্ করে থুতু ফেলল।

হঠাৎ আমার মনে হল, নাইরোবি সর্দারের দেওয়া হলুদ গোল পাথরটার কথা। ঋজুদা আমাকেই রাখতে দিয়েছিল সেটা। তাড়াতাড়ি আমি পকেট হাতড়ে সেটা বের করে ওদের দেখালাম। বললাম, "নাইরোবি সর্দার দিয়েছে। নাইরোবি। নাইরোবি।" দু'বার বললাম।

ওরা পাথরটা হাতে নিয়ে, ভাল করে দেখে, সকলে একসঙ্গে কী সব বলে উঠল।

দুজন মাসাই দুটো হাত পাশে ঝুলিয়ে রেখেই সোজা উপরে লাফিয়ে উঠল তিন চার ফুট। তারপর হাতের মধ্যে থুতু ফেলে দু'হাতে থুতু ঘষে আমার মুখটা দু'হাতে ধরল। বোধহয় আদর করে দিল।

প্রথম দিন নাইরোবি সর্দার এমন করাতে আমার বড় ঘেন্না হয়েছিল। ওডিকোলন ঢেলে শুয়েছিলাম। আজ এই রাতে কিন্তু বড় ভাল লাগল। বড় ভালমানুষ ওরা, ভারী সহজ, সরল।

দেখতে-দেখতে দুটো বল্লমের মধ্যে একজনের লাল কম্বল কায়দা করে বেঁধে একটা স্ট্রেচার-মতো করে ফেলল ওরা। তারপর ঋজুদাকে তার উপর শুইয়ে, কম্বল দিয়ে ঢেকে, কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে বলল, চলো।

ঋজুদার পিস্তলটা একজন আমার হাতে দিল। আমি কোমরে রাখলাম সেটা। বন্দুকটা হাতে নিলাম।

ওরা শনশন করে হাঁটতে লাগল।

ভিজে চাঁদের আলোর মধ্যে সেই ধু-ধু ঘাসের বনে সাত ফুট লম্বা লাল পোশাকের মাসাইদের গুগুনোগুম্বার বা ওগ্‌রিকাওয়া-বিবিকাওয়া বলে মনে হচ্ছিল আমার।

এরাও কি আমাদের সঙ্গে ভুষুণ্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

যারা ঋজুদাকে বইছিল তারা আগে-আগে প্রায় দৌড়ে চলল।

মেরানদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে আবার পিচিক্ করে থুতু ফেলে আমাকে কী যেন দুমদাম বলল। মানে বুঝলাম না।

যুদ্ধ করলেই আহত হয় কেউ-কেউ। ওরা যোদ্ধার জাত। জড়িবুটি, তুক-তাক এবং বনজ-ভেষজ দিয়ে আহতের চিকিৎসা ওরা নিশ্চয়ই জানে। জানে কি না আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমি জানি যে, আমি ভীষণ খুশি। এত কিছুর পরে, এত ঘটনার পরে, এই মনখারাপ-করা নির্জনতার মধ্যে মানুষের মুখ দেখে।

হাড়গোড় আর পাথরের গয়না-পরা, লাল-হলুদ রঙে মুখে কপালে আঁকিবুঁকি কাটা, টাটকা-রক্ত-খাওয়া কতগুলো স্বাধীন সাহসী, বড় মনের মানুষদের পিছনে-পিছনে ছোট্ট শহুরে মনের ছোট্ট ভীরু আমি ছোট-ছোট পা ফেলে চলতে লাগলাম।

দূর থেকে ওদের ড্রামের শব্দের মতো গুম্‌গুম্‌ করে সিংহ্‌ ডেকে উঠল। বারবার ডাকতে লাগল। আর একটা বড় পেঁচা আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে, উড়ে উড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল। ডাকতে লাগল, কিঁচি কিঁচি কিঁচর...

গুগুনোগুম্বারের দেশের দুজন দৈত্যের মতো মানুষের কাঁধের উপর আমার ঋজুদার ঠাণ্ডা, নিথর শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে, দুলতে দুলতে যেন সেই নীলচে চাঁদের আলোয় ভেসে উড়ে চলল এই আদিম আফ্রিকার কুয়াশা-ঘেরা রহস্যময় দিগন্তের দিকে।

অ্যালবিনো

ফোনটা বাজছিল।

একবারের বেশীবার বাজা মানেই, ঋজুদা বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে কুরর-র্-র্ করার আগেই লম্বা হাতে খপ্ করে রিসিভার তুলেই বলত, ইয়েস্।

পাঁচ-ছ'বার বাজার পরে গদাধর ধরলো। বলল, কে রুদ্রবাবু নাকি ? নমস্কার এঁজ্ঞে।

—ঋজুদা কোথায় ?

—ডাক্তারের কাছে।

—ফিরবে কখন ?

—তা সময় হইয়েচে। ডাক্তারবাবু চেইঞ্জে যিতে বইল্‌চে।

—তাই নাকি ? ঋজুদাকে বোলো। তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। গিয়েই কথা হবে।

—এঁজ্ঞে।

—আরে গদাধরদা, এই যে ; ছেড়ো না। কি রেঁধেছ ?

—রান্না ? সে এখন কিসের ? আত্তির ন'টা বাইজ্‌লে তবে-না বাবুর অরডার। কোন্‌দিন, কখন কি খাবার ইচ্ছা কইরবেন। বুইঝলে না, খাদ্য-খাদকের ব্যাপার।

আজও জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। তুমি ভালো করে ভুনি খিচুড়িই চাপাও দেখি, চীনা বাদাম, মটর-শুঁটি, কিস্‌মিস্ এসব দিয়ে।

—বুইঝলাম। সইঙ্গে আর কি কইরব ?

—বেগুনী, ফুলুরি, পেঁয়াজী, মানে তোমার যত খাদ্য-খাদক আছে, সব।

ফাস্টো কেলাশ্। তবে আমি যোগাড়-যন্তর কইর্‌গে যাই। তুমি এইসব খেইও—কিন্তু বাবু বইক্‌লে কিন্তুক সিটাও তুমারই খাইদ্য হবেক। সি কতা মইনে রেকো।

—মনে রাখব। করো ত' তুমি খিচুড়ির বন্দোবস্ত।

॥২॥

পুব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটিতে ভুষুণ্ডা গুলিতে আহত হওয়ার পর আরও যা-যা ধকল গেছিল ঋজুদার উপর দিয়ে তা সামলে ওঠা আর কারো পক্ষে সম্ভব হতো কী না জানি না। কিন্তু ঋজুদা সামলে উঠেছে। মাসাইদের সর্দার, মানে নাইরোবি সর্দারের কাছে আমাদের যা ঋণ জমা হয়েছে সে এ-জন্মে হয়ত শোধা যাবে না। কিন্তু সেসব কথা এখানে নয়। টেডিকে খুন করার আর ঋজুদার উপর গুলি চালাবার শাস্তি ভুষুণ্ডাকে পেতেই হবে। আজ আর কাল ! তবে, কবে ঋজুদা আবার যাবে আফ্রিকাতে জানি না।

এবং গেলেও আদৌ নেবে কি-না আমাকে, তাও নয়। সে কারণেই, এখন থেকে বিশেষ পরিমাণে তৈলদান করে রাখছি ঋজুদাকে ; চান্স পেলেই।

বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে। বেল দিতেই গদাধরদা এসে দরজা খুলেই ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমার পেরার্থনা মঞ্জুর। বাবু বইল্লেন, রুদ্র বইলেচে, তা আবার আমাকে জিইগ্যেস্ কইরবার প্রেয়োজনটা কি ছেল ?

বললাম, তবে। দেখেছো ত ! তুমিই কেবল পাত্তা দাও না আমাকে।

ঘরে ঢুকতেই দেখি ঋজুদা লেখাপড়ার টেবল ছেড়ে সোফায় বসে, সামনে একটা কুশান্-চাপানো মোড়ায় দু'পা তুলে দিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে অটোমোবিল এ্যাসোসিয়েশানের মোটরিং গাইডের পাতা ওল্টাচ্ছে।

আমি ঘরে ঢুকবার পরও মুখ তুলল না। উল্টোদিকের সোফায় বসলাম যথাসম্ভব কম শব্দ করে। আরও মিনিট পাঁচেক কেটে গেল।

হঠাৎ মুখ তুলে বলল, লুলিটাওয়া আর গীমারিয়ার মাঝামাঝি ! বুঝলি !

বোকার মত ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, আমি কিছুই বলছি না। তুই এখন কি বলিস তার উপরই ত যাওয়া-না-যাওয়া নির্ভর করবে।

সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, কোথায় ?

ঋজুদা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিল, বোধহয় আমার উত্তেজনা বাড়াবার জন্যেই।

বলল, তুই যে খবরটা নিয়ে এসেছিস, সেটা বল্ আগে। তারপর যাওয়ার কথা হবেখন।

অবাক হয়ে বললাম, তুমি জানলে কি করে যে ; খবর নিয়ে এসেছি ?

এতটুকুই না জানলাম এতদিনে, তাহলে আর......

বললাম, আজকে চিঠি এসেছে। আমি ন্যাশনাল স্কলারশিপ্ পেয়েছি। তবে যাদের বাবার রোজগার মাসে পাঁচশ টাকার বেশী তাদের স্কলারশিপ দেবে না। একশ টাকা প্রাইজ দেবে। আর সার্টিফিকেট্।

ঋজুদা বলল, ঐ চিঠিটাই বাঁধিয়ে রেখে দে। টাকা আর সার্টিফিকেট পেতে পেতে তোর পড়াশুনার জীবন শেষ হয়ে যাবে। হয়ত কোনোদিনও না-ও পেতে পারিস। আর এই নে। এক্ষুনি তোকে এই একশ টাকা আমিই দিলাম বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনের হয়ে।

বললাম, না না, এ কি ! মা-বাবা খুব রাগ করবে।

ঋজুদা বলল, তোর পাকামি করতে হবে না। সে আমি বুঝব। তোর পছন্দমত বই কিনিস।

তারপরই বলল, তোকে বলাই হয়নি, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নতুন এডিশান আসছে আমার লাইব্রেরীতে। একবারে পারলাম না। ইনস্টলমেন্টেই কিনলাম।

আমি বললাম, দারুণ ! আমার আর ভাবনা নেই। তবে, বারবার দৌড়ে আসতে হবে তোমার কাছে, এই যা।

ঋজুদা বলল, যাই-ই বল্ রুদ্র, আমি খুব খুশী হয়েছি। এত কম পড়াশুনা করে, আমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তোর ত' বকে যাওয়ারই কথা ছিল, তুই যখন সাতশ সাতষট্টি পেলি স্কুল ফাইন্যালে, ভেবেছিলাম টুকে-ফুকে পেয়েছিস। এখনও ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের সময়ে......

বললাম, বিশ্বাস করতে হবেও না। তোমাদের সময়ের ব্যাপারই আলাদা। তোমাদের সময় কেউ টোকাটুকি জানত না, প্রত্যেকেই পরীক্ষায় ফারস্ট হতো।

প্রত্যেকেই কি করে ফারস্ট হয় ? ঋজুদা বলল।

তা জানি না কিন্তু আমার বন্ধুরা বলে, ওদের প্রত্যেকের বাবাই নাকি ফারস্ট হতেন, সেকেন্ড যে কারা হতেন তোমাদের সময়ে তা তোমরাই জানো।

ঋজুদা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, এটা ভাল বলেছিস্।

কিছুক্ষণ হাসি হাসি মুখে বসে থেকে ঋজুদা বলল—আজ খিচুড়িই খা। কিন্তু পরে একদিন পোলাও-মাংস খাওয়াব। না, তার চেয়ে বিরিয়ানীই ভালো। চল্ আমার সঙ্গে মুলিমালোয়া, তোকে ফারস্ট ক্লাস বিরিয়ানী খাওয়াব।

সে জায়গাটা কোথায় ?

হাজারীবাগ জেলায়।

হাজারীবাঘ ? আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

—হাজারীবাঘ নয় রে ন্যাশনাল স্কলার। হাজারীবাগ। বাগ, মানে, বাগিচা।

—সরি, সরি ! আমি ভাবতাম হাজারীবাঘ !

—সাধে কি মনে হয় আমার যে, টুকে পাশ করেছিস।

—ঋজুদা ! ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

—কলেজ কবে খুলবে ? কথা ঘুরিয়ে ঋজুদা বলল।

—বাইশে জুন।

—আজ পয়লা। ফারস্ট্ ক্লাস। পরশুই আমরা বেরোব। বাঁধা-ছাদা করে নে।

আমি বললাম, তোমার পা ? এখন একদম ঠিক ত' ? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা-হাঁটি করবে ?

একদম ঠিক কি আর হবে কখনও ? ভুষুণ্ডাকে সর্বক্ষণই মনে করতে হবে। ভুলতে দেবে না ও নিজেকে। তবে যেমন আছে এখন, সামান্য খুঁড়িয়ে-চলা ছাড়া আর কোনো অসুবিধাই ত' নেই।

রাইফেল-বন্দুক। আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

একদম্ না।

ভুষুণ্ডার গুলিটা দেখছি, তোর গায়েই লাগা উচিত ছিলো। এখন এক বছর নো-রাইফেল-বন্দুক। ভুষুণ্ডা-শিকার না-করে আর কোনো শিকারের নাম পর্যন্ত নয়।

—যা বলেছো। অনুতাপের গলায় আমি বলাম।

—জামা-কাপড়, টর্চ, হাঁটার জুতো, থার্মোফ্লাস্ক্। এক্কেবারে বেড়াতে যাওয়া—চেঞ্জার মাখমবাবুদের মত। দুজনেই শরীর গোলগাল করে আসব। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম।

—সঙ্গে কে যাবে ? গদাধরদা ?

কেউ নয়। শুধু আমরা দুজন।

অবিশ্বাসী গলায় বললাম, তুমি শুধুই খাবে, হাঁটবে আর ঘুমোবে ? সত্যি সত্যি ?

ব্যস্স্—স্-স্...... । বললামই ত'।

—তাহলে আমি যাবো না।

—তোকে যেতেই হবে। আফটার অল, তুই হলি গিয়ে আমার স্যেভিয়র্। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি থেকে আমায় বাঁচিয়ে আনলি তুই—তোকে ফেলে রেখে আমি একা স্বাস্থ্য

ভালো করতে যেতে পারি ? আমাকে কি এতই অকৃতজ্ঞ ভাবিস।

দুস্স্ বন্দুক-রাইফেল ছাড়া গিয়ে লাভ কি ? খালি-খালি লাগে।

আরে, চলই না। বর্ষাকালের সাঁওতাল পরগণার যা চমৎকার ওয়েদার ! কোথায় লাগে সুইট্জারল্যান্ড।

এমন যা-তা বলো না তুমি।

আরে ! ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি।

—আমরা যাব কিসে ?

—কেন ? গাড়িতে ?

—কে চালাবে ? তুমি ? ডাক্তার সেন না মানা করেছেন !

—ডাক্তারদের সব কথা কক্ষনো শুনতে আছে ? সব কথা শুনেছিস কী মরেছিস !

তারপর বলল, না-হয় তুই-ই চালাবি। গাড়ি ছাড়া ঐ অঞ্চলে গিয়ে মজা নেই।

—থাকব কোথায় ?

—তুই ত' মহা ঝামেলা করিস। বলছি না, চুপচাপ থাক। যাচ্ছিস আমার সঙ্গে, তোর কিসের মাথাব্যথা ?

তারপর হেসে বলল, তোকে কষ্ট দেবো না। রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার।

আমি চুপ করে গেলাম।

ঋজুদা বলল, এক কাজ কর্ ত'। দ্যাখ, ঐ ডানদিকের ড্রয়ারে একটা ক্যাসেট আছে। চণ্ডীবাবুর। বের করে, টেপ-রেকর্ডারে লাগা।

—কে চণ্ডীবাবু ?

—আরে চণ্ডীদাস মাল। গুণী লোক। নিধুবাবুর টপ্পা টেপ করা আছে। নিধুবাবুর শিষ্য ছিলেন কালীপদ পাঠক। আর কালীপদ পাঠকের শিষ্য চণ্ডীদাস মাল। তোরা ত' এসব শুনবি না। শুধু বনি এম্, বী-জীস্ আর দ্যা পোলিস্।

আমি বললাম, আমাদের উদারতা আছে। আমরা তোমাদের মত নই। খারাপ বলি না কিছু। আমাদের কাছে টাকও ভালো ; টিকিও ভালো।

গদাধর এসে বলল, টেবল লাইগে দিচি।

খেতে বসেই ঋজুদা বলল, তোর জন্যে আজ সারা রাত ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়েই মারা যাব। কোলকাতা শহরে পয়লা জুন আকাশে মেঘ দেখেই যে কেউ খিচুড়ি খেতে পারে তা আমার জানা ছিলো না। এ রকম বর্ষামঙ্গল ভাবা যায় না। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে কাউকে জোর করে খিচুড়ি খাওয়ানোর মত শাস্তিও বোধ হয় আর কিছুই হয় না। ধন্য তুই ! আর ধন্য তোর খেচুড়ি।

বলল : বৃষ্টিটা নেমেও যে আবার উঠে পড়ল। এমন করবে তা কি করে জানব ? সন্ধের দিকে আকাশের অবস্থা যে রকম ছিল তাতে ত' মনে হয়েছিল...

—ঋজুদা হেসে বলল, যাক্গে আজকে তোকে মাপ করা গেল। আকাশকেও তোর ন্যাশনাল স্কলারশিপের খাতিরে ভবিষ্যতে কখনও আর এমন শাস্তি দিস না।

॥ ৩ ॥

কাল রাতে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আজকাল জি টি. রোডে গাড়ি চালানো মহা ঝক্মারি। বিশেষ করে বরাকর অবধি। বরাকরের ব্রিজের উপর এমন ট্রাফিক জ্যাম্ যে মাইথন হয়ে ঘুরে আসতে হল। তাছাড়াও পথে থামতে থামতে এলাম।

গোবিন্দপুরের মোড়ের খান সাহেবের চটিতে লাঞ্চ। বাগোদরে জি. টি. রোড ছেড়ে এসে টাটীঝারিয়ার পণ্ডিতজীর দোকানে কালোজাম আর নিমকি দিয়ে চা। তারপর হাজারীবাগ শহর ছাড়িয়ে গীমারীয়ার পথে এগিয়ে এসে যখন অনেক রাতে এই বিরাট, গা-ছম্‌ছম্‌ পুরনো দুর্গর মত বাড়িটাতে পৌঁছলাম—গভীর জঙ্গলের মধ্যে, মেঘে-ঢাকা আকাশের থমথমে অন্ধকারে, তখন বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্টই হল যে, আজই সকালে কোলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম আমরা।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বাড়িটার চার পাশে ঘুরে ঘুরে দেখছি। জায়গটার নাম মুলিমালোয়াঁ। লুলিটাওয়া আর গীমারিয়ার মাঝামাঝি। এই পুরনো দুর্গর মত বাড়িটার নাম মালোয়াঁ-মহল মুলিমালোয়াঁর রাজার বাড়ি। বাড়িটাতে পুরনো দিনের বড় বড় গোল খিলান, শিকবিহীন বিরাট বিরাট জানালা, প্রকাণ্ড চওড়া সাদা মার্বেলের বারান্দা। আর ঘরগুলো ত' ফুটবল খেলার মাঠ। ল্যাজারার্স কোম্পানীর বানানো মেহগিনী কাঠের পেল্লায় খাট। তার গায়ে কত সব কারুকার্য। অন্য ফার্নিচারও সব দেখার মত। চোখ জুড়িয়ে যায়।

কিন্তু সারা বাড়িতেই কেমন যেন একটা অগোছালো, অভিশপ্ত ভাব। সব থেকেও যেন কিছুই নেই। বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই, তাই-ই বোধহয় এ রকম অলক্ষ্মী-অলক্ষ্মী ভাব। একজন কেউ থাকলেও সব কিছু গোছগাছ করে রাখতেন হয়ত!

খাটের মাথার উপরে ফিনফিনে নেটের গোল মশারী। কিন্তু যা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা হচ্ছে কোলবালিশ। মখমলের ঢাকনা-পরানো। পাশে রাখলে পাশে শোওয়া লোককে দেখাই যায় না।

আমাদের দুজনের জন্যে দুটো আলাদা ঘর বরাদ্দ হয়েছে। সেজের বাতি। টানা পাখা। মনে হচ্ছে, যেন হঠাৎ ভুল করে কোনো রূপকথার রাজত্বেই চলে এসেছি।

বিষেণদেওবাবুর মত লোক হয় না। যেমন রাজার মত চেহারা। মস্ত বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ। ছ'ফিট লম্বা—শক্ত সমর্থ। আর তেমনি অতিথিবৎসল।

পরিবেশ ভারী চমৎকার বাড়িটায়। কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ওল্ড-রাত্‌রা রোড। লাল মাটির রাস্তা। দু' পাশ ঘন বনে ঢাকা। বাড়ির সামনে দিয়েই গীমারিয়া হয়ে লাল মাটির রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ভালুয়া মোড়। ভালুয়া মোড় থেকে বাঁয়ে গেলে পালামৌর চান্দোয়া-টৌড়ি আর ডাইনে গেলেই রাত্‌রা।

ঝাড় লণ্ঠনের নীচে—রুপোর বাসনে—বিরাট বিরাট মাদুরের তৈরি টানাপাখার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, মেঝেতে, রাজস্থানী কাজ-করা আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যে রাজকীয় ডিনার খেয়েছিলাম কাল রাতে, আগে তেমন কখনই খাইনি। বিষেণদেওবাবু খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। ভানুপ্রতাপ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিষেণদেওবাবু বললেন, ভানুটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। দিনভর রোদে রোদে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। আপনাদেরও গাড়িতে আসার কথা ; কখন আসবেন ঠিক কি ? তাই আমিই বললাম, শুয়ে পড়তে। আমার জঙ্গলে এত শিকার। শিকারও খেলে না ও। বিষেণদেওবাবুর গলায় দুঃখের ছোঁয়া লাগল।

—শিকার ? আমি চোখ বড় বড় করে বলেছিলাম।

জী-হাঁ ! বিষেণদেওবাবু বলেছিলেন।

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলেছিল, জী একদ্দম না ! শিকারের নামগন্ধও নয়।

বিষেণদেওবাবু বললেন, ঈ কোঈ বাত্‌ হুয়া। আমার জমিদারীতে আপনি এলেন,

একদিনও শিকার খেলবেন না ? ভানু ত' আপনারা আসবেন শুনে খুব খুশী। ইন্তেজাম করে রাখা হয়েছে।

ঋজুদা ওঁকে নিরস্ত করে বললেন, খেলব না বলেই ইচ্ছে করেই আমরা বন্দুক-রাইফেল পর্যন্ত আনিনি।

উনি বললেন, বন্দুক রাইফেল কা কোঈ কমী হ্যায় হামারা মুলিমালোয়াঁমে ? কাল সকালে আমাদের বন্দুক-রাইফেলের কালেক্‌শান দেখাব আপনাদের। যা আছে, তা দিয়ে একটা যুদ্ধ লড়া যায়।

ঋজুদা আবারও বলেছিলো, আপনার আমরী দেখতে দোষ নেই। নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু ঐ খালি দেখাই। শিকারের কথা একেবারেই নয়। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, শিকার ছেড়েও দিয়েছি আমি বহুদিন।

—উনি বললেন, এটা ত' আমারই রাজত্ব। এখানের রাজা আমি। এখানে অন্য কারোই আইন-কানুন চলে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলেও চলেনি, এ গভর্নমেন্টের আমলেও চলবে না। আমাদের আইন এখনও আমরাই বানাই। আমরাই ভাঙি।

ঋজুদা আর কিছু বলেনি। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের হোমরা-চোমরারা ঋজুদাকে চিফ্ গেম্-ওয়ার্ডেন বানানোর জন্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চিফ কনসার্ভেটরকে লিখেছেন। ঋজুদার বিপদটা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। কিন্তু বিপদ ঋজুদার। আমার ত' নয়। আমি মনে মনে নেচে উঠেছিলাম। একদিন শিকার করলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ? তাছাড়া, বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ নিশ্চয়ই পট-হান্টিং করেন। স্রেফ, নিজেদের খাওয়ার জন্যেই সামান্য কিছু......

বিষেণদেওবাবু হাসিহাসি মুখ করে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে এমন একটা খবর দেবো এখন যে, শুনে আপনার তাক লেগে যাবে। শুনলেই রাইফেল তুলে নেবেন হাতে।

—কি খবর ? ঋজুদা এমন ভাবে বলল যেন উত্তেজনাকর কিছু শুনতেই চায় না।

বিষেণদেওবাবুর হাসিটা প্রথমে দু' চোখের মণিতে ঝিলিক মারল, তারপর তাঁর তেল চুকচুক ফর্সা গালে পিছলে গেল, এবং তারপরই তাঁর সারা শরীরে ঝাঁকুনী তুলল।

হাসি থামলে, বিষেণদেওবাবু বললেন, অ্যাল্‌বিনো।

অ্যাল্‌বিনো ? টাইগার। বলেন কি ?

জী হাঁ। হাসতে হাসতে বিষেণদেওবাবু বললেন। তারপর বললেন, মামুলী কোনো শিকারের দাওয়াত দিচ্ছি না আপনাকে। আ চান্স্ ইন আ লাইফ-টাইম। সারা পৃথিবীতে অ্যাল্‌বিনো ট্রোফি কতজনের আছে ঋজুবাবু ? আপনিই বলুন।

অ্যাল্‌বিনোর কথা শুনে লজেন্স খেতে মানা বাচ্চা ছেলেকে লজেন্স দিলে তার মুখের ভাব যে রকম হয়, ঋজুদার মুখের ভাবও তেমন হল। মজা লাগল দেখে।

জব্বর তীর ছুঁড়লেন একখানা বিষেণদেওবাবু এবং ঋজুদা সেই তীরে বিদ্ধ হলো।

প্রথমত, অ্যাল্‌বিনো ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। দ্বিতীয়ত, বিষেণদেওবাবু আফ্রিকা-ফেরত, ওয়াস্তারাবো এক্সপার্ট আমা-হেন একজন তালেবর ব্যক্তিকে মোটে মানুষ বলেই গণ্য করছেন না দেখে লোকটার উপর ভীষণ বিরক্ত হলাম আমি। বিরক্ত হলাম বলেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলাম।

শুতে যাওয়ার আগে ঋজুদা বলছিল, মালোয়াঁ-মহলের বাসিন্দা রাজা বিষেণদেও সিং ও তার ভাগ্নে ভানুপ্রতাপ। মাত্র এই দুজন। লোক দুজন হলে কি হয় ? চাকর, বেয়ারা,

দারোয়ান, খিদ্‌মদ্‌গার একেবারে গিস্‌গিস্‌ করছে। জমিদারী চলে গেলেও এঁদের সচ্ছলতার কোনোই হেরফের হয়নি। কারণ জমিদারী থাকতে থাকতেই এঁরা কোডারমা ঝুমরীতিলাইয়া অঞ্চলে বেশ কিছু মাইকা মাইনস্‌ কিনে ফেলেছিলেন। বিষেণদেওবাবু আর তার ভগ্নীপতি মানে ভানুপ্রতাপের বাবা মিলে। খনিগুলো বিশ্বাসী ম্যানেজারেরা দেখাশুনা করেন। গত কয়েক বছরে মাইকা এক্সপোর্ট করে এঁরা কোটিপতি হয়ে গেছেন। মাসে এক দু'বার গিয়ে অভ্র খনিগুলো দেখাশোনা করে আসেন বিষেণদেও। ভানুপ্রতাপ লান্‌ডান পড়তে গেছিল। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গত চার মাসের উপর এখানেই মামার কাছে এসে আছে। ভানুপ্রতাপও উত্তর প্রদেশের খুব অবস্থাপন্ন পরিবারের লোক।

কী একটা পাখি ডাকছে বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে। কী পাখি তা দেখার জন্যে পথ ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢুকে গেলাম জঙ্গলে। আহা! দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর যে পাখিটা! এই পাখি আমি কখনও দেখিনি আগে। বাড়ি ফিরে সালিম আলীর বই দেখতে হবে। গাঢ় লালের মধ্যে ফিকে হলুদ। গলার স্বর সাঁওতাল ছেলের বাঁশীর মত মিষ্টি।

কাল মাঝরাতে এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে এখনও মেঘ। গরম একেবারেই নেই। বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ঋজুদা ঠিকই বলেছিলি। ঝির্‌ ঝির্‌ করে হাওয়া দিচ্ছে। বাঁশ পাতায়, শালের বনে, লিট্‌পিটিয়া, রাহেলাওলা, জীরহুল্‌ আর ফুলদাওয়াইর ঝাড়ে-ঝাড়ে যে এই বিবশ বিবাগী হাওয়া ফিসফিস করে কত কী কথাই বলে যাচ্ছে!

দূরাগত একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো। ঋজুদা কি আমাকে ফেলে কোথাও চলল একা একা? ভারী খারাপ ত'! কিন্তু ভাল করে শুনেই বুঝলাম, এঞ্জিনের আওয়াজটা ফিয়াট গাড়ির নয়। তবে এ্যাম্বাসাডর বা জীপেরও নয়। যতক্ষণে জঙ্গলের ভিতর থেকে আমি আবার লাল মাটির চওড়া পথটাতে এঁসে পৌঁছেচি, ততক্ষণে গাড়িটাও এসে পৌঁছে গেল কাছাকাছি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম এই গভীর জঙ্গলে একটা আকাশী-নীলরঙা বিদেশী ট্র্যাওরার গাড়ি দেখে। গাড়িটা একেবারে আমার কাছে এসেই থেমে গেল, লাল ধুলোর হালকা মেঘে জায়গাটা ঢেকে দিয়ে। গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দরজা খুলে একজন ইয়াংম্যান লাফিয়ে নামলেন। বয়স এই কুড়ি-বাইশ হবে। লম্বা, ফর্সা, কাটা-কাটা চোখ মুখ নাক। সরু একজোড়া প্রজাপতি-গোঁফ। খুব সুন্দর চেহারা, কিন্তু চোখের নীচে কালি, বড় ক্লান্তি সারা মুখে।

গাড়ি থেকে নেমেই, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, হাই!

আমিও বললাম, হাই। ইয়াংম্যান নিজের পরিচয় দিলেন।

বললেন, আমারই নাম ভানুপ্রতাপ সিং। সরি, কাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মামাবাবুর কাছ থেকে আপনারা আসবেন এ খবর শুনেছি অনেকদিন হল। এত্তদিনে এলেন।

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বললেন, আমি একটু যাচ্ছি গীমারীয়াতে। উঠে পড়ুন ভাইসাব। ঘুরে আসি। কখনও দ্যাখেননি ত গীমারীয়া?

ভানুপ্রতাপের অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার নিজের এরকম একটা গাড়ি থাকলে আমার মত যার-তার সঙ্গে কথাই বলতাম না আমি।

উনি আবার বললেন, কি হল? যাবেন না?

বললাম, না, যাব। কিন্তু ঋজুদা?

আরে উনি এখন মামাবাবুর সঙ্গে গল্পে মশগুল। চলুন না, যাব, আর আসব।

গাড়িতে ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে এল।

আমাকে নাক টানতে দেখেই উনি বললেন, ঈত্বর। খস্‌স্‌ ঈত্বর স্প্রে করাই আমি আমার গাড়িতে। গরমে খস্‌স্‌ আর শীতে অম্বর।

আতরের গন্ধ ছাপিয়ে একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসতে লাগল আমার। গন্ধটা যে ঠিক কিসের বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আতরের গন্ধও সেই গন্ধটাকে চাপা দিতে পারেনি পুরোপুরি।

সামনের সীটে ওঁর পাশেই উঠে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট করার আগে, রুপোর ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে উনি পকেট থেকে দুটো বড়ি ফেললেন মুখে।

জিজ্ঞেস করলাম, শরীর খারাপ ?

—না ত'।

—তবে ?

—ও আমি খাই। এমনিই খাই!

তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, নাশা।

নেশা ? তাহলে গাড়ি চালাবেন কি করে ?

ভানুপ্রতাপ হাসলেন। বললেন, না খেলেই বরং চালাতে পারি না। আদত্‌ বৈঠ গ্যয়া।

একটু থেমে বললেন, আমার মামাবাবুই নেশাটা ধরিয়েছেন বলতে গেলে।

সে কি ? আমি অবাক হয়ে বললাম।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমার বাবা এবং মায়ের মৃত্যুটা এতই হঠাৎ হল যে, সেই ধাক্কাটা সামলেই উঠতে পারছি না, পারিনি এখনও। হয়ত পারবো না কখনও। আগে ত' রাতে একেবারেই ঘুম হতো না। মামাবাবু বলতেন, রাতে ঘুম না হলে মানুষ বাঁচে কখনও ? রাতের ঘুমের জন্যে ওষুধ খাওয়াটা দোষের নয়। সেই যে শুরু হল, এখন মুঠো মুঠো খাই। হর্‌ওয়াক্ত। ঘুমুবার জন্যে নয়—খেতে ভালো লাগে বলে। না-খেলেই বরং ঘুম পায়। গা ম্যাজম্যাজ করে।

মনে হল ঋজুদার কাছে যেন শুনেছিলাম যে ভানুপ্রতাপ লান্‌ডান্‌ থেকেই এই নেশা সঙ্গে করে এনেছেন। কিন্তু ভানুপ্রতাপ নিজে অন্য কথা বলছেন।

দেখে বললাম, অবাক কাণ্ড! মামাবাবুর ত' এর জন্যে আপনার উপর রাগই করা উচিত!

না, না! এমন মামা হয় না। তাছাড়া, উনি ছাড়া এখন ত' আমার কেউই নেই। উনিই হয়ত রাগ করতে চাইলেও আমার উপর রাগ করতে পারেন না। আমার বাবাকে হারিয়েছিলাম তিনমাস আগে। মা-ও গেছেন দু'মাস হলো। এখন উনিই আমার মা-বাবা সব। কী যে হয়ে গেল।

বেচ্চারা! আমি ভাবলাম।

গাড়ি চলছিল।

গাড়ি চলছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সামনে দিয়ে একদল ময়ূর রাস্তা পার হলো। তারপর পার হলো বাঁদরের একটি পুরো পরিবার। বোধহয় তিনপুরুষ।

আমি ভানুপ্রতাপের দিকে তাকালাম। একটা জিন-এর শর্ট্‌স্‌ আর গায়ে টেনিস খেলার হলুদ-রঙা ফ্রেড়-পেরী গেঞ্জী। পায়ে হালকা রাবার সোলের চটি। মাঝে মাঝেই রুপোর

ফ্লাস্ক বাঁ হাতে তুলে ধরে জল খাচ্ছেন ডান হাত গাড়ির স্টিয়ারিং-এ রেখে। জলের সঙ্গে কিছু মেশানো আছে কি-না কে জানে ?

বললাম, আপনার মামাবাবু আর ঋজুদা কি এত গল্প করছেন ?

ছুলোয়া শিকার হবে। বোধহয় তারই ইন্তেজাম হচ্ছে।

সত্যি ? এখানের জঙ্গলের কি কি জানোয়ার আছে ? শুধোলাম আমি !

বড় জানোয়ার এখন আর তেমন নেই বললেই চলে। তবে, লেপার্ড আর ভাল্লুক অনেক আছে। চিতল আছে। শম্বর আছে। শুয়োর, শজারু, খরগোস, নেকড়ে এইই সব। একসময় এদিকে হাতী, বড় বাঘ, বাইসন, নীলগাই এসব খুবই ছিল। একেবারেই দেখা যায় না আজকাল।

আমি বললাম, বিষেণদেওবাবু নিশ্চয়ই অনেক বাঘ মেরেছেন ? আর আপনি ?

বড় বাঘ ত' মামাই মেরেছেন ছত্রিশটা। আর আমি পাঁচটা। তবে, আমাদের জঙ্গলে অ্যাল্‌বিনো টাইগার এসেছে একটা। এ একটা খবরের মত খবর।

মনে মনে ভাবছিলাম, খুবই খারাপ আপনারা মামা ভাগ্নে দুজনে মিলেই ত' বাঘের বংশ নাশ করে ফেলেছেন, অন্যদের আর কি দরকার ছিল ! কথা ঘুরিয়ে বললাম, আপনার ত' ওষুধ খাবার নেশা। বিষেণদেওবাবুর নেশা কি ?

—মামাবাবুর ?

বলেই, ভানুপ্রতাপ একটুক্ষণ ভাবলেন।

তারপর বললেন, কোনো নেশাই নেই। মামাবাবু ভগবান। তবে একটা নেশা আছে, যদি সেটাকে নেশা বলা যায় ; সেটা টাকার নেশা। এর চেয়ে বড় নেশা আর কিছু নেই।

গীমারীয়া পৌঁছে, বি-ডি-ও-র অফিসে গিয়ে ঢুকলেন ভানুপ্রতাপ। আমাকে বসতে বললেন গাড়িতেই। অমন ঝক্‌ঝকে গাড়ি দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ধরল গাড়িটাকে। এমন গাড়ি কোলকাতাতেই দেখতে পাই না আমরা ত' এরা আর কোত্থেকে দেখবে ?

একটু পর ফিরে এলেন ভানুপ্রতাপ। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন মুলিমালোয়াঁর দিকে।

আমি বললাম, আপনারা ঋজুদাকে চিনলেন কি করে ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, সে মামার সঙ্গে ভাব। আমি এই প্রথম দেখলাম ওঁকে। কোডারমাতে মাইকা কোম্পানীর মাইকা মাইন্স আছে। রামকুমার আগরওয়ালার আমল থেকে মামাবাবুর সঙ্গে আপনার ঋজুদার আলাপ। শুনেছি, তখন রজৌলির ঘাটে আর শিঙ্গারে খুব শিকার খেলতেন দুজন একসঙ্গে। সে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা। আমরা জন্মাইওনি।

তাই বুঝি ? আমি বললাম।

বাড়ির বিরাট গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকতেই ফটাফট্ সেলাম বাজতে লাগল চারপাশ থেকে। গেটের মধ্যে ঢুকেই গাড়িটা গোঁ গোঁ শব্দ করে থেমে গেল। আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ভানুপ্রতাপ নেমে বনেট খুললেন। আমি গিয়ে এটা ওটা ধরে টানাটানি করতেই উনি বললেন, ছোড়ো ইয়ার্। যিসকা বান্দ্রী, ওহি নাচায়।

আমি লজ্জা পেলাম। যিস্‌কা বান্দ্রী ওহি নাচায় মানে, যার বাঁদর সেই-ই শুধু তাকে নাচাতে পারে। ভানুপ্রতাপের গাড়ি, আমার কথা শুনবে কেন ?

একটু পরই উনি স্টিয়ারিং-এ এসে আবার বসতেই গাড়ি কৈ কৈ করে কথা বলে উঠল। ভানুপ্রতাপ আমার দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

পোর্টিকোতে গাড়ি রাখতেই উর্দি-পরা ড্রাইভার এসে গাড়ি গ্যারাজে নিয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো বেয়ারাকে ভানুপ্রতাপ শুধোলেন, মামাবাবু কাঁহা?

সে বলল, মাল্‌খানায়।

ভানুপ্রতাপ আমাকে নিয়ে একতলার পিছন দিকের একটি বিরাট ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। পুরু কার্পেটে-মোড়া ঘর। মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে চারজন লোক, পলিথিনের শিট্ বিছিয়ে বন্দুক-রাইফেলে তেল লাগাচ্ছে, ব্যারেল পরিষ্কার করছে। ঘরটা ঋজুদার পাইপের এ্যাম্ফোরা তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ভুরভুর করছে।

আমরা ঢুকতেই বিষেণদেওবাবু বললেন, ভানু, তোর রাইফেল-বন্দুক বেছে রাখ্ দশেরা শিকারের জন্যে। তোর ইন্তেজাম, তুইই বে-পাত্তা।

তারপর বললেন, ঋজুবাবুকে কেন দাওয়াত দিয়ে আনিয়েছি আমরা সে কথা ভাল করে জানিয়ে দে।

ভানুপ্রতাপ কাঁচের আলমারী খুলে সারসার রাইফেল-বন্দুকের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, তুমি বলোনি?

বলিনি যে তা নয়, মুলিমালোয়াঁর জঙ্গলে একটা অ্যাল্‌বিনো বাঘ এসেছে শুধু এইটুকুই বলেছি।

ঋজুদা বলল, সত্যি আশ্চর্য বিষেণদেওবাবু। সেদিন গ্রান্ড হোটেলে আপনার সঙ্গে হঠাৎ যখন দেখা হয়ে গেল তখন ত' আমাকে কিছুই বলেননি। শুধু বলেছিলেন, মুলিমালোয়াঁতে এসে ক'দিন থাকলে চুপচাপ, শরীর একদম সেরে যাবে। পায়ের চোটের কথাও ভুলে যাবেন।

বিষেণদেও সিং হাসলেন।

বললেন, তখন কি আমি নিজেও জানতাম অ্যাল্‌বিনোর কথা?

বিষেণদেওবাবুকে বললাম, অ্যাল্‌বিনো বাঘ কিরকম দেখতে হয়?

উনি বললেন, "অ্যাল্‌বিনো" শব্দটি এসেছে লাতিন "অ্যাল্‌বাস্" শব্দ থেকে। অ্যাল্‌বাস বা অ্যাল্‌বিনো মানে হচ্ছে সাদা। হলুদ, লাল, বাদামী অথবা কালো রঙের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো জানোয়ারের রঙ সাদা হয়ে যায়। ঐ সব জানোয়ারের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক পটভূমিতে বেঁচে থাকা কঠিন হয় কারণ তাদের ক্যামোফ্লেজ করার ক্ষমতা থাকে না। অন্যান্য রঙের অনুপস্থিতির কারণ অনেক, সে সম্বন্ধে জ্ঞানের তোমার আপাতত প্রয়োজন নেই। অ্যাল্‌বিনিজম্ একটি রোগ। মানুষের মধ্যেও যেমন শ্বেতী একটি রোগ, জানোয়ারদের মধ্যেও তাই। তবে মানুষের অ্যাল্‌বিনিজম্ হয় 'মেলানিন্'-এর অনুপস্থিতিতে। ঘোড়া, কাক, এবং আরো নানা জানোয়ার এবং পাখিকে অ্যাল্‌বিনো হতে দেখা যায়। অ্যাল্‌বিনো বাঘের প্রজন্ম নানা চিড়িয়াখানাতে এবং ব্যক্তিবিশেষের তত্ত্বাবধানেও গড়ে উঠছে আজকাল। তবে, জংলী বাঘের মধ্যে অ্যাল্‌বিনো এখনও অতি দুর্লভ। এবং যুগযুগান্ত থেকে শিকারীদের কাছে অ্যাল্‌বিনো বাঘের আকর্ষণ যে অত্যন্ত তীব্র একথা শিকারিমাত্রই জানেন। তবে, মুলিমালোঁয়ার অ্যাল্‌বিনো এখন কার গুলি খেয়ে মরবে, তা একমাত্র বজরঙ্গবলীই বলতে পারেন।

ছোটু! ভানুপ্রতাপ ডাকলেন।

ছোটু বলে একটি পনেরো-ষোলো বছরের সাদা পোশাক পরা খুব স্মার্ট সুশ্রী বেয়ারা

ঘরে এলো। মনে হল, এই ভানুপ্রতাপের খাস্ বেয়ারা।

ভানুপ্রতাপ যেন, গররাজী হয়ে বললেন, টুয়েল্‌ভ বোর ওভার-আন্ডারটা বের কর।

কোনটা হুজৌর ? ব্যারেটাটা ?

হ্যাঁ। ব্যারেটাটা।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আমি ভাবছি প্যারাডক্সটা নেব। বলে, নিজেই আলমারী থেকে বের করলেন, টেনে। তার আগে কখনও প্যারাডক্স দেখিনি আমি। হাতে নিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। জীবন সার্থক হল। প্যারাডক্স হচ্ছে এক মজার বন্দুক-কাম রাইফেল। দেখতে, শট্‌গানের মত কিন্তু দু' ব্যারেলেরই শেষের কিছুটা জায়গাতে গ্রুভ কাটা থাকে। বুলেট ফায়ার করলে, তার রেঞ্জ বেড়ে যায়, ভেলোসিটি বেড়ে যায় তাই অনেক দূর অবধি গুলি পৌঁছয়। প্যারাডক্সের গুলিও আলাদা। দারুণ জিনিস।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, তুই কি নিবি ?

আমি যেন খুবই নিরুৎসাহ হয়েছি এমন মুখ করে বললাম, আমাকে একটা শট্‌গানই দাও।

কত বোরের ? টুয়েল্‌ভ বোর ?

হ্যাঁ।

কি বন্দুক নিবি বল ? দ্যাখ্ এখানে পৃথিবীর সব বাঘা-বাঘা বন্দুকের গাদা। চার্চিল, জেমস্—পার্ডি, গ্রীনার ; যা চাস্। ইটস্ ফর ইওর আস্কিং।

আমি বললাম, বত্রিশ-ইঞ্চি ব্যারেলের কিছু আছে ?

আছে। বিষেণদেওবাবু বললেন।

তারপর বললেন, তুমি তাহলে গ্রীনারই নাও।

ভানুপ্রতাপ হঠাৎ বললেন, মামাবাবু বাঘটা তুমি নিজে দেখেছো ?

নিজে দেখিনি। তবে, বাঘটা পুরুষ। মনে হয়, সাড়ে-ন'ফিট পৌনে-দশ ফিট মত হবে।

ওভার দ্যা কার্ভস না বিটুইন পেগস্ ? আমি বললাম, ওঁদের মুখের কথা কেড়ে। পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে। ঋজুদা আর বিষেণদেওবাবু ত' হাসলেনই এমনকি ভানুপ্রতাপও হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে।

ঋজুদা বলল, বাঘ মারা পড়লে তখনই মেপে দেখা যাবে। বিষেণদেওবাবু ত' আর বাঘকে দাঁড় করিয়ে টেপ দিয়ে মাপেননি। পাগ-মার্কস দেখে একটা আন্দাজ করেছেন। সেটা সবসময় এ্যাকুয়েট হতে নাও পারে।

আসলে, শিকারীরা বাঘ দু'রকম করে মাপেন ; মারার পর। বাঘকে লম্বা করে শুইয়ে তার মাথার কাছে একটা খোঁটা আর লেজের ডগাতে আরেকটা খোঁটা পুঁতে তার দৈর্ঘ্যের মাপকে বলে, বিটুইন দ্যা পেগস্। আর নাকের ডগা থেকে শুরু করে বাঘের গায়ের উপর দিয়ে মাপবার ফিতেকে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে লেজের ডগা অবধি নিয়ে এলে তাতে যে মাপ হয় ; তাকে বলে ওভার দ্যা কার্ভস্। স্বাভাবিক কারণে একই বাঘের দৈর্ঘ্য ওভার দ্যা কার্ভস্ মাপলে বিটুইন দ্যা পেগস্-এর মাপের চেয়ে একটু বেশীই হয়।

বোকার মত কথা বলার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে আমি ঋজুদাকে বললাম, তুমি কি নেবে ? রাইফেল না বন্দুক ? তুমি নিশ্চয়ই রাইফেলই নেবে ?

ঋজুদা বলল, নাঃ। ভাবছি, বন্দুকই নেবো ফর আ চেঞ্জ। বুঝলি।

তারপর বিষেণদেওবাবুকে বলল, সবচেয়ে ছোট ব্যারেলের শট্‌গান কি আছে ?

আপনার কাছে ? টুয়েল্‌ভ বোরের ?

বিষেণদেওবাবু বললেন, স্কিট্ গান আছে। একেবারে চব্বিশ-ইঞ্চি ব্যারেলের। ইটালিয়ান, ব্যারেটা। ডাবল ব্যারেল।

ঋজুদা বলল, তাহলে আমি ঐটাই নেবো। মাচায় বসে ছোট্ট ব্যারেলের বন্দুক ম্যানুভার করাই সোজা।

মনে মনে ভাবছিলাম, কোলকাতার বাইরে বেরোলেই ঋজুদার কোমরে সবসময় যে পয়েন্ট-থ্রি-সেভেনটিন্ এ্যামেরিকান কোলট্ পিস্তলটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা থাকে, কাছ থেকে তারই এক ঘা কানে-মাথায় ঠুকে দিতে পারলে বাঘ বাবাজীর আর দেখতে হবে না। বাবা গো বলে ঐখানেই পট্‌কে যাবে। তবে, আমি এমনি বাঘের কথা বলতে পারি। এমন সাহেব বাঘ ত' কখনও দেখিনি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, চলুন চলুন নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো বোধহয় এতক্ষণে। চল্ ভানু।

আমরা সকলে খাওয়ার ঘরে এলাম। মহারাজ গরম গরম খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পরোটা ভেজে দিতে লাগল। সঙ্গে আলুভাজা, শজারুর চচ্চড়ি, তিতিরের বটি-কাবাব, বটেরের রোস্ট আর কমপক্ষে দশ রকমের আচার। চারজন খেতে বসেছি, চারজন লোক সার্ভ করছে। সে এক এলাহী কাণ্ড।

ঐসব শেষ করার পর, এলো বেনারসী প্যাঁড়া আর বেনারসী রাবড়ি।

ঋজুদা বিষেণদেওবাবুকে বললেন, মশায়, আপনার মতলব ত' কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে আর রুদ্রকে কালকেই শুইয়ে ফেলে ওভার দ্যা কার্ভস্ মাপবেন নাকি ? এমন করে খেয়ে মরার চেয়ে ত' গুলী খেয়ে মরাও ঢের ভালো ছিল, যদিও গুলী মোটেই সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য নয়।

বিষেণদেওবাবুকে তাঁর ভীষণ ফর্সা মুখ আর সাদা-পাকা গোঁফে যেন অ্যাল্‌বিনো বাঘের মতই দেখাচ্ছিল। হেসে উঠলেন বাঘের মতই।

তারপর বললেন, কি যে বলেন ঋজুবাবু। এলেন এই প্রথমবার আমার গরীবখানায়—অথচ এত বছরের জান-পহচান, সামান্য খাতির যত্নও একটু......

আসলে ঋজুদা আমার চেয়েও বেশী পেটুক আর ভোজনরসিক। —কিন্তু ভাবটা এমন দেখায়, যেন আলু পোস্ত আর কড়াই ডাল হলেই ত' চলে যেত, এত আর কেন ?

ভানুপ্রতাপ খুবই কম খায়। একটু পরোটা আর কালিতিতিরের কাবাব নিয়ে দু' আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন উনি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। উনি সব সময়ই কেমন অন্যমনস্ক। সব সময়ই ওষুধ খেলে, না হওয়াটাই আশ্চর্য অবশ্য।

তা বেনারসী প্যাঁড়া আর রাবড়ি পেলেন কোথায় ? ঋজুদা শুধোল।

বিষেণদেওবাবু হেসেই বললেন, ভানুর একজন লোক এসেছে আজই বেনারস থেকে। ঠিক বেনারস নয়, বেনারসের কাছেই, ভানুর জমিদারী থেকে।

ভানুপ্রতাপ কথাটা শুনেই চমকে উঠল হঠাৎ। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বলল, কে এসেছে ? মামা ? কে এসেছে ?

বিষেণদেওবাবু ভানুপ্রতাপের দিকে একঝলক চাইলেন।

তারপর বললেন, তোদের ব্রিজনন্দন এসেছে রে আজ সকালে।

ভানুপ্রতাপ মুখ তুলে বলল, ব্রিজনন্দন ? কেন ? হঠাৎ ?

এই রাবড়ি-টাবড়ি নিয়ে এল। আর তোদের জমিদারীর হিসেবনিকেশ।

ভানুপ্রতাপ মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কি বলতে গেলেন। কিন্তু কিছু বলার আগেই বিষেণদেওবাবু হাঁক পাড়লেন, কোঈ হ্যায় ?

জী হুজৌর।

বলে, একজন বেয়ারা বাইরে থেকে দৌড়ে এল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, ব্রিজনন্দনকো বোলাও।

ভানুপ্রতাপ হঠাৎ উঠে পড়ে, আমাদের সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

একটু পর যে-লোকটি ঘরে এসে ঢুকল তাকে দেখেই আমার ভয় লেগে গেল। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির নাইরোবী সর্দারকে রাতের বেলা দেখেও আমার এত ভয় লাগেনি। লোকটা লম্বা নয়, বরং বেঁটেই। কিন্তু অসুরের মত চেহারা—দেখলেই মনে হয়, নিয়মিত কুস্তী-টুস্তী লড়ে। গলায় সোনার চেনের সঙ্গে বাঁধা একটা সোনার তাবিজ। তিন-চারটে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। মাথার সামনে চুল কম, কিন্তু কদমছাঁট। পরনে মিলের মিহি পা-দেখা-যাওয়া ধুতি আর গোলাপি রঙের টেরিলীনের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর হাতা গোটানো। বাঁ-হাতে একটা সোনার রোলেক্স ঘড়ি। আসবার সময় সে জুতো খুলে ঘরে ঢুকলো বটে—কিন্তু দরজার বাইরে রাখা তার লোহার নাল-লাগানো নাগরাখানির দিকে চেয়ে দেখলাম, জুতো জোড়াও দেখবারই মত।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আমার বোন শুভাবাঈ ত' উত্তর প্রদেশের উজ্জানপুরের জমিদার সুরিন্দর নারায়ণ এর স্ত্রী ছিলেন। উজ্জানপুর বেনারসের কাছেই। তা ভগ্নীপতি, সুরিন্দার নারায়ণ মারা গেলেন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎই। বোনটাও সেদিন চলে গেল আমার প্রায় হাতেরই মধ্যে—এই বাড়িতেই—একটু চিকিৎসার সুযোগ দিল না। দু' মাসের তফাতে দুজনে শ্মশান করে দিয়ে গেল হে। এখন আমার আঁখোকা-রোশনী এই ভানুই আছে একমাত্র। নিজে ত' বিয়েথাও করলাম না, করার সময়ও পেলাম না। পরের সম্পত্তি সামলাতে সামলাতেই জীবন গেল। সুরিন্দারের মৃত্যুর পর শুভা একটু-আধটু দেখতে শুরু করেছিল ওর জমিদারীর কাজ। ভানু ত' চিরদিনই মনমৌজী ছেলে। ওকে দিয়ে......

ওখানে খুব ভাল আখ হয়। এ ওদের সুগার মিলের সঙ্গে বছরের পর বছর কনট্রাক্ট করা থাকে। বাঁধা লাভ। সুরিন্দার চলে যাওয়ার পর এই ব্রিজনন্দনই ওদিকটা সামলায়। যা হয়, তাতে ভানুর আর কিছুই না থাকলেও বাকি জীবন এমন গরীবের মতই কোনোক্রমে চলে যেত। কিন্তু আমার মাইকার বিজনেসের টুয়েন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ারও ত' ভানুরই এখন। আমি আর আমার ভগ্নীপতি সুরিন্দার দুজনে মিলেই মাইকা মাইনস্ সব নিয়েছিলাম। এই জঙ্গলের জমিদারীর আয় আর কতটুকু ? তাও ত' জমিদারী থাকলে, তবু কথা ছিল। বাকি জীবন এই ভানুরই জন্যে আমার এই খিদ্‌মদ্‌গারী করে যেতে হবে। ভানুটা একেবারেই ছেলেমানুষ। সম্পত্তি, ব্যবসা, এসব বোঝার চেষ্টাও নেই ; এলেমও নেই। সকলকে দিয়ে সবকিছু হয়ও না। বুঝলেন ঋজুবাবু। ভানুকে বললাম, বিলেতে না গিয়ে এখানে ব্যবসা দ্যাখ। কে কার কথা শোনে ? বলল, ফীজিক্স পড়বে। ফীজিক্সের যুগ নাকি এখন। খ্যয়ের। হবে হয়ত। আমি ত' গর্তের চুহা। দুনিয়ার কোন্ খবরই বা রাখি।

তারপর রাবড়ি মাখিয়ে একটু পরোটা মুখে নিয়ে বিষেণদেওবাবু বললেন, কি জানি রে বাবা ! কিসের যুগ তা জানি না—আমার এই মুলিমালোঁয়াতে ইতিহাস থেমে রয়েছে।

এখানে আমার বাপ-দাদার যুগই চলছে, চলবে।

ভানুপ্রতাপ ফিরে এসেছিলেন। দুটো বড়ি খেলেন দুধ দিয়ে তারপর মামার দিকে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন বলতেও গেলেন মামাকে, আমাদের দিকে একবার হঠাৎ তাকিয়ে।

কিন্তু কিছুই না বলে, থেমে গেলেন। মুখ নামিয়ে নিলেন।

বললেন, সত্যিই আমার এসব আসে না মামা। তুমি ত' জানোই এসব টাকা-পয়সা ব্যবসা-ট্যাবসা আমার একেবারেই আসে না। তুমিই সব নিয়ে নাও। আমাকে শুধু হাতখরচা দিও, যখন যতটুকু যা লাগে, তাতেই আমি খুশী।

বিষেণদেওবাবু ইঙ্গিতে ব্রিজনন্দনকে চলে যেতে বললেন।

তারপরই বললেন, ন্যান্সির চিঠি পেয়েছিস্ ?

ভানুপ্রতাপ বিব্রত হলেন একটু। বললেন, অনেকদিন পাইনি।

বিষেণদেও সিং গর্ব গর্ব মুখ করে বললেন, ভানুর আমার অনেকই গার্ল-ফ্রেন্ড। মেমসাহেবদের চিঠির ঠেলায় গীমারীয়ার পোস্টমাস্টার পাগল। এ হাতভাগা জায়গাতে বিলেতের টিকিট লাগানো চিঠি কি এসেছে কখনও এর আগে ? ভানুর দৌলতেই আসে। প্রথম এবং শেষ।

ঋজুদা বলল, কি রে রুদ্র ? তোর গার্ল ফ্রেন্ডদেরও চিঠি-টিঠি দিতে বলে এসেছিস না কি ?

আমি বললাম, ধ্যাৎ ! কি যে বল না ? আমার কোনো গার্ল ফ্রেন্ড নেই।

খুবই খারাপ কথা ! শুনে দুঃখিত হলাম। ঋজুদা বলল। অস্বাস্থ্যকর কথাও বটে বাগানে ফুল নেই, পুকুরে জল নেই, তোর মত ন্যাশানাল স্কলারশিপ পাওয়া, আফ্রিকাতে এ্যাডভেঞ্চার করা হীরোরও গার্ল ফ্রেন্ড নেই।

বলেই বলল, কি হল কি দেশের মেয়েগুলোর বলুন ত' দেখি বিষেণদেওবাবু ?

বিষেণদেওবাবু সাদা-পাকা গোঁফের ফাঁকে আবার হেসে উঠলেন।

বললেন, রুরুদ্দ্রবাবু, তাতে দুঃখের কিছুই নেই। তুমি ত' ছেলেমানুষ এখনও। এই আমারও জেনো গার্ল ফ্রেন্ড কিন্তু একজনও নেই। প্রায় চার-চারটে রুরুদ্দ্রবাবুর বয়স আমার। তবুও। হাউ স্যাড।

ওঁরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু ভানুপ্রতাপ হাসলেন না।

আমিও না।

কারণ, বিষেণদেওবাবু প্রথম থেকেই আমাকে রুদ্র না বলে রুরুদ্দ্র বলে ডাকছেন।

ভানুপ্রতাপ বললেন, এক্সকিউজ মী ! খেয়ে আমি আর বসতে পারি না। ঘণ্টাখানেক শুতে হবে।

ঋজুদা অবাক হয়ে চলে-যাওয়া ভানুপ্রতাপের দিকে চেয়ে বলল, ব্রেকফাস্টের পরেও ? বলেন কি ?

বিষেণদেওবাবু ভানুপ্রতাপ চলে-যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে থেকে উনি চলে যেতেই স্নেহমাখা গলায় বললেন, আজকালকার ছেলে। ছেড়ে দিন ওদের কথা।

বলেই, আমার দিকে চোখ পড়তে বললেন, রুরুদ্দ্রবাবু অবশ্য একটু অন্যরকম। ব্যাপারটা কি জানেন ঋজুবাবু ? আমার ত' আর কেউই নেই। ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেই শুভার মুখটা মনে পড়ে যায়। বুকের মধ্যে যেন আমার কিরকম, কিরকম করে। ঐ ত' এই সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক। আমি ত' ওর খিদ্মদ্গার মাত্র।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমাদের পরিবারের সকলেই দারুণ মুডি। আমিই হয়ত একমাত্র ব্যতিক্রম। ওর মায়ের দিকটাই বেশী পেয়েছে ও, বাবার দিকের চেয়ে। কথায় বলে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। ও এই রকমই। যা খুশী করুক। আমার চোখের সামনে থাকলেই আমি খুশী। আর কিছু চাই না। অনেকদিন বজ্‌রঙ্গবলী ওকে বাঁচিয়ে রাখুন আর কিছু চাই না।

খাওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে বাগানে এবং বাগান ছাড়িয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিষেণদেওবাবু।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঋজুবাবু, এ সংসারে কিছু কিছু মানুষের ঘাড় চওড়া করে পাঠান বজরঙ্গবলী। পরের বোঝা, দায়-দায়িত্ব সব তাদেরই বইতে হয়। না-বইলে, তাদের মুক্তি নেই। তাই ঝামেলা বা দায়িত্ব এড়াতে চাইলেও এড়াতে পারা সম্ভব হয় না। জানি না, ভানু বিয়ে-টিয়ে করলে আমার কি অবস্থা হবে। আজকাল মায়ের পেটের ছোট ছোট ভাইয়েরা পর্যন্ত বেইমানী করে, বেইজ্জত করে মানুষকে, আর এ ত' বোনেরই ছেলে। সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা।

বলেই, মহলের হাতার মধ্যে একটা খুব উঁচু ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের মাথায় এলোমেলো দামাল হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়তে-থাকা বীর হনুমানজীর নক্সা-তোলা একটা গাঢ় লাল নিশানের দিকে তাকালেন।

ওঁর চোখ অনুসরণ করে আমিও নিশানটার দিকে তাকিয়েছিলাম। একেই এ অঞ্চলে সকলে হনুমান-ঝাণ্ডা বলে। ঋজুদা বলছিল, এত বড় রাজপ্রাসাদের কম্পাউন্ডে এমন ঝাণ্ডা বড় একটা দেখেনি নাকি। এগুলো বিহারের প্রত্যেক বস্তীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

মনে মনে নিশানটার দিকে তাকিয়ে বললাম, জয় বজ্‌রঙ্গবলীকা জয়। অ্যাল্‌বিনো যেন আমার হয়। আমার নতুন ক্লাসে প্রতিভূ বলে একটি নতুন ছেলে এসেছে, সে হায়ার সেকেন্ডারীতে টেন্থ হয়েছিল। আমার পজিশান এসেছে টুয়েন্টিফার্স্ট। খুব ডাঁট ছেলেটার। অ্যাল্‌বিনোটা মেরে ফেলি। তারপর কোলকাতা ফিরে ওকে বোঝাব যে ভালো ছেলে হতে হলে স্কোয়ার হতে হয়। সবদিকে যে ভাল, যার অনেক কিছুতে ইন্টারেস্ট আছে, সেইই আসলে ভাল। বইয়ের পোকা হয়ে শুধু পরীক্ষাতে ভালো ফল করা মানেই ভালো নয়।

তার পরমুহূর্তেই মনে হল। থাক্‌গে। প্রতিভূকে ক্ষমাই করে দিই। বেচারা। ও কি করে জানবে, জঙ্গলের জগতের কথা, এই সব বন্দুক, রাইফেলের পিস্তল-রিভলবারের এ্যাডভেঞ্চারের এত সব কথা ; অ্যাল্‌বিনো বাঘের কথা। ওর জগৎ ত' ছোট্ট জগৎ। ক্ষমাই করে দিলাম, তাই-ই ওকে। ও কি পায়নি, পেলো না, ও তা জানেই না।

ভাগ্যিস আমার ঋজুদা ছিল।

ঋজুদা বলল, এবার রুদ্রবাবু ? কি প্রোগ্রাম ?

আমি বললাম, আমি এত রাবড়ি খেয়েছি যে আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, মার খাবি। চল্‌ হাঁটতে যাবি আমার সঙ্গে।

এই রোদে ? বলেন কি ? বিষেণদেওবাবু রুপোর দাঁত-খোঁচানী দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন।

ঋজুদা বলল, জঙ্গলে বেড়ানোর কোনো সময় অসময় নেই। জঙ্গল, বছরের বা দিনের সবসময়ই ভাল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, যেখানেই যান, মালোয়াঁমহলে পিছনের জঙ্গলে যাবেন না। ঐদিকে একটা পোড়োবাড়ি মত আছে। বহু বছর ওদিকে আমরা কেউই পা দিইনি। আগে আমার ঠাকুর্দার নাচঘর ছিল। আয়না-ফায়না কবে ভেঙে গেছে। ইঁটও হয়ত খসে পড়েছে। এখন সাপেদের আড্ডা। বহুত খতরনাগ জায়গা। ওদিকে না যাওয়াই ভাল।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, কি রুদ্দর্দরবাবু, শঙ্খচূড় সাপ জানেন ত'? এক মাইল অবধি দৌড়ে গিয়ে মাথায় ছোবল মারে।

আমি বিষেণদেওবাবুর দিকে ঠাণ্ডা ক্ষমার চোখে তাকিয়ে রইলাম। মুখে কিছুই বললাম না। আফ্রিকার গাব্বুন্-ভাইপার এর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এলাম, শেষে কী-না দিশী সাপ আমার মত স্বদেশ-প্রেমিককে কামড়াবে?

ঋজুদা বলল, চল্ রুদ্র ঘুরে আসি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দুপুরের খানা ঠিক একটাতে। তার আগে ঘুরেফিরে চলে আসবেন। অবশ্য, আপনারা না এলে বসব না আমরা কেউই।

ঋজুদা হাসলো। বলল, নাস্তাই হজম হোক আগে। লাঞ্চের সময় কিন্তু বেশী কিছু করবেন না।

বিষেণদেওবাবু, রুপোর খোঁচানী দিয়ে এবার কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, না না, খুবই সিম্পল মেনু আজ দুপুরে। শুধু খাসীরই প্রিপারেশান্।

ঋজুদা যেতে গিয়েও, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, কি রকম?

—এই চৌরী, পায়া, লাব্বা, চাঁব, বটি-কাবাব, গুল্‌হার কাবাব। সঙ্গে তক্কর আর বিরিয়ানী। কাশ্মীরের পহাল্‌গাঁও থেকে জাফ্‌রান্ আনানো আছে, শ্রীলঙ্কা থেকে গোলমরিচ আর পাটনা থেকে লাজোয়াব বাবুর্চী।

ঋজুদা বলল, শুনে জিভে জল আসছে আমার। কিন্তু এতগুলো পদের মধ্যে মধ্যে কিছু হজমী টজ্‌মী রাখেননি? নইলে খাসী যে পেটে গিয়ে লাথি ছুঁড়বে।

জী হাঁ। তাও রেখেছি। বললেন, বিষেণদেওবাবু। নিম্বু পানি আর হাম্‌দর্দ দাওয়া কোম্পানীর পাচ্‌নল ট্যাবলেট। ঐসব চলবে, আফটার ইচ্ কোর্স।

তারপর বললেন, আপলোগ ইত্‌মিনান্‌সে ঘুম্-ঘামকে আইয়ে—। খানা এ্যাইসা বন্ রহা হ্যায় কি মেরী মেহেমানোঁকো মজা আ জায়গা।

ঋজুদা বলল, আপনার মত রহিস্ আদমী মেলা ভার।

বিষেণদেওবাবু হাত জোড় করে বললেন, আমি কেউ নই। সবই বজরঙ্গবলীর দয়া। তিনিই সব। আমি তাঁর খিদ্‌মদ্‌গার মাত্র।

॥ ৪ ॥

ঋজুদা পথে বেরিয়েই গম্ভীর, অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

একটা লাঠি নিয়েছে হাতে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে—তবে সেই খুঁড়িয়ে চলাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক।

ওলড় রাত্‌রা রোডের দিকে কিছুটা গিয়েই ঋজুদা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ডানদিকে। সেখানে কোনো শুঁড়ি পথ-টথও ছিলো না। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্প্রাপ্য পাখি বা প্রজাপতি দেখেছে। কিন্তু কালিতিতির ছাড়া অন্য কোনো পাখিই ডাকছে না। এ অঞ্চলে তিতির, কালিতিতির, আসক্‌ল, বটের বুনোমুরগী, ময়ূর ইত্যাদি একেবারে ভর্তি। ফেদার-শুটিং-এর এমন স্বর্গ বড় একটা দেখা যায় না। ঋজুদাই বলছিল। শিকার

বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গেমস্ আগের থেকে বেড়েওছে অনেক।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে এসে একটা ছোট্ট টিলামত দেখে ঋজুদা তার ছায়ায় বসল, লাঠিটা পাশে রেখে। তারপর যত্ন করে পাইপ ভরতে লাগল।

কি যেন ভাবছিল ঋজুদা।

পাইপটা ভরা হয়ে গেলে, ভাল করে পাইপটা ধরিয়ে কোলকাতার স্টেটবাসের একজস্ট্ পাইপ থেকে যেমন ধুঁয়ো বেরোয় তেমন ধুঁয়ো ছাড়ল। ধুঁয়োতে জায়গাটা ঢেকে গেল। তবে, পাইপের ধুঁয়োর গন্ধ ভাল এবং রঙ নীলচে-সাদা। আমাদের পায়ের কাছেই, মাটিতে কতগুলো পোকা গর্ত থেকে ঢুকছিলো বেরোচ্ছিল। ঋজুদার পাশে বসে আমি তাদের দেখছিলাম। পোকাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। সামনেটা লাল; পেছনটা কালো। কুঁচ ফলের মত।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, ঢেঁকিকে স্বর্গে গিয়ে ধান ভান্‌তে হয় বুঝলি।

কি রকম ? ঋজুদার কথাতে রহস্যর গন্ধ পেলাম আমি।

ঋজুদা বলল, রুরুদ্দরবাবু, এখানকার রাবড়ি এখানেই হজম করে যেতে হবে। চেঞ্জে এলাম বটে, কিন্তু শরীর ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আমি আবার উৎসুক হয়ে বললাম, কেন একথা বলছ ?

ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে না, ব্যসস্...তার আবার কেন কিসের ?

কিছুক্ষণ পাইপ খেয়ে বলল, তোর ঘরটাতে যে জানালাগুলো আছে তা দিয়ে মালোয়াঁ-মহলের পিছন দিকটা দেখা যায় না রে ?

—হ্যাঁ।

—আমরা যদি এখন পশ্চিমে যাই, তাহলে ত' বাড়ির পিছনে যাওয়া হবে ? কি ?

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, কম্পাস্ এনেছিস ?

আমি বললাম বাঃ রে ! তুমি বললে এখানে শুধুই খাবে, ঘুমোবে আর কোলকাতার মাখন-বাবু চেঞ্জারদের মত ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে বেড়াবে। আর এখন...

ঠিক আছে। ঋজুদা বলল, কথা বলবি না। চুপচাপ চল। এ জঙ্গলেই হয়ত অ্যাল্‌বিনো বাঘটা আছে। বিরাট বাঘ। বাঘ ত' আর চীফ মিনিস্টারের গাড়ির মত লাল-বাতি জ্বেলে পী-পাঁ-পাঁ-পী করে জানান্ দিয়ে আসবে না। কোয়াইটলী এসে, ফাস্ট্‌লী, বাট নীটলী কিছু করেই চলে যাবে।

কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চরাই-উৎরাই, আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে স্কোয়াশ-খেলার কোর্টের মত উঁচু একটা পোড়ো-বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা পাথরের, একদিকটা ধসে গেছে। অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে উঠেছে এখানে ওখানে। বাড়িটার চারপাশে জংলী নিমের ঘন জঙ্গল। কিছু এলোমেলো ইউক্যালিপ্‌টাস্।

ঋজুদা বলল, রুদ্র। এবারে মালোয়াঁমহল দেখতে পাচ্ছিস ? পিছন ফিরে ?

—হুঁ। আমি বললাম।

—তোর ঘরের জানালা বা পেছনদিকের অন্য কোনো ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলে এই নাচ ঘর দেখা যাবে ?

—যাবে। তোমার ঘর থেকে নয়, আমার ঘর থেকে।

দেখা যাবে ত' সকালে উঠে তোর চোখে পড়েনি কেন ?

বোধহয় নিমগাছগুলোর জন্যে। তাছাড়া, বাড়িভর্তি যত জানোয়ারের যত রকম ট্রোকি—তাই দেখার সময় হল না, বাড়ির বাইরে তাকাবার সময় কোথায় ?

জঙ্গলের ভিতরে সরে আয় এবারে। ফাঁকা জায়গাতে থাকিস না। ঋজুদা বলল।

কেন!

আমাদের কেউ লক্ষ করতে পারে হয়ত।

এ কিরকম জায়গায় বেড়াতে এলে ?

আমি বললাম, ভাল হচ্ছে না কিন্তু ঋজুদা। বলতেই দেখতে পেলাম, একজন মেয়ে আর একজন পুরুষমানুষ পাকদণ্ডী দিয়ে আসছে আমাদের দিকেই।

ঋজুদাকে ইশারাতে দেখাতেই, ঋজুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রুদ্র সামনের ঝর্নাটায় লুকিয়ে পড়।

বলতে না বলতেই, আমরা দুজন তাড়াতাড়ি ঝর্নাটাতে নেমে বালির মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম, পাথরে পিঠ রেখে।

পুরুষ আর মেয়েটি কথা বলতে বলতে এদিকে আসছিল। কিন্তু তখনও বেশ দূরে ছিল।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, গলা ছেড়ে একটা গান ধরত রুদ্র।

গান ? আমি চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ, গান।

ধমকে বললে, কেউ গাইতে পারে না। তবুও ফিসফিস করে বললাম, রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

না। হিন্দী সিনেমার গান। এরা কি শান্তিনিকেতনে পড়েছে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে দৌড়ে আসবে ?

তারপর বলল, হিন্দী গান! সিনেমার গান!

আমি আশ্চর্য হয়ে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গান না-শুরু করায় ঋজুদা আমার মুখের উপর নীরব বিরক্তির নায়েগ্রা ফল্‌স ঢেলে দিয়েই হঠাৎ ভূমিকম্পর মত, গলা ছেড়ে গান ধরল :

> রে মাম্মা, রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ-
> রে মাম্মা, রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ,
> হাম্ ত' গ্যায়ে বাজার সে লানেকা লাট্টু
> লাট্টু ফাট্টু কুছ্ না মিলে, পিছে পড়ে টাট্টু।
> রে মাম্মা রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ...
> রে মাম্মা রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ...।

ঋজুদা মুখ হাঁ-করে গান গাইছিল, আমিও হাঁ-করে ঋজুদার দিকে চেয়ে ছিলাম। ঋজুদা কিন্তু চেয়ে ছিল ঝর্নার অন্য পারে। যেদিকে যে-কোনো মুহূর্তে ঋজুদার গানে মুগ্ধ-হওয়া কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাবে বলে আশা করছিল বোধহয় নিজে।

হঠাৎ গান থামিয়ে ফিসফিস করে বলল, যখন লোকদুটো আসবে, ওদের সঙ্গে আমি কথা বলব। তুই ততক্ষণে উঠে ওদের কাছে গিয়ে, যেন এমনিই উঠে চলে যাচ্ছিস, এমন ভাবে ওদের ভাল করে দেখবি কাছ থেকে ভাল করে। ডিটেইলস্-এ দেখবি।

এইটুকু বলেই, ঋজুদা আবার গান ধরল, রে মাম্মা রে মাম্মা......।

অসহ্য। আমার পেটের রাবড়ি এমন গান শুনে এমনিতেই হজম হয়ে গেলো।

গান গেয়ে গেয়ে ঋজুদার গলা এবং তা শুনে আমার মাথা ধরে গেল কিন্তু কোনো

লোকই ঋজুদার সংগীত প্রতিভাতে মুগ্ধ হয়ে এদিকে এলো না।

মিনিট দশেক পর ঋজুদা আবার পাইপ ধরালো। পাইপ ধরিয়েই বলল, পাইপের এ্যাম্‌ফোরা তামাকের গন্ধই সব মাটি করে দিল, বুঝলি। বলে, একমুঠো বালি নিয়ে কিছুটা তুলে ছেড়ে দিয়ে দেখলো হাওয়া কোন্‌দিকে। তারপর বালি কোনদিকে উড়ছে দেখে নিয়ে বলল, দেখলি। লুকিয়ে পড়া না-পড়াতে কোনোই তফাৎ হলো না। পাইপের গন্ধ, ওরা আগেই পেয়েছিল। তাই গান গেয়ে আমাদের ইনোসেন্স প্রমাণ করবার দরকার ছিলো না।

ঋজুদার এই যুক্তি আমার মাথায় ঢুকলো না। তাদের সঙ্গে কথাই যদি বলতে চায় তাহলে লুকিয়ে বা পড়লো কেন ? আর লুকোলই যদি তাহলে গানই বা গাইতে গেল কেন ? আর গান বলে গান ? গানের বাবা।

বললাম, লোকগুলো কারা ? ঋজুদা বলল, সেই ত' হচ্ছে কতা।

বললাম, তাহলে চলো আমরা তাড়াতাড়ি মালোয়াঁমহলে ফিরে যাই। বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপকে বলি যে, ওঁদের খুব বিপদ। নাচঘরে সাপ নেই, এক জোড়া মানুষ আছে।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, তুই এতদিন আমার জঙ্গলের চাম্‌চে ছিলি। এটা কিন্তু জঙ্গলের ব্যাপারই নয়। গোয়েন্দাগিরিতে তুইও যেমন কাঁচা, আমিও। শরীর ঠিক করতে এসে আমাদের এর মধ্যে জড়ানো কি ঠিক হবে নিজেদের ? না, কালকের দিনটা দেখেই কোলকাতা ফিরে যাব ? বল রুদ্র। হাজারীবাগে, গোপালের বাড়িতেও গিয়ে থাকতে পারি। চমৎকার ছবির মত বাড়ি—বর্‌হি রোডে—। এই অঞ্চলে থাকার জায়গার অভাব আমার নেই। বল্ কি করব ?

আমি বললাম, সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা। আমি আর কি বলব ?

ঋজুদা বলল, তোর কাছে খুচরো আছে ?

বললাম, পঞ্চাশ নয়া আছে একটা।

টস্ কর।

আমি অনেক উঁচুতে টস্ করে দিলাম কয়েনটাকে। ঋজুদা বলল, হেড হলে চলে যাব, টেল্ হলে থাকব। বলতে-বলতেই, পঞ্চাশ নয়াটা বালিতে পড়ল, নরম একটা থপাস্ শব্দ করে।

আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, টেল।

আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঋজুদাকে চিন্তিত দেখাল।

আমি আবার বললাম, সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা।

ঋজুদা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কথা না বলে।

আমরা যখন মালোয়াঁমহলে পৌঁছলাম, তখন ভানুপ্রতাপের সঙ্গে বসবার ঘরেই দেখা হল। আমাকে বললেন, কোথায় গেছিলে ? আমরা গাড়ি করেই না-হয় যেতাম কোথাও।

আমি বললাম, আমরা ত' এখানে খেতে, হাঁটতে আর ঘুমোতেই এসেছি।

ভানুপ্রতাপ বললেন, কোনদিকে গেছিলে তোমরা ? কতদূর ?

আমি উত্তর দেবার আগেই ঋজুদা হালকা গলায় বলল, কাছাকাছি গিয়ে একটা সুন্দর ছায়া-ঘেরা নালা দেখে আমরা বালিতে লম্বা হয়ে শুয়ে গলা সাধছিলাম। আধ-শোয়া অবস্থায় ছায়ায় বসে, জমিয়ে পাইপও খেলাম আমি। বড় সুন্দর পরিবেশ তোমাদের

মুলিমালোয়াঁ।

কথার উত্তর না দিয়ে ভানুপ্রতাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঋজুদার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা কি মহলের পিছনে নাচঘরের দিকে গেছিলেন ? ওদিকে যাবেন না কখনও।

আমি বললাম, কেন বলুন ত' ?

ভানুপ্রতাপ রুক্ষ গলায় বললেন, মানা করছি, যাবেন না। মেহ্‌মানরা কথা না শুনলে ত' মুশকিল।

বলেই ডাকলেন, ছোটু।

ছোটু এসে হাজির হল যেন মাটি ফুঁড়ে।

ভানুপ্রতাপ বললেন, তুমি এখন থেকে সব সময় এঁদের সঙ্গে থাকবে। এ জায়গা ওঁদের চেনা নয়। বিপদ-আপদ হতে পারে। কখনও তুমি ওঁদের একা ছাড়বে না।

ভানুপ্রতাপের স্বভাবটা বড় রুক্ষ। মামার ঠিক উল্টো। ঋজুদা ওর কথার ধরনে রেগে উঠল। মুখটা থমথম করতে লাগল। আমিই রেগে গেলাম, আর ঋজুদা ! আফ্রিকার ওয়াণ্ডারাবোদের দেশ থেকে ঘুরে এলাম, আর মুলিমালোয়াঁতে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে এ ! আমি কি দুধের শিশু ?

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে ভানুপ্রতাপকে শুধোল, মামাবাবু কোথায় ?

বেরিয়েছেন। খানার সময়ে ঠিক ফিরে আসবেন। আপনারা কিছু খাবেন ?

নিম্বুপানি, জিরাপানি বা লস্‌সি-টস্‌সি ? আমপোড়া শরবত খাবেন ?

ঋজুদা বলল, আমি কিছু খাবো না, রুদ্রকে কিছু খাওয়াও। আমি একটু ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছি।

ঠিক আছে। বলেই, ভানুপ্রতাপ দু' হাতে তালি বাজালেন।

একজন বেয়ারা দৌড়ে এল। ভানুপ্রতাপ বললেন, লস্‌সি। সাব্‌কা লিয়ে।

বেয়ারা চলে যেতেই টানাপাখার নীচে বসে ভানুপ্রতাপ বললেন, জেনারেটরের অর্ডার দিয়েছিলাম আমি। তাহলে আলো পাখা এয়ার কন্ডিশানার ফ্রিজ সবই রাখা যেত এখানে, মামা আমার বড় কৃপণ। বলল, টানাপাখা বিনি পয়সায় টানে প্রজারা। জেনারেটরের পয়সা বরবাদী হবে। তাছাড়া তুই আর কতদিন থাকিস এখানে।

তারপর বললেন, জেনারেটরে অবশ্য ভটর্ ভটর্ আওয়াজও হয়। বিহারে ডিজেলেরও ক্রাইসীস্।

যাকগে, মামা যা ভাল বোঝেন করবেন।

যারা পাখা টানে, তারা মায়না পায় না ? আমি শুধোলাম।

মায়না দিলে ত' পাবে। খেতে পায় শুধু। অড়হড়ের ডাল আর রোটি। প্রজারা এখনও হল স্লেভ্-এর মত। মামার এখনও তাই ধারণা। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যা পারি দিই। প্রত্যেক ঘরের জন্যে চারজন লোক। বারো ঘণ্টা করে ডিউটি। আমরা ঘুমুবো, ওরা পাখা টানবে বাইরে গরমে বসে। ইন্‌হিউম্যান। অথচ মামা যা কিছু করেন আমারই জন্যে। আমারই জন্যে সব সঞ্চয়।

আমি বললাম, আপনার মায়ের কি অসুখ হয়েছিল ?

জানি না। ডাক্তার ডাকার সময় পেলেন কোথায় মামা ? হার্টফেল্। আমি ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন মা একটা ফোটো হয়ে গেছেন। কি সব জরুরী কাগজপত্র সই-সাবুদ করতে উজ্জানপুর থেকে মামার জরুরী চিঠি পেয়ে এখানে আসতে হল মাকে।

আপনার বাবার কোনো ভাই-টাই নেই ?

কেউই নেই। বাবা, ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে ছিলেন। আমিও বাবার একমাত্র ছেলে। মামা আর মা ছিলেন দাদুর দুই সন্তান। এখন শুধু মামা।

বাবা মারা গেলেন কোথায় ?

—এই মুলিমালোয়াঁতেই। কাল আমরা যে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে গীমারিয়া গেলাম—ঐ রাস্তাতেই ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় ঘোড়া থেকে হঠাৎ পড়ে মারা যান বাবা। বাবার খুব ঘোড়ার শখ ছিল। কোলকাতার টার্ফ ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরেরও। রেসিং সীজনে কোলকাতা আর ব্যাঙ্গালোরেই থাকতেন।

এমন সময়ে দরজার আড়ালে যেন কার ছায়া সরে গেল। আমার সন্দেহ হওয়াতে গলায় ইচ্ছে করে কাশি তুলে আসছি বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি। দরজার কাছে পৌঁছতেই দেখি, ছোট্টু, ভানুপ্রতাপের খাস বেয়ারা আমাকে দেখেই সরে গেল। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, ব্রিজনন্দনকেই দেখতে পাবো। লোকটাকে আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। প্রথম দর্শনেই।

ফিরে এসে বললাম, ঐ ব্রিজনন্দন লোকটা কে ? আপনাদের বাবার জমিদারীর পুরনো লোক ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, আরে না না। সেখানেও ত' সব চোরের আড্ডা। মামাবাবুর জানা, বিশ্বস্ত লোক। মাইকা মাইনের সর্দার ছিল। ওর বাড়ী মীর্জাপুরে—উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুরে। ব্রিজনন্দনকে বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মামা উজ্জানপুরে পাঠিয়েছিলেন। লোকটা খুব কাজের লোক। ঐ ত' সব দেখাশুনো করে আমাদের জমিদারীর।

তারপর পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে আরেক ঢোঁকের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট খেল। খেয়ে বলল, তবে......

আমি বললাম, তবে কি ?

ভানুপ্রতাপ এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, ঐ ব্রিজনন্দন লোকটা খুব অপয়া।

কেন ? আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম।

অপয়া এইজন্যে বলছি যে, ও এখানে এলেই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। বাবার এবং মায়ের মৃত্যুরও একদিন আগে, ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল। আরেকবার এসেছিল, মা বেঁচে থাকতে। সেবার ও আসার পরের দিন মামাবাবুর এমন অসুখ হল—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরীয়া—যে মামাবাবুকে বাঁচিয়ে তোলাই মুশকিল ছিল। কানেও প্রায় কালা হয়ে গেছিলেন। সেইজন্যেই বলি যে, লোকটা মান হুস্।

মান হুস্ মানে কি ? আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করলাম।

সরী। বললেন ভানুপ্রতাপ। আই মীন আন্‌লাকি। যেমন শিকারে বেরিয়ে পথে যদি প্রথমেই লুমরী দেখে এখানের শিকারীরা, তাহলে ধরেই নেন যে, সেদিন অযাত্রা।

লুমরী কি ?

সরী। লুমরী মানে খ্যাঁকশিয়াল ; ফক্স্।

ওঃ ! আমি বললাম।

ভানুপ্রতাপ বললেন, তোমরা মেহমান। কালকে অ্যাল্‌বিনো বাঘটা তোমারই মারো, এই মামার ইচ্ছা ; আমারও ইচ্ছা। হাজারীবাগের শিকারীরা খবর পেলে ভীড় লাগিয়ে দেবে। তবে এই এলাকাতে কায়দা করা শক্ত। রাতে জীপ নিয়ে এসে স্পট লাইটে মেরে নিয়ে যান ত' অন্য কথা। দিনের বেলা এই এলাকাতে যেই-ই ঢুকুন না কেন, কারোই

সাহস হবে না একটাও গুলি ছুঁড়তে। আমাদের লোকেরা তাহলে গুলিতে তাঁদের ভেজে দেবে।

হাজারীবাগে বুঝি ভাল ভাল শিকারী আছেন ? আমি শুধোলাম।

বাঃ নেই। বিজয় সেন ছিলেন সবচেয়ে নামকরা। তারপরের আমলে টুটু ইমাম্। টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক্। গোপাল সেন, বদিবাবু টুটু—ইমামের ছেলে বুলু ইমাম। শিকারীর অভাব কি ? অ্যাল্‌বিনোটা তোমরা চুপচাপ মেরে নিয়ে চলে যাও ত'। সব শিকারীরাই হচ্ছে মেয়েদের মতন জেলাস্। শিকারী হিসেবে আমি-তুমিও তাই, স্বীকার করি আর নাই করি। অবশ্য তোমাদের দিয়ে মারাবেন বলেই হয়ত মামা আর কাউকে জানাননি। আমার সম্বন্ধে অবশ্য মামাবাবুর কোনো জেলাসী নেই। আমার কারণে আমার ভালোর জন্যে, মামাবাবু নিজের খুনও দিতে পারেন। কিন্তু মামাবাবুর অনেক শত্রু হয়ে গেছে। ওঁর জন্যে বড়ই চিন্তা হয় আজকাল। বন-জঙ্গলের জায়গা। কখন কে যে মেরে দেয় ওঁকে, তার ঠিক কি ? বলি, সব সময় বডিগার্ড নিয়ে যাওয়া-আসা করতে, তা কখনও কি শোনেন কথা ? বলেন, আমার বজরঙ্গবলী আছেন।

বোধহয় আমাদের দেরী দেখেই ঋজুদা উপর থেকে নেমে এল। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে। এই পোশাকেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আজ দিবানিদ্রা দেবে বলে মনে হল।

ঋজুদা নামতে-না-নামতেই বাইরের পোর্টিকোতেও গাড়ি ঢোকার আওয়াজ হলো। একটা কালো রঙের ব্যুইক্। ডিজেল এঞ্জিন বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ করছিল ডিজেলের এঞ্জিন।

হাসতে হাসতে ঢুকলেন বিষেণদেওবাবু। বললেন, কি ? বেড়ানো হল ? রুরুদ্দরবাবু ?

আমি মাথা নোওয়ালাম। টস্-এ যখন টেলই উঠেছে তখন আমা-হেন বোকার কথাবার্তা কম বলাই ভালো।

ঋজুদা বললেন, গেছিলেন কোথায় ?

এই একটু হাজারীবাগে।

হাজারীবাগ ? কেন ?

আরে কালকে ত' অ্যাল্‌বিনো টাইগার মারা পড়বে। এদিকে কাউকে না পারছি বলতে, না-পারছি চাপতে। তাইই সকলকে এমনিই নেমন্তন্ন করে এলাম শনিবার রাতে খাওয়ার জন্যে।

সকলকে মানে ?

বদিবাবুকে, গোপালবাবুকে, পদ্মার রাজা, গোন্দার রাজা, হাজারীবাগের ডি. সি. এস-পি কনসার্ভেটর সাহেব, ডি. এফ-ও সাহেব, সকলকে। আপনার নাম করে। সকলেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। সেউ উপলক্ষে আসবেন। খেয়েও যাবেন।

বদিবাবুকে চেনেন ত' ? সেই যে কাতরাসের কলিয়ারীর মালিক। ইট্‌খোরি পিতিজ-এ জঙ্গলে ত' ওঁর রীতিমত বাড়িঘরই ছিল এক সময়। ও জঙ্গলেও একটা অ্যাল্‌বিনো জুটেছিল একবার, বহু বছর আগে। সেই বাঘ মারার জন্যে জবরদস্ত শৌখীন বদিবাবু কমপক্ষে তখনকার বাজারেও কিছু-না-কিছু এক লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। হাঁ আপনারা বাঙালীরা, পয়সা হলে, খরচা ভি করেন বোটে। দিল্ আছে বোটে।

ভানুপ্রতাপ টিপ্পনী কাটলেন। বললেন, মামা তাহলে আমি ত' বাঙালীই হচ্ছি। ওর কথাতে সকলেই হেসে ফেললাম আমরা।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে অনেকখানি ধুঁয়ো ছাড়ল। তারপর বলল, শনিবার রাতে খেতে বললেন সকলকে। বাঘ কি আর পোষা জানোয়ার যে মারা পড়বেই ? তাছাড়া......

বাঘের সঙ্গে কি সম্পর্ক ! অ্যাল্‌বিনো ত' একটা অ্যালিবাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই ডাকলাম সকলকে। আলাপ করতে আসবেন এত মাইল জঙ্গলের রাস্তায়, ত' খেয়েও যাবেন। এই আর কি ? আপনার মত নামী লোক আমার মেহেমান হয়েছেন আর আপনার সঙ্গে সকলকে মিলিয়ে দেবো না ?

বলেই, বললেন, আপনার তামাকের গন্ধটা বেশ ভাল ত ? কি তামাক এটা ?

এ্যাম্‌ফোরা।

দিশী।

ঋজুদা বললে, আমি দিশী জিনিসই পছন্দ করি, তবে এটা আমাকে দিয়েছে একজন। এটা ডাচ্ তামাক।

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, কাল ছুলোয়া আরম্ভ করবেন কখন ?

এক্কেবারে ভোরে। আমরা বেরোব বাড়ি থেকে পাঁচটাতে। তিনশ বীটার ছুলোয়া করবে। ভানুরই সব বন্দোবস্ত। আমাদের চারটে মাচা—স্টপারদের মাচা আজ সবই বাঁধা হয়ে গেছে। আপনারা কি পা মুড়ে বসবেন মাচাতে ? না ফোল্ডিং-চেয়ার নেবো ? মাচার উপরে ডান্‌লোপিলো পাতা থাকবে যদিও।

ঋজুদা বলল, অ্যাল্‌বিনো বাঘটা বেরোলেই হল, তাকে আপনি কাঁটার উপরেই বসতে দিন আর উল্টো করে চৌপাই বেঁধে তার উপরেই বসান। তাতে কিছুই এসে যায় না।

একজন বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল, খাবার লাগাবে কী না।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার দিকে তাকালেন।

ঋজুদা দেওয়ালের বিরাট সুইস্ কুক্কু-ক্লকের দিকে চেয়ে বলল, পৌনে দুটো। হ্যাঁ। খাওয়া যেতে পারে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, পাঁচ মিনিটে জামা-কাপড় ছেড়ে আসছি আমি। তারপর বেয়ারাদের ইশারাতে বলে দিলেন খানা লাগাতে।

ঋজুদা ভানুপ্রতাপের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ভানুপ্রতাপ অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল, আমায় কিছু বলবেন ?

না। ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল।

ও-ও-ও...। বলল ভানুপ্রতাপ।

বিষেণদেওবাবু জামা-কাপড় ছেড়ে এসে বললেন, চলো রুদ্দর্‌বাবু। খাসীর প্রতি একটু সম্মান দেখানো যাক।

কি বলব, ভেবে না পেয়ে বোকার মত বলে ফেললাম, চলুন।

ঋজুদা বলল, বলিস কি রে রুদ্র ? কাক ত' কাকের মাংস খায় না বলেই জানতাম এতদিন।

হো হো করে সকলে হেসে উঠল। আমার দু' কান গরম হয়ে লাল হয়ে উঠল।

ঋজুদাটা বড় অকৃতজ্ঞ। প্রাণে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলাম কিলালার হাত থেকে। আর এই কী-না কৃতজ্ঞতাবোধ !

এক্কেবারে যা-তা !

বিষেণদেওবাবু বললেন, এখন আর কী রহিমী, আর কী খাওয়া-দাওয়া। উও জমানা চলা গ্যয়ে, যব খলীল খাঁ ফাক্‌তা উড়হাতে থে।

॥ ৫ ॥

খাওয়া-দাওয়ার পর ঋজুদা আমার ঘরে এল।

আমি বললাম, ঐ কথাটার মানে কি ঋজুদা?

কোন্ কথাটা?

ঐ যে, উও জমানা চলা গ্যয়ে, যব খলীল খাঁ ফাক্তা উড়হাতে থে!

ঋজুদা হেসে উঠল।

বলল, বুঝলি না! এর মানে হচ্ছে, খলীল খাঁয়েরা যখন পায়রা ওড়াতেন তখনকার দিন আজ আর নেই।

খলীল খাঁ কে?

আরে মুশকিল! এ ত' একটা চল্তি কথা। বিহারে এরা বলে, কাহাবৎ।

আমরা যেমন বলি : লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। খলীল খাঁও ঐ রকমই, গৌরী সেনের মত। আসলে আগেকার দিনে ত' অনেকেরই বড়লোকী ছিল ফালানা-ঢাম্কানা, নাচনা-গানা, বহুতই খেল্-তামাশা। সেই কথাই বলছিলেন বিষেণদেওবাবু।

তারপর বিষেণদেওবাবুর দেওয়া বড় এলাচ চিবোতে চিবোতে ঋজুদা বলল, তুই যে গ্রীনার বন্দুকটা বাছলি, মাচায় বসে অত লম্বা ব্যারেল ঘোরাতে ফেরাতে অসুবিধা হবে না তোর?

বললাম, তোমার অ্যাল্‌বিনো একবার চেহারাখানা দেখাকই না। তারপর তোমার নাম করে ঠুকে দেব নৈবেদ্য। ঠিক পট্‌কে দেবো। দেখো।

ঋজুদা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল গম্ভীর হয়ে। বলল, বাঘ বাঘই। একমাত্র বোকারাই বাঘ নিয়ে ছেলেখেলা করে। তারপর জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের নাচঘরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে।

কী যেন ভাবছিল ঋজুদা। কোথায় যেন চলে গেছিল। অনেক দূরে। আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অনেকক্ষণ পর, ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ঘোর কাটিয়ে বলল, রুদ্র, তুই এবারে কি কি জিনিস এনেছিস তোর সঙ্গে?

আমি অবাক হলাম। বললাম, এই জামা-কাপড় টুকিটাকি!

না! কি কি জিনিস এনেছিস সব আমাকে বল এক এক করে। দরকার আছে।

আমি আরও অবাক হলাম।

ভেবে ভেবে বলতে লাগলাম, জিনের ট্রাউজার দুটো, জাঙ্গিয়া, মো......

জামা-কাপড় জুতোটুতো ছাড়া কি এনেছিস?

পায়জামার দড়িতে গিঁট পড়ে গেছিল, তাড়াতাড়িতে খুলছিল না, আসবার সময় তাই মাকে না বলেই মায়ের কাঁচিটা নিয়ে চলে এসেছি। সেলাই কলের ড্রয়ারে থাকে। ফিরে গেলে হবে আমার উপর এক চোট।

গুড়। ঋজুদা বলল। ভেরী গুড়।

আমার উপরে মাযদি এক চোট নেন তাতে ঋজুদার গুড় ভেরী গুড় বলার কি আছে বুঝতে পারলাম না।

ঋজুদা আবার ক্রমশ দুর্বোধ্য হতে শুরু করেছে। এর পর একেবারে চাইনীজ ডিকশ্‌নারী হয়ে যাবে বুঝতেই পারছি।

বলল, কি হল ? থামলি কেন ? বলে যা আর কি কি এনেছিস !

আর, আর, আর...আমি ভাবতে লাগলাম...তারপর হঠাৎ মনে হতেই বললাম, আমার ক্যামেরাটা। বড় মামা, পরীক্ষা ভাল করে পাশ করাতে প্রেজেন্ট করেছিল—মোটে এক রীল ছবি তুলেছিলাম কোলকাতায়। তাইই নিয়ে এসেছি হাত পাকাবার জন্যে এখানে।

ফাইন। ঋজুদা বলল। ফিল্ম ভরে এনেছিস ত' ?

হ্যাঁ। ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইট ভরা আছে। কালার্ড ফিল্মও এনেছি।

কত স্পীডের ?

টু হান্ড্রেড এ এস এ।

ফাইন। কালার্ড ফিল্মটা কাজে লাগবে বাঘের ছবি তুলতে। বন্দুক নিয়ে তুই বাঘের সামনে দাঁড়াস নীল জিন্‌স আর লাল গেঞ্জী পরে—আমি তোর ছবি তুলে দেব।

চোখের সামনে যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম, বিরাট সাদা বাঘটা পড়ে আছে আমার পায়ের সামনে। আর আমি বন্দুক হাতে মৃদু মৃদু হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবনা, ভাবনাই। ভাবনা ত' আর দেখানো যায় না।

পরক্ষণেই ঋজুদা বলল, আর কি এনেছিস মনে করে বল ? টর্চ, ছুরি, ভোজালি ?...

আমি বললাম, নাঃ। তারপরেই মনে হল টেপ রেকর্ডারের কথাটা। বণি এম, আব্বা-গ্রুপ, বী-জীস এবং দ্যা পোলিস-এর ক্যাসেট আর পাঁচমিশেলী বাংলা গানের দুটি ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলাম। দিশী টেপরেকর্ডার কিন্তু।

দিশী জিনিস কি খারাপ ? ফোরেন জিনিসের প্রতি আমার দুর্বলতা নেই কোনো। দু-একটা জিনিস ছাড়া, যেমন বন্দুক ইত্যাদি, পাইপের টোব্যাকো...

ঋজুদা যেন বিশেষ উৎফুল্ল হল। বলল, ফারস্ট ক্লাস।

শুনবে নাকি গান ? আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, একদম না। তোর এ সব বিজাতীয় চিৎকার ?

আর শোন, বলেই গলা নামিয়ে বলল, বিষেণদেওবাবু গোলমাল পছন্দ করেন না। এখানে টেপ বাজাস না একবারও। বরং কালকে বীটিং-এর পুরো আওয়াজটা টেপ করে নিবি। দারুণ হবে। বীটারদের চিৎকার, স্টপারদের আওয়াজ, তারপর বীটিং-এ তাড়া-খাওয়া পাখি আর জানোয়ারদের চলাচলের এবং গলার আওয়াজ। তোর বন্ধুরা দারুণ ইমপ্রেসড হয়ে যাবে। কত্তদিন থেকে শখ আমাদের দেশের জঙ্গলকে সেন্ট্রাল-সেম করে একটা ভালো ছবি করব। কিন্তু কে দেবে টাকা ?

বলেই বলল, মাঝে, মেট্রোতে, নুন-শোতে কস্তুরী বলে একটা ছবি এসেছিল। দেখেছিলি ?

বড়দের বই ? আমি বললাম।

ঋজুদা রেগে গিয়ে বলল, তুই এখন যথেষ্টই বড় হয়েছিস। আর ন্যাকামি করিস না। তোর মা যদি এখনও তোকে ছোট্ট ছেলেটি ভাবে ত' আমি এবার গিয়ে কথা বলব সীরিয়াসলী। তুই এই ছবিটা দেখবি কখনও সুযোগ পেলে।

কোন্‌ ছবিটা ? নামই ত' বললে না।

ওঃ। কস্তুরী। বিমল দত্তর ছবি। তাঁরই লেখা স্ক্রিপ্ট, তাঁরই ডিরেকশান। অসাধারণ ছবি। মধ্যপ্রদেশের বস্তারের পটভূমিতে একটি কাল্পনিক পাখিকে নিয়ে গল্প। এরকম লেখা আগে যে কেন কেউ লিখতে পারেননি ; ভাবি তাই।

ছবিটি বোধহয় ঋজুদাকে ভীষণই নাড়া দিয়েছে। ছবিটির কথা মনে পড়ায় অনেকক্ষণ

চুপ করে বসে থাকল ঋজুদা।

তারপর হঠাৎ বলল, তোর কাঁচিটায় কেমন ধার ?

কেন ? নখ কাটবে ? ও যে বিরাট কাঁচি। বললাম না, মার সেলাই-কলের ড্রয়ারে থাকে।

নখ কেন ? কারো নাকও ত' কাটতে পারি। তোর নাকও কাটা যায়। কাঁচিটা বের কর ত' দেখি।

কাঁচিটা বের করে বললাম, দাঁড়াও। আগে যে জন্যে এটাকে আনা সেই কাজটা সেরে ফেলি—পায়জামার দড়িটা......

হঠাৎ দরজার কাছে কার যেন গলার শব্দ শোনা গেল।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি কাঁচিটা বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল।

আমি অবাক হলাম ঋজুদাকে লক্ষ করে।

দরজার পাশ থেকে গলা খাঁকারি দিল কোনো লোক। জানান দিল যে, সে এসেছে।

ঋজুদা বলল, কওন ?

ব্রিজনন্দন হুজৌর।

ব্রিজনন্দন ? আমার ভুরু কুঁচকে উঠল।

ঋজুদা কোমরে বাঁধা পিস্তলের হোলস্টারের বোতামটা পাঞ্জাবীর তলায় হাত চালিয়ে খুলে দিল। তারপর হাত সরিয়ে এনে আমার বিছানাতে যেমন বসে ছিল, তেমনই বসে বুকের কাছে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বলল, আইয়ে, পাধারিয়ে। অন্দর আইয়ে।

ব্রিজনন্দন ভিতরে এল। বাইরে তার নাগরা খুলে রেখে।

ঋজুদা বলল, কা সমাচার ? কুছ বোলনা চাহ্‌তা হ্যায় আপ।

জী হাঁ। খ্যয়ের...বলে একবার কাশল।

এমন সময় নীচের হলঘর থেকে ভানুপ্রতাপের চিৎকার ভেসে এল ব্রিজনন্দন—ব্রি-জ-ন-ন্দ-ন কা আভ্‌ভি বোলাও। গায়া কাঁহা উল্লু ?

ব্রিজনন্দন তাড়াতাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে নাগরা পায়ে গলিয়ে নীচে নেমে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ম্যায় ফির আউঙ্গা।

ঋজুদা চলে-যাওয়া ব্রিজনন্দনের দিকে চেয়ে থেকে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর নিজের মনেই বলল, পইলে দর্শনধারী, পিছলে গুণবিচারী।

মানে ? আমি শুধোলাম।

মানে, প্রথমে মানুষের চেহারাটা অন্য মানুষের চোখে পড়ে। গুণাগুণের বিচার আসে অনেক পরে।

হঠাৎ। এ-কথা ?

এমনিই, মনে হল !

তারপর বলল, ভানুপ্রতাপ ছেলেটাকে ওর মামা একেবারে বকিয়ে দিয়েছে। কি অসভ্যর মত ওর তিন গুণ-বয়সী লোকটাকে উল্লু-ভাল্লু করে ডাকছে শুনলি ? চেঞ্জে এসে যে উল্লু-ভাল্লু-অ্যাল্‌বিনোর রাজত্বে পড়ব তা কি করে জানব আগে ?

আমি বললাম, ঋজুদা, কাঁচিটা !

ওঃ। বলেই কাঁচিটা বের করে আমার বাঁ-পা-টা গোড়ালীর কাছে ধরে সাধের জিনের ট্রাউজারটার গোড়ালীর কাছ থেকে খচ্‌ খচ্‌ করে ইঞ্চি দুয়েক কেটে দিল।

আমি, এ কি ! এ কি ! করে উঠতেই ঋজুদা বলল, এইটেই স্টাইল। আজকাল আস্ত

জিনস্ কেউ পরে না।

আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল।

বললাম, নয়না মাসী দিয়েছিল আমাকে।

তবে ত' নিঃসন্দেহে বস্তাপচা থার্ডরেট জিনিস দিয়েছে। নয়নামাসী ত' বড়লোক। বলিস আরেকটা কিনে দেবে।

তারপরই বলল, কাঁচিটা দিয়ে তোর মা কি কাটে রে ? ত্রিপল-টিপল কাটে নাকি ? এত মোটা জিন্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কেটে গেল। তাঁবু সেলাই করছেন নাকি তোর মা আজকাল সেলাই-কলে ?

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। আমি চুপ করেই রইলাম। ঋজুদা বলল, তোর পায়জামা ইমিডিয়েটলী মেরামত করে নিয়ে কাঁচিটা দিয়ে দে। ওটাকে আমি কনফিস্কেট করলাম। এরকম কাঁচি সঙ্গে নিয়ে যারা ঘোরে তারা আনডাউটেড্‌লী গাঁট-কাটা।

আমি পায়জামার গিঁট কেটে কাঁচিটাকে ফেরত দিলাম ঋজুদাকে। সঙ্গে সঙ্গে হালকা-সবুজ খদ্দরের পাঞ্জাবীর বিরাট পকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েই বলল, রুদ্র, ঠিক চারটেতে তৈরী হয়ে থাকবি। আমরা একটু বেরুব।

কোথায় ?

গাড়িতে জল-মবিল, ব্যাটারীর জল সব চেক করে রেখেছিস ? স্টার্ট করেছিলি সকালে ?

হ্যাঁ, আমি বললাম।

বলেই, বললাম, কোথায় ?

যাব কোথাও একটা। ক্যামেরাটা সঙ্গে নিবি।

বলে, আমাকে পুরো সাস্‌পেন্সে রেখে ধীরে সুস্থে চটি ফটর্ ফটর্ পাইপ ভুসভুস আর পায়জামা পাঞ্জাবীতে খস্‌খস্ শব্দ তুলে ঋজুদা আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি কোলবালিশেত উপর মাথা রেখে শুলাম, একটু ঘুমোব না প্রতিজ্ঞা করে।

একটু পরেই আমার অজানিতে চোখ বন্ধ হয়ে এলো। চোখের সামনের অন্ধকারের মধ্যে একবার করে একটা মস্ত সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা খাসী এসে দাঁড়িয়ে শিং নাড়তে লাগল আর তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তৈরী মুখরোচক খাবারগুলোর নাম মনে করাতে লাগল। কৌরি, চাঁব, পায়া, কবুরা, কলিজা, সিনা এবং মগজ। পরশুরামের লম্বকর্ণর সাদা সংস্করণ আমার চোখের সামনে এত জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল যে মনে হল তার শিং দুটো আমার মগজ ফুটো করে দেবে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তারপর খাসীটা বলছে যে আমার মগজ খায়, সে আমার মগজ পায়। যে আমার মগজ খায়, সে আমার মগজ পায়। ঘুমের মধ্যেই প্রবল আপত্তি করতে লাগলাম তার খাসী-সুলভ এই কথায়, এমন সময় আমার কানে টান পড়ল। কানটাও কি লম্বকর্ণর হয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ঋজুদা !

বলল, ইডিয়ট্। ক'টা বেজেছে ?

লাফিয়ে উঠে দেখি চারটে বেজেছে ঠিক ঘড়িতে।

ঋজুদা বলল, গাড়ির চাবি।

সমস্ত মালোয়াঁমহলে ঘুম নেমেছে। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। দিবানিদ্রা ছেয়ে ফেলেছে পুরো বাড়িটা। এমনকি বিরাট বসবার ঘরের দেওয়ালে কোনায়-কোনায় যে

অসংখ্য বাঘ ভাল্লুক শম্বর নীলগাই বাইসন স্টাক করা রয়েছে তারাও মনে হলো ঘুমোচ্ছে।

আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ঋজুদা বলল, গীমারীয়ার রাস্তা।

গাড়িটা যখন গেট পেরিয়ে বাইরে এল তখন প্রকাণ্ড ফটকের সামনে দাঁড়ানো দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান ছাড়া আর কেউই জানলো না যে, আমরা বেরিয়ে এলাম।

দুপুরেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গীমারীয়ার রাস্তাতে মাইল তিনেক যেতেই ঋজুদা বলল, সামনে এক ফার্লং গিয়েই বাঁদিকে একটা ফরেস্ট রোড পাবি। তাতে ঢুকে যাবি। মাইল খানেক গিয়ে একটা পাহাড়ী নদী পাবি। তার উপর কজওয়ে আছে একটা। কজওয়ের পাশে গাড়ি থামিয়ে কাঁচ তুলে গাড়ি লক্ করে দিবি।

দেখতে দেখতে জায়গাটাতে পৌঁছে গেলাম। হাবভাব দেখে মনে হল এই জঙ্গল ঋজুদার নখদর্পণে। গাড়ি থেকে নেমে, পায়জামা পাঞ্জাবী পরে হাওয়াই চটি পরে ফটর ফটর খসর খসর করতে করতে ঋজুদা নদীর বুক ধরে জঙ্গলের ভিতরের দিকে এগোতে লাগল। নদীর বালিতে চোখ রেখে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার ?

ঋজুদা বলল, এদিকে আর নদী নেই। এই নদীতে বাঘের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কারণ এ নদী না পেরিয়ে বাঘের উপায় নেই। আর এই নদী-বরাবরই মাচা বাঁধা হয়েছে কালকের শিকারের। মাচাগুলো দেখা যাবে।

আমি বললাম, ঋজুদা। খালি হাতে! প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় বাঘটা ডাকাডাকি করে।

ঋজুদা বলল, সঙ্গে থ্রি-সেভেনটিন্ পিস্তল আছে। এত ডাকাডাকি করার পরও যদি সাড়া না দিস্ তাহলে কোলকাতার লোকদের অভদ্র ভাববে না ?

তারপর একটু গিয়ে বলল, তোর বুঝি ভয় করছে নিরস্ত্র বলে ? তাহলে এটা রাখ।

বলেই, পকেট থেকে কাঁচিটা বের করে আমাকে দিল।

আমি বললাম, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। সবসময় এরকম ভালো লাগে না। অতবড় বাঘ।

ঋজুদা বলল, বাঘ বড় হলেই যে ভয়টাও তার সাইজের হতে হবে এমন ত' জানা ছিল না। ভাল চেলাই জুটেছে আমার।

আমি চুপ করে রইলাম।

বালির উপরে চোখ রেখে একটু গিয়েই ঋজুদা থেমে গেল। বলল, দ্যাখ্ শম্বর। অনেকগুলো শম্বরের খুরের দাগ দেখলাম বালিতে। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে হনুমান ডাকছিল হুপ্হাপ্ করে। ডানদিকের জঙ্গল থেকে ময়ূর। আর একটু এগোতেই ডানদিক থেকে একটা বার্কি-ডিয়ার ব্বাক্ ব্বাক্ করে ডেকে উঠে সমস্ত জঙ্গলকে চমকে দিল।

আমি ঋজুদার পাঞ্জাবীর কোনা ধরে টেনে বললাম, নিশ্চয়ই বাঘ দেখেছে।

ঋজুদা পাঞ্জাবীটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, পাঞ্জাবী নিয়ে ফাজলামি করিস না। মোটে দুটো পাঞ্জাবী এনেছি।

আরো একটু গিয়ে একটা বুড়ো হায়নার থাবার দাগ দেখা গেল। তারপর মাচাগুলো চোখে পড়ল একের পর এক। একটা থেকে আরেকটা দেখা যায় না। নদীটা বাঁক নিয়ে এখানে অর্ধচন্দ্রাকারে বয়ে গেছে। শাল, পিয়াশাল, অর্জুন, গাম্হার, ক্ষয়ের, শিশু এসব জঙ্গলই বেশী। শিমুল আর হরজাই গাছও আছে কিছু। সবচেয়ে বেশী শাল। আর

সেগুন একেবারে নেই বললেই চলে।

প্রথম মাচাটার কাছে এসেই ঋজুদা থমকে দাঁড়াল। বলল, এ্যাই দ্যাখ।

বালিতে তাকিয়ে দেখলাম, উরে ব্বাবাঃ! বিরাট বড় একটা বাঘের পায়ের থাবার দাগ। নদীটার এপাশ থেকে ওপাশে গেছে। আবার ওপার থেকে এপাশে গেছে।

ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে দাগগুলো দেখতে লাগল মাথা নীচু করে। আমি কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে, বাঘ এলে, কাঁচি দিয়ে বাঘের গোঁফ কাটব না লেজ কাটব তাই ভাবতে লাগলাম। প্রত্যেকটা মাচার সামনেই বাঘ নদী পারাপার করেছে। দুপুরের বৃষ্টিতে দাগগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। ভেঙে গেছে, বালি সরে যাওয়াতে। ঋজুদা বলল, কতগুলো ছবি তুলে নে এই দাগের। বিভিন্ন দাগের।

শেষ মাচা অবধি গিয়ে আবার আমরা ফিরলাম।

শেষ মাচার সামনে এসে ঋজুদা আবারও নীচু হয়ে বসল।

আমাকে বলল, কি দেখছিস? দেখতে পাচ্ছিস কিছু?

আমার আর দেখার ইচ্ছা ছিলো না। পায়ে হেঁটে খালি-হাতে এত বড় বাঘের শ্রীচরণের ছাপ দেখার ইচ্ছেও নেই আমার।

আসলে যারা বনে-জঙ্গলে রাইফেল-বন্দুক নিয়ে ঘুরে অভ্যস্ত, তারা খালি হাতে বড়ই অসহায় বোধ করেন। কতখানি অসহায় যে বোধ করেন, তা যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।

ঋজুদাকে বললাম, দেখার কি আছে? বাঘ।

ঋজুদা উঠে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরালো।

বলল, বাঘ ত' ঠিকই আছে। বাঘ ত' বটেই। কিন্তু আর কিছু?

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বাঘের পায়ের দাগের আশেপাশে মানুষের জুতোর ছাপ। কোনো শিকারী বা ফরেস্ট-গার্ডের হবে।

বললাম, দেখলাম।

জুতোটা, কি জুতো বলতে পারিস?

বোধহয় বাটা কোম্পানীর এ্যাম্বাসাডর।

ইডিয়ট্। তাছাড়া এ্যাম্বাসাডর জুতো পরে কেউ জঙ্গলে আসে না। আসা উচিত নয় অন্তত।

—কি তবে?

—এ জুতো ডাক-ব্যাক-কোম্পানী তৈরী করে। জলে-কাদায় হাঁটবার জন্যে। ছবি তোল্।

জুতোর দাগের? বোকা বনে শুধোলাম আমি।

তাই-ই ত' বলছি। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, শোন্, আরও একটা কাজ করবি। বীটিং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুই তোর টেপ-রেকর্ডারটা চালিয়ে দিবি। একদিক শেষ হলে, রিওয়াইন্ড্ করে দিবি।

আমি বললাম, বাঃ, আমার সাধের গানগুলো।

ডেপোমি করিস না। ওগুলো ইরেজড হয়ে গেলে যাবে। কোলকাতায় গিয়ে আবার টেপ্ করে নিস্। যা বললাম, তা করতে ভুল না হয় যেন।

গাড়িতে ফিরে এসে গাড়ি খুলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম আমরা। বেশ কিছুদূর আসার পর ঋজুদা গাড়িটা রাখতে বলল, তারপর আমাকেও নামতে বলে, জুতো খুলতে বলে নিজেও

চটি খুললো। দুটো শালের চারা উপড়ে নিয়ে আমাকে একটা দিয়ে নিজেও একটা নিল। তারপর নিজের হাতের শালের চারাটাকে ঝ্যাঁটার মত করে ব্যবহার করে গাড়ির চাকার দাগ মুছতে মুছতে নদীর দিকে যেতে লাগল। আমি একদিকের চাকার দাগ মুছছিলাম আর ঋজুদা অন্যদিকের। অতখানি রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে কোমর ধরে গেল। এদিকে অন্ধকারও হয়ে আসছিল। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছিল। বনের গভীর থেকে তিতির আর ছাতারের দল একই সঙ্গে চেঁচিয়ে মাথা গরম করে দিচ্ছিল আমাদের।

নদী অবধি গাড়ির চাকার দাগ মুছে ফেলে রাস্তা ছেড়ে রাস্তার পাশে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেটে-রাখা অগভীর নালা ধরে আমরা ফিরে এলাম ঋজুদার কথামত।

এই নালার মধ্যে প্রথম গরমে দু' পাশের পাতা পোড়ায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। আর বর্ষায় জল নিকাশ হয় এই নালা দিয়ে।

গাড়ির কাছে যখন পৌঁছে গেছি, ঋজুদা তখন বলল, গাড়িটাকে এখানে একবার ঘোরা।

কেন?

যা বলছি কর্ না। ধমক দিল ঋজুদা বিরক্তির সঙ্গে। তুই বড় বেশী বুঝছিস আজকাল।

গাড়িটাকে আবারও উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পরে আবার যেদিকে মুখ ছিল সেদিকে করলাম। এবার ঋজুদা বলল, সাবধানে চাকার দাগ এমন করে মুছে দে শালের চারা দিয়ে, যাতে মনে হয় যে, আমরা শুধু এই পর্যন্তই এসে বসে, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেছি।

যেমন বলল ঋজুদা, তেমনই করলাম।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, তোর কাছে ফেলে দিয়ে যাবার মত কিছু আছে?

মানে?

এই রুমাল-টুমাল। চকোলেট আনিসনি সঙ্গে।

এই গোলমেলে কথাবার্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সবেধন মাত্র রুমালটি বের করলাম। ঋজুদা ছুঁড়ে ফেলে দিল সেন্ট-মাখানো রুমালটাকে রাস্তার পাশের মস্ত একটা শিমুল গাছের গোড়াতে। তারপর আমাকে বলল, চল, ওখানে গিয়ে বসি। ঐ গাছের গোড়ায়। আচ্ছা কি চমৎকার শিমুলটা দেখেছিস। কিরকম ঋজু, সটান চেহারা। আমার ঠাকুর্দা নাকি আমাদের দেশের বাড়ির বাগানের একটা শিমুলগাছের দিকে চেয়েই আমার নাম দিয়েছিলেন ঋজু।

আমি বললাম, শুধু শিমুলই ঋজু হতে যাবে কোন্ দুঃখে, ডবা বাঁশও ঋজু। ন্যাড়া তালগাছও ঋজু।

ঋজুদা চুপ করে রইল। হয়ত বুঝল, আমাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না আর।

গাছের গোড়ায় বসে বার দুয়েক ঋজুদা তার পাইপের পোড়া টোব্যাকো খুঁচিয়ে ফেলল, ঐ দারুণ গাছেরই গোড়াতে। তারপর কি মনে করে নিজের পুরনো হয়ে-যাওয়া হাওয়াইন্ চপ্পলের স্ট্রাপটাকে নিজেই ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাঁচিটা বের করলাম, ঋজুদার কষ্ট হচ্ছে দেখে।

ঋজুদা বলল, থিংক রুরুদ্দ্রবাবু। থিংক আ হোয়াইল্। বজরঙ্গবলী মাথা একটা সকলকেই দেন, কিন্তু সেই মাথাটা কাজে লাগায় খুবই কম লোক। ভাবতে চেষ্টা কর্—কার্য হলেই কারণ থাকে, একটা কিংবা অনেকগুলো।

তখন আমার মনে হল, তাই ত' ! কাঁচি দিয়ে কাটলে যে কেউ একটু নজর করে দেখলেই বুঝবে যে, কাঁচি দিয়ে ইচ্ছে করে এটাকে কাটা হয়েছে। হঠাৎ ছিঁড়ে যায়নি।

টানাটানি করতে করতে চটিটা সত্যিই ছিঁড়ে গেল। ঋজুদা তখন দু' পাটি চটিই ঐ গাছতলাতে ফেলে রেখে খালিপায়ে এসে গাড়িতে উঠল। আমি জুতো পরে নিলাম। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে ফেরার পথ ধরলাম।

ঋজুদা বলল, আরেকটা কথা রুদ্র। এই ফিল্মটা এক্ষুনি খুলে নিজের পকেটে রাখবি। সবগুলো এক্সপোজার দেওয়া না হলেও। আর কাল বীটিং শেষ হওয়া মাত্রই যে ক্যাসেটটাতে বীটিং-এর আওয়াজ রেকর্ড করাবি সেটাও খুলে পকেটে ভরে, অন্য কোনো ক্যাসেট—যাতে গান আছে, তা ভরে রাখবি তোর রেকর্ডারে।

কেন !

আবার কেন ?

বললাম, আচ্ছা !

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চল্। চা না খেয়ে মাথা ধরে গেছে।

মালোয়াঁমহলে পৌঁছতেই রীতিমত জেরার সামনে পড়তে হল আমাদের দুজনকে। খালি পায়ে ঋজুদাকে নামতে দেখেই বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ হৈ-হৈ করে উঠল।

ঋজুদা বলল, আর বলবেন না, আপনার রুরুদ্দ্রবাবুকে নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম। ও আবার কবিতা লেখে। নির্জনে জঙ্গলের প্রাণের শব্দ শুনবে বলে একটা ফরেস্ট রোডে ঢুকে গাড়ি নিয়ে এতক্ষণ বসে ছিলাম। কবিত্ব শেষ হলে বলল, কার বডি বেশী ফিট্ দেখা যাক। বলেই, লাফিয়ে শিমুলের ডাল ধরার কম্পিটিশান লাগাল আমার সঙ্গে। ও আর আমি ! ঐ করতে গিয়েই এই অবস্থা ! হাওয়াই-চপ্পলের এত ধকল কি সয় ? খামোকা কোমরে এমন টানও লাগল যে, কাল ভোরে উঠতে পারলে হয় বিছানা ছেড়ে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, নিমের তেল দিয়ে আপনাকে একেবারে এমন মালিশ করাব আমার নাপিত মহাবীরকে দিয়ে যে, কাল সকালে দেখবেন ওয়েলার ঘোড়ার মত দৌড়চ্ছেন আপনি।

ঋজুদা হাসল। বলল, তার আগে শীগ্গিরী চা। আর চটি।

বিষেণদেওবাবু একজন বেয়ারাকে দিয়ে ঋজুদাকে তাঁর কামরায় পাঠালেন চটি পছন্দ করে নিয়ে আসতে।

কিছুক্ষণ পর ঋজুদা খুব খুশী খুশী মুখে ফিরে এল একজোড়া কোলাপুরী চটি পায়ে গলিয়ে—। কিন্তু গোড়ালীটা মাটিতেই রইল। বিষেণদেওবাবুর পা ঋজুদার চেয়ে ছোট।

বিষেণদেওবাবু তাকিয়ে রইলেন লজ্জিত হয়ে।

ঋজুদা বলল, চটি জোড়া আপনার দারুণ। শুধু একটু ছোট হয়েছে।

বলেই বলল, আপনার পায়ের সাইজ কত ?

সাত। বিষেণদেওবাবু বললেন।

আর তোমার ভানু ? ভানুপ্রতাপের দিকে চেয়ে বলল ঋজুদা।

আমারও সাত।

ঋজুদা বলল, আমার আট।

বিষেণদেওবাবু বললেন, এক সাইজ হয়েই ত' মুশকিল হয়েছে। কোনো জুতোই কি আর আমার নিজের আছে ? যে জুতো কিনি, তাই-ই নিয়ে নেয় ভানু। মহা বিপদেই

পড়েছি!

ভানুপ্রতাপ দুষ্টুমির হাসি হাসল।

ঋজুদা বলল, কথায় বলে, মামা-ভাগ্নে যেখানে, আপদ নেই সেখানে।

এটা যা বলেছেন। লাখ কথার এক কথা। মামা-ভাগ্নে দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল।

এরপর চা এল। সঙ্গে বোঁদে আর মাঠ্‌রী। গোরখপুরী চা। নানারকম মশলা-টশলা দিয়ে।

ঋজুদা বলল, ফারস্ট ক্লাস চা। তারপর তিন-চার কাপ চা খেল ঋজুদা এবং আমাকে অবাক করে প্রায় দুশো গ্রাম মত মাঠ্‌রীও মেরে দিল।

আমি বললাম, অত খেও না ঋজুদা, পেট আপসেট করবে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, কিচ্ছু হবে না, একেবারে বাড়িতে তৈরি খাঁটি ঘি দিয়ে বানানো।

আমি বললাম, সেইখানেই ত' বিপদ। খাঁটি জিনিস খাওয়া আমাদের যে অভ্যেসই নেই।

বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ হেসে উঠলেন।

ঋজুদা আমার দিকে একঝলক এ্যাপ্রিসিয়েশানের হাসি হেসে, আমার যে বুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ খুলছে এমন একটা নীরব ইঙ্গিতও করে বলল, আরে, হলে হবে। এমন ভাল মাঠ্‌রী সেই কবে খেয়েছিলাম ছোটবেলায়, গিরিডিতে!

চা-টা খাওয়া হলে ঘর ভর্তি ট্রোফিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঋজুদা বলল, আপনাদের পরিবারের এই এক একটা ট্রোফি ত' এক-এক ইতিহাস। কি বলেন বিষেণদেওবাবু?

তা ত' বটেই। কী সব দিনই ছিল। বিহারের গভর্নর শিকারে আসতেন আমার বাবার আমলে এই জঙ্গলে। আমাদের এই গরীবখানাতে ডিনার দেওয়া হত তাঁর অনারে। কত জায়গার রাজা-রাজড়ারা আসতেন।

বসবার ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে, ঘরের বিভিন্ন কোনাতে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে স্টাফ্ করা বাঘ ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, শিং, মাথা, পা ইত্যাদি ছিল। পশ্চিমের দেওয়ালের গা-থেকে ঝোলানো একটা প্রকাণ্ড বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মাথা শুদ্ধু চামড়া দেখিয়ে ঋজুদা বলল, এই বাঘটা কোথায় মেরেছিলেন, এত বড় বাঘ বড় একটা দেখা যায় না।

বিষেণদেওবাবুর চোখে স্মৃতি ঝলসে উঠল। বললেন, এই বাঘ মেরেছিলাম পালামৌর রাংকার জঙ্গলে। সবে গরম পড়েছে। দুপুরবেলা বীটিং হচ্ছে। মাটিতে বসে আছি একটা ফেলাউদা ঝোপের পাশে, মুরগী মারব বলে। আমার হাতে শট্ গান। তাতে ডানদিকের ব্যারেলে এল-জি আর বাঁদিকের ব্যারেলে চার নম্বর ভরা আছে। বলা নেই, কওয়া নেই, এক ঝাঁক মুরগী তাড়িয়ে নিয়ে, প্রায় বীটিং শেষ হওয়ার সময়ে তিনি বেরোলেন। সে এক অভিজ্ঞতা। এখনও মনে হলে হাতের পাতা ঘেমে ওঠে উত্তেজনায়।

কত বড় ছিল বাঘটা? মানে, মাপের কথা বলছি। ঋজুদা শুধোল।

দশ ফিট ছ' ইঞ্চি। ওভার দ্যা কার্ভস্। বিষেণদেওবাবু বললেন।

তারপর বললেন, ঠিক এই মাপেরই একটি ট্রোফি আছে এ তল্লাটে হাজারীবাগে। তখন হাজারীবাগের এস পি ছিলেন সত্যচরণ চ্যাটার্জি সাহেব। ভারী ভাল লোক। তাঁরই ছেলে মেরেছিল বাঘটাকে সিতাগড়া পাহাড়ের নীচে, টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল্

হক্-এর সাহায্যে। এখনও চামড়াটা আছে চ্যাটার্জি সাহেবের ক্যানারী হিল্ রোডের বাড়ির বসবার ঘরে।

ঋজুদা হঠাৎ ঐ চামড়াটার দিকে এগিয়ে গেল। পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, একটু ভাল করে দেখি। এতবড় বাঘ আমিও ত' কখনও মারিওনি, দেখিওনি।

ভানুপ্রতাপ এবং বিষেণদেওবাবু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, হাত দেবেন না, ভীষণ ধুলো ত' ধুলো লেগে যাবে। পোকাও হয়েছে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, তাছাড়া চুহার উপদ্রবে এখানে ট্রোফি রাখাই মুশকিল। বাঘের কান খেয়ে দিচ্ছে, ভালুকের থাবা, চিংকারা হরিণের নাক, মহা মুশকিলেই পড়েছি। ইয়াব্বড়-বড়। দেখলে ভয়ই করে।

ঋজুদা ফিরে এল বাঘের চামড়াটার কাছ থেকে।

ফিরে এসে, আমাকে বলল, যা-যা, দেখে আয় রুদ্র কাছ থেকে। দেখার মত জিনিস বটে।

আমিও দেখে ফিরে আসার পর ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, এত ভাল ট্যানিং এবং স্টাফিং ত' আজেবাজে কোম্পানীর দ্বারা হবে না। আমি ত' এইজন্যেই, শিকার যখন করতাম, তখন আমার সব ট্রোফি পাঠাতাম ম্যাড্রাস এর ভ্যান্-ইন্জেন্ এন্ড ভ্যান-ইন্জেনে।

ভানুপ্রতাপ দুটো বড়ি গিললেন জল দিয়ে। আমরা সকলেই ওঁর দিকে তাকালাম। উনি নির্বিকার। বিষেণদেওবাবু ওঁর দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, কি যে করছিস তুই! আত্মহত্যা সবচেয়ে বড় পাপ! তোর জন্যেই মরতে হবে আমার। আর কোনোই উপায় নেই দেখছি।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমি ত' মরতেই চাই। আমার বাঁচতে ভালো লাগে না। তোমাকে ত' বলেছি। আমার ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। যথেষ্ট বড় হয়েছি আমি। এসব আর ভালো লাগে না দশজনের সামনে। আমি কি মাইনর? না তোমার ওয়ার্ড?

বিষেণদেওবাবু আমাদের সামনে একটু অপমানিত ও লজ্জিত বোধ করলেও, তা গায়ে না-মেখে বললেন, যা খুশী তুই কর, তবে যাই-ই বলি, তোর ভালোর জন্যেই বলি।

ঋজুদা ফেলে-আসা কথায় ফিরে গিয়ে কথার খেই ধরিয়ে বলল, আপনিও কি আপনার সব ট্রোফিই ভ্যান্-ইন্জেনে পাঠান?

না, না। আমরা আমার বাবার আমল থেকেই পাঠাই কোলকাতায়। এক আর্মেনীয়ান সাহেবের কোম্পানী ছিল। সাহেব মরে গেছেন বহুদিন। ছেলেরাই বোধহয় মালিক এখন! কি যেন নাম ছিল সাহেবের? ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে, ফ্রেভিয়ান্। আর তাঁর ম্যানেজার ছিলেন হালদারবাবু। এখনও নিশ্চয়ই আছেন। বহুদিন ত' আর শিকার-টিকার করা হয় না। অনেক বছর দেখাশুনা নেই ওঁদের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, বাঃ, ওঁরা ত' দারুণ কাজ করেন দেখছি। আগে জানলে...

দারুণ! বললেন বিষেণদেওবাবু।

ভানুপ্রতাপ একটা হাই তুলে বললেন, অ্যাল্‌বিনোর কথা বল তার চেয়ে। যত্ব সব মরা-বাঘ নিয়ে পড়েছো তোমরা।

আমি বললাম, আপনি দেখেছেন অ্যাল্‌বিনো বাঘটাকে?

হুঁ। দু' দিন।

মারলেন না কেন?

বাঘ দেখলেই মারতে হবে নাকি? মামারই মারামারি বেশী পছন্দ। অবশ্য ঋজুবাবুকে

মলোয়াঁমহলের ভেট্‌ এই বাঘ। বাঘ মারতে কি আছে ? ও ত বাঁচ্চোকা খেল্‌। আমার প্রথম বাঘ আমি কত বছর বয়সে মারি জানো ?

কত ? আমি চোখ বড় করে বললাম।

দশ বছর বয়সে। আমার মায়ের পাশে বসে, মায়েরই মাচা থেকে।

তা বটে। বিষেণদেওবাবু বললেন, আমার বোন শুভাও বাঘ মেরেছিল ঠিক দশ বছর বয়সেই, আমারই পাশে বসে।

ঋজুদা বলল, ঐভাবে সব বাঘ মারলেন বলেই ত' আজ এই অবস্থা। এ অঞ্চলে ক'টা বাঘই বা আছে এখন ?

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার কথাতে আহত হলেন।

বললেন, আরে, বাঘ না মারলে আমাদের সময়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হতো না। জমিদারীর গেঁহু-বাজরার মত বাঘও আমাদের সম্পত্তি ছিল। নিজেদের জমিদারীর বাঘ মেরেছি তার আবার জবাবদিহি করব কার কাছে ?

ঋজুদা বলল, রাগ করলেন নাকি ?

বিষেণদেওবাবু জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, রাগ করার কি আছে ?

কথা ঘোরাবার জন্যে আমি ভানুপ্রতাপকে বললাম, কেমন দেখতে অ্যাল্‌বিনো বাঘটা ?

মনে হল, ভানুপ্রতাপও ঋজুদার উপর চটেছিল। আমার কথার জবাব না-দিয়ে বলল, তাহলে দেখছি ঋজুবাবুর জন্য রেখে-না-দিয়ে এতদিনে মেরে দিলেই পারতাম অ্যাল্‌বিনোটা !

ঋজুদাও রেগেছে মনে হল। বলল, বাঘ মারা এখন বে-আইনের কাজ। আমার বাঘ মারবার শখ নেই। বীটে যদি অন্য কোনো জানোয়ার বেরোয়, মানে শুয়োর কি ভাল্লুক, তবেই আমি মারব। শুয়োর ভাল্লুকের পারমিট ত' দিচ্ছে কিছু কিছু আজকাল। বাঘ মারতে হয় ত' রুদ্রই মারুক। সুন্দরবনেই ও কেব্‌ল মেরেছে একটা। অবশ্য ম্যান ইটার বাঘ। ও মারলেই আমার মারা হবে। আমি শুধু তোমাদের সঙ্গে থাকব। আবহাওয়া বেশ জটিল হয়ে উঠছিল।

আমি আবার ভানুপ্রতাপকে বললাম, অ্যাল্‌বিনো কেমন দেখতে তা ত' বললেন না ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, ছাই-ছাই গায়ের রঙ— ক'টা চোখ। পেল্লায় বাঘ।

ঋজুদা একটু আগের উত্তজনা সামলে নিয়ে, অ্যাল্‌বিনো দিনের গল্প শুরু করল বিষেণদেওবাবুর সঙ্গে।

বলল, বিষেণদেওবাবু, সেই পূর্ণিমার রাতে খলকতুম্বী মাইনের পাশে যে বড় শিঙাল শম্বরটা মেরেছিলেন আপনি, মনে আছে ? অতবড় শম্বর আমি জীবনে দেখিনি। নর্থ আমেরিকান মুজ-এর মত দেখতে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আপনি ভুলে গেছেন সব। তখন মাইকা মাইনসের লেবার ওয়েল্‌ফেয়ার অফিসার ছিলেন মিস্টার বিজাপুকার। মারাঠী ভদ্রলোক। মনে পড়েছে ? শট্‌গানের দু' ব্যারেলেই বল ব্যবহার করতেন উনি। রাইফেল দেখতে পারতেন না দু' চক্ষে। ঐ বিজাপুকার সাহেবই মেরেছিলেন শম্বরটা। মেরে, জোর করে ট্রোফিটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন।

তাই নাকি ? ঋজুদা বলল, আমার ধারণা ছিল আপনিই যেন মেরেছিলেন।

বিষেণদেওবাবু বললেন, না, না। হি ওজ আ ওয়ান্ডারফুল শট্‌।

গল্পে গল্পে রাত অনেক হল। বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল খাওয়ার লাগাবে কি-না।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার দিকে চেয়ে বললেন, ইজাজৎ দিজিয়ে।

ঋজুদা হাসলেন। বললেন, চলুন যাওয়া যাক্।

বাখর্খানি রোটি, কালিতিতিরের কাবাব, পাকা পণ্ডিত রুইয়ের রেজালা, শম্বরের মাংসর আচার আর বেনারসের রাবড়ি দিয়ে নমঃ নমঃ করে আমরা ডিনার সারলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, রাতে আর বিশেষ কিছু করতে পারা গেলো না। কাল ত' সকলকেই ভোরে উঠতে হবে। সেইজন্যেই রাতের খাওয়াটা ইচ্ছে করেই নাকি অত্যন্ত হালকা করেছেন আজ। কালকের ভোজ্ হবে জবরদস্ত।

ভানুপ্রতাপ বলল, মামা ঈত্বরই—খ্বীল্-এর ডিকান্টারটা বাইরে বের করে রেখো।

আমি বললাম, ঈত্বরই খ্বীল্? সেটা আবার কি আত্বর?

ঋজুদা হাসল। ভানুপ্রতাপও হাসলেন আমার কথাতে। তারপর ভানুপ্রতাপ বললেন মৃত্তিকা-গন্ধী-ঈত্বর। ঐ ঈত্বর গায়ে লাগিয়ে, বাঘ-শিকারে যাই আমরা। মানুষের গা-দিয়ে মাটির গন্ধ বেরোয় হাওয়া যেদিকেই থাকুক না কেন বাঘ শিকারীদের গায়ের গন্ধ পায় না।

থ' হয়ে গেলাম শুনে। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপারই আলাদা।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা উপরে এলাম। ঋজুদা ঘরে ঢুকেই বলল, কাঁচিটা ফেরত দিলি না আমাকে?

আমি সত্যি-সত্যিই গাঁট-কাটার মত মুখ করে কাঁচিটা ফেরত দিলাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, রুরুদ্দ্রবাবু, কেস্ খুব গোলমালের ঠেকছে। তোর জন্যেই গোয়েন্দাগিরিতে ফেঁসে গেলাম। আর তোর জন্যেই ঈজ্জত ঢিলে হবে। সব কাজ কি সবাইকে দিয়ে হয়?

আমি বললাম, যত দোষ, নন্দের ঘোষ।

এই কথাটা ঋজুদারই এক পাঞ্জাবী বন্ধুর কাছ থেকে শেখা। একটু একটু বাংলা শিখেই ভদ্রলোক কথায় কথায় এইটে বলেন। নন্দ ঘোষ না বলে, বলেন, নন্দের ঘোষ।

ঋজুদা বললে, বসবার ঘরের স্টাফ-করা বড় বাঘটাকে তুই ভাল করে দেখেছিলি?

কোন্ বাঘ? দেওয়ালে যেটা টাঙানো আছে?

হ্যাঁ। ঋজুদা আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল।

দেখেছিলাম।

অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল?

না ত'?

আরও খাসীর মগজ খা! বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, শুনলি ত' এখানে ভীষণ চুহা। সব ট্রোফির নাক, কান, লেজ খেয়ে যাচ্ছে। রাতে সাবধানে শুয়ে থাকিস। ঘুমের মধ্যে কার কি খেয়ে যায়, কে বলতে পারে?

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, কাল কিছু একটা ঘটে, বুঝলি। তবে, কি যে ঘটবে, আর কে যে ঘটাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, যা কিছু ঘটুক। অ্যাল্‌বিনো বাঘটা মারা পড়ুক আর নাইই পড়ুক, একবার দেখতে পেলেই আমি খুশী।

ক'জনের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য হয়। বলো?

ঋজুদার পাইপটা নিভে গেছিল, দেশলাই জ্বেলে ধরাতে ধরাতে বলল, দেখতে পেলে

ত' আমিও খুশী হতাম। কিন্তু বোধহয় আমাদের দেখা হবে না তার সঙ্গে।

অতগুলো পায়ের দাগ—রেগুলার যাওয়া-আসা করছে আর দেখাই হবে না বলছ তুমি ?

আমি মনমরা হয়ে বললাম।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, কথায় বলে, সাপের লেখা ; বাঘের দেখা। অ্যাল্‌বিনো আমাদের ইচ্ছেপূরণ করবে বলে ত' মনে হয় না আমার। তবে, দ্যাখ্‌, এখন তোর কপাল।

তারপর বলল, নে, এবার শুয়ে পড়। কোনো দরকার হলে আমাকে ডাকিস। চললাম আমি।...

এমন সময় দরজার কাছে দুপুরবেলার মতই গলা খাঁকারী দেবার শব্দ পাওয়া গেল।

ঋজুদা বলল, আইয়ে ব্রিজনন্দনজী, পাধারিয়ে।

ব্রিজনন্দন নাগরা খুলে ভিতরে এসেই বলল, এই বাড়িতে ভূত আছে, চারপাশে, নাচঘরে, সব জায়গাতে ভূত আছে। আপনারা রাতে একদম ঘরের বাইরে বেরোবেন না।

ভূত ? আমি অবাক হয়ে ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা ব্রিজনন্দনের দিকে। তারপর ঋজুদা বলল, কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমাদের কাছে ?

বিষেণদেওবাবু এবং ভানুপ্রতাপ দুজনেই। আসলে, কথাটা বলবেন কী না তাই শোচতে শোচতেই ওঁদের সারাদিন গেছে।

ঋজুদা আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ব্রিজনন্দনকে বলল, কিরকম ভূত ? ভূত না পেত্নী ? কোন চেহারায় দেখা দেয় তারা ?

ব্রিজনন্দন দু' কানের কাছে দু' হাত তুলে ভিক্ষা-চাওয়ার মত হাতের পাতা দু'দিকে মেলে ধরে বলল, রাতের বেলা ওরকম ঠাট্টা-তামাশা করবেন না হুজৌর্‌। কখন কি হয়, বলা কি যায় ?

তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ভানুপ্রতাপের বাবা ঘোড়া থেকে পড়ে এখানেই মারা গেছিলেন। তাঁকে মাঝে মাঝেই ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে দেখা যায় গভীর রাতে। এই মহলের চারপাশে। নাচঘর থেকে বাঈজীর গানও ভেসে আসে কখনও সখনও। বিষেণদেওবাবুর বাবা গয়ার এক বাঈজীকে খুন করেছিলেন ঐ নাচঘরে। সেই গায় গান।

বিষেণদেওবাবু এত সাহসী শিকারী হয়েও ভূত মানেন ?

শিকারের সাহস আলাদা, আর ভূত-প্রেতের ব্যাপার আলাদা। বিষেণদেওবাবু কত দেব-দেবীর কাছে পুজো চড়িয়েছেন—মহলের সব নোকর-বেয়ারারা জানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

ঋজুদা বলল, এইসব ভূত-পেত্নীরা কবে থেকে উপদ্রব শুরু করেছে ?

ব্রিজনন্দন বলল, মাসখানেক হলো বলেই ত' শুনেছি। আমি ত' এখানে থাকি না। আমার সবই শোনা কথা।

ঐ নাচঘরে কেউ যায়নি দিনের বেলাও ?

কে যাবে ওখান ? সাপেদের আড্ডা সেখানে। ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতেই পারে না।

কেউ চেষ্টা করেছিল ?

হ্যাঁ। বিষেণদেওবাবু তাঁর দুজন শিকারীকে পাঠিয়েছিলেন। বন্দুক দিয়ে একদিন। একজনকে সাপে কামড়ে নীল করে দিয়েছিল। ভূতে অন্যজনের গলা কাম্‌ড়ে মাংস খেয়ে গেছিল।

কত্ত্বদিন আগে ?

তা দিন পনেরো হ্‌ল।

তারপর কেউ যায়নি আর ?

কে যাবে ? কার এত হিম্মত ?

ভানুপ্রতাপ ?

ভানুপ্রতাপের হিম্মত আছে। ও যেতে চায় বলে, আমার বাবার ভূত আমি বুঝব! কিন্তু বিষেণদেওবাবুই যেতে দেন না। ওর হাতে-পায়ে ধরে আটকান প্রত্যেকবার। ভানু ছাড়া যে ওঁর আর কেউই নেই। ঐ শিকারী দুজনের কপালে যা যা ঘটেছিল তা জেনেশুনেও তারপর ভানুপ্রতাপকে কি করে পাঠান উনি !

ঋজুদা বলল, বহত্‌ মেহেরবানী। আমাদেরও প্রাণের ভয় আছে। তাছাড়া বেড়াতে এসে এসব ঝামেলাতে জড়াতে চাই না আমি। আমরা কালই শিকারের পর এখান থেকে চলেই যাব ভাবছি। এ ত' দেখছি খতরনাগ্‌ ব্যাপার-স্যাপার।

বহত্‌। ঘাড় নীচু করে বলল ব্রিজনন্দন।

ঋজুদা হঠাৎ বলল, আপনার কোমরে গোঁজা ওটা কি ? পিস্তল না রিভলবার ?

ব্রিজনন্দন চমকে উঠে বাঁদিকের কোমরে হাত দিল।

আমার চোখে পড়েনি। কিছু বোঝাও যাচ্ছে না কেরোসিনের ঝাড়ের বাতিতে। গোলাপী টেরিলিনের পাঞ্জাবীর নীচে ধুতির সঙ্গে যে কিছু বাঁধা থাকতে পারে তা আমার একবারও মনে হয়নি।

ব্রিজনন্দন মুখ নীচু করে বলল, রিভলবার। জমিদারী দেখাশোনার কাজ করি। গায়ের জোরও কম খাটাতে হয় না। আমাদের দেঁহাতে এখনও জোর যার, মুলক্‌ তার। অনেক শত্রু আমার উজ্‌জান্‌পুরে—তাই সবসময় সঙ্গে রাখি।

ঋজুদা বলল, ও।

তারপর বলল, তা এখানে ত' শত্রু নেই। আছে নাকি ?

—না, এখানে নেই। তবুও সবসময় গোঁজাই থাকে। আসলে, আদতও বৈঠ গ্যয়া।

তারপরই বলল, হুজৌর। আপনারও ত' কোনো শত্রু নেই এখানে—কিন্তু আপনিও ত' সবসময় কোমরে পিস্তল বেঁধে রেখেছেন। কেন ?

ঋজুদা হাসল। বলল, অভ্যেস, ঐ আপনারই মত। আদত্‌ বৈঠ গ্যয়া।

ঋজুদা আবার বলল, বহত্‌ মেহেরবাণী। আমরা দরজা ভাল করে বন্ধ করে শোব। আর খুলব সেই সকালে—বেয়ারা চা নিয়ে এলে।

তারপর কি ভেবে ঋজুদা বলল, যা ভয় ধরিয়ে দিলেন আপনি—আমরা দুজনে আজ এই এক ঘরেই শোব। আপনি যদি আমার শামানগুলো কাউকে দিয়ে এ ঘরে আনিয়ে দেন।

ব্রিজনন্দন হাতের সোনার ঘড়িতে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, ওয়াক্ত জাদা নেহী হ্যায়।

বলেই, বলল, আমি তুরন্ত্‌ বন্দোবস্ত করছি। বলেই, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে নীচে চলে গেল।

ঋজুদা কথা না বলে ইজীচেয়ারটাতে বসে পাইপ খেতে লাগল। একটু পরই দুজন বেয়ারা ঋজুদার মালপত্র ধরাধরি করে আমার ঘরে নিয়ে এল। ব্রিজনন্দন বারবার ঘড়ি দেখছিল। সব মাল এসে যেতেই ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল নীচে।

ওরা নীচে চলে যেতেই হঠাৎ যেন সমস্ত মালোয়াঁ-মহলে গা-ছমছম অন্ধকার নেমে এল। নীচের দেউড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বাইরে যে কত জ্যোৎস্না তা সারা বাড়ির আলো এক এক করে নিভে যাওয়াতে প্রথম উপলব্ধি করলাম আমরা। ঋজুদা উঠে ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। তারপর ইজীচেয়ারটাকে তুলে যাতে শব্দ না হয় তেমন করে জানালার সামনে এনে পাতল। আমিও চেয়ারটাকে ঐভাবে নিয়ে এলাম।

অন্ধকার ঘরে ঋজুদার পাইপের লাল আগুনটা একবার জোর হচ্ছিল আর একবার নিভু নিভু হচ্ছিল—পাইপে টান দেওয়ার সঙ্গে সমতা রেখে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সাদা মারবেলের চওড়া বারান্দাতে থামের ছায়াগুলো এসে পড়েছিল লম্বা হয়ে। এখন পুরো পরিবেশটাই ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছে।

পাইপটা হাতে নিয়ে ঋজুদা বলল, এখানের ভূত পেত্নীরা ত' খুব ইন্টারেস্টিং। ব্রিজনন্দন যেভাবে ঘড়ি দেখছিল, তাতে মনে হল যে, তারা ঘড়ি দেখেই ঘোড়া চড়ে ; ঘড়ি ধরে গান গায়।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বেড়াতে এসে কী ঝুটঝামেলাতে পড়লাম রে বাবা !

ঋজুদা বলল, রুরুদ্দ্রবাবুর ব্যাপার আলাদা। একে অ্যাল্‌বিনো ; তায় ভূত-পেত্নী। ফিরে গেলে ক্লাসের ছেলেগুলোর অবস্থা কাহিল হবে তোর গুল শুনতে শুনতে। ওরা যতই শুনবে, ততই অবিশ্বাস করবে। আর ওরা যত অবিশ্বাস করবে তুই ততই ওদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করবি। পুওর রুরুদ্দ্রবাবু ! ওয়াম্ভারাবোদের হাত থেকে বেঁচে এসে শেষে কী না হাজারীবাগী ভূতের হাতে থাপ্পড় খেয়ে মরবি ?

আঃ চুপ করো না। আমি বললাম, উত্তেজিত গলায়।

ঋজুদা বলল, খিলটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে তুই খাটে শুয়ে পড় গিয়ে কোলবালিশ টেনে। দেখা বা শোনার মত কিছু থাকলে তোকে তুলে দেবো। আমি আজ এইখানেই রাত কাটাব। ইজিচেয়ারটা ভারী কমফর্টেবল্। পা-ও তুলে দেওয়া যায় দুই হাতলের নীচের বাড়তি হাতলে।

তারপর বলল, যাঃ। শুয়ে পড়।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বড় বড় পাল্লাওয়ালা শিকবিহীন খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের এক কোণে মেঘ জমেছে আস্তে আস্তে। কিন্তু দু'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়াতে চারদিকের জঙ্গল পাহাড় ঝক্‌ঝক্ করছে জ্যোৎস্নাতে। ঝির ঝির করে হাওয়া দিয়েছে। বনে-বনে, পাতায় পাতায় ঝরঝরানি আওয়াজ তুলে। চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে সেই হাওয়া ভেজা বনের মিশ্র গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে ঘরে। ব্রেইনফিভার পাখি ডাকছে থেকে থেকে। নাচঘরের কাছে ডিড়্-ইউ-ডু-ইট ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে কাকে যেন কি শুধোচ্ছে। ভারী শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধ প্রকৃতি এখানে। জানালার সামনে বসা পাইপমুখে ঋজুদার শিল্যুট বাইরের জ্যোৎস্না-মাখা আকাশের পটভূমিতে অনড় হয়ে রয়েছে।

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি জানি না। ঘুমের

মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দূরে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যের পাথুরে পথ দিয়ে। টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌—টগাবগ্‌-টগাবগ্‌ ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ যেন মাথার মধ্যে জোর হচ্ছে। আচমকা আমার ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি দরজাটা খোলা, হাঁ-করে। ঘরের মেঝেতে চক্‌চক্‌ করছে চাঁদের আলো, আর বাইরে স্বপ্নের মধ্যে শোনা সেই শব্দ। ধড়মড় করে আমি উঠে বসলাম খাটে। তারপর ঋজুদাকে দেখতে না পেয়ে, খাট থেকে নেমে বারান্দায় এলাম। দেখি ঋজুদা বারান্দার রেলিঙে দু' হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে দূরে একটা অস্পষ্ট কালো মূর্তি দ্রুত চলে যাচ্ছে।

ঋজুদা খুব মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে সেই সাদা রাতে সাদা ঘোড়ায় দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট কালো-সওয়ারের দিকে।

যতক্ষণ শব্দটা শোনা গেল ততক্ষণ আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে যখন এসে ঢুকেছি ঠিক তখনই তানপুরা আর সারেঙ্গীর আওয়াজ ভেসে এল নাচঘরের দিক থেকে। আর ঠিক তারপরেই ভেসে এল দারুণ মিষ্টি গলার আলাপ।

কয়েক সেকেন্ড কান খাড়া করে শুনেই ঋজুদা সুস্থ গলার বলল, আহা! কোন্‌ পেত্নী এমন গান গায় রে। জানতে পেলে, এই পেত্নীকেই বিয়ে করে ফেলতাম।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কথা বলিস না। আলাপটা শোন ভাল করে। আহা রে! যেন গহরজান বাঈজী গাইছে!

এমন রাত, এমন সুরেলা গান, এমন সারেঙ্গীর ছড়ের করুণ কান্না যে, আমার মত বেসুরো লোকের বুকের ভিতরটাও মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। পেত্নীর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আমি ইজীচেয়ারে বসা ঋজুদার কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঐদিকে চেয়ে রইলাম।

সমস্ত মালোয়াঁ-মহল নিথর নীরব। ঐ দূরাগত গান জঙ্গল আর জ্যোৎস্না সাঁতরে এসে কোনো গভীর নদীর পরিষ্কার খরস্রোতা জলের মত এই প্রাসাদের আনাচ-কানাচ, জাফরি-ঘুলঘুলি সব কানায়-কানায় ভরে দিচ্ছে। অথচ এই মালোয়াঁ-মহলে একজনও প্রাণী জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। জেগে থাকলেও কি তারা কেউই ভয়ে শব্দ করছে না? কে জানে?

গান ত' নয়, যেন করুণ মিনতি, যেন উথলে-ওঠা কান্না কারো।

ঋজুদা গম্ভীর গলায় বলল, কি রাগ বল্‌ ত'?

আমি বললাম, বেহাগ।

ঋজুদা মাথা নাড়ল দু'পাশে।

তাহলে? চন্দ্রকোষ?

আঃ। বিরক্ত হয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঋজুদা। তারপর বলল, মালকোষ। তোর মায়ের গলায় "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" গানটা শুনিসনি? এই রাগের উপরই ত' ঐ গানটি বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের ঐ একটিমাত্র গানই আছে মালকোষ রাগাশ্রিত। সরী। না আরও একটি গান আছে। চিরকুমার সভার গান। "স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে"।

গানের রাগের কথা ভুলে গেলাম আমি। কিন্তু আমার রাগ আর ভয় দুইই একসঙ্গে এল। এই ভৌতিক রহস্যময় গানের মধ্যে, আমার মায়ের গানকে টেনে আনার কি মানে হয়?

গান চলতেই লাগল। ঋজুদা তন্ময় হয়ে বসে রইল। বলল, এখানে আসা আমার সার্থক। বুঝলি রুদ্র। বহুদিন এমন গান শুনিনি। আর এমন চমৎকার পরিবেশ!

আহাঃ।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এসে গেছে আবার, প্রায় ঠিক সেই সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ আবার ফিরে এল। কে এই ভৌতিক ঘোড়সওয়ার ? কোথায় এবং কেন এর রাতের সহল তা কে জানে ? শব্দটা জোর হতে হতে যে পথে এসেছিল সেই পথেই মিলিয়ে গেল। নাচঘরের কাছে গিয়েই হঠাৎ যেন থেমে গেল।

গান কিছু তখনও চলছিল। আলাপ শেষ হয়ে বিস্তারও শেষ হয়ে তখন তান তার গন্তব্যের দিকে বয়ে চলেছিল দূর জঙ্গলের বহতা ঝর্নার জলের কুলকুলানি জলতরঙ্গর মত ; রাতের হাওয়ায় বনের বুকের মধ্যে থেকে ওঠা মৃদু মর্মরধ্বনির সঙ্গে।

॥৬॥

ভোরবেলা চা দিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙাবার কথা ছিল। ভোর সাড়ে-চারটের সময় বেরিয়ে পড়ার কথা অ্যাল্‌বিনোর জন্যে ছুলোয়া শিকারে।

কিন্তু যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা। চোখ খুলেই দেখলাম, ঋজুদা ইজীচেয়ারটাতে বসে, ডাইরীতে কী সব লিখছে। পায়জামা পাঞ্জাবীই চড়ানো আছে। তৈরি হয়নি বেরুবার জন্যে।

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, কি হল ? যাবে না ?

যাব মানে ? যাঁরা নিয়ে যাবেন তাঁদেরই পাত্তা নেই।

পাত্তা নেই মানে ?

বোধহয় ভূত-পেত্নীর খপ্পরে টপ্পরে পড়েছেন কেউ।

এমন সময় টি-কোজী মোড়া কেট্‌লী আর কুচো নিম্‌কি নিয়ে বেয়ারা ঘরে এল।

সেলাম করে বলল, ছোটা হুজৌরকা তবিয়ৎ গড়বড়া গ্যয়া। উসী লিয়ে আজ ছুলোয়া নেহী হোগা।

বলতে বলতেই, ব্রিজনন্দন এসে হাজির। মানুষটার সবসময়ই ঐ একই পোশাক। ধুতি আর গোলাপী টেরিলিনের শার্ট। ঘুমোবার সময়ও পরে কি-না কে জানে ?

আইয়ে, আইয়ে ; পাধারীয়ে। ঋজুদা আপ্যায়ন করে বলল। তারপর বলল, ভালোই হয়েছে আজ ছুলোয়া না করে।

রাতে আমারও তবিয়ৎ গড়বড় করেছিল। ঘুম থেকেও আমরা ত' এইই উঠলাম।

ঋজুদা শুধোলো, বিষেণদেওবাবু কেমন আছেন ?

এখন ভালোই আছেন। মনে হয়, এই গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। শরীর রসস্থ। জ্বর-জ্বর ভাব। ওষুধপত্রও বেশি খেয়েছেন হয়ত।

বিষেণদেওবাবু উঠেছেন ? ঋজুদা শুধোলো।

উঠেছেন। বড় হুজৌর বোধহয় পুজো করছেন। ঘর এখনও বন্ধ।

আমি অধৈর্য গলায় কথার মধ্যে কথা বলে উঠলাম, অ্যাল্‌বিনো বাঘটা এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে না ত'!

ব্রিজনন্দন আশ্বাস দিয়ে বলল, না না, আপনাদের বাঘ আর যাবে কোথায় ? হুজৌরদেরই জঙ্গল, হুজৌরদেরই বাঘ। বাঁধাই আছে বলতে গেলে। যাবেন, আর ধড়্‌কে দেবেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গিয়ে ঋজুদার দিকে চেয়ে বলল, আপনার কথা বিষেণদেওবাবুর কাছে অনেক শুনেছি হুজৌর। আপনি ত'

আমাদের উজ্জানপুরের হুজৌরকেও চিনতেন ?

আমি কথাটা শুনে অবাক হলাম।

ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। চিনতাম বৈকি ! আমরা ওকে 'স্যান্ডি' বলে ডাকতাম। স্কুলে পড়তাম একসঙ্গে। মুলিমালোয়াঁর রাজাসাহেবের মেয়ে শুভাবাঈর সঙ্গে বিয়ের সময়ও কোলকাতার দাওয়াতে গেছিলাম। তবে মুলিমালোয়াঁ আর উজ্জানপুরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ব্রিজনন্দন বললেন তাহলে ত' ভানুপ্রতাপ আপনার নিজের ছেলেরই মত। একটু দেখবেন হুজৌর !

ব্রিজনন্দনের চোখে-মুখে ভানুপ্রতাপের জন্যে বিশেষ এক দরদ ফুটে উঠল যেন।

মনে হল, ব্রিজনন্দন কি যেন বলতে চায়, যেন ভানুপ্রতাপের খুব বিপদ এখানে, এমন কিছু বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না মুখ ফুটে। কাল থেকে ও যতবার উপরে এসেছে, ততবারই আমার এ-কথা মনে হয়েছে।

ঋজুদা বলল, ও ত' যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। ও নিজেই নিজেকে দেখতে পারে। তাছাড়া, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কেউ ওদের উপর গার্জেনী করুক তা ওরা পছন্দ করে না। তারপর আমার দিকে দেখিয়ে বলল, আমার সাথীটিকে দেখে বুঝছেন না ?

এইই ত' হচ্ছে আসল কথা। ব্রিজনন্দন দু' হাতের পাতা তাঁর পেটের দু' পাশে উলটে দিয়েই বললেন। ঈ-জামানাই দুস্‌রা হ্যায়।

ব্রিজনন্দন চলে গেলে, ঋজুদা বলল, কেমন ঘুম হল রাতে রুদ্দরবাবু ?

ভালো।

বলেই, বললাম, টানাপাখার পাখাওয়ালা কোথায় বসে পাখা টানে বলো ত' ? বারান্দায় ত' নেই ওরা।

পাখার দড়িটা কোথা থেকে আসছে চোখ খুলে দ্যাখো রুদ্দরবাবু।

ঋজুদা বলল।

তাইই ত' ! পাটার দু'পাশ থেকে দুটো দড়ি মধ্যিখানে এসে জোট-বেঁধে দেওয়ালের ফুটো দিয়ে চলে গেছে যেদিকে, সেদিকে বারান্দা নেই।

ঋজুদা বলল, বাইরের বারান্দায় বসলে বেচারীরা একটু হাওয়া পেত নিজেরা। কিন্তু তেমন ত' নিয়ম নয়। ঘরের লোকের প্রাইভেসী ডিস্টার্বড হত তাহলে। ওরা হয়ত চতুর্দিকে বন্ধ কোনো ঘরে বসে গরমে ঘেমে-নেয়ে সারারাত পাখা-টেনে ঘুম পাড়াচ্ছে তোকে।

আমি বললাম, না না, ভিতরের দিকে যে বারান্দা আছে, নিশ্চয়ই সেই বারান্দায় বসেই পাখা টানছে ওরা।

সম্ভাবনা কম। অবশ্য, হতেও পারে। এ বাড়িতে মেয়েই নেই। তাই আপাতত অন্দরমহলের বালাই নেই।

আমি বললাম, তুমি ভানুপ্রতাপের বাবাকে চিনতে নাকি ? বলোনি ত' ?

আরে সে কি আজকের কথা ! খুব ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল স্যান্ডি। যে-কোনো খেলাই ভালো খেলত। চুনী গোস্বামীর মত। উজ্জানপুর থেকে ফারস্ট-ক্লাস ল্যাংড়া আম এনে স্কুলের ফাদারদের দিত ঝুড়ি ঝুড়ি—তাও মনে আছে। ছুটির আগে বাড়ি

যাওয়ার সময় হস্টেলের বেয়ারাদের প্রত্যেককে তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকা করে বকশিশ দিত। সেলুন রিজার্ভ করে যাওয়া-আসা করত। ফুটানী করে নিয়েছে একসময় ওরা।

আমি বললাম, এখনও করছে অন্যরা। তখন ওরা ছিলেন মহারাজা আর এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর পোলিটিক্যাল লিডাররা মহারাজা। ফুটানী করার মানুষ ঠিকই আছে। সেই মানুষগুলোর চেহারা আর পোশাকই বদলেছে শুধু।

তারপর বললাম, কি, ঠিক করলে কি ?

কিসের কি ? বলেই, ধমক লাগালো আমাকে। তাড়াতাড়ি খা। নিম্‌কিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ফারস্ট-ক্লাস খেতে কিন্তু। দারুণ খাস্তা।

ভূত-পেত্নীর ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করবে না ?

হুঁ। ঋজুদা বলল। অন্যমনস্কভাবে।

তারপর বড় এক ঢোক চা খেয়ে বিড়বিড় করে আবৃত্তি করল :

"মিঞার মুখোশ বিবির মুখোশ
ছেলের মুখোশ, মুখোশ চাই ?
মুখোশওয়ালা যাচ্ছে হেঁকে
লেঙ্গে মুখোশ ? হাতেম তাই ?"

—এ আবার কি ? আমি বললাম।

—লালা মিঞার শায়েরী।

আমি আর বেশী ঘাঁটালাম না ঋজুদাকে। আজ সকাল থেকেই কেমন হেঁয়ালী হেঁয়ালী মুড়।

চা খাওয়া শেষ করে বলল, আমার বাক্সটা এনেছিস ? গদাধর দিয়ে দিয়েছে ত ?

—না ত' ?

সত্যি। তুইও সেরকম ! বিরক্ত হয়ে ঋজুদা বলল। গদাধরের যদি অতই দায়িত্বজ্ঞান আর বুদ্ধি থাকবে, তাহলে ও আমার মত লোকের কাছে সারাজীবন নক্‌রী করে মরবে কেন। তুই যে কী না !

আমি বললাম, দাঁড়াও দাঁড়াও—হয়ত গাড়ির ডিকিতেই পড়ে আছে। স্টেপ্‌নীর পাশেও থাকতে পারে। আমি এখুনি দেখে আসছি।

ঋজুদা বলল, একদম না। ইডিয়ট্‌।

আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ঋজুদা বড্ড খিটখিটে হয়ে গেছে। আমি যে ইডিয়ট্‌ এ-কথাটা যেন এতদিন পরেই আবিষ্কার করল। রাগ হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

একটু চুপ করে থেকেই বলল, আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়েই হাজারীবাগ যাব। যাওয়ার সময় পথে দেখলেই হবে গাড়ি থামিয়ে, বাক্সটা আছে কী নেই। বুঝলি !

হাজারীবাগ কেন ?

হাজারীবাগ বলে বেরোব। তারপর নাও যেতে পারি। কোলকাতাও চলে যেতে পারি। যেমন ইচ্ছা করবে।

বাঃ ! অ্যাল্‌বিনো ?

অ্যাল্‌বিনোর জন্যে আবার ফিরে আসা যাবে। নিজেদের হাতিয়ার-টাতিয়ার নিয়ে। পরের তা সে যত দামীই আর যত ভালোই হোক না কেন, আমি ভরসা পাই না।

অবাক হলাম। বললাম, সত্যিই চলে যাবে ?

ঋজুদা বলল, কথা না বলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

সেদিন ব্রেকফাস্টের সময় ভানুপ্রতাপ সামান্যই খেলেন। চোখ দুটো লাল দেখাচ্ছিল। খুব সর্দি হয়েছে। বিষেণদেওবাবু নামলেনই না নীচে তখনও। কী এত পুজো করছেন উনিই জানেন।

ঋজুদা ভানুপ্রতাপকে বলল, নাস্তা করে আমরা একটু লুলিটাওয়া অবধি ঘুরে আসি। আপনাদের রুরুদ্দ্রবাবু ত' অ্যাল্‌বিনো না মারতে পেরে আমার উপর খাপ্পা হয়ে রয়েছে। ভীষণ। ছুলোয়াটা পিছিয়ে গেল!

ভানুপ্রতাপ হাসলেন।

এমন সময় বিষেণদেওবাবু ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, বাঘ ত' তোমারই আছে। আমার যে শিকারীরা তোমাদের কালিতিতির বটের মেরে খাওয়াচ্ছে, তারাও বাঘটাকে দেখেছে। সব ইন্তেজামও করছে তারাই। ওদের ইন্তেজামের কোনো ত্রুটি থাকে না। বাঘ মারিয়েই ওরা ছাড়বে তোমাকে। ঋজুবাবু যদি নাওও মারেন!

ভানুপ্রতাপ বললেন, শরীরটাও নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। আজ হলো না ত' কি? কাল-পরশু ছুলোয়া নিশ্চয়ই হবে।

ঋজুদা বলল, আমরা তাহলে একটু ঘুরে-টুরে আসি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, গাড়িতে যাচ্ছেন, সঙ্গে ঠাণ্ডা জল আর কিছু খাবার দিয়ে দিই? ফ্লাস্কে করে চা নেবেন না কি?

চা হলে ত' ফারস্ট ক্লাস হয়। ঋজুদা বলল।

চায়ের সঙ্গে কিছু বরফি আর শেওইও নিয়ে যান। জঙ্গলের পথ। গাড়ি খারাপ হল, হঠাৎ টায়ার পাংচার হল; কে বলতে পারে!

আমরা যখন ফটকের বাইরে এসে পড়লাম তখন আমি বললাম, প্রথমে হাজারীবাগ বলে, পরে আবার টুটিলাওয়া বললে যে।

প্রথমে লুলিটাওয়া পড়বে তারপর টুটিলাওয়া, তার অনেক পরে হাজারীবাগ। আমাদের কাজ টুটিলাওয়াতে হয়ে গেলে আর হাজারীবাগ যেতে হবে না।

কি কাজ?

ঋজুদা বলল, শোন রুদ্র। তোকে একবার কোলকাতায় যেতে হবে। কতগুলো কাজ দিয়ে পাঠাব তোকে। কাজগুলো যে কি, তা এখনও আমি নিজেও জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, তোকে যেতেই হবে।

তুমি একা থাকবে? এখানে?

দু'দিন। মাত্র দু'দিন। তারপর ত' তুইও চলে আসবি। তুই এলে, তারপর আরও দু-একদিন থেকে; যদি এখানে থাকার মত অবস্থা থাকে; দুজনেই ফিরে যাব।

লুলিটাওয়া হয়ে টুটিলাওয়া পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত লাগল। পথের প্রতিটি মোড়, পথের পাশের প্রতিটি ল্যান্ডমার্ক মনে হল, ঋজুদার মুখস্থ। এদিক-ওদিকে নানা দেখার জিনিস দেখাতে দেখাতে চলেছিল আমাকে। আসবার সময় এ পথে রাতের অন্ধকারে এসেছিলাম। রাতে আর দিনে জঙ্গলের রূপের যে কত তফাত; তা বলার নয়। রাতের অন্ধকারে ভয়, কৌতূহল আর রহস্য যেন মাখামাখি হয়ে থাকে। আর দিনের আলোয় সব স্পষ্ট স্বচ্ছ।

টুটিলাওয়ার জমিদারবাড়িটা দেখে মনে হয় একটা মসজিদ। মসজিদও আছে পাশে। এখানকার জমিদার ইজাহারুল হক্ খুব শৌখিন লোক। ইনিই এস-পি সাহেবের ছেলের সঙ্গে সিতাগড়ার বড় বাঘটা মারার সময় ছিলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল ইজাহারুল নেই। হাজারীবাগে গেছেন। হাজারীবাগেই থাকেন উনি।

ঋজুদা ইজাহারুল সাহেবের ম্যানেজার হাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, ওঁদের কোনো লোক শিগগিরি কোলকাতায় যাবে কি না ?

—হাজী সাহেব বললেন, আমি নিজেই যাব কালকে—সারিয়া হয়ে।

—ফারস্ট ক্লাস্। গিয়েই এই চিঠিটা যদি পৌঁছে দেন হাজীসাহেব।

আমি ত' কোলকাতা চিনি না ভাল।

হাজীসাহেব বললেন।

আপনার চিনতে হবে না। খামের উপর ফোন নম্বর দিলাম। ফোন করলেই আমার লোক এসে চিঠিটা নিয়ে যাবে। খুব জরুরী চিঠি।

ব্যসস্, ব্যসস্, তাহলে ত' কোনো অসুবিধাই নেই। জরুর এ চিঠি পৌঁছে যাবে। কিন্তু মিঞাসাহেব নেই বলে আপনারা তসরিফ রাখবেন না একটু, এ কি করে হয় ? নামুন নামুন। কোথা থেকে আসছেন ? কবে এসেছেন ?

আমরা নেমে ভিতরের পাথরের তৈরি ঠাণ্ডা ঘরে বসলাম। হাকিমী দাওয়া মেলানো গোলাপী-রঙা শরবত আর ফিরনী এলো আমাদের জন্যে।

আপত্তি করতেই হাজীসাহেব জিভ কেটে বললেন, তওবা, তওবা, গরীবের নোক্‌রী খেয়ে হুজৌরের লাভ ? মিঞাসাহেব এসে শুনলে আমাকে কোতলও করতে পারেন।

ঋজুদা হাসল। বলল, এসেছি ত' ডালটনগঞ্জে। এদিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম আমার এই চেলাকে। ইম্‌তেহান পাশ করেছে—পঁড়ে-লিখেমে বহত্ তেজ।

আমি ফিরনী মুখেই হেসে ফেললাম। আমার পড়াশোনায় তেজ-এর কথা শুনে। এমন গ্যাস্ দেয় না।

হাজীসাহেব বুলেন, ঘর খুলে দি। স্নানের বন্দোবস্ত করি ? খস্‌স ঈত্বর দিয়ে চান করে আরাম করুন, তারপর ভালো করে বিরিয়ানী বানিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানী এখনও আগের মতই ভালোবাসেন ত' ?

ঋজুদা বলল, হাজীসাহেব, যে খাসীর বিরিয়ানী ভালো না বাসে, সে নিজেই নির্ঘাৎ খাসী। এমন উম্‌দা খনা খুদার বেহেতরীন্ দুনিয়ায় আর বেশী কি আছে ?

হাজীসাহেব দাড়ি-কচ্‌লে হেসে উঠলেন।

এ-কথা সে-কথার পর ঋজুদা বলল, পথে মুলিমালোয়াঁর মালোয়াঁমহল দেখলাম। ওঁদের একসময় চিনতাম ত' আমি ভালো করেই। ওঁদের খাল্-খরিয়াত্ সব ভাল ?

হাজীসাহেব দু' বার দাড়িতে হাত চালিয়ে কাছা ঠিক করার মত মসৃণ করে নিয়েই বললেন, কা কহে সাহাব—পইসা বড়া গন্ধা চিজ্। পইসা আদ্‌মীকো জানোয়ার বনা দেতা। বিলকুল জানোয়ার।

ঋজুদা চোখ বড় বড় করে বলল, কি হল ? ব্যাপার কি ?

দিদিজীর স্বামী ত' ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেলেন। বড়ী তাজ্জব কী বাত্। ঘোড়াকে এসে সাপে কামড়াল। কি সাপ কেউ জানে না, কিন্তু অত বড় ওয়েলার ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পাথরে চোট লাগল মাথাতে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

দিদিজীও হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা গেলেন। এখন রয়েছে শুধু ভানুপ্রতাপ। কানাঘুষোয় শুনি বিষেণদেওবাবু এখন তাঁকেও মেরে সব কিছু নিজে হাত করার চেষ্টা

করছেন। লোকে বলে। শোনা কথা। হয়ত বাজে কথা। পরের কথায় কান দিতেও ইচ্ছে করে না।

তারপর বললেন, আমার কাছে এসব শুনেছেন এ যেন কাউকে বলবেন না।

ঋজুদা শরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল, হুম্-ম্-ম্-ম। সেইজন্যেই বাইরে থেকে কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে লাগছিল বাড়িটাকে। যেন জঙ্গলের জিন-পরীদের আড্ডা, অথচ জানে......

জিন-পরীর কথাও শুনি। লোকে বলে, নাচ-ঘরে নাকি, রাতের বেলা নানারকম আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিছুদিন হল।

হ্যাঁ ? তাই নাকি ? ঋজুদা বলল। যেন অবাক হয়ে।

তারপর বলল, ওঁরা আছেন ত' ওখানে ? বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ ?

ঝুমরি-তিলাইয়াতে যাওয়া-আসা করতে হয় ওঁদের প্রায়ই, কিন্তু যখন থাকেনও, তখনও মনে হয়, ভূতেরই বাড়ি ! তারপর বললেন, বোস্ সাহাব, যেখানে ইমানদারী নেই, দিল নেই, খুশী নেই, পেয়ার নেই, সেখানে টাকা ভূত ছাড়া আর কি ? মাইকার বিজনেস্ করে এঁরা ত' বোধহয় শ মাইলের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড়লোক। কিন্তু লাভ কি ? টাকা কি দিল ওঁদের ?

একটু থেমে আবার দাড়ি-কচ্‌লে বললেন, হুজৌর। টাকা রোজগার করা সহজ, বড়লোক হওয়াও খুবই সহজ ; কিন্তু টাকাওয়ালা হওয়ার পরও মানুষ থাকা বড়ই কঠিন। যাদের অনেক টাকা, তাদের মধ্যে বেশীই বদ্‌বু জানোয়ারের মত হয়ে যায়। টাকা ত' কাগজই সাহাব। টাকাকে কাজের মত কাজে লাগাতে ক'জন জানে ?

ঠিক বলেছেন হাজীসাহব। একদ্দম সাহী বাত্। এবার আমরা উঠি। বহত্ মেহেরবানী। আপনি ইজাহারকে বলবেন, আমার কথা।

কালই ত' আমার সঙ্গে দেখা হবে হাজারীবাগে। নিশ্চয়ই বলব, আপনার কথা। হাজীসাহেব বললেন। হাজারীবাগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ?

নাঃ। এবারে বোধহয় হবে না। ঋজুদা বলল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা মুলিমালোয়াঁর দিকে চললাম।

ঋজুদা বলল, হাজীসাহেব যখন বললেন পরের কথায় কান দিতেও ইচ্ছে করে না, তখন হাজীসাহেবের কান দুটো কেমন লম্বা হয়ে গেল, দেখেছিলি ?

আমি হাসলাম।

ঋজুদা বলল, বিরিয়ানীর চেয়েও মুখরোচক আর কি জিনিস আছে বল্ ত'?

কি ? আমি শুধোলাম মুখ ঘুরিয়ে।

ঋজুদা বলল, পরনিন্দা আর পরচর্চা। বিনি পয়সার এমন খানা আর হয় না।

টুটিলাওয়া থেকে বেরিয়ে লুলিটাওয়া ছাড়িয়ে এসে যখন আমরা প্রায় মুলিমালোয়াঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন ঋজুদা পথের ডানদিকে হঠাৎ একটা একেবারে অব্যহৃত ঝরা-পাতা ভরা পথে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে স্পীড কমিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। মচ্‌মচ্ করে খয়েরী পাতা গুঁড়োতে লাগল চাকার নীচে পাঁপড় ভাজার মতো।

বেশ কিছুদূর গিয়ে, গাড়ি থামিয়ে বলল, ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ চা ঢাল ত' রুদ্র। পাইপটা ধরিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই।

আমি চা ঢালছি এমন সময় ঋজুদা হঠাৎ বলল, তোর মায়ের মরণাপন্ন অসুখ রুদ্র। তোকে কোলকাতায় যেতে হবে, আর......

কথাটা শুনেই আমার হাত কেঁপে চা চল্‌কে পড়ে গেল গাড়ির সীটে।

তুই একটা যা-তা ! ঋজুদা বলল।

বললাম, বললে আমার মা মরণাপন্ন আর......

ঋজুদা বলল, সেনটেন্সটা কমপ্লিট করতে দিবি ত' ! দিলি ত' সীটটাতে দাগ ধরিয়ে, বলেই হলুদ ন্যাকড়া বের করে মুছতে লাগল।

তারপর বলল, পরশু-তরশুই কোলকাতা থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আসবে তোর নামে—মাদার সিরিয়াসলী ইল্। কাম ইমিডিয়েটলী।

কে করবে ?

ভট্‌কাই। ভট্‌কাইকে ব্যাপারটা সিক্রেট রাখতে বলেছি। হাজীসাহেবের সঙ্গে ওর কাছেই চিঠি পাঠালাম। টেলিগ্রামটা পেয়ে অন্তত একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করিস—সত্যি হলে ত' আর করবি না ; জানাই কথা। টেলিগ্রাম পাবার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবি। কোলকাতা অবধি কিন্তু গাড়ি নিয়ে যাবি না। ধানবাদে গাড়ি রেখে দিবি—ধানবাদ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ঠিক উলটো দিকে নারাং আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী আছে। সেখানে। চিঠি দিয়ে দেব আমি। রাতটা ওদের কাছে থেকে, ভোরের ট্রেন ধরে কোলকাতা। টেলিগ্রাম যদি সকালে এসে পৌঁছয় তবে ত বিকেল বিকেলই ধানবাদ পৌঁছে সেই রাতেই কোলকাতা পৌঁছে যাবি।

তারপর ?

আমি একসাইটেড্ হয়ে বললাম, ঋজুদাকে চা এগিয়ে দিতে দিতে।

তারপর তোদের বাড়িতে না গিয়ে আমার বাড়িতে উঠবি সটান। ভট্‌কাইকে ফোন করে জানবি তোর মা-বাবা কেমন আছে। তোর সঙ্গেই তিনটি জায়গায় তিনটি চিঠি দেব। সেই তিন জায়গাতেই নিজে গিয়ে দেখা করবি। ওঁদের সঙ্গে নিজে কথা বলবি। যা জানার, জেনে আসবি। তোর পাশ করার কারণে তোকে যে প্রেজেন্টটা দেব বলেছিলাম, সেটাও এতদিনে এসে যাওয়ার কথা। এসে গেলে, সেটাও সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। হয়ত, এখানে কাজে লাগতে পারে।

—কোথা থেকে ? আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম। কি প্রেজেন্ট ?

—ধীরে, রুদ্দরবাবু, ধীরে। সময়ে, সবই জানবে। এখন চল্, চা খেয়ে নিয়ে আমরা নাচঘরে যাব।

নাচঘর ? নাচঘর এখানে কোথায় ?

ভূতের ভয়ে আমার গলা কেঁপে গেল একটু।

এই রাস্তাই নাচঘরের সামনে নিয়ে গেছে। এ রাস্তা এখন আর কেউই ব্যবহার করে না। তবে গাড়ি কতদূর যাবে তা বলা যায় না। পুরো রাস্তা গাড়িতে যাওয়াও হয়ত ঠিক হবে না। শেষের আধ মাইল হণ্টন মারব। আমার লাঠিটাও বের করিস পেছন থেকে। আর এই বেলাই নিরিবিলিতে বাক্সটা দেখে নে বরং।

আমি নেমে, বুট খুলে ঋজুদার লাঠি আর বাক্স বের করলাম। বাক্সটা ঠিকই আছে। আফ্রিকা থেকে এসে একটা নতুন বাক্স ; নতুন করে গুছিয়েছি আমরা। এখন থেকে যেখানেই যাব ; বাক্সটা সঙ্গে যাবে। ঋজুদার স্ট্যান্ডিং-অর্ডার।

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে গাড়ি স্টার্ট করল ঋজুদা। আস্তে আস্তে চলতে লাগল গাড়ি। দু'ধারে নানারকমের গাছ ঝুঁকে পড়েছে রাস্তায়। নানারঙা শুকনো পাতায়—হলুদ, লাল, হলুদ-লাল, খয়েরী, সবজে-হলদে, সবজে এবং কালো পাতায় পথ

ছেয়ে রয়েছে। কিছু পাতা পচেও গেছে। খুব আস্তে চলছে গাড়ি পাতার মোটা নরম গাল্‌চের উপর দিয়ে। সূর্যের আলো ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে সামান্যই আসছে সেখানে। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে একটা কাঠঠোকরা সমানে কাঠ ঠুকে চলেছে আর ডানদিক থেকে একজোড়া হুপী। হুপীর ডাক, ঘন জঙ্গলের মধ্যে শুনলে ভারী গা-ছম্‌ছম্‌ করে।

কেন জানি না, এরকম পথে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। যে পথে কেউ যায় না, যে পথে আমার আগে আর কারও পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেই পথে। ঋজুদা আমার মুখে এই কথা শুনে একদিন বলেছিল : জীবনের পথ সম্বন্ধেও এই কথা সবসময় মনে রাখিস রুদ্র। যে পথে অনেকে গেছে, সবাই যায় ; সে পথে যাস না কখনও। নিজের পায়ের রেখায় নতুন পথ কেটে চলিস।

এত বছর ঋজুদার সঙ্গে থেকে থেকে জেনেছি যে, এই মানুষটার মধ্যে অনেকগুলো বিভিন্নমুখী মানুষ বাস করে। কোন্‌ মুহূর্তে যে কোন্‌ মানুষটা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখা দেবে, তা আগের মুহূর্তেও বুঝতে পারি না।

প্রায় মিনিট পনেরো চলার পর হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঋজুদা বলল, সামনে পথের উপরে ওগুলো কি দ্যাখ্‌ ত'। ঘোড়ার ময়লা না ?

আমি নেমে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। বললাম, হ্যাঁ।

খুরের দাগ নেই ?

দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ঝরা-পাতাতেও ঢেকে গেছে। এঞ্জিনটার মৃদু ঝিক্‌-ঝিক্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি মাটিতে নেমে, এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় দূরে একটা শীস শুনলাম। সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ ; হঠাৎ।

মানুষের শীস কি না বোঝবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময়ই পথের সামনের ঝরা পাতার উপর দিয়ে কি যেন কী একটা জিনিস বিদ্যুৎগতিতে আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। জিনিসটার গায়ের রঙ জঙ্গলের মতই জলপাই-সবুজ। তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, শুকনো পাতায় হঠাৎ ওঠা ঝড়ের মত সড়সড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল শুধু।

কি ব্যাপার, ভালো করে বোঝবার আগেই ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, দৌড়ে গাড়িতে, রুদ্র ! দৌড়ে।

এক দৌড়ে গাড়িতে উঠেই আমি দরজা বন্ধ করলাম।

ঋজুদা নিজের দিকের কাঁচ ওঠাতে ওঠাতে উত্তেজিত গলায় আমাকে বলল, কাঁচ, কাঁচ।

আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি আমার দিকের কাঁচ তুলে দিলাম।

ততক্ষণে জিনিসটা এসে পড়েছে একেবারে সামনে—বিদ্যুতের চেয়েও বুঝি তাড়াতাড়ি। অতবড় সাপ যে হয় তা কখনও জানতাম না। সে লম্বায় বোধহয় প্রায় বারো ফিট হবে। গাড়ির বাম্পারের সামনে থেকে লাফিয়ে সোজা এক মানুষ সমান দাঁড়িয়ে উঠেই প্রকাণ্ড চওড়া ফণা আর প্রায় এক হাত লম্বা চেরা জিভ বের করে হিস্‌স্‌-হিস্‌স্‌ শব্দ করে বনেটের উপর আছড়ে পড়ে কাঁচের উপর এমন এক ছোবল মারল যে, একটু হলে কাঁচটা ভেঙে যেত।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্‌ গীয়ার দিল। বুঝলাম ঋজুদা গাড়ি ব্যাক্‌ করে নিয়ে সাপটাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, সাপটা এতই বড় যে, ইচ্ছে

করলে এতটুকু ছোট্ট ফিয়াট গাড়িকে উলটেও দিতে পারে।

সাপটা গাড়ির বনেটের উপর উঠে এসেছিল, তবুও তার শরীরের পেছনের অংশটা গাড়ির সামনের অনেকখানি মাটি জুড়ে ছিল। গাড়িটা একটু পেছিয়েছে—সাপটা বনেট থেকে পিছনে নীচে নেমে গেছে, ঠিক তক্ষুনি পিছনের দরজার কাঁচের সামান্য ফাঁক দিয়েই আবার ঐ রকম জোরে শীসের আওয়াজ শুনলাম। এবং সেই শীস শোনার মুহূর্তের মধ্যে সাপটা নিজেকে কুঁকড়ে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে নিয়ে উলটে গিয়েই যেমন বিদ্যুৎ বেগে এসেছিল তেমন বিদ্যুৎ বেগেই চলে গেল। যখন উলটালো তখন তার পেটের সাদা-কালো দাগগুলো পরিষ্কার দেখা গেলো। এত জোরে গেলো যে, তার চলার পথের দু'পাশে শুকনো পাতা উড়তে লাগল।

আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

সাপটা দৃষ্টির বাইরে যেতেই ঋজুদা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, হুম্‌ম্‌......

আমি অধৈর্য গলায় বললাম, কি হল ? কিছুই বলছো না, খালি হুম্-হাম্ করছ। এক্ষুনি ত' "মাদার সিরিয়াসলি ইল্" টেলিগ্রাম আসার বদলে "সান বিট্‌ন বাই স্নেক—এক্সপায়ার্ড—" বলে টেলিগ্রাম পাঠাতে হত তোমার !

ঋজুদা বলল, হুম্‌ম্, ভেরী ইন্টারেস্টিং।

আমি এবার রেগে গেলাম। বললাম, ইন্টারেস্টিং ? অতবড় সাপ চিড়িয়াখানাতেও দেখিনি—বাপ্‌রে বাপ্ ব্যালিস্টিক্ মিসিল্ এর চেয়েও জোরে চলে এল। এখনও আমার বুক ধুক্‌পুক্ করছে।

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, ক্ষীরের বরফি খা, জল খা ; চুপ কর। ভাবতে দে।

গাড়ি বড় রাস্তাতে পড়তেই ঋজুদা গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, রুদ্র তুই চালা গাড়ি। আমি পাশে বসব।

ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এসে, পাশের দরজা খুলে বসল ঋজুদা। আমি না-নেমেই বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে এলাম ড্রাইভিং সীটে। গাড়ি স্টার্ট করতেই ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বাঁ হাতটা জানলাতে রেখে, পথের সামনে সোজা তাকিয়ে বসে রইল।

বলল, গাড়ি আস্তে চালা—চল্লিশ কি মি-র উপরে তুলবি না।

তরপরই আমার পাশে বসা জলজ্যান্ত মানুষটা পাইপ আর ভাবনার ধোঁয়ায় যেন অদৃশ্যই হয়ে গেল।

আমরা যখন মালোয়াঁমহলে ফিরে এলাম তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যদিও ক্ষিদে একটুও নেই। ভানুপ্রতাপ অথবা বিষেণদেওবাবু, দুজনের একজনও মহলে ছিলেন না। বিষেণদেওবাবু গেছেন ব্রিজনন্দনকে নিয়ে উজ্‌জানপুরের রাজবাড়ি থেকে আনা বেনারসী ল্যাংড়া আমের কলম বসাতে নিজের বাগানে—। আর ভানুপ্রতাপ গেছেন গীমারীয়া। কেন গেছেন, কেউ জানে না।

আমরা গ্যারাজে গাড়ি রেখে ভিতরে ঢুকতেই-না-ঢুকতেই তুমুল বৃষ্টি নামল। ঝড়কে সঙ্গে করে। দুড়দাড় করে অত বড় মহলের দরজা জানালা পড়তে লাগল। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল সেসব বন্ধ করার জন্য। ঠাণ্ডা, ভেজা হাওয়া বইতে লাগল জোরে। ঝরে যাওয়া পাতা আর ফুল উড়তে থাকল। একঝাঁক হুইস্‌লিং টীল জঙ্গলের মধ্যের কোনো তালাও থেকে উড়ে আসতে লাগল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

আমরা আমাদের ঘরে গেলাম। নীচে বলে গেলাম যে, ওঁরা এলে খাওয়ার জন্যে তৈরি হলে, তখন আমাদের খবর দিতে।

ঋজুদা আমার ঘরে ঢুকেই বলল, আজ থেকে এক ঘরেই শুতে হবে। বুঝলি। যা ঘটল, তারপর তোকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না।

আমি বললাম, হাত খালি যে। কিছুই আনতে দিলে না তুমি। আমার হাতে একটা কিছু থাকলে—ঐ শীস দেওয়া গাব্বুন ভাইপারের বাবাকে আমি ঐ ঝরা পাতার উপর শুইয়ে দিতাম।

ঋজুদা চুপ করে রইল। আমরা দুজনেই জানতাম যে, এ সময় কাঁচ নামিয়ে ঋজুদা পিস্তল বের করলেই সঙ্গে সঙ্গে হাতে ছোবল দিতো ঐ সাপ। সাপ মারতে শট্‌গান হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। চার নম্বর কি ছ' নম্বর ছর্‌রা দিয়ে দেগে দিলেই হল মাথাতে। মাথায় সুবিধে না হলে কোমরে। কোমরে গুলি লাগলেই, সময় পাওয়া যায়—পরের গুলি ধীরে সুস্থে মাথা লক্ষ্য করে করা যায়। অনেক সময় গাছের ডালে বা বাঁশের ঝাড়ে সাপ জড়িয়ে থাকলে তার মাথাটা যে কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতেই সময় লেগে যায় অনেক।

ঋজুদা ঘরে ঢোকার পর থেকেই আমাদের জিনিসপত্রের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ বলল, আমাদের অবর্তমানে আমাদের জিনিসপত্র কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে। বুঝলি ?

কি করে বুঝলে ?

আমার ব্যাগের জীপ-ফাস্‌নারটা আমি ইচ্ছে করেই আধ ইঞ্চি মত খুলে রেখে গেছিলাম। দ্যাখ্ যে খুলেছিল, সে কিন্তু পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর বলল, তোর জিনিস সব ঠিক ঠিক আছে ত' !

আমি আমার স্যুটকেস খুলে দেখলাম। সবই ঠিক আছে। শুধু আমার এ্যাড্রেস-বইটা নেই। ছোট্ট বই ; তাতে আমার পুরো নাম ঠিকানা লেখা ছিল। সকলের ফোন নম্বরও।

ঋজুদাকে বললাম সেকথা।

ঋজুদা বলল, এখানে ফোন থাকলে গদাধরকে বলে দিতাম।

অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করতে ভাল করে। আমাদের ত' কম যত্ন করছেন না এঁরা। আমাদের খোঁজ করতে কি নিখোঁজ করতে গেলে এঁদের মধ্যেই কেউ যাবেন। অথবা এঁদের লোকজন।

কেউ মানে ? বিষেণদে......

ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে কথা বলতে মানা করল আমাকে। বারান্দাতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

হুজৌর।

কওন ? ঋজুদা বলল।

ছোট্টু।

বোলো।

হুজৌর লোঁগ আ গ্যয়া। পঁন্দরা মিনিট বাদ খানেকে লিয়ে আইয়ে আপ্‌লোগ নীচ্চে।

ঠিক হ্যায়। বলল ঋজুদা।

ঋজুদা বলল, রুদ্র। আজ দুপুরে খাওয়ার পরই আমাদের পেট আপসেট হবে দুজনেরই। এবং তোর টেলিগ্রামটা না-এসে পৌঁছনো অবধি আমরা বাড়ির মধ্যেই

থাকব। বাড়ির মালিকরা বাড়ির বাইরে গেলে বাড়িটার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখতে হবে বুঝলি।

বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু এত লোকজন ! পারবে ?

পারতে হবে। ওরা আমাদের জিনিস ঘেঁটে যাবে, চুরি করবে, আর আমরা কেন করব না।

খেতে এসে আমি অথবা ঋজুদা যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে গল্প-গুজব করতে করতেই খেলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, কাল সব ঠিকঠাক থাকলে, মানে আমাদের সকলের শরীর-স্বাস্থ্য, কাল সকালেই ছুলোয়া করব। অ্যাল্‌বিনোর জন্যে।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমি জগদেওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও বলছে ও নাকি অ্যাল্‌বিনোকে দেখেইনি। তবে কে দেখেছে। আসোয়া আর রত্না। আসোয়ারা কোথায় ?

ওরা গেছে মাইন্‌সে।

মাইন্‌স কেন ?

ভানুপ্রতাপ সন্দিগ্ধ গলায় শুধোলো।

মাইন্‌সে নাকি একটা নেকড়ে, বাচ্চা ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-পাঁচটি বাচ্চা নিয়েছে—তিন থেকে ন' বছরের। তাইই ওদের পাঠিয়ে দিলাম।

কবে পাঠালে ?

এই ত' আজ সকালেই।

আজ সকালে ? খবর নিয়ে এল কে ?

গুগুারিলালকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলো ম্যানেজার আজ খুব ভোরে।

বাসে এলো গুগুারিলালের লোক ? কখন এল ? দেখিনি ত' ! ভোরে কোন্ বাস আছে ?

তুই ত' শুনেছিলি। বাসে আসেনি, এসেছিল ডিজেলের জীপ নিয়ে। আসামাত্র ওদের আসোয়ার বাড়ি পাঠিয়ে পত্রপাঠ ওদের দুজনকে তুলে নিয়ে চলে যেতে বলে দিয়েছিলাম। আজকাল ত' পান থেকে চুন খসলেই মালিকের দোষ। জঙ্গলের নেকড়ে খনির কুলীদের বাচ্চা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার পিছনেও মালিকের ষড়যন্ত্র আছে বলে রটে যাবে। তাইই, আর দেরী করলাম না।

ভানুপ্রতাপকে যেন ভূতে পেয়েছে। আবারও বললেন, আসোয়ারা কোন্ দিকে অ্যাল্‌বিনোর পায়ের দাগ দেখেছিলো ?

যেখানে মাচা বাঁধা হয়েছে—সেখানেই ত' দেখেছিল বলল।

পিস্‌কি নদীতে ? ভানুপ্রতাপ আবার শুধোলেন।

হ্যাঁ। তাইই ত' শুনেছি।

বিষেণদেওর গলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছিল ভানুপ্রতাপের জেরার তোড়ে।

কিন্তু ব্যালিস্টিক্ মিসিল-এর মত বারোফুটি শীস দিয়ে কন্ট্রোল-করা সাপ ছেড়ে এরা মামা-ভাগ্নেতে অ্যাল্‌বিনো বাঘটাকে নিয়ে যে কেন পড়লেন বুঝলাম না। অথচ সাপটার কথা আমরা ভুলেও উচ্চারণ করতে পারছি না। মধ্যে এই গোলমালে এ জন্মে অ্যাল্‌বিনো মারার চান্সটাই আমার হাতছাড়া হবে মনে হচ্ছে। মনই খারাপ হয়ে গেল। কাল সকালেও ছুলোয়া হবার নয়, কারণ দুপুরের খাওয়ার পর আমাদের দুজনেরই ত' আবার পেট-আপসেট করবে। পেটের মধ্যে কি হয় না হয় তা একমাত্র পেটের মালিকই জানে।

তাই পেটের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আজ বিকেলে ভাবছি, একবার পিস্‌কি নদীতে গিয়ে পাগ-পার্কসগুলো দেখে আসব।

বিষেণদেওবাবু বললেন, খালি হাতে যাস্‌ না ; আর একাও নয়। অত বড় বাঘ। বুড়োও হয়েছে। কি রকম মেজাজ থাকে, কে বলতে পারে ?

ভানুপ্রতাপ ঋজুদাকে বললেন, চলুন না, বিকেলে ঘুরে আসি।

ঋজুদা খুশী মুখে বলল, যাব। ভালোই ত'। ঘুরে আসা হবে।

বিষেণদেওবাবু হঠাৎ বললেন, পিস্‌কি নদী কোথায় আপনি জানেন ? ওদিকে গেছিলেন নাকি এদিকে আসার পর ?

পিস্‌কি ? ঋজুদা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বলল, এসব জঙ্গল আমার অচেনা। পিস্‌কি নদী কোথায় তা তো জানি না আমি। বলেই, ইচ্ছে করে হাত ঘুরিয়ে পিছন দিকে নাচ-ঘরের দিকে দেখালো। বলল, ঐদিকে ?

না, না ওদিকে নয়। ভানুপ্রতাপ বললেন।

তারপর বললেন, কাল রাতে কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনেছিলেন ? আপনাদের দুজনের কেউ ?

আওয়াজ ? হ্যাঁ। ব্রিজনন্দনজী গিয়ে আমাদের সাবধান করে দিলেন।

ব্রিজনন্দন ? বিষেণদেও জিজ্ঞেস করলেন—ওঁর মুখে একটা রাগের ছায়া এসেই সরে গেল। অবাক গলায় বললেন, ব্রিজনন্দন গেছিল আপনাদের সাবধান করতে ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, হ্যাঁ। আমিই বলে দিয়েছিলাম।

তারপর ?

বিষেণদেও ঋজুদার চোখে চোখ রেখে বললেন।

তারপর এই আপনার রুদ্দ্‌রবাবু। এতটুকু ছেলে এমন বাজের মত নাক ডাকে পাশে শুয়ে যে, বাইরের কোনো শব্দই কী আর শোনার উপায় ছিল ? নইলে ভূত-পেত্নীর আওয়াজ কখনও শুনিনি, শোনার ইচ্ছে ছিল খুবই।

আপনারা কাল এক ঘরে শুয়েছিলেন বুঝি ? বিষেণদেওবাবু শুধোলেন।

হ্যাঁ। ভয়ে। ছেলেটি কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমিও মশাই ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটিয়েছি—জন্তু জানোয়ারের ভয় আমার নেই—সে যে জন্তুই হোক আর যত হিংস্রই হোক—বলেই আড়চোখে চাইল একবার আমার দিকে। তারপর বলল, কিন্তু এই অশরীরী ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আমার, ঠিক ভয় বলব না ; অস্বস্তি আছে একটু। এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করি সবসময়। তবে রুদ্র নাক না-ডাকালে শুয়ে শুয়ে শুনতে আপত্তি ছিলো না।

বিষেণদেওবাবু খাবারের থালায় মুখ নামিয়ে বললেন, তাহলে বলুন ভানু ভালই করেছিল ব্রিজনন্দনকে পাঠিয়ে আপনাদের কাছে। ভানুর দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান বাড়ছে আস্তে আস্তে। খুব ভাল। খুবই ভাল বলতে হবে

ভানুপ্রতাপ বললেন, ঠাট্টা করছো মামা ?

ঠাট্টা ? সত্যিই বলছি। কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। এই ত' চাই। মেহমানদের দেখভাল সকলে করতে পারে না ; জানেও না। এর মধ্যেও খানদান-এর ব্যাপার থাকে। তোর বাবার গুণটা পেয়েছিস দেখে ভাল লাগছে।

ঋজুদা আমার ঘরের খাটে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পাইপ খাচ্ছিল।

বলল, একটু আরাম করে নে রুদ্র। ঘণ্টাখানেক পর বাথরুমে গিয়ে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে হবে। যত জোরে পারিস ; শব্দ করে।

মুরগী-মুসল্লম্‌টা বড় ভালো করেছিল, উগরে দিতে বলছ ?

আমি বললাম।

হ্যাঁ। সরি রুদ্র। উগরেই দিতে হবে। গোয়েন্দাগিরির সবে হাতেখড়ি হচ্ছে আমাদের। অনেক কিছুই করতে হবে। গোয়েন্দাগিরি কি চাট্টিখানি কথা ?

আমি বললাম, ঋজুদা, কেস্‌টার কি বুঝছ ? কিছু কি ক্লু পেয়েছো ? মার্ডারি-টার্ডারি হবে নাকি ?

যে-কোনো মুহূর্তে। ঋজুদা গম্ভীর মুখে বলল।

তারপর বলল, আজ সকালে তোকে দিয়েই এ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফেলেছিল প্রায়। একটুর জন্যে মিস্ করে গেল।

সকাল থেকে আমার চোখের সামনে কেবলি সাপটার চেহারা ভাসছিল। ভাবলেই, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল আমার। কী একখানা সাপ ?

ঋজুদাকে বললাম, ওটা কি সাপ ঋজুদা ?

তখন থেকে আমিও বোঝবার চেষ্টা করছি। কাছাকাছি এসেছি, তবে ঠিক কী-না জানি না। কোলকাতা গিয়ে বাদুর স্নেকপার্কে গিয়ে দীপকবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমার অনুমান ঠিক কী-না। ভদ্রলোক খুবই ওয়েল-ইনফর্মড এসব ব্যাপারে।

সাপেদের নাকি কান নেই। আমি বললাম।

না কান নেই। কিন্তু সাপেরা যে শুনতে পারে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ম্যালকম্ স্মিথ-এর রেপ্‌টালিয়া এন্ড অ্যাম্ফিরিয়া বইয়ের খুব সম্ভব তৃতীয় চ্যাপ্টারে, যেখানে সার্পেন্টিস্ সম্বন্ধে উনি আলোচনা করেছেন, সেখানে উনি বলেছেন : It is difficult to say much this lack of auditory apparatus has affected their hearing, or whether they have any compensatory machanism to make up for it, but that they can hear very well is indisputable.

তারপর বলল, আসলে, যে-কোনো শব্দ যে তরঙ্গ তোলে আবহতে, তাতেই সাপেরা শুনতে পারে। ওদের একটিমাত্র sensory area আছে—তাবে বলে Papilla basilaris. সেই জায়গাতেই শব্দ-তরঙ্গ লহরী তোলে। তাই শীষ্ দিয়ে যে লোকটি ঐ এতবড় বিষাক্ত সাপকে শত্রুনিধনের জন্যে ব্যবহার করছে, তাকে বাহাদুরী দিতে হয়। পাকা সাপুড়ে।

সাপটা কি সাপ তা ত' বললে না ?

যতদূর মনে হচ্ছে, সাপটা ওফিফাগাস্ ভ্যারাইটীর। আমাদের পুরাণ সাহিত্যে যাকে নাগ বলে। নাগের মধ্যে এ হচ্ছে যম-নাগ। খালি অন্য সাপ খেয়েই থাকে এরা। বড় গাছের কোটরে অথবা বড় বড় গাছের ডালে পেঁচিয়ে থাকে। অ্যাল্‌বার্ট গান্থার সাহেব, আঠারশ একষট্টি সালে তাঁর যে বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, দ্যা রেপটাইলস্ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, সে-বইতেও তিনি এ-সাপের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। পাওয়া যায় অনেকই জায়গায়, কিন্তু খুবই দুষ্প্রাপ্য সাপ। এর কামড় একবার খেলে আর দেখতে হত না। অবশ্য যদি পেট-ভরা থাকে সাপেদের, তাহলে বিষের তেজ কম হয়। সব বিষাক্ত সাপই

যত উপোস থাকবে, তার বিষ তত বেশি হবে।

আফ্রিকাতে আছে এই সাপ ? আমি ঋজুদাকে শুধোলাম।

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে কী যেন ভাবছিল পাইপ খেতে খেতে।

আসলে এই সাপ ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ছোট কি বড়, বিষধর কি নির্বিষ ; যে-কোনো সাপ দেখলেই আমার গা-ঘিন্‌ঘিন্ করে। মা-বাবার সঙ্গে একবার স্কুলের ছুটিতে বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়ে একটা শঙ্খচূড় সাপ মেরেছিলাম। ওখানে যে-বাড়িতে ছিলাম আমরা, সেখানে একটি মেয়ে কাজ করত। সে একদিন সকালে দৌড়ে এসে কেঁদে পড়ল। তার ছেলেকে শঙ্খচূড় সাপে কামড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ। আর তাদের গ্রামের পথের পাশেই একটা গর্তমত জায়গায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে সাপটা। লোকেরা লাঠি নিয়ে গেছিল মারতে, তাদের এমন তাড়া করেছে যে, তারা পালিয়ে এসে বেঁচেছে কোনোক্রমে। বন্দুক নিয়ে গিয়ে মেরেছিলাম সাপটাকে—কিন্তু গুলি খাওয়ার পরও তার কী আস্ফালন। গর্তর মধ্যে বাঁশগাছগুলো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলো। এখনও মনে হলে, ভয়ে গা শিউরে ওঠে। গ্রামের লোকেরা আমায় কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেছিল, ছোট্ট ছেলে বলে—। মা খুব আদর করেছিলেন আর বকেওছিলেন।

ঋজুদা তখনও কি ভাবছিল।

আমি আবারও বললাম, আফ্রিকাতে আছে ? ঋজুদা ?

ঋজুদা বলল, না। এই সাপ নেই। এদের দেখা যায় সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপিনস্, আর আন্দামানে। ডুমেরিল সাহেব অবশ্য বলেছেন যে, নিউগিনিতেও এই সাপ দেখেছিলেন তিনি।

ঋজুদা বলল, আমি শুধু ভাবছি, এমন এক সাপ পোষ মানিয়ে এমন কাজে কে লাগাতে পারে ?

তারপরই বলল, উত্তরপ্রদেশে বেহেড়িয়া বলে একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বন্য-প্রাণী বশ করতে ওস্তাদ। তোদের ঐ বিন্ধ্যাচলের কাছেই মীর্জাপুর জেলায় শিউপুরা গ্রামে একটা লোক আসত বিন্ধ্যাচল পাহাড় থেকে নেমে ; ওখানে জেঠুমণির সঙ্গে আমিও একবার গেছিলাম, সেই লোকটা ছিল ঐ সম্প্রদায়ের। সে আমাকে বলত যে, ও কুমীরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। সেইই ত' জেঠুমণিকে একবার শম্বর মারার জন্যে নিয়ে গিয়ে ভুল করে মীর্জাপুরের কুখ্যাত লেঠেলদের গ্রামের পেছনের দু'পা বাঁধা একটা ঘোড়া মারিয়েছিল। রাত্তির বেলা।

আমি ঋজুদার কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, জেঠুমণির কাণ্ড।

ঋজুদা বলল, সব বেহেড়িয়াই যে ওরকম আনাড়ি তা নয়। বেহেড়িয়ারা সব পারে।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে ঋজুদা বলল, রুরুদ্দরবাবু আপনার পেট-আপসেট হবার টাইম হয়েছে। প্রথমে জোর বমি। তারপর ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট বাদে বাদে তুই আর আমি দুজনেই বাথরুমে যাব। এত জোরে শব্দ করে ফ্লাশ টানতে হবে যে মনে হবে বাড়ি বুঝি ভেঙেই পড়ল। আওয়াজটা ত' বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপের শোনা দরকার। কি বলিস ?

গুরু-আজ্ঞা। অতএব আমার পেট গড়বড় হল। গুরুরও হল। তবে কম। কিন্তু তখন যদি জানতাম এর পরিণাম কি হতে পারে।

বিকেল চারটে নাগাদ বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আমরা ভাবলাম, বেয়ারা চা

নিয়ে আসছে। ঠিক করেছিলাম, বেয়ারাকে চা রেখে যেতে বলব, তারপর চলে গেলে মাঠ্‌রী এবং বোঁদে মেরে দেব। ফাস্টক্লাশ টেস্ট।

কিন্তু যে এল, সে বেয়ারা নয়। স্বয়ং বিষেণদেওবাবু।

বললেন, মনে হচ্ছে কারো শরীর খারাপ। যে বেচারী হ্যান্ডপাম্প দিয়ে কুঁয়ো থেকে জল তোলে ওভারহেড-ট্যাঙ্কে সে এসে বলছে ট্যাঙ্কের জল শেষ। খুবই কি বেশি অসুবিধে।

ঋজুদা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, আসুন আসুন। তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, ছেলেটা মারা যাবার উপক্রম। আপনি আসবেন ভেবে আগে খবর দিইনি, তাছাড়া এতটা যে বাড়াবাড়ি হবে তাও......হাতের জল শুকোতে পাচ্ছে না।

এত অসভ্য ঋজুদাটা! এই ভাষা বলতে পারে ঋজুদা, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে অনেক কিছুই করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিষেণদেওবাবু বললেন, সারা দুপুর ফ্লাশ টানার ঘনঘন আওয়াজ শুনেই আমি বুঝেছিলাম। যাকগে, আমি ওষুধ নিয়েই এসেছি সঙ্গে করে। জংলী জায়গা। হাতের কাছে সব ওষুধই মজুত রাখতে হয়।

আমি মনে মনে বললাম, সাপের হাত থেকে বেঁচেছি, এবার ওষুধ বলে বিষ খাইয়ে দেবেন ইনি।

আমার চোখের ভাষা ঋজুদা বুঝল।

বলল, কি ওষুধ? দেখি! বলেই, ওষুধটা ইজীচেয়ারে-বসা বিষেণদেওবাবুর হাত থেকে নিল। এন্টারোস্টেপ। পড়ল নামটা।

চারটে ক্যাপসুল নিয়ে এসেছিলেন উনি।

ঋজুদা বলল, খাইয়ে দেব ওকে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দেব নয় মশাই, এক্ষুনি খাওয়ান। এখানে অসুখ বেড়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।

ঋজুদার মুখের ভাব করুণ হয়ে উঠল। হঠাৎই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল আমার সঙ্গে। বলল, আমারটা তেমন সীরিয়াস নয়—ঐ আপনার রুরুদ্‌দ্‌রবাবুরই কেস খুব সীরিয়াস।

বিষেণদেওবাবু হঠাৎ ইজীচেয়ার ছেড়ে উঠে লাল-ভেজা-কম্বলে ঢাকা মোরাদাবাদী কলসী থেকে রুপোর গ্লাসে নিজের হাতে জল ঢেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আও বেটা, দাবা লে লেও। চার-গোলী একসাথ্।

ওঁর সামনেই খেতে হল। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চার-চারটে এন্টারোস্টেপ। বলতে গেলে কলেরারই ওষুধ।

ওষুধ খাইয়ে বিষেণদেওবাবু ঋজুদাকে বললেন, বিকেলে হাঁটতে বেরোবেন না?

ঋজুদা বলল, দেখি, এখন ছেলেটা কেমন থাকে।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদাকে বললেন, চা পাঠিয়ে দিই গিয়ে?

ঋজুদা বললেন, দিন। শুধু আমার জন্যে।

বিষেণদেওবাবু চলে যেতেই, আমি ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা ডান হাতে পাইপ ধরে বাঁ হাতটা আমার নাকের সামনে তুলে বলল, তুই শার্লক-হোমস পড়েছিস?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, এটা কি হল? তুমি এমন করে লেট-ডাউন করলে

আমাকে। নিজে কেটে গেলে ; আমাকে ডুবিয়ে।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইটস ওল্ ইন দ্যা গেম।

আমি স্তোকবাক্যে না ভুলে প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, ঈসস-স। বললাম, কাল সকালে কি হবে আমার ?

সেইটাই হচ্ছে কতা। বলেই, ঋজুদা একবার উঠে গিয়ে বারান্দায় কেউ আছে কি নেই দেখে নিয়েই হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর আমার কাছে এসে বলল, সরী, ভেরী ভেরী সরী ; রুদ্র।

আমি ভাবছিলাম, কালকে সারাদিন, অথবা কে জানে পরশুও হয়ত আমার কেবলই মনে হবে এর চেয়ে বিষেণদেওবাবু আমাকে বিষ খাওয়ালেই খুশী হতাম।

ঋজুদার জন্যে চা এল। মাঠরী এবং বোঁদেও এল।

ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, লোভে পাপ ; পাপে মৃত্যু।

তারপর বলল, যাক ওয়াট্সনের খাতিরে শার্লক হোমস না-হয় আজ শুধু চা-ই-ই খেল। মাঠরী এবং বোঁদে স্যাক্রিফাইস করলাম আমি তোর জন্যে। বুঝলি কমরেড।

আমরা বিকেলে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলাম। বাইরে বেলা পড়ে এসেছিল। নাচঘরের কাছে বুনো নিমের সবুজ অন্ধকারের মধ্যে অল্প কটা ইউক্যালিপটাসের সাদা নরম গা-মাথা দারুণ কনট্রাস্ট-এর সৃষ্টি করেছে। সাদা নরম গাছের গায়ে প্রথম ভোরে এবং শেষ দিনের আলো যেমন করে আলতো হাতে রঙ লাগায় এমন আর কোনো গাছেই লাগায় না। সুন্দরবনের সাদা বানীগাছ, পালামৌর চিলবিল আর আফ্রিকার ইয়ালোফিভার এ্যাকাসিয়াকে গোধূলির আলোতেই দেখতে হয়।

এক ঝাঁক টিয়া এক স্কোয়াড্রন সবুজ ক্ষুদে জেট-প্লেনের মত উড়ে যাচ্ছে। কোট্রা হরিণ ডাকছে পশ্চিমের জঙ্গল থেকে। নানারকম পাখির মিশ্র আওয়াজ। হঠাৎ নিঃশব্দ পায়ে দিন চলে গিয়ে যে রাত এলো, তা বোঝা গেল যখন একটা হুতুম প্যাঁচা তার কামানের গোলার মত ডাক ছুঁড়ে গার্ড-অফ-অনার দিল রাতকে। দুররগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্-ম্-ম্।

আমার অবস্থা কাহিল। মিথ্যা পেট্ আপসেট হওয়াতে এবং সত্যি এন্টারোস্টেপ্ খাওয়াতে। তাই বিষেণদেওবাবু এবং ভানুপ্রতাপ দুজনেই উপরে এলেন। কাল সকালে ছুলোয়ার বন্দোবস্ত করবেন কি করবেন না তা নিয়ে আলোচনা হল। ঋজুদা যেহেতু ওষুধ খায়নি, বলল, আমি ত' যেতে পারিই, কিন্তু আমি ত' মারব না—যার সবচেয়ে উৎসাহ বেশি, সেই-ই যদি...।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দাবা লেনেকা বাদ ভি টাট্টী...... !

এত অসভ্য। ভাবলাম আমি। ঋজুদার উপর ভীষণই রাগ হল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, তব্ ঔর্‌ভি চার-গোলি মাঙ্গাতা ম্যায়। খা লেও তুরন্ত্।

শুনে, ভয়েই আধমরা হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, না না, ওষুধ খাওয়ার পর আর......একেবারেই.....

ঋজুদা আমাকে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে বলল, ও ত' রাতে কিছুই খাবে না, আমিও খাবো না। কালকে ছুলোয়া না করলেই ভাল। রুদ্র বেচারী। মারতে না পারুক, দেখতে ত' পারবে অ্যাল্‌বিনো বাঘটাকে !

দেখতে মানে ? মারতেও পারবে জরুর। বিষেণদেওবাবু বললেন। আসোয়া আর তার বেটা রত্ন নিজের চোখে দেখেছে।

বললাম, কেমন দেখতে ?

ছাই-ছাই রঙ, কটা চোখ, আর দাড়ি-গোঁফওয়ালা হলুদ একটা ঘোড়ার মত দেখতে। দিখ্‌কে দিমাগ্ খারাপ হো যায়গা।

শুনেই দিমাগ খারাপ হচ্ছিল আমার। তারপর কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে ওঁরা নেমে গেলেন। বললেন, রাতে মিছরির শরবত খেয়ে যেন শুই।

ওঁরা চলে গেলেই আমরা ঘরের ভিতরে এলাম। ঋজুদা বলল, এর আগেও অ্যাল্‌বিনোর যা ডেসক্রিপ্‌শান ওঁরা দিয়েছেন তার সঙ্গে কিন্তু আসল অ্যাল্‌বিনোর চেহারা মিলছে না। আমি মধ্যপ্রদেশের ভীণ্ডার রাজার কাছে অ্যাল্‌বিনোর গল্প শুনেছি। উনি একটা মেরেছিলেন, যখন তোর মত বয়স ওঁর। অ্যাল্‌বিনোর গায়ের রঙ, লোম, সব সাদা হয়। আর চোখের রঙ হয় গোলাপি অথবা হাল্‌কা নীল। ভীণ্ডার রাজার বাঘটার চোখের রঙ ছিল গোলাপি। বুঝতে পারছিস ? এই মালোয়াঁ-মহল ঘিরে অনেকই রহস্য আছে। এক নম্বর রহস্য অ্যাল্‌বিনো। দু' নম্বর, নাচঘর। তিন নম্বর, ভূত। চার নম্বর, ভূতের ঘোড়া। পাঁচ নম্বর, পেত্নী। ছ' নম্বর, পেত্নীর গান। সাত আর আট নম্বর ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার। ন'নম্বর, ওফিকাগাস সাপ। দশ নম্বর, ভানুপ্রতাপের বাবা ও মার হঠাৎ এবং এত অল্প দিনের ব্যবধানে মারা যাওয়ার রহস্য।

আমি বললাম, আরও একটা রহস্য আছে।

কি ? ঋজুদা বলল।

ভানুপ্রতাপের বিদেশী ট্যুওয়ার গাড়িটা দেখেছিলে ?

হ্যাঁ। ঋজুদা বলল।

আমাকে প্রথম দিন রাস্তায় দেখা হতেই তুলে নিয়ে গেছিলেন উনি গীমারীয়াতে। মনে আছে ?

হ্যাঁ।

ঐ গাড়িতে খস্‌স্ আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম—আর সেই গন্ধ ছাপিয়ে একটা বোঁটকা বাঘ-বাঘ গন্ধ। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে ?

ভানুপ্রতাপ বলেছিলেন ওঁর গাড়িতে উনি গরমের দিনে খস্‌স্ আর শীতের দিনে অম্বর আতর স্প্রে করিয়ে রাখেন।

হুম্‌ম্......ম্। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, গন্ধটা বাঘ-বাঘ, তোর ঠিক মনে আছে ?

ঠিক বাঘেরই কি-না জানি না, তবে বাঘ-বাঘই মনে হয়েছিল।

তাহলে ; এগারো নম্বর—রহস্য বোঁটকা-গন্ধ। আমাদের এই এগারোটি রহস্য ভেদ করতে হবে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এটা অন্যায় নয় ? প্রথমেই কি কাউকে গোয়েন্দাগিরিতে ডক্টরেটের থীসিস্ সাবমিট করতে বলা উচিত ? বল্ রুদ্র ! একটু সোজা কেস এবং একটা-দুটো রহস্য দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হলেই ভালো হত না ?

বললাম, ভালো ত' হত ! কিন্তু......

॥ ৮ ॥

টেলিগ্রামটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে আমরা কেউই ভাবিনি। কাল দুপুরে আমার যখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা—অসুখে নয়, ওষুধ খেয়ে ; তখনই টেলিগ্রামটা এল।

ভট্‌কাই, আমার পিস্‌তুতো ভাই, এবং ঋজুদার গ্রেট অ্যাড্‌মায়ারার খুব প্রমপ্‌ট্‌ অ্যাকশ্যান নিয়েছে। অনেকদিন ধরেই ওর আমাদের সঙ্গে আসার ইচ্ছা। ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে পড়ে ও ক্ষুদে ডিটেক্‌টিভ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ঋজুদা হয়ত এর পরের বার ওকেও আমাদের সঙ্গে নেবে। ভট্‌কাই সঙ্গে থাকলে একেবারে জমে যাবে ব্যাপার-স্যাপার। শারীরিক কারণে এমনিতেই কান্না পাচ্ছিল, তাই টেলিগ্রাম পেয়ে কাঁদতে অসুবিধে হয়নি একটুও। মনে মনে, মায়ের আয়ু বেড়ে যাবে এই প্রার্থনা করে, মায়ের অসুখের খবরে খুব কাঁদলাম।

ঋজুদা বিষেণদেওবাবুদের মিথ্যে বলল, কবেকার টেলিগ্রাম কবে এলো। তবুও চলে যা রুদ্র, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে চলে যা। মা যদি ভাল থাকেন তবে ফিরে আসিস্‌ সঙ্গে সঙ্গে। তোর জন্যে আমরা দু'দিন অপেক্ষা করব। বীটিং করাবো না অ্যাল্‌বিনোর জন্যে। ওঁরা বললেন, আলবাৎ ! আলবাৎ ! ছেলেমানুষ, সবচেয়ে উৎসাহ বেশী ! ও না থাকলে !

আমাকে একা গাড়ি চালিয়ে যেতে সকলেই মানা করছিলেন। ঋজুদাও, দেখাবার জন্যে। আমি বললাম, ঠিক আছি আমি।

ধানবাদে গাড়ি রাখতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। নারাং আয়রণ অ্যান্ড স্টীলের অরুণ নারাং খুব আদর-যত্ন করলেন রাতে। অনেক কিছু খেতে বললেন। কিন্তু খাব কি !

ঋজুদার বাড়ি পৌঁছে বেল দিতেই গদাধর গেট খুলল। আমি বললাম, কাউকে বলবে না যে আমি এসেছি। আমি আজ রাতেই ফিরে যাব। গদাধর বলল, কি গো খিচুড়ি খেইবে নাকি ?

ভীষণ রেগে বললাম, একদ্দম্‌ খাওয়ার কথা বলবে না।

গদাধর আহত হল। আমি যে কতখানি আহত ; তা যদি গদাধর জানত !

চান করে নিয়ে সোজা মিনি ধরে চলে এলাম ড্যালহাউসী পাড়াতে। গ্রেট্‌ ইস্টার্ন হোটেলের পাশেই—ওয়াটার্লু স্ট্রীটের ঠিক মোড়ে কাথবার্ট্‌সন হার্পারের দোকান। আমি এতদিন এটিকে শুধু জুতোর দোকান বলেই জানতাম। কিন্তু একসময়ে এঁদের প্রধান ব্যবসা যে ছিল জংলী জন্তু জানোয়ারের চামড়া ট্যানিং করা, ট্রোফি মাউন্টিং করা, স্টাফিং করা, তা জানতাম না। কতটুকুই বা জানি আমি। কতদিনই বা জন্মেছি।

ম্যানেজার হালদারবাবুকে খোঁজ করতেই, আমাকে গুপী বলে একজন বুড়োমত লম্বা লোক ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলো সুইং-ডোর ঠেলে। কোমরে কোঁচা গোঁজা, ধুতির উপরে সাদা ফুলহাতা শার্ট, আর ঘি-রঙের জিনের কোট পরে হালদারবাবু বসেছিলেন সামনে পানের ডিবে নিয়ে।

বললেন, কি চাই খোকা ?

আমার খুব রাগ হলো। এখনও খোকা। কাল থেকে আমার পৃথিবীর সকলের উপরই রাগ হচ্ছিল। যতক্ষণ না রাগের কারণটা ক্লিয়ার হচ্ছে, ততক্ষণ রাগ থাকবেই। তবু, রাগ না করে ঋজুদার চিঠিটা ওঁকে এগিয়ে দিলাম।

উনি আদ্যোপান্ত পড়লেন। পড়ে বললেন, করেছিই ত'।

কি করেছেন তা আর বললেন না।

খোকা, তোমার সঙ্গে বোসসাহেব কিছু পাঠাননি ?

আমি চমকে গেলাম।

—কি হল ? বোস্‌সাহেব যে লিখেছেন আপনার হাতে......

আমার মনে পড়ল, ঋজুদা একটা বড় খামও দিয়েছিলো বটে ওঁকে দেওয়ার জন্যে।

খামটা এগিয়ে দিলাম ব্রিফকেস থেকে বের করে।

উনি ওটাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন, তারপর ফিরে এসে বললেন, হুঁ, মিঃ বোসকে বলবেন যে, তিনি যা ভেবেছেন তা ঠিক। কিন্তু এ জিনিস বোসসাহেব পেলেন কি করে?

আমি বললাম, তা ত' আমি জানি না।

অ! জানো না। স্ট্রেঞ্জ!

তারপর বললেন, বোসসাহেবকে বোলো যে, জিনিসটি ডেলিভারী দিয়েচি মাত্র মাস দেড়েক আগে। আমি বিল নম্বর অর্ডার নম্বর সব নোট করে রাখব। অর্ডার বুক, বিল বুক, ডেলিভারী বুক সব ঠিকঠাক রাখব। বোলো, কোনো চিন্তা নেই। বোসসাহেবের সঙ্গে ত' আমার আজকের সম্পর্ক নয়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, বোসসাহেবের জেঠুমণি একবার একটা শম্বর মেরে তার চামড়া ট্যান করতে দিয়ে গেলেন। চামড়া ট্যান হতে না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো, বুঝলে খোকা, সেই শম্বরের চামড়ার জুতো বানানোর জন্যে। অত বড় ব্যারিস্টার, কত জানাশোনা, সকলকেই একটি করে স্লিপ ধরিয়ে দিয়েচেন—যাও কাথবার্টসন গেলেই জুতোর মাপ নেবেন ওঁরা আর শম্বরের চামড়ার জুতো বানিয়ে দেবেন। পয়সা দেবে না তোমরা কেউ।

আমার মজা লাগছিল, ঋজুদার জেঠুমণির কথা ওঠাতে।

হালদারবাবু বললেন, তা বোঝই ত' একটা শম্বরের চামড়াতে কি আর একশ তেত্রিশ জন লোকের দু'পাটি করে জুতো হয়?

—জেঠুমণি কি আবারও শম্বর মারলেন? আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

হালদারবাবু বললেন, মাত্তা খারাপ; শম্বর কি মশা না মাছি যে, মারলেই হল? শেষে আমিই মুশকিল আসান করলুম।

—কি করলেন?

—ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে শম্বরের রঙ করে দিলুম—চামড়া চেঁচে রাফ্ করে নিয়ে। বোস সাহেবের সম্মান রাখা নিয়ে কতা। আমি কিন্তু কোনোই তঞ্চকতা করিনি। কোনো লোককে বলিওনি যে, শম্বরের চামড়াই দিচ্চি। বোসসাহেব জুতো বানাতে লিখেছেন, আমিও জুতো বানিয়ে দিয়েচি। ওঁদের সঙ্গে বোসসাহেবের কি কথা হল না হল আমি জানব কি করে? ব্যারিস্টার মানুষ। শম্বরের চামড়া শেষ হয়ে যাবার পর উনিও কোনো চিঠিতে লেখেননি যে, একে শম্বরের চামড়ার জুতো বানিয়ে দাও। শুধু লিখেছিলেন, জুতো বানিয়ে দেবেন। কতায় বলে, শতং বদ মা লিখ।

ঋজুদা যে খামটি দিয়েছিল সেটি আবার বন্ধ অবস্থায় ফেরত দিয়ে উনি বললেন, এসো খোকা।

এবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

আই. জি. সাহেবের নামেও ঋজুদা একটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির উপরে লেখা, কোটাল-বন্ধু।

আই. জি. সাহেব চিঠি পড়েই বললেন, নো-প্রব্লেম। আমি বিহারের আই. জি. সাহেবের অফিসে কথা বলে হাজারীবাগের এস. পি. ও ডি. এম.-কে ওয়্যারলেস করিয়ে দিচ্ছি। তারপর বললেন, তুমি ফিরবে কবে?

আজই বিকেলে। কোলফিলড্ এক্সপ্রেস ধরে রাতে ধানবাদে পৌঁছব। তারপর রাতটা ওখানে থেকে ভোরে গাড়ি নিয়ে যাবো মুলিমালোয়াঁতে।

আই. জি. সাহেব বললেন, তোমার ট্রেন কোলকাতা ছাড়বার আগেই যেখানে যেখানে খবর পৌঁছবার পৌঁছে যাবে। তারপর বললেন, এক সেকেন্ড বোসো, তারপর ওঁর পি. এ.-কে যেন কী বললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার লাইসেন্সটা ?

একটু পরই ওঁর ফোনটা বাজল।

উনি বললেন, তোমার পিস্তলের লাইসেন্স হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ওক্‌কে হয়ে গেছে। তোমাদের গান-ডীলার ডেলিভারী নিয়ে গেছেন। গুডলাক। ঋজুবাবুকে বোলো। আমি উঠতে যাব, এমন সময় বললেন, স্টেশনে যাবার সময় লালবাজার থেকে ট্রান্সমিটারটা নিয়ে যেও। ঋজুবাবুকে বোলো—পাস-ওয়ার্ড হচ্ছে, "গুল্‌লি-অলি।" মনে রেখো, গুল্‌লি-অলি।

আমি ওখান থেকে বেরিয়ে ফেয়ারলি প্লেসে গিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলেই চৌরঙ্গীতে ইস্ট-ইন্ডিয়া-আর্মস কোম্পানীর দোকানে গেলাম। ঋজুদার কথামত এ-বি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম।

একজন ধুতিপরা, ফর্সা, খুব লম্বা, ভদ্রলোক, সামনের দিকে চুল কম, স্ট্রাইপড্-ফুলহাতা শার্ট কিন্তু হাতা-গুটিয়ে খদ্দেরদের নানারকম বন্দুক রাইফেল দেখাচ্ছিলেন। তাঁর কাছেই আমাকে নিয়ে গেল ছোটে বলে, খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন বেয়ারা।

এ-বি বাবু বললেন, কিসের জন্য আসা হয়েচে ?

ঋজুদার চিঠিটা দিলাম ওঁকে।

উনি বললেন, অ ! তুমিই সেই আফ্রিকা-ফেরত ছোঁড়া ? কি যেন নাম, শূদ্র না কি যেন ? যে, ঋজুবাবুকে ঢুষুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছেল।

বললাম, শূদ্র নয় ; রুদ্র। আর ঢুষুণ্ডা নয়, ভুষুণ্ডা।

উনি বললেন, ঐ হ'ল।

তারপর বললেন, অজিতবাবু, সেই লামা পিস্তলটা বের করুন ত'।

টু-টু বোরের একটা দারুণ ঝক্‌ঝকে পিস্তল লোহার আলমারী থেকে বের করে দিলেন অজিতবাবু।

এ-বি বাবু বললেন, নাও এইটে তোমার। ঋজুবাবু তোমাকে প্রেজেন্ট করেছেন রেজাল্ট ভালো করায়।

কিন্তু এটা আমার কেন বলছেন ?

আজ্ঞে ? কেন মানে ? লাইসেন্স-এর অ্যাপ্লিকেশানে সই করার সময় দ্যাকোনি কিসে সই করছ ?

—না ত'। ঋজুদা বলেছিল সই কর, সই করে দিয়েছিলাম।

—বেশ করেচো !

—কোন্ দেশী এটা ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লামা ? স্প্যানিশ্ !

ও ! আমি বললাম।

উনি বললেন, কি করে হ্যান্ডল্ করতে হয় জানো ত' ?

এ্যাই দ্যাকো—এই হচ্ছে ম্যাগাজিন ; এ্যাই এমনি করে গুলি ভ'রবে ; এই দিলে ত'

ভেতরে, এই কক্ করলে ; আর এই হচ্ছে সেফ্‌টি। খুব সাবধান। এ বড় সব্বনাশা জিনিস্। বুয়েচো!

—বললাম, তা টু-টু পিস্তল দিয়ে কি মানুষ মরবে ?

—মরবে না ? বল কি হে তুমি ! আরে ঐ যে গো, আমাদের জ্যাকি কেনেডির দেওর গো, ধুত্তেরি আমার কিস্সুই মনে থাকে না, সেই থমাস কেনেডি না কি যেন ?

—রবার্ট কেনেডি ? আমি বললাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ! সেই রবার্ট কেনেডি তাকে হোটেলে কোন্ পিস্তল দিয়ে মারলে ? মরবে না মানে ? বুকের উপরের যে কোনো জায়গায় ঠুকে দেবে—ব্যস্স্ তার আত্মীয়রা গিয়ে নিমতলায় কাঠ কিনতে লাইন দেবে সঙ্গে সঙ্গে। কোনো দেরী নয়। এক দিক দিয়ে গুলি ঢুকবে, অন্য দিক দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

তারপর একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে কি প্রতিক্রিয়া হ'ল দেখে নিলেন একটু।

তারপর বললেন, এই নাও। আর গুলিও নিয়ে যাও। লাইসেন্সটাও নাও। দাঁড়াও, এন্ট্রি করে নিই গুলিগুলো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এ-বি বাবু সটান উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, এইটে নিয়ে আবার চলে যাও অস্ট্রেলিয়া, গিয়ে ঢুষুণ্ডাকে সাব্ড়ে দিয়ে এসো।

আমি বললাম, আজ্ঞে অস্ট্রেলিয়া নয়, আফ্রিকা। আর ঢুষুণ্ডা নয়, ভুষুণ্ডা।

উনি বললেন, আরে যাও ত' ! ঐ হ'ল। ওতেই হবেখ'ন্।

বিরাট দোকানটা থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছিল না আমার। কার্তুজের গন্ধ, বন্দুকের তেলের গন্ধ ; নেশা লেগে যায়।

ওখান থেকে বেরিয়েই বিশপ্-লেফ্রয় রোডে যাবার জন্যে ট্যাক্সি ধরলাম। পথে কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে যেতে হবে ঋজুদার অর্ডার মাফিক।

ট্যাক্সিতে বসে ভাবছিলাম এ-বি বাবুর আসল নামটা যে কি তা ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে আসল নাম যা-ই হোক, এ-বি নামটা আসলে বোধহয় অসম্ভব ভুলো।

ঋজুদার ফ্ল্যাটে ফিরে ভট্‌কাইকে ফোন করলাম। বললাম, থ্যাংক য়ু।

তারপর বললাম, বুঝলি, এবার আর শিকার-টিকার নয়। ডিটেকটিভ-গিরি।

ভটকাই হাসল। বলল, দেশের কী করুণ অবস্থা।

—মানে ?

—মানে, তুইও ডিটেকটিভ হলি !

—আমি বললাম, তোর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার সময় নেই আমার।

—ও বলল, সুনির্মল বসুর লেখা পড়েছিস ?

—মানে ?

—মানে উনি একজন তোর মত গোয়েন্দার গল্প লিখেছিলেন। তোরই মত সায়েন্টিস্ট। এবং ব্রিলিয়ান্ট গোয়েন্দা। সেই গোয়েন্দা এক দারুণ ছারপোকা বিধ্বংসী পাচন আবিষ্কার করেছিলেন। ছোট ছোট হোমিওপ্যাথীর ওষুধের শিশিতে সেই লাল-নীল পাচন বিক্রী করতেন, সঙ্গে ব্যবহার-বিধি লেখা থাকত—কাগজের মোড়কে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কি লেখা থাকত জানিস ?

—কি ? আমি রাগের গলায় বললাম।

—লেখা থাকত—"সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, মুখ হাঁ করাইয়া এক ফোঁটা গিলাইয়া দিবেন—মৃত্যু অনিবার্য।"

আমি চুপ করে থাকলাম। ফাল্‌তু লোকের সঙ্গে কি কথা বলব!

ভট্‌কাই বলল, ওল্ দ্যা বেস্ট—টিক্‌টিকি।

আমি বললাম, এটা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। তোর সঙ্গে আর কথা নেই আমার। ঋজুদা বলেছে রোজ ফোন করে গদাধরদার খোঁজ নিতে—আর আমি এসেছিলাম তা যেন কেউ না জানে।

তারপর বললাম, মা ভালো আছে ত'?

ভট্‌কাই বলল, সীরিয়াসলী ইল্।

আমি ফোন ছেড়ে দিলাম ঘটাং করে।

কথা ছিল, রাতে গিয়ে ধানবাদেই খাব, তারপর ভোর চারটেতে গাড়ি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব। অরুণবাবু নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, গাড়ি সার্ভিস করিয়ে, তেল-মবিল, ব্রেক অয়েল, গীয়ার ও ডিফারেন্সিয়াল অয়েল, ব্যাটারীর জল, চাকার হাওয়া সব চেক-টেক করিয়ে রেডি করে রেখে দেবেন যাতে সকালে গাড়িতে সোজা বসে স্টার্ট দিতে পারি।

স্টেশনে যাওয়ার পথে লালবাজার হয়ে যেতে হবে। ট্যাক্সিতে উঠেই পিস্তলটাকে একটু খুলে দেখলাম।

চুমু খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু চারধারে লোকজন। কে কি ভাববে; পিস্তলটা একটা নরম কিন্তু মোটা পলিথিনের হোল্‌স্টারে আছে। এই হোল্‌স্টারটা বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেই পিস্তলটা কোমরের সঙ্গে ঝুলবে। দেখা যাবে না, জামার তলায় থাকলে।

ভাবলাম, এবার এসো—ওফিফাগাস্ সাপ, অ্যাল্‌বিনো বাঘ...

কিন্তু এন্টারোস্ট্রেপ ট্যাবলেটগুলো যে পিস্তল দিয়ে মারা যায় না।

॥ ৯ ॥

আমি যখন গিয়ে ঢুকলাম ধুলো-মাখা গাড়ি নিয়ে তখন বেলা প্রায় চারটে বাজে। ঋজুদারা সবাই চীনের বসবার হল ঘরে বসে গল্প করছিল।

সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন। কি ব্যাপার? এরই মধ্যে? গিয়েই ফিরে এলে কি রকম?

মা অনেক ভালো আছে। বাবা টেলীগ্রাম পাঠাতে বলেছিল আমার পিসতুতো ভাই ভট্‌কাইকে। বলেই, ঋজুদার দিকে তাকালাম, তারপর বললাম, বুঝতেই পাচ্ছো, কিরকম গেঁতো, ইরেস্‌পন্‌সিবল্ ভট্‌কাইটা! যেদিন টেলিগ্রাম পাঠাতে বলেছিল, তার দু'দিন পরে পাঠিয়েছিলো। ততদিনে মা ভালই হয়ে গেছে বলতে গেলে। মধ্যে দিয়ে আমার এই হয়রানী!

মায়ের কি হয়েছিল? বিষেণদেওবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

এ্যাই সেরেছে! তা ত' জানি না। ঠিকও করিনি কিছু, কী বলব না বলব। মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল ঐ, ঐ, আমারও যা হয়েছিল—প্রায় কলেরারই মতন।

বিষেণদেওবাবু একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, তাহলে দ্যাখো রুরুদ্দ্‌রবাবু, কেমন ওষুধ দিয়েছিলাম তোমাকে। চার গোলিতেই ফিট্।

আমি মনে মনে বললাম, আপনাকেও আমি এক গুলিতেই ফিট্ করে দেবো। দাঁড়ান

না।

ঋজুদা বললো, মা কি বললেন রে ?

আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, অ্যাল্‌বিনো মারা চাই-ই—চাই।

ঋজুদা বলল, তাহলে ত' ছুলোয়াটা কালই শেষ করে ফেলা যায়। কি বলো ভানুপ্রতাপ ? রুদ্র যখন মায়ের আশীর্বাদ টাশীর্বাদ নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ফিরে এলো।

ভানুপ্রতাপ যেন ঘোরের মধ্যেই ছিল।

বলল, যা করার তা দেরী করার কি মানে হয় ? করে ফেলাই ভাল।

বলেই, বলল, তাহলে কি ঠিক করলে ? কালই হবে ? মামা ?

কালই হোক। তুই গিয়ে বস্তীতে ওদের একটু খবর-টবর দিয়ে রাখ ভোর পাঁচটাতে ছুলোয়ার জন্যে সকলে যেন তৈরী হয়।

বিষেণদেওবাবু বললেন।

আর কাউকে কি নেমন্তন্ন করবে ? ভানুপ্রতাপ বললেন।

ঋজুবাবু আমাদের মেহমান আর রুরুদ্দ্‌রবাবু হচ্ছে গিয়ে আবার ঋজুবাবুর মেহমান। আমরাই জোর পার্টি লাগাব এখানে। কচি-শুয়োরের বার-বী-কিউ হবে মহলের কম্পাউন্ডে। বিষেণদেওবাবু আবার বললেন।

—শুয়োর খান নাকি আপনারা ? আমি বললাম। আমি ভেবেছিলাম......

বল কি রুরুদ্দ্‌রবাবু। বন্য বরাহ ! শ্রীরামচন্দ্রেরও অখাদ্য ছিলো না। খেলে, জন্ম সার্থক।

ভানুপ্রতাপ উঠে গেলেন, আমাদের সকলের মাঝ থেকে।

বললেন, যাই একটু ঘুরে আসি।

কোথায় ?—ঋজুদা বলল।

এই লুলিটাওয়া থেকে। বোরড হয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন, প্রতিমুহূর্ত।

বলেই, দুটো বড়ি মুখে পরলেন।

বিষেণদেওবাবু বললেন, সাবধানে গাড়ি চালাবি।

তারপর বললেন, আমিও একটু যাব, কাজ আছে। আপনারা আরাম করুন। রুরুদ্দ্‌রবাবু চান-টান করো। খাওয়া-দাওয়া করো।

—তারপরই বললেন, আজ কি খাবে ?

—যা খুশি।

—পেট একদম ঠিক ত' ?

—একদম ঠিক।

—একদ্দম ঠিক ?

তাহলে কেমন ঠিকা, তা পরীক্ষা করার জন্যে একটা স্পেশ্যাল রান্না খাওয়াব।

কি রান্না ?

সর্ষে-মুরগী।

সর্ষে-মুরগী ?

হ্যাঁ। তোমরা বাঙালীরা জোর সর্ষে-বাটা কাঁচালংকা দিয়ে ইলিশ মাছ, অথবা অন্য মাছ, যেমন আড় বা বোয়াল বা কই মাছ খাও, তেমন করেই আমরা সর্ষে-মুরগী খাই।

ঋজুদা বলল, আমি কিন্তু খেয়েছি।

কোথায় ? বিষেণদেওবাবু শুধোলেন।

ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, সত্যি রে ! রিণা, মানে অপর্ণা সেনের বাড়িতে। নিজে-হাতে রেঁধেছিল। ফার্স্ট ক্লাস

তারপর বলল, ওর হাতের রান্না চমৎকার। ভাল রান্না করতে পারা যে মেয়েদের কত বড় গুণ !

আমি বললাম, যাই-ই বলো তুমি, কম্‌লুদির মত কেউই রাঁধতে পারে না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি রাঁধে।

—কে কম্‌লুদি ? ঋজুদা হেসে জিজ্ঞেস করল।

তারপর বলল, সুন্দর দেখতে হলেই ভাল রাঁধবে ?

আমি বললাম, আরে কমলুদি। লীলা দীদার মেয়ে ; মনীষীদার স্ত্রী।

ঋজুদা পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, ওঃ, তাই-ই বুঝি। তা না-খাওয়ালে আর কি করে জানবো বল। মনীষী আর কম্‌লুকে বলিস এই খাদ্য-রসিককে নেমন্তন্ন করতে একদিন।

নিশ্চয়ই বলব। কম্‌লুদি ত' রান্নার বইও লেখে, লীলা দীদার সঙ্গে—তাতে কি সব ভাল ভাল রান্না যে আছে না ?...

বিষেণবাবু বললেন, এ রকমই হয়। কলেরা কি ডিসেন্ট্রী থেকে ভাল হয়ে উঠলে মানুষ খুব পেটুক হয়ে যায়। জিভে জল আসছে, না রুরুদ্‌দরবাবু ?

—বলেই, উঠে চলে গেলেন।

এ্যাইসা রাগ হলো আমার !

ভানুপ্রতাপ আগেই গেছিলেন। দুজনেই ডিনার টাইমের আগেই আসবেন বলে গেছেন।

ঋজুদা বলল, দেখ্‌লি ত' বিষেণদেওবাবু তোকে পেটুক বললেন। পেটুক আর খাদ্য-রসিকের মধ্যে তফাতটা আর ক'জন বোঝে বল্ ? পেটুক হলো, আ বিলিভার ইন্ কোয়ানটিটি। আর রসিক হচ্ছে, আ বিলিভার ইন্ কোয়ালিটি।

আমি বললাম, জেঠুমণি কি যেন একটা কথা বলতেন ঋজুদা ?

বলতেন দ্যা ওন্‌লি ওয়ে টু দ্যা হার্ট ইজ থ্রু দ্যা স্টম্যাক্। অর্থাৎ, কারো হৃদয় জয় করতে চাইলে তাকে ভাল করে খাওয়াও। হৃদয়ে পৌঁছনোর সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হচ্ছে পেটের ভিতর দিয়ে।

আমি বললাম, বিষেণবাবুরা বোধহয়—ঐভাবেই আমাদের হৃদয় জয় করবেন ঠিক করেছেন।

ঋজুদা আমার কথার উত্তর না-দিয়ে হঠাৎ হাততালি দিল। একজন বেয়ারা এল।

ব্রিজনন্দনজী কাঁহা ? ঋজুদা শুধোল।

উনি ত' বিকেলের বাসেই হাজারীবাগ চলে গেছেন। সেখান থেকে সারিয়া গিয়ে বেনারসের ট্রেন ধরবেন।

—আজই চলে গেছেন ? ঋজুদার গলায় উদ্বেগের সুর লাগল।

—এই ত' ! খোকাবাবুকো গাড়ী ঘুষা, ঔর উনোনে ভি নিক্‌লা, একদম্ সাথ্‌হি সাথ্। কাহে ? আপলোঁগ দেখা নেহি ?

নেহি ত' ! ঋজুদা বলল।

বেয়ারা চলে গেলেই ঋজুদা বলল, রুদ্র, তোর ঘরে চল্ তাড়াতাড়ি—খবর বল্ সব।

ঘরে ঢুকেই ঋজুদাকে সব খবর বলতে যাচ্ছিলাম।

ঋজুদা বলল, এখানে নয় ; বাথরুমে চল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথটাবের জল জোরে খুলে দিয়ে সব শুনল।

তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বলল আমাকে।

বলেই কাঁচিটা বের করে যে লাল-রঙা ভিজে-কম্বলে-মোড়া মোরাদাবাদী কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিয়েছিলেন বিষেণদেওবাবু, সেই বিরাট কুঁজোর উপরের লাল-দামী কম্বল কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে ফেলল। কেটে ফেলার পরই কুঁজোটার মধ্যে একটা জোড়া দেখা গেল। জোড়-এর প্যাঁচ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খুলতেই কুঁজোটা দু'ভাগ হয়ে গেল। দেখা গেল, জল আছে নীচের ভাগে। আর নীচের ভাগের সঙ্গে একটা নল এসে পড়েছে উপরের ভাগের মুখে ; যাতে কুঁজো কাৎ করলেই জল পড়ে। কিন্তু ঐ নলের চারপাশে গোল করে সাজানো তিনটে টেপ-রেকর্ডার। এমন ছোট ছোট ব্যাটারী-চালিত ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস রয়েছে তাতে যে, একটার ক্যাসেট রেকর্ডিং শেষ হলেই অন্যটার রেকর্ডিং শুরু হবে। কুঁজোর উপরের ভাগটাতে ঝাঁঝরির মত অসংখ্যা ফুটো করা।

ঋজুদা বলল, তোর কাছে কি কি ক্যাসেট আছে ?

বলেইছি ত' ! দ্যা পোলিস্, বী-জীস্, আর কিছু বনি-এম্ আর আব্বা গ্রুপের পুরনো গান—। জ্যাক লেনন্ও আছে।

হুঁ। আমার কাছে আছে গিরিজা দেবী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আর মালতী ঘোষাল।

তারপরই বলল, এক কাজ কর। তুই টর্চটা ধর, আমি ক্যাসেট্গুলো পাল্টে দিচ্ছি। ব্যাটাদের রুচি ভাল করে দিয়ে যাব আমরা।

আমি বললাম, এ তোমার কেমন নেমন্তন্ন আসা হে, তোমার ঘর বাগিং করে রেখেছে ?

ঋজুদা ক্যাসেট চেঞ্জ করতে করতে বলল, "কার্য হলেই কারণ থাকে, একটা কিংবা অনেকগুলো"—

আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন লাল ভেজা কম্বলটা সেলাই করি কি করে ?

ঋজুদা বলল, এ্যারালডাইট নয়, অন্য একটা স্ল্যসানের টিউব আছে, নীল-রঙা। বের কর্ আমার ব্যাগ থেকে। একদম কথা বলবি না এখন থেকে আর। বললেই তোর ঠোঁট দুটোই সীল্ করে দেবো।

কাটা-কম্বল সেলাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বারান্দায় যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

শব্দ শোনামাত্রই আমরা দুজন বডি থ্রো দিয়ে বিছানায়।

—কওন ? ঋজুদা বলল।

ম্যায় বেয়ারা হুজৌর।

গলার স্বরটা অচেনা লাগল।

ক্যা বাত্ হ্যায় ? ঋজুদা বলল।

রাজাসাব আপলোগোঁকা লিয়ে একঠো খাত্ ভেজিন।

খাত্ ? বলে, ঋজুদা দরজা খুলতেই, বিকটদর্শন লোকটাকে দেখা গেল। সঙ্গে আরো দুজন গুণ্ডা মত লোক।

বাধা দেবার আগেই ওরা দুজনে মিলে ঋজুদাকে মুখ-ঠেসে জড়িয়ে ধরল। একজন তাড়াতাড়ি মোটা দড়ি বের করে বেঁধেও ফেলল। পিছ্-মোড়া করে।

তারপর তিনজনই দমাদ্দম্ কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল—ঋজুদার বুকে-পেটে-মুখে। বলল, নমক্হারাম্ !

ঋজুদা মুখটা ভেট্‌কিমাছের মত করে বলল, উঃ লাগছে।

—লাগবে।

ওদের মধ্যে একজন বলল। লাগাবার জন্যেই ত' এই হরক্‌ৎ।

ঋজুদা আবার বলল, লাগছে-এ।

ওরা একসঙ্গে বলল, লাগাতার।

অনেকটা কোলকাতার পথের মিছিলের চলছে চলবের মত শোনাল ব্যাপারটা।

ওরা বলল, যারা নম্‌ক খেয়ে গুণ না গায়, উল্টে নম্‌ক-হারামী করে তাদের এই-ই শিক্ষা। এটা মুলিমালোয়াঁ। আপনাদের কোলকাত্তা নয়। এখানে আপনাদের পুঁতে দিলেও কেউই জানতে পারবে না, কোথায় হারিয়ে গেলেন আপনারা। অনেক লোক এর আগে হারিয়ে গেছে এখানে থেকে।

আমার ভয় করছিল। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা, বারবার দেখেছি, ভয় যখন পাওয়ার ঠিক তখন না পেয়ে, আমার একটু পরে যায়।

আমি লোকগুলো আর ঋজুদার দিকে চোখ রেখে খুবই ভয়-পাওয়া মুখ করে খোলা দরজার দিকে যেতে লাগলাম।

গির্‌ধারী না কে, সে বলল, এ বাঁচ্চো চুপ-চাপ্‌ অন্দরমে রহো, নেহি ত' আভি ধড়্‌কা দেগা।

বলেই কোমর থেকে তুলে একটা এক-হাত লম্বা ঝকঝকে ছুরি দেখালো।

তিনটে লোকই তখন আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম, ঋজুদা পিছমোড়া অবস্থাতেই, আস্তে আস্তে নীচের কার্পেটে পড়ে-থাকা কাঁচিটার দিকে এগোচ্ছে। আমার ভয় হল, ঋজুদার কোমর থেকে যদি পিস্তলটা ওরা খুলে নিয়ে নেয়, তাহলে ?

হঠাৎ এ-বি বাবুর দেওয়া নতুন পিস্তলের কথা মনে হল আমার। এক মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা কোমর থেকে তুলে নিয়েই দু' হাত লাগিয়ে কক্‌ করলাম। ম্যাগাজিন ভরাই ছিল। পিস্তলটা কক্‌ করার শব্দ হতেই ওরা ভয়ের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি ওদের বুকের দিকে পিস্তলের নল ধরে বললাম, হাত উপার, একদ্দম্‌ উপার ! তিনো আদ্‌মী !

ওরা সকলেই হতভম্ব হয়ে গেছিল। আমাকে নিতান্তই নিরামিষ ছেলেমানুষ বলে ঠাউরেছিল ওরা।

আগুনের ভাঁটার মত চোখে দেখছিল সকলেই আমার দিকে।

.হঠাৎ ঋজুদা একলাফে আমার দিকে চলে এসেই আমার পিছনে দাঁড়াল।

আমাকে বলল, ওদের বাথরুমে পুরে দিয়ে বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে আমার হাতের দড়িটা খুলে দে রুদ্র। শিগগিরি !

আমি ঋজুদার দিকে চেয়ে দেখলাম, মুখের কষ বেয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে ওদের তিনজনকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢোকালাম আমি। ঢুকিয়েই হুড়কো টেনে দিলাম।

হাতের বাঁধন কাটা হতেই, ঋজুদা নিজের পিস্তলটা বের করে নিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল। একটা লোক বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে লাফাবার উপক্রম করছিল, ঋজুদা তার কাছা ধরে টান দিতেই তার ধুতি খুলে গেল। কেলেঙ্কারী অবস্থা !

ঋজুদা বলল, তোমরা কার লোক ? এখুনি বলো। নইলে গুলিতে খুপ্‌রি উড়ে যাবে। আলু-কাটা ছুরি নিয়ে এসেছো, আমার চেলার সঙ্গে টক্কর দিতে। বল, তোমরা কার

লোক ?

আমাদের যে-কটা রুমাল ছিল সবকটাকে ভালো করে প্রত্যেকের মুখ-হাঁ করিয়ে গোল করে পাকিয়ে টাগরা অবধি ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর প্রত্যেককে কচ্ছপের মত উপুড় করে দু'হাত-দু'পা কোলকাতা থেকে নিয়ে আসা নাইলনের দড়ি দিয়ে টাইট্ করে বেঁধে, দুজনকে বাথরুমের জলভর্তি বাথটাবে আর একজনকে কমোডের মধ্যে মুখ করে ফেলে দিলাম আমরা। বাথরুমের দরজা জানালা বন্ধ করে বাথরুমের দরজায় বাইরে থেকে আমাদের নিজেদের তালা লাগিয়ে ঋজুদা বলল, চল্ এবার। অনেক কাজ আছে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুবার আগে আমাদের যে-দুটো চামড়ার ব্যাগ সবসময় কাঁধে থাকে, বিশেষ বিশেষ সময়ে, সেই ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের আনা তালা দিয়ে ঘরের বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নীচে নেমেই, ঋজুদা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, গাড়ি কোথায় ?

বললাম, গ্যারাজে। তারপর বললাম, তোমার রক্ত পড়া থেমে গেছে ?

ঋজুদা বলল, এখন অবান্তর কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি কর।

গ্যারাজের দিকে যেতে যেতে বলল, তেল কত আছে ?

আমি বললাম, হাফ-ট্যাঙ্ক।

ঋজুদার ফিয়াটের পাশেই ভানুপ্রতাপবাবুর সাদা-রঙা পেট্রল-মার্সিডিসটা দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি সাইফনিং-এর পাইপ বের করে ঐ গাড়ি থেকে আমাদের গাড়ির ট্যাঙ্ক ফুল করে নিলাম। গ্যারাজে একটা কালো, ধূলি-ধুসরিত এ্যাম্বাসাডর গাড়ি দেখলাম। ঋজুদা বলল, নম্বরটা লিখে নিতে। এটা এ বাড়ির গাড়ি নয়। আজই এসেছে। কোথা থেকে এল ?

তারপর বলল, ডিকি থেকে টৌয়িং-রোপ, বাক্স সব পিছনের সীটে এনে রাখ্। তাড়াতাড়ি। সময় নেই। ট্রান্সমিটারটা ?

বললাম, সব আছে।

গাড়ি স্টার্ট করেই, আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বিরাট গেটের দু' দিকে যে দুজন দারোয়ান থাকে, তারা বেরিয়ে এল। ওদের দুজনের হাতেই বন্দুক।

ওরা বলল, রাজাসাহেব আর ভানুপ্রতাপজী আপনাদের রাতের বেলা মহল থেকে বেরোতে একেবারেই মানা করে গেছেন।

ঋজুদা হাসল। বলল, আমরা জঙ্গলেরই চিড়ীয়া।

হেসেই, পাইপের তামাক বের করল পাউচ্ থেকে। বের করে বলল, বিলাইতী খৈনী, ইধার্ আও।

নেহী হুজৌর।

আরে, লাও। ডাট্‌কে পিষ্‌কে, ঠোঁটোয়াকা নীচে জারাসে দাব্ দেও ; ঔর ফ্রিফ্ দিখো কিত্‌না মজা আতা হ্যায়।

বলেই, বলল, রাজাসাব আর ভানুপ্রতাপজীই আমাদের বলে গেছেন ওঁরা যেখানে গেছেন সেখানেই যেতে। কোন্‌দিকে গেল ওঁদের গাড়ি ?

লোকদুটো সরল। বলল, রাজাসাহেব গেলেন গীমারিয়ার দিকে আর ভানুপ্রতাপজী লুলিটাওয়ার দিকে।

বহুত্ মেহেরবানী।

বলেই, ঋজুদা গাড়িটাকে এক দমকে বাইরে আনল।

ফুট-ফুট করছে জ্যোৎস্না নির্মেঘ আকাশে। ছাউ-রঙা ফিয়াট গাড়িটা চাঁদের আলোর সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। ঋজুদা গাড়ির হেডলাইট, এমনকি সাইড লাইটও না জ্বেলে খুব আস্তে আস্তে লুলিটাওয়ার দিকে চলেছে। ছোট ছোট চড়াই উতরাইয়ে রাস্তা। উতরাইয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে নামছে—আর চড়াই আসার আগেই গাড়ি গীয়ারে রেখে হঠাৎ চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট করছে যাতে কম শব্দ হয়।

সেদিন টুটিলাওয়ার হাজীসাহেবের কাছ থেকে শরবত খেয়ে আসার পথে আমরা যে পথে ডানদিকে ঢুকেছিলাম, সেই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ঋজুদা বলল, রুদ্র, দেখ ত', কোনো গাড়ির চাকার দাগ আছে কি না এ পথে ঢোকার—টাট্‌কা।

আমি নেমে পড়ে, পিছন ফিরে বসে, যাতে টর্চের আলো বেশীদূর না যায়, এমনভাবে দেখে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ আছে। জীপের চাকার দাগ।

ঋজুদা বলল, হুম্‌ম্‌ম্‌।

আমি বললাম, কিন্তু কেন ? সাপটা ?

হঠাৎ ঋজুদা নিজের মনেই বলল, নাঃ এখানে সময় লাগবে আমাদের অনেক। চল্‌ আগে, অ্যাল্‌বিনোটাকে দেখে আসি।

বলে, ঐ ভাবেই গাড়ি ঘুরিয়ে, বাতি নিবিয়ে চলতে লাগল। মালোয়াঁ-মহলের আগের চড়াইটাতে জোরে উঠেই এঞ্জিন বন্ধ করে এমনভাবে চুপচাপ, নিঃশব্দে গাড়িটাকে মালোয়াঁ-মহলের গেটের পাশ দিয়ে গীমারিয়ার দিকে নিয়ে গেল যে, এ্যাফোরা তামাকের খৈনীর নেশাতে বুঁদ দারোয়ানদের তা নজরে এলো না।

মালোয়াঁ-মহল থেকে বেশ কিছুটা এসে আমরা সেদিন বিকেলে যেখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম পিস্‌কি নদীর উপর, সেই পথের মোড়টা ছাড়িয়ে গিয়ে ঋজুদা বড় রাস্তাতেই গাড়িটা রাখল।

তারপরই ঋজুদা, জঙ্গলে ঢুকে পড়ল আমাকে নিয়ে। যত কম শব্দ করে গাড়ি লক্‌ করা সম্ভব তাই-ই করলাম।

টর্চ আছে, কিন্তু জ্বালাচ্ছি না। পিস্তলের হোল্‌স্টার খোলা। যে-কোনো মুহূর্তে হাতে নিতে পারি। ঋজুদা যে কী পাগলের মত করছে, কেন করছে, কিছুই বলছে না। ঠিক এমন সময় অ্যাল্‌বিনোটা ডাকল নদীর দিক থেকে। আজকে শেষ বিকেলে ডেকেছিলো কি-না মনে নেই। আমরা শুনিনি। আজ এত দেরি করে ?

জঙ্গলের মধ্যে চাঁদনী রাতে, যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে হাঁটা কিছুই নয়। অন্ধকারেও নয়। শহরের লোকেরা পায়ের পাতা আগে ফেলে তারপর পথের উপর পা পাতেন। কিন্তু জঙ্গলে গোড়ালি আগে পেতে তারপর পাতা পাতলে সুবিধা হয়। এই কারণেই সমস্ত আদিবাসী ও জঙ্গলের মধ্যে যে সব মানুষ থাকে তাদের গোড়ালির কাছটা অসম্ভব সাদা দেখায়। খালি পায়ে হাঁটে এবং ঐভাবে হাঁটে বলেই ওরকম হয়। কিন্তু দৌড়বার সময় তা বলে ওরা কেউই ফ্ল্যাট-ফুটেড্ নয়। চমৎকার দৌড়য়, মনে হয় উড়েই যাচ্ছে যেন।

ঋজুদা অ্যাল্‌বিনোর ডাকই অনুসরণ করে পাগলের মত চলেছে খানায় পড়ে, কাঁটায় ছড়ে। আমরা বেশ কিছুদূর গেছি। আন্দাজে বুঝতে পারছি যে, ঋজুদা নদীটার দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে।

আবার বাঘের ডাক শুনলাম আমরা। এবার বেশ্ কাছ থেকে। অ্যাল্‌বিনোটা। আমি চমকে উঠলাম। একটু ভয়ও পেলাম। পয়েন্ট টু-টু পিস্তল হাতে রাতের বনে, পায়ে

হেঁটে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হওয়াটা আমার কাছে সুখের ব্যাপার নয়। ঋজুদার কাছে হলেও হতে পারে।

বাঘটা আবারও ডাকল। বারবার ডেকেই চলল। বাঘটা এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকতে লাগল। খুবই কাছ থেকে। এখানে আসার পর প্রায় সন্ধেতেই ডাক শুনেছি এর। কিন্তু এমন ভাবে, এত কাছের থেকে নয়।

আমার ভয় বাড়তে লাগল।

ঋজুদা ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, ভেরী ইন্টারেস্টিং!

আমি তাতে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বাঘে আমাকে খেয়ে নিলে ঋজুদা বাঘকেই হয়ত বলবে, হাউ নাইস অফ্ উ্য। ভেরী ইন্টারেস্টিং।

ঋজুদা এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল—কিছুদূরেই নদীর সাদা বালির বুক দেখা যাচ্ছিল—তারই মধ্যে একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনে হল। চাঁদনী রাতে সাদা বালির চরে, তার মূর্তিকে ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল। আর বাঘটা ডেকেই যাচ্ছিল। লোকটার একেবারে কাছ থেকেই।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল। অনেকখানি। প্রায় দু' ফার্লং।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রুদ্র, ভালো করে শোন্।

বেচারা ঋজুদা! আফ্রিকাতে ভুষুন্ডার গুলি-খাওয়া পাটা এখনও ঠিক হয়নি। কিরকম হাঁপাচ্ছে। পায়ে ব্যথাও নিশ্চয়ই করছে।

ঋজুদা বলল, তুই এইখানে একটা গাছে উঠে বসে থাক্। ঐ লোকটা, যে-রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাবে। লোকটা তোর কাছ দিয়েই যাবে ডানদিকে, ঐ ত' পথটা দেখা যাচ্ছে। লোকটার কিরকম পোশাক? কেমন হাঁটার ধরন! সব লক্ষ্য করবি। লোকটাকে এই চাঁদের আলোতেও হয়ত চিনতে পারবি তুই। হয়ত কেন? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই পারবি। তারপর লোকটা চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর, তুই আস্তে আস্তে হেঁটে ঐ রাস্তা ধরেই বড় রাস্তার মোড়ের দিকে আসবি—যেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে ছিলাম আমরা। আমি গাড়ি নিয়ে গীমারিয়ার দিকে গিয়ে লুকিয়ে থাকব। লোকটা চলে যাওয়ার পর তুই হেঁটে আসবি গাড়ির কাছে। বুঝেছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

তারপর বলল, ও, তোকে ত' আসল কথাটাই বলা হয়নি। লোকটা দূরে চলে গেলেই—তুই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীতে যাবি। লোকটা যেখানে ঘোরাঘুরি করছিল ঠিক সেইখানেই ভাল করে খুঁজবি।

—কি? অ্যাল্‌বিনো? বলতে পারলাম না আর, যে, টু-টু পিস্তল নিয়ে?

আমার গলায় থুথু আটকে গেল।

ইডিয়ট্। ঋজুদা চাপা গলায় বলল।

—তারপর বলল, অ্যাল্‌বিনো নয়, একটা টেপ-রেকর্ডার পাবি। হয়ত কোনো ঝোপের আড়ালে, কী পাতার মধ্যে, কী কোনো শুকনো নালার মধ্যে লুকিয়ে রাখবে ও—যেখানে সকলের অলক্ষ্যে দিনের বেলাতেও গিয়ে রেকর্ডারের প্লেয়ারের স্যুইচ টিপে দেওয়া যায়। ওটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

—যদি পাই? ত' নিয়ে আসব?

—না। রেকর্ডারটা আনবি না। ক্যাসেট্‌টাই শুধু চেঞ্জ করে দিবি। ঐ ক্যাসেট্‌টা বের করে—তোর কাছে যদি কোনো ক্যাসেট্ থাকে—দ্যাখ্ তোর ব্যাগে—তাহলে চেঞ্জ

করবি। নইলে, রেকর্ডারটাকে ঐ ভাবেই ফেলে রেখে ওর ভেতরের ক্যাসেট্‌টা নিয়ে আসবি। ক্যাসেট্‌টা আমার চাইই।

বলেই, বলল, আর সময় নেই। গুড লাক্‌। বর্ষাকাল, সাপ-কোপের ঘাড়ে পা দিস্‌ না। সাবধানে।

বলেই, ঋজুদা জঙ্গলের নীচের আলো-ছায়ার বুটি-কাটা গালচের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমি এবার একটা গাছ খুঁজলাম—যাতে পাতা বেশী, পিঁপড়ে কম, সাপের ফোকর নেই। কিন্তু তেমন গাছ ত' মেলা মুশকিল। অন্ধকারে বুঝতেও পারলাম না কি গাছ। চড়ার পর মনে হল, শিশু। গোলগোল পাতা। বসে, একেবারেই আরাম নেই; বড়ই শক্ত কাঠ।

একটা ব্রেইন-ফিভার পাখি ডাকছে আমার দিক থেকে। নদীর উল্টোদিক থেকে তার সাথী সাড়া দিচ্ছে। একটা একলা টিটি পাখি পিস্‌কি নদীর শুকনো সাদা বালিতে ছায়ার মত নড়ে বেড়ানো লোকটার মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটো দুলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভালই হয়েছে। পাখিটা ঐ লোকটার সঙ্গ ছাড়বে না। ঠিক তার মাথার উপর উড়তে উড়তে আসবেই। তার চলাচল বোঝার কোনো অসুবিধেই হবে না আমার।

একটা ঢাব পাখি হঠাৎ ডাকতে লাগল রাস্তার ওপার থেকে। ঢাব্‌-ঢাব্‌-ঢাব্‌-ঢাব্‌-ঢাব্‌ করে ডেকেই চলবে। বাঘটা এখন আর ডাকছে না। অত কাছ থেকে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের ডাক শুনতে ইচ্ছেও নেই। রবার্ট কেনেডির মাথা আর বাঘের মাথা ত' এক জিনিস নয়—এ-বি বাবু যাইই বলুন না কেন! একটা খাপু পাখি ডাকছে আরও দূর থেকে খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু—। সারারাত চাঁদ-ওড়া বনে ও ডেকে যাবে এমনি করেই। মাঝে মাঝে ময়ূর ডাকবে কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে বুকের মধ্যে চমক তুলে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে টিটি পাখিটা পাইলটিং করে লোকটাকে নিয়ে আসতে লাগল—তার মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়ে। লোকটা কাছে আসছে; এসে গেল। তার নাগরা জুতোর লোহার নাল পথের কাঁকড়ের উপর খচর মচর আওয়াজ করছে।

—কে? ব্রিজনন্দন?

হ্যাঁ। তাইই ত'! অবাক হয়ে আমি চেয়ে রইলাম। সেই ধুতি, গোলাপি টেরিলিনের পাঞ্জাবী—এখন সাদা দেখাচ্ছে চাঁদের আলোতে। ব্রিজনন্দনের পাঞ্জাবীর তলায় পিস্তল আছে—আমি জানি। থাকুক। আমারও আছে এখন।

ও চলে গেলে, আমি গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। নদীতে নেমে পড়লাম। একদল চিতল হরিণ নদীতে জল খেতে আসছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই, চাঁদের আলোয়, বনের ছায়ার দুধ্‌লি অন্ধকারে তারা এমন বড় বড় লাফে দৌড়ে পালাল, যেন মনে হল উড়েই যাচ্ছে—আফ্রিকান গ্যাজেল্‌দের মত। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ করে পুরুষ হরিণগুলো বনের সব প্রাণীদের আমার আসার কথা জানান্‌ দিয়ে সাবধান করে দিয়ে ডেকে উঠল, রাতের ঝিম্‌ঝিমে নিস্তব্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে।

ভাল করে খুঁজতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে নদীটার সমান্তরালে একটা খোয়াই চলে গেছে। তার মধ্যে বড় বড় ঘাস—চওড়া-চওড়া তাদের ফলা। পাতার কোণে খুব ধার—ওর মধ্যে নেমে দেখতে গিয়ে আমার হাতই কেটে যেতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই পাওয়া গেল। টেপ-রেকর্ডারটা। চট্‌ করে ক্যাসেট্‌টা খুলে নিয়ে আমি আমার ব্যাগ থেকে বের-করা ক্যাসেট্‌টা পুরে দিলাম। এর মধ্যে কোন্‌ গান আছে কে জানে—টর্চ না জ্বালালে জানবারও উপায় নেই। টর্চ জ্বালবার অর্ডারও নেই।

কাজ শেষ করে জঙ্গলে কিছুটা ফিরে এসে আমি এবার পথে উঠলাম।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বিকট বুক কাঁপানো আওয়াজ তুলে একটা হায়না হেসে উঠল নদীর ওপার থেকে। কাকে ঠাট্টা করছে ও, ওই-ই জানে। হয়ত নিজেকেই। কিন্তু রাতের জঙ্গলে হায়নার ডাক গায়ের লোম খাড়া করে দেয়। আমাদের দেশের হায়নারা আফ্রিকান হায়নার চেয়ে অনেক বড় হয়—অনেক সময়, যে এই ডাক চেনে না, সে রাতের জঙ্গলে দূর থেকে কোনো ভৌতিক শব্দ বলে ভুলও করতে পারে। হায়নার ডাক শুনলেই গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে আমার।

আমি বড় রাস্তাতে এসে উঠতেই ঋজুদার গাড়িটা ভুতুড়ে গাড়ির মত গড়িয়ে এল আমার কাছে। এঞ্জিন বন্ধ করে।

ঋজুদা বলল, কিরে ? চিনতে পারলি ?

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, ব্রিজনন্দন !

ঋজুদা বলল, অনুমান তাই-ই করেছিলাম। কিন্তু ও এই পথেই গেছে, চল্ আমরা বরং ওল্ড রাত্‌রা রোড হয়ে মালোয়াঁ-মহলকে বাইপাস্ করে বেরিয়ে যাই। শোন্, পিস্তলে যখন গুলি ছুঁড়বি, হাতটাকে কাঁধের কাছ থেকে শক্ত করবি। আঙুলগুলো আর হাতের পাতাটা আলগা করে ধরে থাকবে পিস্তলকে। সমান প্রেসারে ট্রিগার টানবি। আর সবসময় টার্গেটের সিক্স-ও-ক্লকে এইম্ করবি। কারণ, পিস্তল-এর মাজল্-এর গুলি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠার টেন্‌ডেন্সী থাকে। পরে, অনেক ছুঁড়তে ছুঁড়তে এইম্ করারও আর দরকার হবে না। তুলবি আর মারবি।

ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোদের মত ? আমি বললাম।

হ্যাঁ। ওরা ত' ছবিরই হীরো। এখন তুই এই হাজারীবাগী জঙ্গলের জেনুইন হীরো। খুবই এ্যালার্ট থাকবি। কোনো কিছু গণ্ডগোল দেখলেই গুলি চালাতে এক সেকেন্ড দেরি করবি না—আমার পারমিশান্ নেওয়ারও দরকার নেই। তবে......

বলে, নিজের পিস্তলটা বের করে, ব্যাগ খুলে কি একটা লোহার নলের মত জিনিস ঋজুদা তার নিজের পিস্তলের নলের মুখে পরিয়ে নিল।

বললাম, এটা কি ?

সাইলেন্সার।

গুলি করলেও, শুধু ব্লপ্ করে একটা চাপা আওয়াজ হবে। দশ গজ দূরের লোকও শুনতে পাবে না যে, থ্রি-সেভেনটিন্-এর গুলি কারো মগজ বা বুক ফাঁক করে দিল। এর জন্যে স্পেশ্যাল লাইসেন্স্ লাগে। আমাকে দিয়েছেন ওয়েস্ট-বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হোম-ডিপার্টমেন্ট—ভেরী কাইন্ড অফ্ দেম্।

ঋজুদা বলল, ট্রান্সমিটারটা বের কর্ শীগগিরী।

তাড়াতাড়ি বের করলাম সেটাকে টেনে। একটা ছ' ভোল্টের ব্যাটারীর মত জিনিস। তবে ওজন অনেক কম।

এরীয়ালটা তুলে দিয়ে ঋজুদা বলল, পাসওয়ার্ড কি দিয়েছেন ?

আমি বললাম, এ্যাই রে। দাঁড়াও মনে করি। হ্যাঁ। গুল্‌লি-ওলি।

ট্রান্সমিটারে নানারকম শব্দ হতে লাগল।

ওপাশ থেকে ভেসে এল গুল্‌লি-ওলি। রজার।

ঋজুদা বলল, কাম টু ডান্সিং হল এ্যাট টুয়েন্টিওয়ান আওয়ার শার্প। সারাউন্ড ইট্ কমপ্লিট্‌লী উইথ ফোর্স্। এপ্রিহেন্ড স্ট্রং রেজিস্ট্যান্স্। এনিমী ওয়েল-আর্মড। ওভার।

ওপাশ থেকে ভেসে এল, গুল্‌লি-ওলি—রজার ওভার।

ঋজুদা বলল গুল্‌লি-ওলি। আই্‌ রীপিট্‌। বলে আবার মেসেজটা রীপিট্‌ করল ঋজুদা।

ওপাশ থেকে বলল, রজার। উই্‌ আর রেডী। এন্ড মুভিং আউট্‌। ওভার।

থ্যাংক্‌স্‌। ওভার।

চল্‌। বলল, ঋজুদা। তারপর গাড়ি স্টার্ট করল।

বলল, ক'টা বাজল রে রুদ্র ?

আমি ঘড়ির রেডিয়ামে তাকিয়ে বললাম, সাতটা দশ। ঋজুদা বলল, ফাইন্‌। উই উইল জাস্ট বী আ লিটল এ্যাহেড্‌ অফ রাঁদেভু টাইম।

তারপর বলল, ট্রান্সমিটারটা এই্‌ পথের মোড়েই্‌ জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখ যাতে কাল সকালে খুঁজে পেতে অসুবিধা না হয়।

আমি বললাম, কেন ? গাড়িতেই্‌ থাকুক না।

ঋজুদা বলল, যা বলছি, তাই্‌ই্‌ কর।

গাড়ি থেকে নেমে একটা কেলাউন্দা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম ওটাকে।

গুন্ড্‌ রাত্‌রা রোড হয়ে আমরা সেই্‌ সাপের আক্রমণের রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। রাস্তাটা ছায়াচ্ছন্নতার জন্যে দিনের বেলাতেই্‌ এত অন্ধকার যে, রাতের বেলা আলো না জ্বেলে চলাই মুশকিল।

ঋজুদা বলল, এখন শুধুই্‌ সাইড-লাইট জ্বালাচ্ছি। তুই কোনো গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাস কি-না দ্যাখ ত' ভালো করে। যতদূর চাকার দাগ পাওয়া যাবে—আমরা সেফ্‌লি গাড়ি নিয়ে ততদূর যেতে পারব।

আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বললাম, পাচ্ছি না। পেলেই্‌ তোমাকে বলব। এত অন্ধকার যে সাইড-লাইটে কিছু দেখাই্‌ যাচ্ছে না।

খুব আস্তে আস্তে গাড়িটা চলছে—আমরা প্রায় মাইল তিনেক এসে গেছি ; এমন সময় ঋজুদা গাড়িটা থামিয়ে দিল। এঞ্জিনও বন্ধ করে দিল।

বলল, দেখেছিস্‌ কী ধুরন্ধর এরা !

বলেই্‌ বলল, গাড়িতে যা জিনিস-পত্র আছে, তার যা-কিছু পারিস সবই্‌ ব্যাগে পুরে নে। আর গদাধরের বাক্সতেও যা দরকারী জিনিস আছে, তাও নিয়ে নে নিজেদের ব্যাগে।

যতখানি আঁটল দুজনের ব্যাগে পুরলাম। তারপর বললাম, এবার কি ?

ঋজুদা বলল, সামনে, রাস্তায় শুক্‌নো পাতার উপরে কিছু কাঁচা পাতা দেখতে পাচ্ছিস ? কিছু বিসাদৃশ্য ?

হ্যাঁ।

ঐখানে একটা গর্ত করে রেখেছে ওরা। ঐ দ্যাখ্‌। গাড়ির চাকার দাগ বরাবর নিশ্চয়ই্‌ কোনো কাঠ-টাট পেতে নিজেদের গাড়ি পার করেছে। আমরা ঐ অবধি গেলেই্‌ গাড়ি গর্তে পড়ে যেত, আর আটকে যেতাম আমরা। মারাও যেতে পারতাম। গর্তটা কত গভীর, তা কে জানে ?

কি করবে ? আমি নার্ভাস গলায় বললাম।

ঋজুদা বলল, গাড়ি থেকে নেমে গর্তের বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে জঙ্গলে জঙ্গলে তুই নাচঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাক্‌, যত তাড়াতাড়ি পারিস, ব্যাগ কাঁধে নিয়ে কক্‌-করা

পিস্তল হাতে নিয়ে। যত জোরে পারিস এগিয়ে যাবি—যতখানি পারিস ডিসট্যান্স কভার কর।

আর তুমি ?

আমিও আসছি। ওরা আমাদের এক্সপেক্ট করছে তৈরী হয়ে। আমরা যে এসেছি, তা ওদের জানান দিতে হবে না ?

বলেই, ঋজুদা ব্যাগ থেকে কতগুলো মোটা রাবার ব্যান্ড বের করল। আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি একটা ফ্ল্যাট পাথর কুড়িয়ে দে ত' আমাকে, রুদ্র।

পথের পাশ থেকে একটা তিন-চার ইঞ্চি চওড়া-চ্যাপ্টা ভারী পাথর দিলাম ঋজুদাকে। ঋজুদা সেই পাথরটাকে গাড়ির এ্যাকসিলারেটরের উপর শুইয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধল—এঞ্জিন বন্ধ করে নিয়ে। তারপর গাড়িটাকে পাতা-চাপা-গর্তের একেবারে সামনে নিয়ে গেল—ঠেলে। নিজে ব্যাগ-ট্যাগ সমেত নেমে, দরজা খুলে রেখেই আবার সীটে বসে ফার্স্ট গীয়ারে দিল গাড়িটাকে। দিয়েই,—হেডলাইট জ্বেলে দিল—তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে , বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে এঞ্জিনের সুইচ টিপে দিল।

এ্যাকসিলারেটরে পাথরের ওজন ছিলই। এঞ্জিনটা গোঁ গোঁ করে প্রচণ্ড আওয়াজ করে উঠে একলাফে গিয়ে পাতার ঢাকনা ফুড়ে গর্তে পড়ল আর্তনাদ করে। হেডলাইটের একটা আলো সোজা সামনের রাস্তাটাকে আলোকিত করে রাখল। আর অন্য আলোটা আকাশের দিকে মুখ করে জ্বলতে লাগল।

ঋজুদা বলল, ফারস্ট্ ক্লাস। পুলিশ ফোর্সের আর খুঁজতে হবে না জায়গাটা। এঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ করেই যেতে লাগল, গর্তে-পড়া জংলী শুয়োরের মত।

বাঁ দিকের অন্ধকারে খুব তাড়াতাড়ি আমি অনেকখানি এগিয়ে গেছিলাম। পথের সমান্তরালে। হঠাৎ দেখি, রাস্তা দিয়ে তিনজন লোক হাতে বন্দুক নিয়ে আলো-আঁধারীতে দৌড়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। তাদের পোশাক ও মাথার ঝাঁকড়া চুল দেখে মনে হল যে, স্থানীয় লোক নয় এরা। কিন্তু তাদের পিছনে আরও একজন লোক দৌড়ে গেল। তাকে ভাল দেখা গেল না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে ওদের দেখছিলাম, এমন সময় রাস্তার ডানদিক থেকে একটা লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকল। আবারও ডাকল।

বুঝলাম, ঋজুদা উল্টোদিকে পৌঁছে গেছে। ঋজুদা পেঁচার ডাক ডাকতে ডাকতে নাচঘরের দিকে যেতে লাগল জোরে দৌড়ে। আমিও দৌড়তে লাগলাম। নাচঘরের কাছে আসতেই দেখলাম মরচে-পড়া প্রকাণ্ড দুটো লোহার দরজা। বিরাট বিরাট কড়া-লাগানো। ভেজানো রয়েছে। ভিতর থেকে অল্প আলো আসছে বাইরে। ঋজুদা প্রথমে ঢুকল। পরে আমি।

রীতিমত বড় ঘরটা। এল্ শেপ্-এর ঘরে হ্যাজাক জ্বলছিল একটা। দেওয়ালের আয়নাগুলো খয়েরী, কালো দাগে ভরা। অনেকেই ভেঙে গেলেও সব তখনও ভাঙেনি। না-ভাঙা আয়নাগুলোতে আমাদেরই দুই মূর্তিমানের পিস্তল-হাতে ছায়া দেখে আমরা নিজেরাই চমকে উঠলাম। এক কোনায় একটা সাদা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সামনে ঘাস, বিচালী। তার মুখ আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। যাতে ডাকতে না পারে। নানারকম পাঁচমিশেলী গন্ধ বেরোচ্ছে জায়গাটা থেকে।

হঠাৎ বোঁট্কা গন্ধ পেলাম নাকে। এখানে আসার পরদিন ভানুপ্রতাপের গাড়ি থেকে যেমন গন্ধ পেয়েছিলাম। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, প্রকাণ্ড লোহার খাঁচার মধ্যে, একটা

বিরাট হায়না দাঁত বের করে রাগে আমার দিকে দেখছে। তার গায়ের লোম অনেক জায়গায় ঝরে গেছে। ঘেয়ো কুকুরের মত।

উত্তেজিত হয়ে ডাকলাম, ঋজুদা। দ্যাখো, হায়না।

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, জানি।

ঋজুদা আমার ঐ দারুণ আবিষ্কারে উত্তেজিত ত' হলোই না, মুখও ফেরালো না।

দুঃখিত হলাম খুব।

ঋজুদা এদিকে ওদিকে যেন কী খুঁজছিল। হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। একটা সুড়ঙ্গ।

নাচঘরের অন্য দিক থেকে নানারকম হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ আসছিল। ঐ দিকে গিয়ে টর্চ ফেলতেই দেখি, একটা গভীর গর্তের মধ্যে কম করে তিরিশ-চল্লিশটা নানা জাতের সাপ কিলবিল করছে। গর্তের পাশগুলো মসৃণ পিতলের। তাতে কোনো তেল ঢেলে আরও মসৃণ করা হয়েছে। তাই গর্তের গা বেয়ে উঠে আসা সাপেদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তারই পাশে একটা লোহার-জাল-লাগানো খাঁচায় প্রকাণ্ড একটা সাপ হিস্‌স্‌ হিস্‌স্‌ করে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, মনে হচ্ছে খাঁচাটাকে শুদ্ধু নিয়ে সে আমাদের দিকে ছুটে আসবে। একটুখন দেখেই, সে-মক্কেলকে দেখে চিনতে একটুও দেরী হলো না আমার।

ঋজুদা বলল, চল্‌ রুদ্র। আর দেরী করার সময় নেই। বলেই, টর্চের বোতাম টিপে সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে পড়ল। আমরা যখন সুড়ঙ্গে নামছি তখন অনেক দূর থেকে বন্দুক ও রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল গুম্‌ গুম্‌ করে।

সুড়ঙ্গটা প্রথমে তিন-চার ধাপ নেমেছে। নেমে অনেকটানি সোজা চলে গেছে। খুবই লম্বা ও বড় সুড়ঙ্গ। ঋজুদার মত লম্বা লোকেরও মাথা নোয়াতে হচ্ছে না। এবং আমরা পাশাপাশিই যেতে পারছি দুজনে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম, সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ভিজে, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি।

যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা উঠে গিয়েই সুড়ঙ্গের মুখে একটা লোহার ভারী দরজার সামনে পৌঁছলাম। তা অন্য দিক থেকে বন্ধ।

ফিস্‌ফিস্‌ করে আমি বললাম, কি হবে, ঋজুদা ? যদি ওরা সাপ আর হায়নাটাকে ছেড়ে দেয় সুড়ঙ্গের মধ্যে ? যদি আগুন লাগিয়ে দেয় ? যদি ঐ সাপটাকে......

কথা বলিস না। ঋজুদা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল।

তারপর বলল, তুই পেছন দিকটা দ্যাখ্‌। পিস্তল হাতে রাখ্‌। একেবারে রেডী। ভগবান এলেও মেরে দিবি ; দুবার না ভেবে।

ঋজুদা ব্যাগ থেকে কি একটা গোল কিন্তু লম্বাটে লোহার জিনিস তাড়াতাড়ি বের করল। করেই পাইপের লাইটার জ্বেলে তাতে আগুন জ্বালল। ছোট্ট একধরনের গ্যাস-সীলিন্ডার। আমাকেই কিনে আনতে বলেছিল কলকাতা থেকে। কিন্তু অত ছোট সীলিন্ডার দিয়ে কি হবে কিছুই বুঝতে পারিনি তখন আমি। বরং ভেবেছিলাম, কারো অসুখ হলে অক্সিজেন দেবে বুঝি।

ঋজুদা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, এদিক থেকে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে দরজা ভাঙবার। এই বুদ্ধিটা যে কেন মাথায় ঢোকেনি ওদের।

লোহা কাটতে লাগল ঋজুদা নিঃশব্দে। নিঃশব্দে ঠিক নয়, ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ হতে লাগল, অতি সামান্য'। লোহা গলে পড়তে লাগল।

মিনিট দু-তিনের মধ্যেই উল্টোদিকের তালার কড়া গলে গেল।

দরজাটাতে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই, আমরা বিষেণদেওবাবুর, প্রায় ময়দানের মত বড় শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, কাপড়-চোপড়ের একটা আলনা উল্টে ফেলে। সেটা দিয়েই সুড়ঙ্গের দরজাটা আড়াল করা ছিল।

হায় বজ্‌রঙ্গ্‌বলী !

বলেই, ইজীচেয়ারে শুয়ে, গড়গড়ার নলে টান দিতে-থাকা বিষেণদেওবাবু এক লাফে তা থেকে উঠতে গিয়েই গড়গড়ার নলে পা জড়িয়ে গড়গড়া-টড়গড়া নিয়ে উল্টে পড়ে গেলেন।

প্রকাণ্ড ঘরটার অন্য কোণে উনি ট্রানজিস্টর শুনছিলেন, সেটাকে প্রায় কানের কাছে রেখে। তাই, আমাদের কোনো আওয়াজই শুনতে পাননি।

আমাদের দুজনের হাতেই খোলা পিস্তল দেখে বিষেণদেওবাবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বললেন, ঋজুবাবু ! এই কি মেহমানের কাজ ? ছিঃ ছিঃ। হায় বজ্‌রঙ্গ্‌বলী ! আমার যা আছে সব নিয়ে যান, আলমারীর চাবি দিচ্ছি, সোনা জহরৎ, টাকা-পয়সা সব কিছু—আমাকে শুধু জানে মারবেন না। আমি চলে গেলে ছেলেটা একেবারে ভেসে যাবে ঋজুবাবু। আমাকে দয়া করুন। ভানুর, আমি ছাড়া কেউই নেই।

ঋজুদা সুড়ঙ্গের দরজাটা বন্ধ করে তার সামনে একটা টেবল্ দিয়ে ঠেকা দিল।

তারপর তাড়াতাড়ি বিষেণদেওবাবুকে বলল, সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। কোনো বাজে কথা শোনারই সময় নেই এখন আমাদের। আপনি শীগগির সামনের এই ওয়াড্রোবটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। দরজাটা নিজেই ধরে রাখবেন ভিতর থেকে, একটু ফাঁক করে। ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবেন।

হায় বজ্‌রঙ্গ্‌বলী। হায় বজ্‌রঙ্গ্‌বলী। কী বিপদ। কী বিপদ ! ভানু কোথায় ? ভানু ?

ঋজুদা বিষেণদেওবাবুর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে বলল, রুদ্র, তুই সুড়ঙ্গের দরজার বাঁ পাশে গিয়ে ঐ টেবল্‌টার উপরে উঠে দাঁড়া। পিস্তল রেডী রাখিস। দেখিস, ঐ ওয়াড্রোবের দিকেই আবার যেন গুলি চালাস না। খু-উ-ব সাবধান।

বলেই, এই পায়ে লাথি দিয়ে টেবল্‌টাকে সরিয়ে দিল সুড়ঙ্গের মুখ থেকে। সুড়ঙ্গের দরজাটা হাঁ করে খুলে রইল।

মিনিট তিনেক চুপচাপ। মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ। শুধু এ বিপদের মধ্যেই গড়গড়ার নলটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে ঋজুদা ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে টানছিল। পাইপটা গাড়িতেই রেখে এসেছিল, গাড়ি ছেড়ে আসবার সময়। পাছে, পাইপের তামাকের গন্ধ বিট্রে করে আমাদের।

ঐ সাংঘাতিক সিচুয়েশানেও ফিস্‌ফিস্ করে ঋজুদা আমাকে বলল, গয়ার অম্বুরী তামাক—ফারস্ট্ ক্লাস।- বুঝলি রুদ্র !

বিষেণদেওবাবু সেই কথা শুনে অবাক হয়ে ওয়াড্রোবের দরজা খুলে ধরে বললেন, অজীব আদ্‌মী হ্যায় আপ্।

ঋজুদা প্রায় ধমকে বলল, দরজা বন্ধ করে মুখ ভিতরে করুন শিগগিরি।

ঠিক সেই সময়ই সুড়ঙ্গের নীচ থেকে কী একটা নরম কিন্তু দ্রুতগামী আওয়াজ ভেসে এল।

তারপরই মনে হল, একটা ঝড় আসছে। পাতাল ফুঁড়ে।

গড়গড়ার নল আর পিস্তলটা সাইড-টেবলের উপর রেখে, বিষেণদেওবাবুর দরজার পেতলের ভারী খিল্‌টা হাতে তুলে নিল ঋজুদা। তুলে নিয়েই দু' হাতে ধরে মাথার উপরে

তুলল।

বিষেণদেওবাবুর ওয়াড্রোবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার আরও এক মেহ্‌মান আসছে।

আমার খুব ভয় করতে লাগল। ঋজুদা ভুল করছে। এ সাপ, সাপ নয়; অভিশাপ।

মুহূর্তের মধ্যে সাপটা এসে গেল। সে যেই সুড়ঙ্গের দরজা দিয়ে মুখ বের করে সিঁড়ি থেকে মাথা তুলে মেঝেতে মাথা রাখল—অমনি ঝন্‌ঝন্ করে পিতলের খিলটা পড়ল তার মাথায়।

কিন্তু অত বড় সাপের মাথায় মাল্টিস্টোরিড বাড়ির পাইলিং করার লোহার চৌকো হাতুড়ী পড়লেও বোধহয় কিছুই হতো না। আঘাত পেল ঠিকই—কিন্তু খিল্‌টাই লাফিয়ে উঠলো; যেন রাবারের উপর পড়েছে গিয়ে। খিল্‌টা লাফিয়ে উঠেই ঋজুদার হাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে মেঝের একেবারে মাঝখানে চলে গেল ঝন্‌ঝন্ করে। সাপটা এবার ফণা তুললো। কী ফণা।—ফণা তুলে, একবার ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে দেখলো। ঋজুদাকে দেখামাত্রই সে প্রায় ছ' ফিট লম্বা হয়ে দাঁড়ালো পুরো ফণা ছড়িয়ে, জলপাই-সবুজ রঙ তার পিঠের, পেটের দিকে কালো-সাদা ডোরা, প্রকাণ্ড বড় হাঁ, একজোড়া বীভৎস দাঁত ও একটা এক হাত লম্বা চেরা-জিভ দিয়ে সে যেন পৃথিবী ধ্বংস করবে বলেই মনে হল।

আমি আমার অজান্তেই টেবলের উপর দাঁড়িয়ে ফণাটার গোড়াতেই লক্ষ করে মনে মনে জয় বজরঙ্গবলী বলে পিস্তলের ট্রিগার টানলাম। ঘরের মধ্যে শর্ট ব্যারেলের পিস্তলের আওয়াজ গম্‌গম্ করে উঠল। গুলিটা সাপটার মাথা এ ফোঁড় ওফোঁড় করে বিষেণদেওবাবুর রাইটিং টেবলের উপরে রাখা একটা সুন্দর ঝাড়বাতিকে ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে দিল। গুলি খেয়েই সাপটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একবার। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে লুটিয়ে পড়েই যেই আবার উঠতে যাবে, ভারী মেহ্‌গনী কাঠের গোল টেবল্‌টাকে মুহূর্তের মধ্যে দু' হাতে তুলে নিয়ে ঋজুদা তার গায়ের উপরে দড়াম্ করে ফেলে দিল। এজ, লাক্ উড হ্যাভ ইট্; পড়ল ত' পড়, একেবারে কোমরেরই উপর। মাথায় গুলি খেয়ে কোমরটাতেও চোট খাওয়াতে এত বড় কালনাগ ঘরের মধ্যে যে কী তাণ্ডব শুরু করল সে কী বলব! তার চোখের আগুন, দাঁতের বাহার, জিভের লক্‌লক্—ও বাবা গোঃ।

বিষেণদেওবাবু ওয়াড্রোবের দরজা একটু ফাঁক করে, হায়। হায়! করেই আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ওয়াড্রোবের ফাঁক থেকে মাঝে মাঝেই শুধু বিষেণদেওবাবুর হায় বজরঙ্গ্‌বলী, জায় বজরঙ্গ্‌বলী, হায় বজরঙ্গ্‌বলী, জায় বজরঙ্গ্‌বলী শোনা যাচ্ছিল কান্না-মেশানো দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, তুই এবার আমার জায়গায় এসে দাঁড়া রুদ্র। আমি এ ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করি।

আমি ঋজুদার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই ঋজুদা পেতলের খিলটাকে আবার তুলে নিয়ে পর পর সাপটার মাথায় গোটা দশ-বারো মোক্ষম বাড়ি মারাতে সাপটা অবশেষে ফণাটা নামিয়ে মেঝেতে শুলো। ওর দীর্ঘ, তীব্র ঝাঁঝালো পথ এবারে শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও যে সে মরবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। কেবলই উল্টে-পাল্টে হিস্‌হাস্ করতে লাগল। আমি যে টেবল্‌টাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম,

সেটাকেও উল্টে দিলাম সাপটার উপরে।

এমন সময় আমার নাকে একটা বোঁটকা গন্ধ এবং ঋজুদা, আফ্রিকাতে ভুষুণ্ডার গুলি খাওয়ার পর ঋজুদাকে খুঁজতে গিয়ে পাথরের উপর যেমন নূপুরের শব্দের মত শব্দ এসেছিলো কানে, ঠিক তেমনই শব্দ পেলাম।

রেডি হয়েই রইলাম। গন্ধটা জোর হতে লাগল, পায়ের নখের শব্দটাও ; হঠাৎ একেবারে কাছে এসে গেল।

যেই লোম-ওঠা হতকুচ্ছিৎ হায়নাটা মাথা বের করবে ঘরের ভিতরে, আমি তার ঠিক বাঁ কানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা গুলি চালান করে দিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেব মনস্থ করে পিস্তল তুলেই রেখেছিলাম। কিন্তু সে মাথাটা ঘরে ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্লপ্ করে একটি চাপা নরম আওয়াজ হল। কি হল, বোঝবার আগেই, লোম-ওঠা, ঘেয়ো হায়নাটা জিভ বের করে মেঝেতে চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। যেন ঘুমোবে। যেন অনেকদিন থেকে অনেক ঘুম জমা হয়েছিল ওর মধ্যে।

এর পর আর কিছুই ঘটলো না। আমি ভেবেছিলাম, সেই ঝাঁকড়া-চুলের জংলী লোকগুলোও বুঝি আসবে। তারা কারা কে জানে ? আর তাদের পিছনের লোকটি ? সে কে ?

যেন, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই ঋজুদা বলল, পুলিশ আসবে এখুনি।

বিষেণদেওবাবু খুব ভয় পেয়ে মুখ কালো করে বললেন, পুলিশ ? পুলিশ কেন ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনও মানুষ ভি খুন হলো না কি ? আমি ত' নির্দোষ। আর আমার ভানু ত' ফুলের মত ; শিশু।

ঋজুদা বলল, মামা-ভাগ্নের ব্যাপার। সেসব আপনারাই জানেন।

বিষেণদেওবাবু আবার বললেন, ভানু ? ভানু কোথায় ? সত্যি কথা বলুন ঋজুবাবু, আমার ভানুর কোনো বিপদ ঘটেনি ত' ?

ঋজুদা কি বলতে যাবে বিষেণদেওবাবুকে, ঠিক এমনি সময়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে পুলিশের একজন বড় অফিসার আর তাঁর সঙ্গে দু'জন দারোগা ও চারজন কনস্টেবল খোলা রিভলবার, রাইফেল আর টর্চ হাতে বিষেণদেওবাবুর ঘরে ঢুকেই ঐ বিরাট নড়াচড়া করা সাপ আর মরা হায়নাটা দেখে চমকে উঠলেন। তারপরই আমাদের দু'জনের দিকে রাইফেল, রিভলবার তুললেন।

ঋজুদা বলল, গুল্‌লি-অলি। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম, গুল্‌লি-অলি।

বিষেণদেওবাবু ওয়াড্রোব থেকে বাইরে বেরোতেই পুলিশ সাহেব দ্বিতীয়বার চমকালেন।

ঋজুদা বলল, পুলিশ সাহেবকে—আপনি ত' চেনেনই রাজা বিষেণদেও সিংকে। আর আমিই হচ্ছি ঋজু বোস। আর এই আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট, রুদ্র।

॥ ১০ ॥

ডি-এস-পি রহমান সাহেব এবং অন্যান্যদের নিয়ে বিষেণদেওবাবু বসার ঘরে বসেছিলেন মুখ নীচু করে। সঙ্গে ঋজুদাও ছিল। সকলকে নাস্তাপানি দিচ্ছিল খিদ্‌মদ্‌গার ও বেয়ারারা।

ঘর থেকে অন্য একটা পাইপ এনে ঋজুদা চুপচাপ পাইপ খাচ্ছিল। আর কি যেন ভাবছিল। রহমান সাহেবের ফোর্স তিনজন লোককে এ্যারেস্ট করেছেন। একজন

উন্ডেড্। ওঁদের একজন কনস্টেবলও উন্ডেড হয়েছে। পায়ে এল-জি লেগেছে। উন্ডেডদের নিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান চলে গেছে সদরের পুলিশ হসপিটালে। তবে ভানুপ্রতাপকে পাওয়া যায়নি। ব্রিজনন্দনকেও নয়।

একটু আগেও রহমান সাহেব ঋজুদাকে বলেছেন—মিস্টার বোস মাই আই-জি হ্যাজ স্পোকেন ভেরী হাইলী অফ ট্যু টু আমরা সবই ত' বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু এভিডেন্স্ ত' একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে উজ্জানপুরের জমিদার সুরিন্দারবাবু আর তাঁর স্ত্রী শুভাবাঈ-এর মৃত্যু যে মার্ডার, তা প্রমাণ করবেন আপনি কি করে? সাক্ষীও পাবেন না। এভিডেন্সও নেই কোনো। যদি কোনো ফ্রেশ-মার্ডার হত, তবে না-হয়......

ঋজুদা পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, তাহলে বলছেন, আপনাদের সুবিধে হত যদি বিষেণদেওবাবুও মার্ডার্ড হওয়া অবধিই অপেক্ষা করতাম আমরা?

তারপর বলল, ওঁকে বাঁচিয়ে তাহলে আমরা সকলে খুবই অন্যায় করে ফেলেছি বলুন?

রহমান সাহেব একটু বিরক্ত হলেন। এ-দেশের পুলিশ, তাঁদের মুখের ওপর কেউ কোনো কথা বললে তা বরদাস্ত করতে পারেন না।

রহমান সাহেব বললেন, স্যার। আপনি একটু আনরীজ্‌নেব্‌ল হচ্ছেন।

—মোটেই নয়।

ঋজুদা বলল। আমি এতেই খুশী। বিষেণদেওবাবুকে বাঁচাতে পেরেছি, এটাই আমার মস্ত লাভ। ভানুপ্রতাপ ধরা পড়ুক আর নাই-ই পড়ুক। এত কিছুর পরও যদি আপনারা বলেন যে, প্রমাণ-সাবুদের অভাব আছে; তাহলে নাই-ই বা ধরলেন তাকে। তবে, না-ধরলে বিষেণদেওবাবুর বাকি জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। তাতে কি আপনারা রাজী আছেন?

এ ত' আন্‌প্র্যাকটিকেবল্ কথা হল।

রহমান সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন।

এমন সময় ঋজুদা বলল, রুদ্র। তুই এঁদের জীপেই চলে গিয়ে আমার ট্রান্সমিটারটা আর নদীর বেড থেকে টেপ-রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে আসবি। যা! চলে যা!

তারপর রহমান সাহেবকে একটা জীপ দিতে অনুরোধ করলো ঋজুদা।

রহমান সাহেব আমার সঙ্গে একজন দারোগাকেও যেতে বললেন।

আমরা মালোঁয়া-মহল থেকে পাঁচশ গজও যাইনি, দেখি, যেখানে নাচঘরের দিকের পায়ে-হাঁটা পথটা এসে মিশেছে বড় রাস্তায় ঠিক সেই মোড়েই ব্রিজনন্দন পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। পথের ধুলোর উপর। দুদিকে দু' হাত ছড়িয়ে।

দারোগা সাহেব লাফিয়ে নামলেন। বললেন, মার্ডার।

সাপে কামড়েছিল ব্রিজনন্দনকে। ডান হাতের বাহুতে গোলাপী টেরিলীনের পাঞ্জাবীর উপরে দু'দিকে দুটি গভীর ক্ষত। মুখে গ্যাঁজ্‌লা। মরতে বোধহয় সময় লাগেনি বেশী!

জীপ ঘুরিয়ে মালোয়াঁ-মহলে এলাম আমরা লাশ নিয়ে।

ঋজুদা বলল, রহমান সাহেব আপনি যা চাইছিলেন, তাই-ই হল। ফ্রেশ মার্ডারই হল শেষ পর্যন্ত। এখন ইমিডিয়েট্‌লী ঐ সাপটাকে আর ব্রিজনন্দনকে হাজারীবাগ সদরে নিয়ে যান। ফরেনসিক ও মেডিক্যাল এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখুন, ব্রিজনন্দন এই সাপের কামড়েই মারা গেছে কী না। তাহলেই......

রহমান সাহেব বললেন, এটা ভাল বলেছেন। এ ত' করতেই হবে। তারপর ঋজুদাকে খুশী করার জন্যে বললেন, এই কেস ঠিকমত ইনভেস্টিগেট না করলে আমার

নোকরী যাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের আই-জি সাহাব আমাদের আই-পি-জি সাহাবকে যখন বলেছেন।

ঋজুদা আবারও বলল, তুই আবার যা অন্য জীপে করে রুদ্র, কাউকে নিয়ে—ঐগুলো নিয়ে আয়।

আমি আবারও উঠলাম। আজই সেই ভোরে কোলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে ধানবাদ এসে এতখানি গাড়ি চালিয়ে পৌঁছেছি। তারপর ত' কাণ্ডর পর কাণ্ড। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড। এখন রাত প্রায় এগারোটা বাজে। ঘুম পেয়ে গেছে আমার।

আবারও বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমার হঠাৎ মনে হল ব্রিজনন্দনের কোমরে ত' সব সময় একটা রিভলবার থাকত ; সেটা আছে ত' ?

পুলিশদের বলতেই সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা খুঁজলেন।

না। নেই। হোল্স্টার আছে, কিন্তু রিভলবারটি নেই। কেউ নিয়ে গেছে।

ঋজুদাকে বললাম কথাটা। ঋজুদা পাইপের একগাল ধুঁয়ো ছাড়ল শুধু আমার দিকে তাকিয়ে।

ঋজুদা বলল, চলুন রহ্মান সাহেব। আমরাও দুজনে জায়গাটা একবার দেখে আসি।

দুটি জীপে করে ঐখানে পৌঁছেই ঋজুদা ভালো করে টর্চের আলো ফেলে ব্রিজনন্দন যেখানে পড়েছিল তার চারপাশ—নাচঘরে যাওয়ার পথ এবং গীমারিয়ার পথে ভালো করে কী যেন খুঁজতে লাগল।

তারপর রহ্মান সাহেবকে বলল, এ্যাই দেখুন।

রহ্মান সাহেবের সঙ্গে আমরাও দেখলাম যে একজনের জুতো-পরা পায়ের ছাপ—নাচঘর থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে গীমারিয়ার পথে চলে গেছে। আর পথের উপরে নাচঘর থেকে আসা ও ফিরে যাওয়া বিরাট সাপের দাগও স্পষ্ট।

ঋজুদা জুতোর দাগের দিকে চেয়ে বলল, ভানুপ্রতাপ! রহ্মান সাহেব, আপনার ফোর্স নিয়ে পিস্‌কি নদীতে গেলে এখনও ভানুপ্রতাপের সঙ্গে দেখা হতে পারে। চলুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে গীমারীয়ার রাস্তার মোড় অবধি যাই—ওখান থেকে ট্রান্সমিটারটা তুলে নিয়ে আসব।

তারপর নিজের মনেই বলল, টেপ রেকর্ডারটা আর পাবি না রুদ্র। যাই-ই হোক। ক্যাসেটটা ত্' আছেই। তাতেই আমার কাজ হবে। এতক্ষণে ভানুপ্রতাপ টেপ রেকর্ডারটা খুঁজে বের করে জঙ্গলের গভীরে গা-ঢাকা দিয়েছে। ও ত' আর জানে না যে, তুই ক্যাসেট খুলে নিয়েছিস!

—কোথায় যেতে পারেন ভানুপ্রতাপ এখান থেকে জঙ্গলে ?

আমি বললাম।

যেখানে খুশী। জঙ্গলে জঙ্গলে পালামৌ, গয়া, চাতরা ; হান্টারগঞ্জ জৌরী, কত জায়গায় যেতে পারে। যেদিকে ইচ্ছে। চারদিকেই ত' জঙ্গল!

ঋজুদাকে বললাম, ঋজুদা! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি ?

সাধের লাউ।

কি ? ব্যাপারটা কি ? ঋজুদা অধৈর্য গলায় বলল।

আরে, যে-ক্যাসেটটা রেকর্ডারে চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে "সাধের লাউ বানাইলো মোরে ডুগডুগি" গানটা ছিল।

উঃ রুদ্র ! তুই ইনকরিজিবল্ । তোকে অনেক বড় বড় লাউ কিনে দেব । এখন ফর গডস্ সেক্, চুপ কর ।

কি বলব ? ঋজুদা আমার কথার ফাইন পয়েন্টটাই বুঝলো না । গানটা কখনও শুনলে, ত' বুঝবে । লাউ কিনে আমি কি তরকারী খাবো ? যত্ত......

ট্রান্সমিটারটা তুলে নেবার পর একটি জীপ আমাদের মালোয়াঁ-মহল-এ পৌঁছে দিল । রহমান সাহেব পুলিশ ভ্যান ভর্তি আর্মড কনস্টেবল এবং জীপে দারোগাদের নিয়ে চলে গেলেন পিস্‌কি নদীর দিকে । হেডলাইট ও স্পটলাইট জ্বেলে ।

মালোয়াঁ-মহলের বসবার ঘরের প্রকাণ্ড সোফাতে বিধ্বস্ত বিষেণদেও সিং বসেছিলেন । ভিজে চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল । মনে হচ্ছিল, গত একঘণ্টাতে ওঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে ।

পুলিশের একটা ব্রেক-ডাউন ভ্যান ঋজুদার ফিয়াট গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এল ফটকের মধ্যে দিয়ে । এঞ্জিন বা রেডিয়টরের কিছুই হয়নি । ডানদিকের কিছুই হয়নি । ডানদিকের মাডগার্ড এবং বাম্পার একদম তুবড়ে গেছে, যদিও চাকাতে আটকাচ্ছে না । অনেক স্ক্র্যাচ পড়েছে দুদিকেই । ডানদিকের জানালার কাঁচটাও ভেঙে গেছে ।

ঋজুদা বিষেনদেওবাবুর দুটি হাত ধরে নরম গলায় বলল, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই বিষেণদেও বাবু । সারারাত চালিয়ে ভোরে আসানসোল কি ধানবাদ পৌঁছে যাব । তারপর কিছুটা রেস্ট করে, কোলকাতা ।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি খুব দুঃখিত । আপনার জন্যেই দুঃখটা সবচেয়ে বেশী ।

বিষেণদেওবাবু দাঁড়িয়ে উঠে ঋজুদার দু' হাত ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, বাচ্চা ছেলের মত ।

বললেন, ঋজুবাবু, যে মালিক, সে কখনও নিজেরটাই চুরি করে ? যে, বংশের একমাত্র বাতি—যে আমার আঁখোকা রোওশ্‌নী—সে কিসের জন্যে এমন হয়ে গেল ? ভানু আমাকেও কেন শেষ করে দিলো না । আমাকে আপনি বাঁচিয়ে দিয়ে মরারও অধম করে রেখে গেলেন ঋজুবাবু ! এখন কি করে আমি বাঁচব বাকি জীবন ? এ বাঁচা কি বাঁচা ?

ঋজুদা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ।

তারপর বলল, ঐ ড্রাগ-এডিকশানই ওর সর্বনাশের মূল । ও একটা ইভিল-জিনিয়াস্ হয়ে উঠেছিল ।

হ্যাঁ । প্রথম দিকে, লান্‌ডানে, পড়াশুনায় ও খুবই ভাল ছিল । বলুন ত' ! এ কী বর্‌বাদীর রাস্তা বেছে নিল এত বড়া খান্‌দানের ছেলে ? নিজের বাবাকে মারল, মাকে মারল ? আমি না-হয় বাইরের লোকই হলাম ।

বাইরের লোকই হলাম ! বলে, আবারও জোরে কেঁদে উঠলেন বিষেণদেওবাবু ।

আমার চোখে জল এসে গেল ।

গাড়িতে আমি মালপত্র উঠিয়ে, গুছিয়ে নিচ্ছি । ঋজুদা বিষেণদেওবাবুকে কোলকাতায় ঋজুদার বাড়িতে কিছুদিন এসে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাল । এবার ঋজুদাও গাড়িতে উঠবে ।

বিষেণদেওবাবু বাইরে অবধি এলেন । গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়ালেন ।

বললেন, ঈসস্ গাড়িটার কি হাল ।

তারপর বললেন, আমাদের ঐ মার্সিডিস গাড়িটা আপনি নিয়ে যান ঋজুবাবু ।

কে চড়বে ? এ ত' ইম্পোর্টেড গাড়ি। আমি ত' ডিজেল-এঞ্জিন বসানো জীপে চড়ে—ভাগ্নের জন্যে পয়সা জমাচ্ছিলাম। এজ আ ট্রাস্টী।

ঋজুদা বলল, আমি সাধারণ লোক বিষেণদেওবাবু, আমার এই সাধারণ গাড়িই ভাল সেই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাথরুমের মধ্যে বন্ধ লোকগুলোর কথা।

তাড়াতাড়ি একটা পুলিশকে ডেকে বললাম সেকথা।

ঋজুদা যে তালা দিয়ে বাথরুম বন্ধ করা হয়েছে তার চাবিটা বের করে দিল। পুলিশরা দল পাকিয়ে উপরে চলল রাইফেল ও হাতকড়া নিয়ে।

বিষেণদেওবাবু আবার একটা ধাক্কা খেলেন।

বললেন, আপনাদের ঘরে ? বাথরুমে ? তিনজন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ ! আমাদের ছোরা নিয়ে খুন করতে গেছিল।

হায় বজরঙ্গবালী, হায় বজরঙ্গবালী—মেহেমানোকোভি এহি.....

ঋজুদা একটা কার্ড দিয়ে ওঁকে বলল, রহমান সাহেবকে দেবেন। সবরকম সহযোগিতা আমি করব। ওঁর দরকার হলে, ফোনও করতে বলবেন আমাকে। আর আপনি এসে থাকুন কদিন আমার কাছে।

॥ ১১ ॥

গাড়িটা ত' বাঘের বাচ্চার মত চলছে রে রুদ্র ? কে বলবে, অত বড় গাড্ডায় পড়েছিল। তবে, মনে হচ্ছে, সাস্‌পেনসানটা গেছে।

তা যাক্। আমি বললাম। আমরাই যে যাইনি এই ঢের ! এখানে আসা অবধি থেকে এই আজ চলে যাওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা ব্যাপার যা সব ঘটল সবই যেন হেঁয়ালী। তুমিও সেরকম। কে যে কে ! আর কে যে কেন কি করছে তার কিছুই যদি বললে এখনও অবধি। মধ্যে দিয়ে প্রাণই যেতে বসেছিল। তার উপর এন্টারোস্ট্রেপ্।

বলেই, বললাম, মার কাঁচিটা ? এনোছো ত' ঋজুদা ?

ঋজুদা গাড়িটা থামিয়ে, পাইপটা ধরালো। তারপর বলল, তুই-ই চালা রুদ্র। আমি তোর পাশে বসে তোর ধাঁধার উত্তর দিতে দিতে যাই। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। বাজে কটা ?

—রাত একটা।

চল্ তোকে গরম জিলিপী, শিঙাড়া খাওয়াব কোথাও, ভোরবেলা।

আমি বললাম, জানো,—প্রথম থেকেই আমি ভাবছি, বিষেণদেওবাবু-ই যত গোলমালের গোড়া। আর শেষে কী না ভানুপ্রতাপ !

—তোর দোষ কি ? প্রথমে আমিও তাই-ই ভেবেছিলাম। এবার তুই জিজ্ঞেস কর, তোর যা যা প্রশ্ন আছে।

অ্যাল্‌বিনোটা কোথায় গেল ? রোজই ত' ডাকাডাকিও করত। এই সব ঝামেলাতে পড়ে মাঝখান দিয়ে আমার অ্যাল্‌বিনো বাঘটাই মারা হল না।

অ্যাল্‌বিনো কেন, এই জঙ্গলে কোনো বাঘই নেই এখন। একটা বুড়ো হায়না আছে শুধু।

নেই মানে ? এত পায়ের দাগ। ডেকে ডেকে মাথা গরম করে দিল রোজ সন্ধেবেলাতে।

না। বাঘ নেই। যে-বাঘের ডাক শুনেছিস তা চিড়িয়াখানার বাঘের ডাক।

টেপ্-করা।

ভানুপ্রতাপ কিংবা তার কোনো লোক টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে জঙ্গলে ওটা নিয়ে হাঁটত রোজ সন্ধেবেলাতে।

তারপর বলল, স্বাভাবিক অবস্থাতে বাঘ হাঁটতে হাঁটতে কখনও ডাকে না। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে ডাকে। প্রথমদিন ডাক শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ডাকটা অমনভাবে জায়গা বদলাচ্ছে শুনে। যাক্ বাঘের ডাকের টেপ সঙ্গে করেই ত' নিয়ে এসেছি। কোলকাতা গিয়ে তোকে শোনাব।

—আর পায়ের দাগ ?

—সেটা তোর বোঝা উচিত ছিল কাথবার্টসন হার্পারের হালদারবাবুর কাছে যখন পাঠিয়েছিলাম তোকে, তখনই। বেচারী বিষেণদেওবাবু ! ঘাড়ের দাদ চুলকোবার জন্যে যা বানিয়েছিলেন তাতে যে তাঁর নিজের ঘাড়টিই চলে যেতো তা উনি কি আর জানতেন ? রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কেউ কখনও শুনেছো, না শুনলেও বিশ্বাস করবে যে দাদ চুলকোবার জন্যে বাঘের থাবা স্টাফ্ করিয়ে, থাবার নীচে ভেলভেট্ দিয়ে, তাতে হ্যান্ডেল লাগিয়ে এমন জিনিস বানানো যায় ?

ভেল্ভেট দিয়ে মানে ?

নদীর বালিতে বাঘের থাবার দাগে ভেলভেটের দাগ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল—তাছাড়া পাতার মধ্যেটা অস্বাভাবিক উঁচু করে দিয়েছিলেন হালদারবাবুর লোকেরা স্টাফ করবার সময়। ওটা বানিয়েছিলেন বিষেণদেওবাবু। কিন্তু চুরি করেছিল ভানুপ্রতাপ অ্যাল্‌বিনোর গল্প বানাবার জন্যে।

আচ্ছা ঋজুদা, হালদারবাবুকে তুমি একটা বড় খামে করে কি পাঠিয়েছিলে ?

তোর মায়ের বড় কাঁচিটা দিয়ে দেওয়াল থেকে ঝোলানো বাঘের চামড়াটার অন্য থাবাটাও কেটে পাঠিয়েছিলাম ওঁর কাছে, যাতে উনি শ্যুওর হন। অন্য থাবাটি ত' আগেই কেটে বিষেণদেওবাবু ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। স্টাফ করার জন্যে।

আমি বললাম, এবার বুঝেছি। এই জন্যেই তুমি বাঘটাকে কাছ থেকে দেখতে যেতেই ওঁরা দুজনেই হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন।

তা বটে। তবে দুজনের 'না' করার পেছনে কারণ কিন্তু আলাদা আলাদা ছিল।

বললাম, হুঁ।

কিন্তু অ্যাল্‌বিনোর সঙ্গে বিষেণদেওবাবুর মৃত্যুভয়ের কি সম্পর্ক ছিল ? তাছাড়া বিষেণদেওবাবুকে মারতেই যদি চাইবে ভানুপ্রতাপ, তাহলে ও আমাদের এ্যাভয়েডও করতে পারত। আমাদের দিয়েই বাঘ মারবার আয়োজন করল কেন সে ?

স্যান্ডি, মানে সুরিন্দার আর শুভার অল্পদিনের ব্যবধানে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অনেকেরই সন্দেহ হচ্ছিল যে, ওদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অথচ দেখলি ত' ? টুটিলাওয়ার হাজীসাহেব থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, বিষেণদেওই খুন করেছেন ওদের। খুনের ব্যাপারে মোটিভ্‌টাই আসল। ভানুপ্রতাপই ত' একমাত্র বংশধর—তার কি দরকার মা-বাবাকে খুন করবার। আমিও কনফিউজ্‌ড হয়েছিলাম এ কারণেই প্রথম থেকে। কারণ, ভানুপ্রতাপকে মারতে বিষেণদেওর যে মোটিভ্, বিষেণদেওকে মারতে ভানুপ্রতাপেরও সেইই মোটিভ্। একজন মারা গেলেই অন্যজন সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক হত। এই জিনিসটারই পুরো সুযোগ নিয়েছিল ভানুপ্রতাপ। কিন্তু ভানুপ্রতাপ যে পরিমাণ ড্রাগ খাচ্ছিল এবং লান্‌ডানে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছিল তাতে সম্পত্তির জন্যে তার

আর একদিনও অপেক্ষা করবার তর সইছিলো না। অল্প সম্পত্তিতেও তার মন ভরছিল না, সবই চাইছিল সে।

তোদের জেনারেশানের এই-ই দোষ। যা তোরা চাস সব এক্ষুনিই চাস্। তর সয় না তোদের। যা তোদেরই, তা পেতেও একটুও দেরী সয় না। সম্পত্তি ওর হাতে এলেই ও বিদেশে পাড়ি দিত। ওদের এক্সপোর্টের ব্যবসা। আন্ডার-ইনভয়েসিং, জাল-জয়াচুরি করে বিদেশে ফরেন-এক্সচেঞ্জ ওরা জমাতে পারত। যে টাকার জন্যে নিজের মা-বাবাকে দু' মাসের মধ্যে খুন করতে পারে ; তার পক্ষে অসাধ্য কিছুই ছিলো না। লান্ডানের বেইজ-ওয়াটার স্ট্রীটে বেড-সীটার মহল্লাতে ছাত্র-ছাত্রীদেরই ভীড়। নানারকম কাণ্ডই হয় সেখানে। আমার নিজের চোখে দেখা। টাকা, অনেক টাকা, অনেক টাকার দরকার ছিলো ভানুপ্রতাপের। তুই তখন কোলকাতা গেছিলি, তখন ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম, ও লান্ডানের প্লে-বয় ক্লাবের মেম্বার হয়েছিল। ঐ ক্লাবে আবু-দাবী আর দুবাইয়ের শেখরা আর সারা পৃথিবীর প্লে-বয়রা এক রাতে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া খেলে। সব গুণই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ও ইংল্যান্ড থেকে আসার সময়। হয়ত অনেক ধারও হয়েছিল সেখানে। জুয়া যাকে একবার পেয়েছে, তাকে ছাড়ে না সহজে। আসলে কি যে হয়েছিল, তা পুলিশের জেরায় আর ইনভেস্টিগেশানেই বেরোবে। এমনি এমনি ও আসেনি। মা-বাবা-মামাকে মেরে সর্বেসর্বা হয়ে ফিরে যাবার জন্যেই এসেছিল। ওখানে ফিরে গিয়ে ও ফুর্তি করত—মাঝে মাঝে ফিরে আসত বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে। কিছুদিন খনির কাজ দেখে, টাকার সংস্থান করে আবার ফিরে যেত। এই হয়ত ছিল ওর ধান্দা!

বললাম, ঋজুদা, ভানুপ্রতাপ কি ওষুধ খেতেন ? ওগুলো কি ঘুমের ওষুধ ?

ঠিক ঘুমের নয়। শুনেছি, নানারকম ট্যাবলেটস আছে, নেম্বুটালস্ ; এ্যাম্‌ফিটামাইন্‌স বারবিচুরেট। তাছাড়া, আরও নানারকম নেশা করে, যেমন হেরোইন, মেসকালিন ; মাড়িজুয়ালা। জানি না, ও হয়ত মারিজুয়ালাই খেত—আমাদের দেশের গাঁজার মত ব্যাপার। ওর মধ্যে ডেলটা-নাইন-টেট্রাক্যানাবিনল বা সংক্ষেপে, টি-এইচ-সি বলে একরকমের রাসায়নিক উপাদান থাকে। এ সব বেশী খেলে, মানুষের মানসিক বিকৃতিও ঘটে। ভানুপ্রতাপ যে মানসিক বিকারগ্রস্ত নয় ; এমন কথাও জোর করে বলতে পারি না আমি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলে, জানতে পারবেন।

আমি বললাম, কিন্তু অ্যাল্‌বিনোর নাম কর ছুলোয়া শিকার করিয়ে ওঁর কি লাভ হত ?

লাভ হত এই যে, বীটাররা যখন বীটিং করত, হৈ-হল্লা শোরগোল, তার মাঝে টেপ-রেকর্ডারে বাঘের ডাক ডাকিয়ে ও বিষেণদেওবাবুকে অন্যমনস্ক করে দিত—দিয়ে, নিজেই হেঁটে গিয়ে বিষেণদেওবাবুকে মাচা থেকে নামতে বলত, মাচাটাও ভেঙে পড়তে পারত যে-কোনো সময়ে অন্তত একটা মাচা যেভাবে বাঁধিয়েছিল ও, তাতে কেউ বসলে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তারপর হয়ত ওর বেহেড়ীয়া চর হায়নাটাকে লেলিয়ে দিত পিছন থেকে—হায়নাটা ঘাড় কামড়ে ওঁকে শেষ করত। হায়নাটা উনি মাটিতে নামলে আগেও ওঁকে কামড়াতে পারত। এবং যেখানে হায়না কামড়াত সেখানে ও গুলিও করতে পারত দূর থেকে। এমনিতেও গুলি করতে পারত। বাঘের ডাক, গুলির শব্দ ও জংলী জানোয়ারের কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে কারোই সন্দেহ থাকত না যে বিষেণদেওবাবুকে বাঘেই মেরেছে। নদীতে এত পায়ের দাগ বাঘের!

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, আসলে ঠিক কি যে করত, তা ওইই কেবল

জানত, আর হয়ত জানত ব্রিজনন্দন। অ্যাল্‌বিনোর গল্পটা চালু করত না ভানুপ্রতাপ তার সঙ্গে বিষেণদেওবাবুকে মারার কোনো সম্পর্ক না থাকলে।

তাই যদি হবে, তা উনি আমাদের ডাকতে যাবেন কেন ? আমাদের ডেকে কি লাভ হল ?

—আমাকে অনেকেই চেনে-জানে। আসলে, আমাকেই সাক্ষী মানতে চেয়েছিল ও। বিষেণদেওবাবুর কাছে, আমি মুলিমালোয়াঁতে আসছি শুনেই অ্যাল্‌বিনোর গল্প চালু করেছিল। শিকারী আসোয়া আর তার ছেলে রত্নাকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়েছিল বিষেণদেওবাবুর কাছে, ওরা বাঘ দেখেছে বলে। তবে, আসোয়ারা হয়ত আসলে ভানুপ্রতাপ কোন্ উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা বলাচ্ছে না জানতোই না। পুলিশ ওদের জেরা করলেই তখন সত্যি কথা বেরুবে। আমি আর তুইই যে ভানুর কাল হবো, তা বেচারা একটুও বুঝতে পারেনি। যে-মুহূর্তে ও তা বুঝতে পেরেছিল ; সেই মুহূর্তে আমাদেরও শেষ করে দিতে একটুও পিছপা হয়নি। তবে ওর বোঝাবুঝির আগেই অ্যাল্‌বিনোর চালটা ও চেলে দিয়েছিল। ওর রক্তে জুয়া ঢুকে গেছিল। চাল দেবার পর পাকা জুয়াড়ির মতই ভেবেছিল খেলাটা ওইই জিতবে।

জানালা দিয়ে পাইপের ছাই ঝেড়ে ঋজুদা বলল, তোকে বলিনি, যখন তুই ছিলি না—মানে যেদিন তুই কোলকাতা চলে গেলি, সেদিনই খুব বৃষ্টি হয় বিকেলে। খুব ঠাণ্ডা পড়ে যায়, সোয়েটার গায়ে দেওয়ার মত। পাঙ্খাপুলারদের পাখা টানতে মানা করে দিই আমি। ঘুমিয়ে আছি, গায়ে চাদর দিয়ে, হঠাৎ কী রকম অস্বস্তি বোধ হল। চোখ মেলে দেখি, ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর ঠিক আমার মাথার উপরে—যে-ফুটো দিয়ে টানা-পাখার দড়ি ঘরে ঢুকেছে সেই ফুটো দিয়েই একটা সরু সাপ ঢুকে, পাখার দড়ি বেয়ে নেমে আসছে। একেবারে আমার বুকে লাফিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময়ই সেন্স কাজ করায় ঘুম ভেঙে গেছিল আমার। তড়াক্ করে বিছানা থেকে নেমেই দরজার খিল খুলে নিয়ে তাকে বিছানাতেই পিটিয়ে মারি। সবুজ, পরিধিতে এক-আঙুল মত একটা সাংঘাতিক সাপ। একবার কামড়ালে, আর দেখতে হত না। রাতে কি ঘটেছিল, তা পরদিন আমার মুখ দেখে কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু সেখানেই আমার একটু ভুল হয়ে গেছিল চালে। ব্যাপারটা যে কি ঘটেছিল, তা সাপটা ফিরে না-যেতেই ভানুপ্রতাপ বুঝেছিল। কিন্তু আমি ওকথা প্রকাশ না করাতেই ওর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আমার মতলব অন্য কিছু না থাকলে, সেই রাতেই চেঁচামেচি করে আমি বাড়ি মাথায় তুলতাম—নয়ত পরদিন সকালেই বলতাম সাপের কথাটা অন্তত সকলকে। তাই-ই করা উচিত ছিল—তাহলে ফাইন্যাল-অপারেশনটা অনেক কম ডেঞ্জারাস হতে পারত।

আমি বললাম, ভানুপ্রতাপের বাবা কি করে মারা যান ? মানে, তোমার ধারণা কি ?

দ্যাখ্, স্যান্ডিকে আমি চিনতাম। ওঁর মত ভালো পোলো প্লেয়ার দেশে বেশী ছিলো না।

ওর মত ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যেতে পারে বলে আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। স্যান্ডির মাথায় ভারী কোনো জিনিস, হাতুড়ি-টাতুড়ি দিয়ে হয় ভানুপ্রতাপ নিজে, নয় ব্রিজনন্দন অথবা ওর কোনো শাগরেদ বাড়ি মেরেছিল। তারপর এমন করে শুইয়ে দিয়েছিল পাথরের উপর সেই পাথরে ওরই রক্ত লাগিয়ে যে, কারোই সন্দেহের কারণ ছিলো না।

আর শুভাবাঈ ? আমি বললাম। নিজের মাকে ? ঈস্‌স্......

শুভাবাঈ-এর জ্বর হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ঠিক সেদিনই তার এখানকার পুরনো আয়া ওর জ্বর হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি ফিরে যায়। সে আর কখনও ফিরে আসেনি। এই ব্যাপারটাও রহস্যময়। শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। সে ভানুপ্রতাপের কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়ে পালিয়ে গেছিল, না ভানুপ্রতাপই তাকেও সরিয়ে দিয়েছিল পৃথিবী থেকেই, তাও বলতে পারব না—কিন্তু যেদিন শুভাবাঈ মারা যায় সেদিন সে একাই শুয়েছিল তার ঘরে। আমার ঘরেরই মত কোনো না কোনো সাংঘাতিক বিষধর সাপ টানা-পাখার দড়ি-ঢোকার ফুটো দিয়ে এসে তাকে কামড়ে চলে যায় বলেই আমার বিশ্বাস। এপ্রিলের প্রথমে মারা যায় শুভাবাঈ। তখনও এখানে খুব প্লেজেন্ট ওয়েদার। টানা-পাখা চলে না তখন।

আমি বললাম, অস্বাভাবিক মৃত্যু ; কোনো পোস্টমর্টেম হলো না ? আশ্চর্য ?

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, সন্দেহের কোনো কারণ না থাকলে এখনও খুব বড়লোক, আর রাজা-রাজড়ার বাড়িতে সহজে পোস্টমর্টেম হয় না। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁদের সকলেই খাতির করেন। আইন ত' তামাশা! আইনের প্যাঁচে পড়লেও একমাত্র বড়লোকরাই পয়সা খরচ করে সে তামাশা দেখতে পারে। গরীবরা সে তামাশার খরচ জোগাতে পারে না। দুটি মৃত্যুই স্বাভাবিক ভেবেছিল সকলেই প্রথমেই। কিন্তু গত ক'মাসে যে বেহেড়ীয়াদের এনে নাচঘরকে একেবারে স্নেক্‌-হাউস করে তুলেছিল ভানুপ্রতাপ, সে আর কে জানত ?

একটু চুপ করে থেকে, ঋজুদা বলল, আমাদের মত রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল সাক্ষীর উপস্থিতিতে যদি বাঘের বীটিং-এ বাঘের হাতেই বিষেণদেওবাবু মারা যেতেন—তাহলেও পোস্টমর্টেম ভানুপ্রতাপ করতে দিতো না এবং আমাদেরই সাক্ষী মানত। আর এইখানেই ভানুপ্রতাপ মারাত্মক ভুল করেছিল। আমাদের কাছে ওর এই অ্যাল্‌বিনোর চালটা না চাললে, বিষেণদেওবাবুকে ও নির্বিঘ্নেই মারতে পারত অন্যভাবে, আমরা চলে যাবার পর।

আমি বললাম, তাহলে ভূত-পেত্নীর বাপারটা ? নাচঘরের ?

সেটা ত' খুবই সোজা! এটা তুই জিজ্ঞেস করবি আমাকে তা ভাবিনি। যাতে কেউ নাচঘরের দিকে ভুলেও না যায় দিনের বেলাতেও, তাইই টেপ-রেকর্ডারে বাঈজীর গান বাজিয়ে আর নিজে ঐ সাদা ঘোড়াটাতে রাতে চেপে বেরিয়ে পুরো জায়গাটাকে একটা ভৌতিক আবরণে মুড়ে দিতে চেয়েছিল ভানুপ্রতাপ। নইলে, পেত্নী কখনও সারেঙ্গী তবল্‌চি নিয়ে গান গায় ? এবং শুধু গানই নয়, একেবারে আলাপ, বিস্তার তান দিয়ে ? এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাছাড়া, তুই যাওয়ার রাতে এবং পরদিন রাতেও এ' গানই শুনেছিলাম। ঐখানেও একটা নীরেট বোকামি করেছিল ভানুপ্রতাপ। কোনো নামকরা গাইয়ের একটিমাত্র গানই টেপ করেছিল। ভানুপ্রতাপ নিজে নিশ্চয়ই গানবাজনা ভালবাসে না—বাসলে, অমন করতো না, অন্তত কিছু ভাল গান শোনাতে পারত আমাদের। আর গান ভালোবাসত না বলেই ত' ও খুনী।

একটু চুপ করে থেকে আবার ঋজুদা বলল, ভূতেরা নিজেরা যে অন্য ভূতদের ভয় পায় না ; এ কথাটা ভানুপ্রতাপের আমাদের সম্বন্ধে ভাবা এবং জানা উচিত ছিল। সকলেই দেহাত-জঙ্গলের কুসংস্কারাবদ্ধ মানুষ নয়। বিষেণদেওবাবুর কথা আলাদা। চিরদিনই এইরকম জায়গায় থেকেছেন, ধার্মিক, সরল প্রকৃতির লোক। ভূত-পেত্নীর ব্যাপারে ভয় পেয়ে বারবার নানারকম পুজো চড়াতেন উনি। নানা জায়গায়। এখানেও বনদেওতার আর বজ্‌রঙ্গ্‌বলীর মন্দিরে। তাতেও, তাঁর বোন-ভগ্নিপতীর আত্মা শান্ত হচ্ছে না দেখে

খুবই মনমরা হয়ে থাকতেন বেচারী সবসময়। এ কথাটাও সত্যি যে, বিষেণদেওবাবুর বাবা খুব অত্যাচারী, দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন। সত্যি সত্যিই গয়ার এক বাঈজীকে তিনি ঐ নাচঘরে খুনও করেছিলেন। একথা আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থেকে ভেরিফাই করে নিয়েছিলাম। বিষেণদেও সেকথা জানতেন বলেই ভাবতেন, সেই বাঈজী হয়ত সত্যিই পেত্নী হয়ে এসেছে, আর অপঘাতে মারা যাওয়ায় সুরিন্দারও ভূত হয়ে গেছে। বিষেণদেওবাবু হলেন এরকম চরিত্রের লোক। আর তায় ভাগ্নে পেল তার দাদুর চরিত্র। একেবারে নর্থ পোল্ সাউথ পোল্-এর ব্যাপার। সুরিন্দারও ফারস্ট-রেট্ জেন্টেলম্যান্ ছিল। বুঝলি না, একেই বলে জিন্। কার মধ্যে যে পূর্বপুরুষদের কার জিন্ প্রভাব ফেলে, এবং কেন ফেলে, এই রহস্যের সমাধান করতে এখনও বিজ্ঞানীরা হিমশিম্ হচ্ছেন।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, বাঘের থাবার কাছে যে জুতোর দাগ দেখেছিলে—সেই ডাক্ব্যাক কোম্পানীর জুতো ? সেটা কার ?

শুনলি না ? বিষেণদেওবাবু বললেন, ওঁদের দুজনের জুতোর মাপই এক। যেদিন আমি চটি নেওয়ার অছিলাতে বিষেণদেওবাবুর ঘরে যাই, সেদিন ঐ জুতোজোড়াকে বিষেণদেওবাবুর ঘরে দেখে আমি অবাক হই। কিন্তু জুতোর তলায় যে বালি লেগেছিলো তা চেঁচে নিয়ে আমি কাগজে মুড়ে নিই—পরে মেলাবো বলে। নদীর বালির সঙ্গে তা মেলে। জুতোটা কিন্তু গাম্-বুট নয়—অন্যরকম জুতো—একমাত্র ডাক্ব্যাক্ই বানায় তা। ভানুপ্রতাপ এমনই ধূর্ত যে, পরতো মামারই জুতো, বাঘের পায়ের-ছাপ নদীর বালিতে লাগাবার সময়—কিন্তু জুতো-জোড়া খুলে রেখে আসত আবার মামারই ঘরে। আমরা থাকতে থাকতে এবং ঐ দাগ দেখার সময় বিষেণদেওবাবু বাড়ির বাইরেই যাননি এবং গেলেও গাড়িতেই গেছেন, সঙ্গে অন্যান্য পাঁচমিশেলী লোক নিয়ে। ঐদিকেও যাননি, তা আমি চেক্ করেছি। আই এ্যাম এ্যাব্সোলুট্‌লী শ্যুওর।

ঋজুদা বলল, সামনে আলো জ্বলছে, দ্যাখ্ ত', এককাপ চা পাওয়া যায় কি-না, কোথাও !

তাই-ই ত'। হাজারীবাগ শহরের বাজারের অনেক দোকানেই আলো জ্বলছে। ব্যাপারটা কি ? আমি বললাম।

ও হো। কাল ত' মুসলমানদের পরব আছে রে একটা। বাঃ আমাদের বরাতই ভাল। দাঁড়া দাঁড়া।

গরম রুটি আর চাঁব দিয়ে আমরা চা খেলাম। চায়ের লিকারটা বড্ড স্ট্রং আর বড় বেশী চিনি ; এই-ই যা। তাও পাওয়া যে গেল রাত তিনটেতে এই-ই ঢের !

হাজারীবাগ শহর ছাড়িয়ে আমরা বগোদরের রাস্তা ধরলাম।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, ব্রিজনন্দনকেও মারল কেন ভানুপ্রতাপ ?

আসলে, ব্রিজনন্দন লোকটাও খুব ধূর্ত এবং লোভী ছিল। তা না হলে বিষেণদেওবাবুর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করত না। এবং ভানুপ্রতাপের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডর সাক্ষীও ছিল ও প্রথম থেকেই। প্রত্যেক খুনের আগে ভানু ব্রিজনন্দনকে আনিয়ে নিত উজ্জ্বাননগর থেকে। আনাবার আরও একটা কারণ ছিল। যদি সন্দেহ কারো হয়ই তা যেন ব্রিজনন্দনেরই উপর হয়। ভানুপ্রতাপ বুঝতে পেরেছিল, কোলকাতা থেকে তুই ফিরলেই কিছু একটা করব আমরা। খুনীরা খুব বুদ্ধিমান হয়। তাছাড়া ভানু ত' বিলেতে পড়াশুনা-করা বাপ-মায়ের সু-পুত্তুর !

ঋজুদা তারপর বলল, পিস্‌কি নদীর ওদিক থেকে আমরা গাড়ি নিয়ে ওল্ড-রাত্‌রা রোড হয়ে মালোয়াঁ-মহলকে বাইপাস্ না-করে গেলে, হয়ত ব্রিজনন্দন বেঁচে যেত। করণ, আমাদের যাওয়ার পথেই ত,'পড়ত। নিজে লুকিয়ে না-পড়লে আমরা ওকে তুলেও নিতাম হয়ত গাড়িতে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে। মৃত্যু ছিল ওর কপালে ! কি আর কথা যাবে ?

অমি বললাম, তাই-ই যদি হয়, তাহলে ঐ সাপ আর হায়নার জিম্মাদার বেহেড়ীয়াদেরও ত' উনি মারতে চাইতেন।

বেহেড়ীয়াদের মেরে দেওয়া বা অনেক টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া ভানুর পক্ষে কঠিন ছিলো না কিন্তু ব্রিজনন্দন ছিল অসম্ভব লোভী। ওর চোখেই সেই লোভ চক্‌চক্ করত। ও হয়ত শেষে ভানুপ্রতাপকেই সরিয়ে দিতে চাইত কিংবা পঙ্গু করে দিয়ে সবকিছু নিজে দখল করে নিতো এমন একটা সন্দেহও ভানুর মনে হয়েছিলো। অথবা ওর কৃতকর্মের একজনও সাক্ষী ভানুপ্রতাপ রাখতে চায়নি হয়ত। প্রথম দিন সাপটা যখন আমাদের আক্রমণ করল নাচঘরের রাস্তায় এবং কামড়াতে না-পেরে ফিরে গেল, তখন থেকেই ভানুর মনে নানারকম ভয় দানা বাঁধতে শুরু করে। তাই ব্রিজনন্দনের সব কাজ শেষ হওয়াতে এবং আমরা আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করব তাও হয়ত বুঝতে পারাতে ও তাকেও সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে। আমরা যখন আজ রাতে নাচঘরে ঢুকলাম, তার একটু আগেই ব্রিজনন্দনকে কামড়ে আসার পর সাপটাকে খাঁচায় পুরে দিয়েছিল বেহেড়ীয়ারা।

অতগুলো সাপ দিয়ে ওরা কি করত ঋজুদা !

উল্টোদিক থেকে আসা একটা ট্রাককে পাস দিয়ে, আমি শুধোলাম।

বাঃ। ওফিফাগাস্ সাপ ত' সাপ খেয়েই বাঁচে। ওর খাওয়ার কাজও হতো—আর বেহেড়ীয়াদের ট্রেনিং-এ ঐসব সাপের মধ্যে কিছু সাপ দিয়ে মৃত্যুদূতের কাজও হতো—যেমন শুভাবাঈকে মারা ; আমার ঘরে আমাকে মারতে পাঠানো।

আমি বললাম, আচ্ছা, বিষেণদেওবাবুর ঘর থেকে যে সুড়ঙ্গ চলে গেছে নাচঘরে তা তুমি জানতে পেলে কি করে ?

ঋজুদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল দ্যাখ্, একেই বলে ভাগ্য। আর ভানুপ্রতাপের নিয়তি। এটা একটা কো-ইন্‌সিডেন্ট্। অনেকদিন আগের কথা, আমি যাচ্ছি কানাডাতে আর স্যান্ডি যাচ্ছে ইউরোপে। বোম্বেতে দুজনেই কাস্টমস্ ক্লীয়ার করে যার যার প্লেনের জন্যে ওয়েট্ করছি। ও যাবে লুৎফ্‌হান্‌সাতে, আমি যাব এয়ার-ইন্ডিয়ায়। হঠাৎ দেখা হওয়াতে অনেক গল্প হল। স্কুলের বন্ধু। বৌ-ছেলেমেয়ের কথা উঠল। ও বলল, আমার আর শুভার একটিই মাত্র সন্তান—। বলতে পারিস্, প্রিন্স্-অফ-ওয়েলস্। তবে, ব্যাটা যে কি হবে ভগবানই জানেন। থাকে ত' আমার শ্বশুর মশায়, মানে শুভার বাবার কাছে—আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় চড়াচ্ছেন। জানিসই ত,' আমাদের ফ্যামিলীতে আমিই একমাত্র ছেলে, কাজিন্ পর্যন্ত নেই কোনো। তাই আমার ছেলেই, আমাদের ফ্যামিলীর একমাত্র বংশধর। তার উপর আমার শ্বশুর মশায়ের ব্যাপারই আলাদা—বেডরুমের থেকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে নাচঘরে—সেখানে নাচ-গান হয় রাতের বেলা, বুঝলি। বলেই, আমার দিকে চেয়ে দুষ্টুমীর হাসি হেসেছিল। তাই, এখানে এসে, ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকায় একদিন বিষেণদেওবাবুকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম : "আপনার বাবা কোন্ ঘরে শুতেন" ? উনিই বলেছিলেন যে, ওঁর বাবার

ঘরেই এখন উনি শোন।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, বিষেণদেওবাবুকেও ত' ভানুপ্রতাপ সাপ দিয়েই মারতে পারত।

তা পারত। কিন্তু ভানুপ্রতাপের সাপের খেলা পুরনো হয়ে যাওয়ায়, বিষেণদেওবাবুকে অন্য কায়দায় মারতে চেয়েছিল ও। এবং প্রায় সাকসেসফুল হয়েও ছিল।

আসলে, শুভা আর সুরিন্দার দুজনেরই এমন হঠাৎ মৃত্যুর কথা বিষেণদেওবাবুর কাছে শুনে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহটা অবশ্য হয়েছিল বিষেণদেওবাবুরই উপর। এখানে আসতে রাজী হওয়ার আসল কারণও ছিলো এটা।

ঋজুদা বলল, আমার মনটা খুউবই খারাপ লাগছে। শুভা আমার প্রিয় বান্ধবী ছিল। বড় ভালো মেয়ে আর স্যান্ডি ত' ছিল স্কুলেরই বন্ধু—ওর কথাই আলাদা। এমন ভদ্র, সভ্য, মার্জিত মানুষ খুব কম হয়। তাদেরই একমাত্র ছেলেকে আমি......

তারপর বলল, অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয়, আমার বড় প্রিয় কাছের লোকদের যে খুন করেছে, তাকে এক্সপোজ্ করে দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে বড় করলাম।

আমি বললাম, যাই-ই বলো, অ্যাল্‌বিনোটা সত্যি হলে, আমি কিন্তু খুবই খুশী হতাম! সব বেঁচে গেল!

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, রুদ্র, শুধু বাঘই কি অ্যাল্‌বিনো হয়? আমরা? মানুষরা? এই ভানুপ্রতাপ? বা বিষেণদেওবাবু? বাইরের রঙ আমাদের যা, তাই-ই কি আমাদের আসল রঙ? মনে মনে আমরা অনেকেই অ্যাল্‌বিনো। হয়ত সকলেই। বাইরের চামড়ার পিগ্‌মেন্টেশানের ত্রুটিটাই আমাদের চোখে পড়ে; আর মনের আসল রঙ চিরদিন চামড়ার আড়ালেই থাকে।

ভোর হওয়ার আগে আগে, অন্ধকার বনে ভোরকে পথ-দেখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যে একটা হাওয়া চলে, জঙ্গলের হব্‌জাই গন্ধ বয়ে নিয়ে, ভোরের পাখিদের ঘুম-ভাঙিয়ে; রাতের পাখিদের ঘুম-পাড়িয়ে সেই হাওয়াটা চলতে শুরু করেছে। বনে বনে মচ্‌মচানি, ঝরঝরানি আওয়াজ তুলে সে তার চলাচল জানান দিচ্ছে, যারা জানতে চায়, তাদের।

খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। দূরে টাটীঝারীয়ার ডাকবাংলোটার দেওয়াল দেখা যাচ্ছে,—গাড়িটা চলেছে।—টপ্ গীয়ার ফেলে জানলায় কনুই আর স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে বসে আছি, চোখ, হেডলাইট-পড়া আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু জঙ্গলের পথে।

ঋজুদা এখন একদম চুপ করে গেছে। পাইপের ধুঁয়োয় আর গন্ধে গাড়ি ভরে উঠেছে। মালোয়াঁ-মহলের দুঃস্বপ্ন আর অ্যাল্‌বিনোর স্বপ্ন পিছনের লুলিটাওয়া আর গীমারীয়ার মধ্যের জঙ্গলের গভীরে ফেলে রেখে দ্রুত দূরে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

এই মুহূর্তে পিস্‌কি নদীর সাদা বুকে অথবা তার দু'পাশের আলো-ছায়া-ভরা জঙ্গলের মধ্যে হাতে খোলা রিভলবার আর রাইফেল নিয়ে একটি অ্যাল্‌বিনো বাঘকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পুলিশের লোকেরা।

যদি ভানুপ্রতাপ পুলিশদের বাঘের ডাক-শুনিয়ে ভয় পাওয়াবার জন্যে টেপ-রেকর্ডারি বাজান, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবেন পুলিশদের হাতে। কারণ, এ টেপ-রেকর্ডারে বাঘ আর কোনোদিনও ডাকবে না! চাবি টিপলেই; জঙ্গল সরগরম্ করে বাঘের ডাকের বদলে, মেয়েলী গলায় বেজে উঠবে: "সাধের লাউ! বানাইলা মোরে বৈরাগী!"

ঐ উত্তেজনা, ক্লান্তি, মন-খারাপের মধ্যেও আমার হাসি পেয়ে গেল সাধের লাউ-এর কথা ভেবে।

কি রে ? হাসছিস যে।

বললাম, না। এমনিই।

তুইও মারিহুয়ানা ফারিহুয়ানা খেতে শুরু করেছিস না কি ? ভানুপ্রতাপের সঙ্গে মিশে ? পাগলের মত এমনি এমনি হাসছিস !

আমার তখন উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো না। ভট্‌কাইকে ফিরে গিয়ে এমন দেব। ছারপোকা বিধ্বংসী পাঁচন ওকেই গেলাব এবার। বুঝবে ভট্‌কাই।

রুআহা

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, "তোকে ঋজু ফোন করেছিল।"

"কিছু বলেছে ?"

"তোকে ফোন করতে বলেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বই-খাতা ফোনের টেবিলেরই একপাশে নামিয়ে রেখে ফোন করলাম।

একবার বাজতেই ফোনটা ধরল ঋজুদা। বলল, "কে রে ? রুদ্র ?"

"হ্যাঁ। ফোন করেছিলে কেন ?"

"অ্যাল্‌বিনো।"

"মানে ?"

"মুলিমালোঁয়া থেকে বিষেণদেওবাবু এসেছেন। আমার এখানেই আছেন। ভানুপ্রতাপ অ্যারেস্টেড্। জামিন পায়নি। যেভাবে পুলিশ কেস সাজিয়েছে প্রমাণ-সাবুদ দিয়ে, তাতে ফাঁসি না-হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধারিত।"

বললাম, "আহা ! এখন যেন দুঃখ হচ্ছে তোমার ! কী ?"

"ভানুপ্রতাপ তো প্রায় তোরই সমবয়সী ছিল। দুঃখ কি আর তোরই হচ্ছে না ?"

"জানি না।"

"বিষেণদেওবাবু তোকে দেবার জন্যে ওঁর গ্রীনার বন্দুকটা আর একটা পয়েন্ট-টু-সেভেন-ফাইভ রাইফেলও নিয়ে এসেছেন। বলতে গেলে, একেবারেই নতুন। লাইসেন্স্ করাতে হবে। আর শোন্, আজকে রাতে আমার এখানে খাবি তুই। আরও একটা ভীষণ খবর আছে।"

"কী ?"

"খবর পেলাম, ভুষুণ্ডাকে নাকি পুব-আফ্রিকার তান্‌জানিয়ার আরুশা শহরে দেখা গেছে। আমার খোঁড়া-পায়ের বদলা নেবার সময় এসেছে। আবার গুগুনোগুম্বারের দেশে যেতে হবে। বুঝেছিস ?"

"সত্যি ?" আমি খুব উত্তেজিত গলায় বললাম। "কবে যাচ্ছি আমরা ?"

"যে-কোনোদিন গেলেই হল। কিন্তু একটা মাইনর প্রবলেম দেখা দিয়েছে।"

"প্রবলেম ? কী প্রবলেম ?"

"একজন সুন্দরী মহিলা আমাদের সঙ্গী হতে চান।"

"মহিলা ?" আমার নাক কুঁচকে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে ভুষুণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবে মহিলা নিয়ে ? নিজেই তো গতবার মরতে বসেছিল ! আর—

বললাম, "ইম্‌পসিবল্‌। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি যাব না তাহলে!"

"আহা! তুই যে এত বড় মেল্‌-শভিনিস্ট্‌ হয়ে উঠেছিস, তা তো জানতাম না। তবে, আমিও যে মহিলা-টহিলাদের একেবারেই পছন্দ করি না তা তো তুই জানিসই। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, মহিলা ছাড়া কারো সঙ্গে পুরুষের বিয়ে হয় না বলে আমার তো বিয়েই করা হল না। তবে এই মহিলার রাইফেলের হাত শুনছি নাকি তোর চেয়েও ভাল। গাড়িও চালাতে পারে। ইংরিজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়া, সোয়াহিলিও জানে নাকি একটু-একটু। একেবারে নাছোড়বান্দা! কী করি বল তো রুদ্র? মহা মুশকিলেই পড়েছি।"

আমার মাথার মধ্যে বাণ্টুদের ড্রাম বাজছিল। রাগে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। বললাম, "কী বললে তুমি একটু আগে? আমার চেয়েও ভাল হাত রাইফেলে? একজন মহিলার? তা তো তুমি বলবেই। ওয়াণ্ডারাবোদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে আনলাম আর তুমি এ-কথা বলবে না! তুমি আজকাল সত্যি খুবই অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছ।"

মনে হল, একটু চাপা হাসি হাসল ঋজুদা। বলল, "আহা, চটছিস কেন? তুই অ্যাপ্রুভ্‌ না-করলে তো আর সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না। আমি তাকে বলেই দিয়েছি যে, তুই-ই হলি ডিরেক্টর অব অপারেশানস্‌। তোর কথাই শেষ কথা! তুই-ই আমার মালিক।"

"এমন গ্যাস দিতে পারো না তুমি!"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ভট্‌কাই বেচারার কত যাবার ইচ্ছা ছিল।"

"ও তো রাইফেল-বন্দুক ধরতে পর্যন্ত পারে না। ওর জীবনের দায়িত্ব কে নেবে? তুই? ভট্‌কাইকে নিয়ে যাব তখনই, যখন অ্যাল্‌বিনোর মতো কোনো রহস্য-টহস্য ভেদ করার ভার পড়বে আবার আমাদের উপর। ভট্‌কাই, বর্ন্‌-গোয়েন্দা তোরই মতো। ভট্‌কাইকে তালিম-টালিম দিয়ে তোর চেলা বানিয়ে ফ্যাল্‌। তারপর—"

আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেছিল মহিলার কথা শুনে। বললাম, "নাম কী সেই মহিলার? বয়স কত?"

"বলছি, বলছি, সবই বলছি। বয়সে তোর চেয়ে সামান্য ছোট, দেখতে একেবারে মেমসায়েবের মতো। আর নাম হচ্ছে তিতির!"

"তিতির? মানে? মডার্ন হাই স্কুলের? তাকে তো আমি খুবই চিনি। প্রযত সেনের বোন? সে কোত্থেকে এসে ভিড়ে গেল তোমার কাছে? যাব্বাবাঃ। মহা ন্যাকা, নাক-উঁচু মেয়ে। না, ঋজুদা! তাকে সঙ্গে নিলে আমিই যাব না।"

"আঃ। এত কথা পরেই হবে'খন। তুই আয়ই না সন্ধেবেলা।" বলেই বলল, "রুদ্র, গদাধর তোকে জিজ্ঞেস করছে, কী রান্না করবে? কী খাবি?"

আমি রেগে বললাম, "জানি না। খাব না।" মেয়ে! আফ্রিকার জঙ্গলে মেয়ে!

"দেরি করিস না। সাতটার মধ্যে আসিস কিন্তু। আজকাল তো রোজই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বিকেলের দিকে।"

বলেই, ফোন ছেড়ে দিল ঋজুদা।

মা আমার উত্তেজনা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, "কোন্‌ তিতির?"

"মডার্ন গার্লস স্কুলের ভারী নাক-উঁচু মেয়ে একটা। দ্যাখো না ঋজুদার নির্ঘাৎ মাথার গোলমাল হয়েছে। মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে চায়। ভুষুণ্ডার গুলি খেয়ে নিজেই একেবারে গুলিখোর হয়ে গেছে। মেয়েরা—"

মা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বীরপুরুষ ! আমিও কিন্তু মেয়ে। বীরপুরুষের মা। মেয়ে বলে কি মানুষই নয় তিতির ? আমি ওর কথা শুনেছি নীপাদির কাছে। সবদিক দিয়ে খুবই ভাল মেয়ে। তার মা-বাবার আপত্তি না থাকলে তোর আপত্তির কী ? মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ছোট ?"

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। গভীর চক্রান্ত। ঘরে-বাইরে অতি সুগভীর চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে।

সাতটা নাগাদ গিয়ে ঋজুদার ফ্ল্যাটে পৌঁছতেই "অ্যাল্‌বিনোর" মালোঁয়ামহল-এর বিষেণদেওবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আও বেটা, মেরে লাল।"

তিতির আমাকে দেখে বলল, "হাই ! রুদ্র।"

দেখলাম, একটা রঙ-চটা জিনস্ পরেছে। উপরে হলুদ গেঞ্জি ! মাথায় পনি-টেইল্।

আমি উদার হাসি হেসে বললাম, "ভাল আছ ? প্রযতদা কেমন ?"

জবাব না দিয়ে ও বলল, "তুমি কেমন আছ বলো। ডিবেটে হেরে গিয়ে খুব রেগে রয়েছ বুঝি এখনও ?"

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, "আমাদের সকলেরই এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে তিতির। আমার ডিরেক্টর অব অপারেশানস্ তোমার রাইফেল ও পিস্তল শুটিং-এর পরীক্ষা নেবেন।"

"আমি ?" বললাম, লজ্জায় মরে গিয়ে।

ঋজুদার মতো অন্যকে বে-আব্রু, বে-ইজ্জত করতে আর কেউই পারে না।

ঋজুদা গদাধরকে বলল, "গদাধর, রাইফেল, পিস্তল সব গাড়িতে তোল্। বিষেণদেওবাবু যে রাইফেলটা এনেছেন, সেটাও।"

গদাধর ভিতরে গেল।

ঋজুদা দেওয়ালে ঝোলানো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখিয়ে বিষেণদেওবাবুকে বললেন, "বিষেণদেওজি, মুলিমালোঁয়ার অ্যাল্‌বিনো বাঘ রুদ্রবাবু মারতে পারেনি ঠিকই, কারণ বাঘ তো সেখানে ছিলই না ; কিন্তু এই বাঘটি ওরই মারা। সুন্দরবনের ম্যান-ইটার। গদাধরের বাবাকে এই বাঘই খেয়েছিল, 'বনবিবির বনে'।"

বিষেণদেওবাবু স্তুতির চোখে তাকালেন আমার দিকে।

চোখের আড়ালে দেখলাম, তিতির সেনের চোখেও অ্যাপ্রিসিয়েশান ঝিলিক মারছে। ভাবলাম, মেয়েটাকে যতখানি নাক-উঁচু ভাবতাম, ততখানি সত্যি-সত্যি না-ও হতে পারে।

তিতির আমার দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে বলল, "সত্যি। কী সাহস তোমার রুদ্র ! আই অ্যাড্‌মায়ার য়ু।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, "এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলা শুটিং কম্‌পিটিশান করতে কোথায় যাবে ঋজুদা ? চাঁদও নেই ; অন্ধকার, তার উপর এই দুর্যোগ !"

ঋজুদা বলল, "আমাদের ভুষুণ্ডা-চাঁদ তো তোমাকে উজ্জ্বল চাঁদনি রাতে দেখা না-ও দিতে পারে ? যাচ্ছি, জেঠুমণির কোন্‌চৌকির খামারবাড়িতে, ডায়মণ্ডহারবার রোডে। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

জোকা পেরিয়ে একটু গিয়েই ডান দিকে কোন্‌চৌকিতে ঋজুদার জেঠুমণির খামারবাড়ির সামনে পঁচিশ একরের ধানখেত। চারপাশে বিরাট গভীর নালা। বাঁধের মতো আছে। প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছে চারকোনা টিনের

ছোট-ছোট বাক্সর উপর সাদা রঙ করে দড়ি দিয়ে ঝোলানো। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ডালপালা উথাল-পাতাল করছিল। টিনগুলোও পাগলের মতো নাচানাচি করছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, কতগুলো সাদা বিন্দু।

"প্রথমে আমি।" ঋজুদা বলল। বলেই, থ্রী-টু পিস্তলটা খাপ থেকে বার করে নিয়ে পরপর তিনটি গুলি করল ওয়াড়-কাটার দিয়ে।

একটিও লাগল না।

আমি বুঝলাম, ঋজুদা ইচ্ছে করেই মিস করল। তার মানে, আফ্রিকাতে তিতিরকে নিয়ে যাবেই। তিতির মিস্ করলে বলবে, 'যা দুর্যোগ। অন্ধকার! আমিই পারলাম না, তা ও কী করে পারবে।' কী চক্রান্ত! তাহলে আর মিছিমিছি এসব ঢং কেন?

"এবার রুদ্র।" ঋজুদা বলল। "কিন্তু কোন্ ওয়েপন দিয়ে মারবি? বিষেণদেওবাবুর নতুন প্রেজেন্ট টু-সেভেন্টিফাইভ রাইফেল দিয়েই মার। তোকে হ্যান্ডিক্যাপ্ দেব— নতুন রাইফেল—প্র্যাকটিস্ করার সুযোগ পাসনি। রাইফেল জিরোয়িং করাও হয়নি। ওক্কে? বাট্ ওন্লি থ্রী শটস্! মাত্র তিনটি গুলি।"

রাইফেলটা তুলে নিলাম। গুলি ভরলাম ম্যাগাজিনে। কোথাও কোনো আলো নেই। খামারেরও সব আলো নিভোনো। শেডটার নীচে দাঁড়িয়েও মুখে-চোখে ঝোড়ো হাওয়ায় জলের ঝাপটা লাগছে। টিনগুলো ক্রমাগত দুলছে। প্রথম গুলি, মিস্। দ্বিতীয় গুলি করতেই দন্দন্ করে একটা টিন কথা বলল। তৃতীয় গুলি মিস্।

ঋজুদা বলল, "ওয়েল ডান্। ভেরি ওয়েল ডান্, ইনডিড। এই ওয়েদারে অন্ধকারে।"

তারপর তিতিরকে বলল, "তিতির, তোমার রাইফেলটা দিয়েছে তো গদাধর?"

"হুঁ।"

আমি বললাম, "কী রাইফেল?"

"পয়েন্ট টু-টু।" তিতির বলল।

বললাম, "ওঃ। অনেক লাইট-রাইফেল। এ তো খেলনা।"

তিতির সঙ্গে-সঙ্গে কথাটার মানে বুঝল। বুঝেই, ঋজুদার দিকে তাকাল। বলল, "ঋজুকাকা, আমার রাইফেলে মারা অনেক সহজ হবে। রুদ্র যে রাইফেলে মারল, আমিও সেই রাইফেলেই মারব—আমার কাছেও তো এটা নতুন।"

ঋজুদা বলল, "দ্যাটস্ ভেরি স্পোর্টিং অব হার ইন্ডিড!"

আমি আমার নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হলাম। খুশিও হলাম এই কারণে যে, এই রাইফেল দিয়ে তিতির একটি গুলিও লাগাতে পারবে না। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল, ছোটবেলায় আমাদের সাউথ-ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের ক্যাপ্টেন বসু-ঠাকুর থুতনির উপর বসিয়েই বলে-বলে কাক মারতেন।

তিতির রাইফেলটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিল। তারপর তুলে এইম্ করল। দেখলাম, চমৎকার হোলডিং। তারপর, আমি যা করিনি, ফ্লাইং শট্ নেবার সময় যেমন ব্যারেল সুইং করে মারতে হয়, তেমনভাবে দু-একবার শ্যাডো সুয়িং করে নিয়েই পরপর র‍্যাপিড ফায়ার করে তিনটে গুলি করল। কী হল, তা বোঝবার আগেই দন দনাদ্দন্, দন্ দনাদ্দন্, দন দনাদ্দন্ করে তিনটি টিনই আওয়াজ দিল।

বিষেণদেওবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন, "শাব্বাশ, শাব্বাশ! শাব্বাশ বেটি।"

আমার গলার কাছে লজ্জা ও অপমান এবং হেরে-যাওয়ার গ্লানি দলা পাকিয়ে উঠল। তবুও মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই র‍্যাপিড-ফায়ারের গুলির মতোই বেরিয়ে গেল : "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স !"

তিতির বলল, "রুদ্র, আমি শুনেছি ঋজুকাকার কাছে, তুমি আসলে আমার চেয়ে অনেক ভাল মারো। আমার আন্‌তাবড়ি গুলিগুলো আজ বাই-চান্স লেগে গেছে।"

ঋজুদা আর একটু সময় নষ্ট না করে, পাছে আমি আর কোনো আপত্তি তুলি, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তাহলে তিতির যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে ? কী বলো ডিরেক্টর ?"

"আমি তো আর পরীক্ষা নিতে চাইনি। তুমিই এসব করলে, এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ !"

ঋজুদার ফ্ল্যাটে আমরা খেতে বসলাম, বিষেণদেওবাবুর সঙ্গে অনেক গল্প-টল্প করার পর বিষেণদেওবাবু বললেন, "তোমরা আফ্রিকাতে যাবার আগে তিতির-বেটিকে আমার পয়েন্ট থ্রী-টু কোল্ট পিস্তলটা পাঠিয়ে দেব মুলিমালোঁয়া থেকে। ভানুপ্রতাপই নেই। আমি আর অতগুলো রেখে কী করব। শিকার তো আমি ছেড়েই দিয়েছি কবে। ঋজুবাবু, আপনি শুধু ওর লাইসেন্সের বন্দোবস্তটা করে রাখবেন।"

ঋজুদা বলল, "তিতির অল-ইন্ডিয়া রাইফেল শুটিং কমপিটিশানে ফার্স্ট হয়েছিল। আর্ল-রবার্ট ক্যাডেট-ট্রফিও ও পেত, জ্বর না হলে। অতএব লাইসেন্স কোনো প্রবলেম নয়।"

তিতির বলল, "আমার ছোট দাদু ওয়েস্ট বেঙ্গলের হোম-সেক্রেটারি। লাইসেন্স পেতে অসুবিধা হবে না।" বলেই, রান্নাঘরে গিয়ে আমাদের জন্যে এমন নরম আর ফার্স্ট ক্লাস ওমলেট বানিয়ে আনল মাশরুম, চিকেন, কাঁচা পেঁয়াজ, টোম্যাটো আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে যে, খেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, "স্ট্রিক্ট ভেজিটারিয়ানও ঐ ওমলেট খাবে। ভারী উম্‌দা বানালে বেটি !"

ঋজুদা বলল, "গদাধর, ইমপ্রুভ কর, রান্না শিখে নে ; নইলে, তোর চাকরি যাবে।" আমার দিকে চেয়ে বলল, "মিস্টার ডিরেক্টর সাহেব, তাহলে, যে-রাঁধে সেও যে কভি-কভি চুল বাঁধতে পারে, এ-কথা স্বীকার করছ ?"

ফেঁসে গেলাম। ঋজুদার কাজই এই।

মুখে বললাম, "কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

বলেই হেসে উঠলাম। হাসতেও যে এত কষ্ট হয়, তা আগে কখনও জানিনি।

॥ ২ ॥

এখন এয়ার-ইন্ডিয়ার ডাইরেক্ট ফ্লাইট হয়েছে ডার-এস্-সালামে। গতবার যখন এসেছিলাম, তখন সেশেলস অবধি গিয়ে সেশেলস থেকে তান্‌জানিয়ান্ এয়ার-লাইন্‌সের প্লেনে যেতে হত।

ডার-এস্-সালামে কিলিম্যান্‌জারো হোটেলে ঋজুদার ঘরে বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমরা তিনজনে তিনটি সিংগল্ রুমে রয়েছি পাশাপাশি। হোটেলের সামনে পার্কিং লট। সারি সারি বিদেশী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তান্‌জানিয়াতে টুথব্রাশও তৈরি হয় না—তাই, গাড়ি-টাড়ি সবই ইম্পোর্টেড। সামনে রাস্তা। রাস্তার ওপাশে ভারত মহাসাগরের বুক থেকে এক টুকরো ফালি ঢুকে এসেছে। উত্তরে সমুদ্র বেয়ে কিছুটা

এগোলেই মোম্বাসা। পুবে জাঞ্জিবার। সারি সারি জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। রাস্তা নিয়ে নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষ হেঁটে চলছে। গাড়ি যাওয়া-আসা করছে জোরে, বুইক্, জুইক্ শব্দ করে। দাঁড়কাক ডাকছে।

আমরা যার যার কিট্ চেক করে নিচ্ছি। তিতির ভাল ফোটোও তোলে। টেলিফোটো লেন্স-লাগানো আশাহী-পেনটাক্স্ এম-ই ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছে ও। আর এনেছে ওর পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা। এই রাইফেল দিয়ে ছোট হরিণ, গ্যাজেল্, খরগোশ ইত্যাদি মারে লোকে। মানুষ মারার জন্যেও আইডিয়াল। তবে, তিতির কখনও মানুষ মারেনি। আমি আর ঋজুদা তো অলরেডি খুনিই হয়ে গেছি। দাগি খুনি। বিষেণদেওবাবুর প্রেজেন্ট একেবারে ঝকঝকে আমেরিকান কোল্ট পিস্তলটাও নিয়ে এসেছে ও। গোটা ছয়েক এক্সট্রা ম্যাগাজিন। লোড করা থাকলে, পর-পর ঢুকিয়ে দিলেই হল।

আমার পয়েন্ট টু-টু স্প্যানিশ লামা পিস্তলটাও নিয়ে এসেছি। অ্যাল্‌বিনোর রহস্য ভেদ করার সময়ে যেটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল ঋজুদা। আর বাবার সেকেণ্ড লাইসেন্সে চড়ানো, থার্টি-ও-সিক্স ম্যান্‌লিকার শুনার। ঋজুদা যে থ্রী-সেভেনটিন পিস্তলটা মুলিমালোঁয়াতে নিয়ে গেছিল সেটাই এনেছে। সাইলেন্সারটাও। আর ফোর-সেভেনটি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা। গণ্ডার, হাতি কি সিংহ, কি লেপার্ড বা চিতা যদি গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধাতে আসে, তাদের মোকাবিলার জন্যে। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গে আছে জাইসের বাইনাকুলার। তিতিরের সঙ্গে একটা জাপানি বাইনাকুলার। কাঠমাণ্ডু থেকে ওর বাবা ওকে এনে দিয়েছিলেন।

এবার আমরা জানি না, কোন্‌দিকে যাব। কতদিন থাকব। কিসে করে যাব। সবই ঠিক হবে আরুশাতে পৌঁছে ভুষুণ্ডার খোঁজ পেলে। তাছাড়া, এবার আমাদের সঙ্গে আছে ছদ্মবেশ নেবার সরঞ্জাম। ডার-এস্-সালাম থেকে আরুশার প্লেনে আমরা নিজেদের নামে ট্র্যাভেল করব না। আরুশার হোটেলেও আলাদা আলাদা নামে ঘর বুক করা হয়েছে। মাসাইদের মতো আমরাও পুরনো নাম ইচ্ছেমতো বদলে ফেলব।

হোটেলের বিল পেমেন্ট করেই, ঋজুদার এক তান্‌জানিয়ান বন্ধুর গাড়ি নিজেরা চালিয়ে সমুদ্রের ধারে নির্জনে, যেদিকে প্রেসিডেন্ট নীয়েরের বাড়ি, সেখানে সী-বীচে ছদ্মবেশ নিয়ে, আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে ডার-এস্-সালাম এয়ারপোর্টে পৌঁছব। ঋজুদার এই বন্ধুই গতবারে মীরশ্যাম্ পাইপ প্রেজেন্ট করেছিল ঋজুদাকে।

গতবার ভুষুণ্ডার গুলি খেয়ে আহত হবার পরে ঋজুদা নানা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছে যে, ভুষুণ্ডা একটা যন্ত্রমাত্র। পুব-আফ্রিকার জানোয়ারদের মাংস ও চামড়া, হাতির দাঁত এবং গণ্ডারের খড়্গের চোরা-চালানের ব্যবসার পিছনে আছে সব বাঘা-বাঘা লোক। অথচ কেউই জানে না, তারা কারা। তাদের অর্থ, প্রতিপত্তি, সুনাম কিছুরই অভাব নেই।

ঠিক হয়েছে, আমি একজোড়া ফলস্-দাঁত আর লাল পরচুলা পরব এবং কানাডাতে সেট্‌ল-করা একজন অল্পবয়সী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ট্যুরিস্ট হিসাবে আরুশাতে পৌঁছব। তিতির সাজবে একটি ব্লণ্ড, ফ্রেঞ্চ মেয়ে। প্যারিসের কলেজের ছাত্রী।

তান্‌জানিয়া কম্যুনিস্ট দেশ। এখানে আমেরিকানরা কম আসে। তিতির কাজ চালানোর মতো ফ্রেঞ্চ জানে। ও এই দেশে নতুন যাত্রী। আমিও নতুন। তাই আমরা আরুশা পৌঁছবার পরদিনই আরুশার হোটেলের লাউঞ্জে আমার সঙ্গে তিতিরের আলাপ হবে; হঠাৎই। আমরা বন্ধু হয়ে যাব। ঋজুদা সাজবে একজন দিল্লিওয়ালা বুড়ো

সর্দারজি। বয়স্ক, চুল-দাড়ি সাদা, হাতে লাঠি ; তান্‌জানিয়াতে এক্সপোর্ট বিজনেস করার ধান্দায় এসেছে। আমাদের তিনজনেরই জাল পাসপোর্ট করে নেওয়া হয়েছে। তান্‌জানিয়ান এবং ইণ্ডিয়ান ফরেন ডিপার্টমেন্টের এবং হোম ডিপার্টমেন্টের সম্মতি নিয়ে। আমাদের আসল পাসপোর্ট এখানেই রেখে যাব ঋজুদার ঐ বন্ধু মিঃ লিলেকাওয়ার কাছে। রক্ষাকবচ আছে তিনজনেরই। একটি করে ছোট্ট কার্ড। সে-রকম বিপদ না ঘটলে সেই কার্ড দেখিয়ে এখানে কোনো পুলিশের সাহায্য নেব না বলেই ঠিক করেছি আমরা। কারণ, বড় বড় অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ সব দেশেই থাকে। ভুষুণ্ডার ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই হ্যাণ্ডল করব।

ঋজুদা বলেছিল, ওর একটা ঠ্যাং ভেঙে দিয়েই ছেড়ে দেবে। আমি বলেছি, টেডির মৃত্যুর বদলা না-নিয়ে আমি ওকে ছাড়ব না। যে-রাইফেল দিয়ে অনেক শুয়োর মেরেছি ছোটবেলা থেকে, তা দিয়েই ভুষুণ্ডা-শুয়োরকে আমি শেষ করব। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই দেখা পেলে, তাতে প্রাণ যায় তো যাবে। তিতির আমাদের সাহায্য করবে।

তিতিরকে ভুষুণ্ডার সমস্ত ছবি দেখিয়ে আমরা চিনিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, ওর ব্যাগেও একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি দিয়ে দিয়েছি।

ঋজুদার নাম হয়েছে সর্দার গুরিন্দার সিং। অতএব, নিবাসও ডিফেন্স কলোনি ; নিউ দিল্লি। আমার নাম জন অ্যালেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ছোটবেলা কেটেছে বিহারের ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলোনিতে। এখন ক্যানাডার টোরোন্টোর ডন্‌-ভ্যালিতে একটি ফ্ল্যাটে থাকি। এঞ্জিন-ড্রাইভারের কাজ করি টিউব রেলে। ছুটিতে টাকা জমিয়ে আফ্রিকা দেখতে এসেছি।

তিতিরের নাম ক্রিস্‌ ভ্যালেরি। প্যারিসেই ওর জন্ম। জুওলজির ছাত্রী। আফ্রিকান হাতি সম্বন্ধে জানতে-শুনতে এবং রিসার্চ করতে এসেছে ও!

তিতির বলল, "রুদ্র, তোমার হঠাৎ ব্যথা লাগলেই তুমি বল উঃ বাবাঃ। কক্ষনো বলবে না, বলবে, আউচ্‌! বুঝেছ! তুমি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।"

ঋজুদা বলল, "ক্রিস। রুদ্র বলে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, তার নাম জন অ্যালেন। এখন থেকে যার-যার নতুন নামেই ডাকাডাকি করবে, নইলে মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এখন থেকে ইংরিজি। অন্যদের সামনে। বুঝেছ! একবারও ভুল কোরো না। এসো, একবার বরং রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া যাক।"

আমি বললাম, "স্টার্ট!"

তিতির বলল, "মিঃ সিং, হাউ বাউট্‌ দ্যা আন-এণ্ডিং পাওয়ারশেডিং ইন ক্যালকাটা ? উ্য সেইড, উ্য হ্যাভ অ্যান অফিস ইন ক্যালকাটা! ওয়ান অব মাই ফ্রেণ্ডস্‌ লিভস্‌ দেয়ার। হি ওলওয়েজ কমপ্লেইনস্‌ বাউট দ্যাট।"

ঋজুদা বলল, "হান্‌জি। উ্য আর রাইট্‌ জি! দ্যা কণ্ডিশান্‌ ইজ ভেরি টাইট্‌।"

বলেই বলল, "মাই ইংলিশ ইজ নাট্‌ গুড।"

তিতির হাততালি দিল।

আমি এবার বললাম, "মিস ভ্যালারি, ড্যু উ্য হ্যাভ এনি পাঞ্জাবি ধাবা'জ ইন ইওর কানট্রি ?"

তিতির ভুরু কুঁচকে বলল, "পাঁর্দো মঁসিয়ে ? নেভার হার্ড অফ সাচ্‌ থিংগস। হোয়াট ইজ ইট ? আ টেম্পল অর সামথিং ?"

ঋজুদা বলল, "নান্‌জি। আ ধাবা ইজ আ প্লেস হোয়ার উই সীট অন চারপাইজ,

অ্যাণ্ড রেল্লিশ্ আওয়ার রোটি—তাড়কা অ্যাণ্ড রাজ্মা দাল।"

"হোয়াট ইজ টাড়কা-রাজ্মা-দাল ?"

তিতির ভুরু কুঁচকে শুধোল।

"হান্জি। হ্যাভনট্ হার্ড অফ ? স্ট্রেঞ্জ ! ছোড়ো জি। ক্যোই গ্যাল্ নেহি। বাট তাড়কা-রাজ্মা-ডাল গিভস্ উ্য জোস্ত্। রিয়্যালি জি !"

ঋজুদার কথা শেষ হতে না-হতেই ফোনটা বাজল। মিস্টার শাহ্ বলে একজনের ফোন। ফোন রেখে ঋজুদা বলল, "আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন গুজরাটি ভদ্রলোক ডিনারে।"

ব্যাপারটা কী তা ভাল করে জানবার আগেই আবার ফোন। এবার লিলেকাওয়া। ঋজুদার বন্ধু।

লিলেকাওয়া বললেন যে, ওঁর সঙ্গে নাকি আগে মিঃ শাহ্র কথা হয়নি কোনো। ঋজুদাকে ফোন করার পরই উনি লিলেকাওয়াকে ফোন করেছিলেন। তবে ডিনারের অনুরোধ জানালেন লিলেকাওয়াও, মিঃ শাহ্র হয়ে।

"বন্ধুর বন্ধুকে জোর করে খাওয়ানোর এমন আগ্রহ তো বড় একটা দেখা যায় না !" গম্ভীরমুখে ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "কী করবে ঋজুকাকা ? যাবে ?" www.pathagar.net

"যাব না ? কেন ? গুজরাটি খাবার আমার খুব ভাল লাগে।" আমি বললাম।

ঋজুদা হাসিমুখে পাইপটাতে তামাক ভরতে ভরতে তিতিরকে বলল, "যাওয়াই যাক। সাধা লক্ষ্মী, পায়ে ঠেলতে নেই। হ্যাঁ। একটা কথা—।"

রাত পৌনে-আটটায় রিসেপশান থেকে ফোন।

লিলেকাওয়া এবং মিস্টার শাহ্ দুজনেই এসে গেছেন। নীচে নেমে দেখলাম, বেশ মোটাসোটা, বেঁটে একজন গুজরাটি ভদ্রলোক কালো-রঙা থ্রী-পিস-স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে ইয়া মোটা সিগার। চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়ছেন সব সময়। বোঁটকা গন্ধ সিগারটার ! ওঁর সাদা-রঙা ঝকঝকে মার্সিডিস্ গাড়িতে আমি আর তিতির উঠলাম। ঋজুদা মিস্টার লিলেকাওয়ার সঙ্গে। মিনিট-কুড়ির মধ্যেই আমরা একটি ফাঁকা কিন্তু খুব পশ্ এলাকায় চলে এলাম। দারুণ দারুণ সব বাড়ি ; বাংলো। আলো-বসানো বিরাট গেট-ওয়ালা ছবির মতো একটা বাংলোতে গাড়ি ঢুকল। টুপি-পরা শোফার দরজা খুলে দিল।

নানা জানোয়ারের ফোটোতে সাজানো বিরাট ফিকে খয়েরি-রঙা কার্পেটে মোড়া ড্রয়িংরুমে আমাদের সকলকে নিয়ে বসালেন মিস্টার শাহ্। ঋজুদা ও মিস্টার লিলেকাওয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় জানা গেল যে, মিস্টার শাহ্ কফি প্ল্যান্টেশানের মালিক, তাছাড়া আরও নানান ব্যবসা তাঁর। একজন শখের ফোটোগ্রাফারও উনি। নানা জীবজন্তুর ছবি তোলেন সময় পেলেই। বন-জঙ্গল খুবই নাকি ভালবাসেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে পরপর অনেকগুলি ট্যুরিস্ট লজ এবং মোটেল খুলবেন, এবং পৃথিবীর তাবৎ জায়গা থেকে আসা ট্যুরিস্টদের একাংশকে ভারতেও পাঠাবেন। একটি কোম্পানি গড়বেন তিনি, নাম দেবেন "জাঙ্গল্ মোটেলস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।" তিনি ঋজুদাকে সেই কোম্পানির ডিরেক্টর করতে চান বলেই নাকি আজকের এই হঠাৎ নেমন্তন্ন।

মিস্টার শাহ্ আর ঋজুদারা কোম্পানি এবং আয়কর আইনের নানা কচ্কচি নিয়ে

আলোচনা করছিলেন। সে-সবের একবর্ণও আমি আর তিতির বুঝি না এবং বোঝবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না আমাদের। তিতির আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার লিলেকাওয়াকে বললাম, "এক্স্‌কিউজ মী আঙ্কল, মে উই টেক ইওর কার ফর হাফ-এন আওয়ার ?"

ঋজুদা আমার চোখে তাকাল। ইংরিজিতে বলল, "কোথায় যাবি তোরা ?"

"এমনিই একটু ঘুরে আসতাম। তোমাদের কথার তো কিছুই বুঝছি না।"

মিস্টার লিলেকাওয়া বললেন, "বাই ওল্‌ মীনস্‌", বলে চাবিটা দিলেন আমাকে।

মিস্টার শাহ্‌ বললেন, "উগাণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধের পর প্রচুর আর্মস এসে গেছে তান্‌জানিয়াতে। খুব ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে চারধারে, তোমরা ছেলেমানুষ, রাতে একা একা যেও না।"

আমি কিছু বলার আগেই তিতির বলল, "উই ক্যান টেক কেয়ার অব আওয়ারসেলভ্‌স। থ্যাঙ্ক উ্য।"

মিঃ শাহ্‌ আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হেসে বললেন, "তবে যাও ; সাবধানে যেও।"

লিলেকাওয়া এখানে ইউ-এন-ও'র চাকরি করেন। তাঁর লাল-রঙা টোয়াটো গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসে তিতিরকে পাশের দরজা খুলে দিলাম। তিতির উঠে বসে বলল, "কোথায় যাবে ?"

বললাম, "লক্ষ করেছিলে ? ড্রইংরুমের দেওয়ালে একটা ছবি আছে, ক্যাম্পফায়ারের সামনে চেয়ারে বসে মিঃ শাহ্‌ সিগার টানছেন। পিছনে কতগুলো খড়ের ঘর। ঐ জায়গাটা আমার ভীষণই চেনা-চেনা লাগল। ভী—ষণ।"

"কোন জায়গা সেটা ?"

"ঠিক কিনা জানি না, তবে মনে হচ্ছে গুগুনোগুম্বারের দেশে ভুষুণ্ডা সোডা লেকের পাশে যেখানে আমাদের নিয়ে গেছিল, যেখানে টেডিকে বিষের তীর দিয়ে মেরেছিল সেই জায়গা ওটা। ওয়াণ্ডারাবোদের সেই ডেরা।"

"বল কী ?" তিতির রীতিমত এক্‌সাইটেড হয়ে বলল। "তুমি শিওর ?"

"মনে হচ্ছে। ভুলও হতে পারে।"

"বাবাঃ। শুনেই আমার ভয়-ভয় করছে।" তিতির বলল।

"আমারও। সব পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

"এখন কোথায় যাবে ? মতলবটা কী তোমার ?"

"কোথাও না। গাড়িটাকে ঐ সামনের গাছগুলোর নীচে পার্ক করে রেখে, মিঃ শাহ্‌র বাংলোর চারপাশে ঘুরে দেখব। টর্চ আছে তোমার সঙ্গে ?"

"হুঁ। তবে, চাঁদও আছে।" তিতির বলল।

"তা আছে।"

যখন পথের পাশের বড় বড় গাছগুলোর ছায়ার অন্ধকারে গাড়িটাকে রেখে, লক্‌ করে নামলাম, তখন গাড়ির লাল রঙ রাতের অন্ধকারে কালো মনে হওয়ায় ওখানে যে গাড়ি আছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা সাবধানে হেঁটে বাংলোটার পিছনে এলাম। পথে লোকজন নেই। বড়লোকেদের পাড়া। অনেকক্ষণ বাদে বাদে দু-একটি গাড়ি হুস্‌-হাস্‌ শব্দ করে হেডলাইট জ্বেলে চলে যাচ্ছে। বাংলোর পিছনের বাউণ্ডারি-ওয়ালের গায়ে কতগুলো আফ্রিকান টিউলিপের গাছ, আমরা দেশে যাকে আকাশমণি বলি। সেই

গাছগুলোর ছায়ায় ছোট্ট একটা গেট। তালাবন্ধ, ভিতর থেকে। তিতিরকে ইশারা করে আমি গেটের লোহা বেয়ে উপরে উঠে নামলাম। তিতিরও গেট ডিঙোল আমার পেছন পেছন।

বিরাট লন। নানারকম ফুল ও ফলের গাছ। জাঞ্জিবারের দারচিনি লবঙ্গ থেকে গোরোংগোরোর মরা আগ্নেয়গিরির পাশের উঁচু পাহাড়ের অর্কিড পর্যন্ত। বাংলোটার পেছনদিকে লাগোয়া বাবুর্চিখানা, প্যান্ট্রি, সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারস্। আলো জ্বলছে। রান্নাঘরের উপরের মেটে-লালরঙা ফায়ারব্রিকে তৈরি চারকোনা চিমনি থেকে মিশকালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে দুধসাদা চাঁদনি রাতে। বাংলোটার বাঁ পাশে একটা আলাদা বাড়ি অথবা গুদাম। সেখানটা বেশ অন্ধকার, গাছপালার ঘন ছায়ায়। চাঁদের আলো পড়ে ছাই-রঙা গুদামটাকে কেমন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। আমি ও তিতির পায়ে পায়ে ওদিকে গিয়ে পৌঁছতেই কোত্থেকে একটা কুকুর গুর্-র-র-র-র করে উঠল। আমার পেটের মধ্যেও গুর্-র-র-র করে উঠল। তাকিয়ে দেখলাম একটা কালো লাব্রাডর গান্-ডগ আমাদের দেখছে লেজ উঁচিয়ে কান খাড়া করে। তার হাবভাব মোটেই ভাল নয়। তিতির বোধহয় ওর রুমালটা পাকিয়ে কুকুরটার মুখে পুরে দেবার মতলব করছিল, এমন সময় কুকুরটা আরও একবার ডাকাল। সংক্ষিপ্ত চাপা ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলোর বিভিন্ন দিকের দেওয়ালে ফিট-করা অনেকগুলো সার্চ লাইট জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

অলিভ-গ্রীন কর্ডুরয়ের ট্রাউজার ও কোট পরা প্রায় সাত ফিট লম্বা একজন ষণ্ডামার্কা নিগ্রো যেন মাটি ফুঁড়েই উঠে আমাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খসখসে গলায় ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে বলল, "জাম্বো !"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "হু-জাম্বো।"

লোকটা এগিয়ে এসে বলল, "ওহে, ডিক্ ডিক্-এর বাচ্চারা ! তোমরা কারা ? এখানে কোন্ মহৎ কম্মো করতে আসা ?"

আমি গম্ভীর গলায় তার মুখের দিকে মুখ তুলে বললাম, "আমরা মিঃ শাহ্‌র অতিথি। ডিনারে এসেছি। বাগান দেখছিলাম।"

"তাইই ? তবে অতিথিরা গেট টপকে ঢুকে সচরাচর তো হোস্টের বাগান-টাগান দেখেন না। এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল ? মিঃ শাহ্‌কে বললেই তো হত।" বলেই, পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই ঐ রহস্যময় অন্ধকার বাড়িটার দিক থেকে সরিয়ে আনল। তারপর আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খুব ঠাণ্ডা ঠাট্টার গলায় বলল, "তোমরা খুব অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসো, তাই না ? জোড়া ডিক্-ডিক্ ?"

"হ্যাঁ।" তিতির বলল।

"আমিও। খুব ভালবাসি অ্যাডভেঞ্চার !" বলেই, লোকটা আমাদের দুজনের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ একবার হাততালি দিল। সবকটা সার্চলাইটের আলো একসঙ্গে নিভে গেল।

তিতির বলল, "তোমার নাম কী ?"

লোকটা হাসল, অদ্ভুতভাবে। সোনা-বাঁধানো তিন-চারটে দাঁত চাঁদের আলোতেও ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। বলল, "আমার নাম ওয়ানাবেরি। চলো, তোমরা যেখানে গাড়ি রেখেছ, সেখানেই যাই। আজ বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। গাড়িতে বসেই তোমাদের একটা গল্প বলব।"

"গল্প ? কিসের গল্প ?" তিতির ভয়-মেশানো কৌতূহলের সঙ্গে শুধোল।

"ওয়ানাকিরি, ওয়ানাবেরির গল্প।"

গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। তিতির ওর বাঁ হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ওর হাতটা হাতে নিয়ে দেখলাম একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাতটা।

ছোট গেটটার কাছে পৌঁছতেই লোকটা পকেট থেকে চাবি দিয়ে গেটের তালা খুলল। তারপর কথা না-বলে গেট থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

তিতির বাংলায় বলল, "আমরা কোথায় গাড়ি রেখেছি তা পর্যন্ত ও দেখেছে! সবই দেখেছে!"

"হুঁ।" বলে, আমি কোমরের কাছে হাত দিয়ে, যেন হঠাৎই হাত লেগে গেছে এমন করে পিস্তলটার হোল্‌স্টারের বোতাম খুললাম।

লোকটা যেন নিজের মনেই হেসে উঠল। বলল, "ওয়ানাবেরিকে মারা যায় না। ওয়ানাবেরি কখনও মরে না, জানো?"

"জানি।" তিতির বলল।

"জানো?" বলেই লোকটা তিতিরের দিকে বিচ্ছিরি চোখে তাকাল।

অবাক চোখে তিতিরের দিকে তাকালাম আমি।

তিতির বলল, "তুমি এই বাংলোতেই থাকো?"

"হ্যাঁ। মিস্টার শাহ্ আমার মালিক।"

"তুমি কী কাজ করো?"

"অকাজ।"

"মানে?"

"মানে নেই। সব কথার মানে হয় না।"

গাড়ির কাছে পৌঁছে, গাড়ি খুলে ওকে সামনের সীটে বসতে বলে তিতিরকে পিছনে বসতে বলালম। কেন বললাম, তিতির নিশ্চয়ই বুঝল। প্রয়োজন হলে, ওর ঘাড়ে পিছন থেকে পিস্তলের নল ঠেকাবে।

লোকটা একটা সিগারেট ধরাল পকেট থেকে প্যাকেট বের করে। সিগারেটের গন্ধটা বিচ্ছিরি। তারপর জানালার কাঁচ নামিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে, জানালাটা খুলেই রাখল।

গাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগতে লাগল আমাদের। অথচ, লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই। চাঁদের আলো গাছগুলোর ফাঁক-ফোঁক্ দিয়ে এসে পড়ে আলোছায়ার কার্পেট বুনেছিল গাড়ির বনেটের উপরে। চারপাশে। লোকটা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে, নিজের মনেই, যেন নিজেকে শোনাবার জন্যেই, নিচু স্বরে বলতে আরম্ভ করল:

"অনেক, অ—নেক দিন আগে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছিল আফ্রিকার বনে প্রান্তরে। কোন্ মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই খোঁজে। আর মানুষদের লোভ দেখানোর জন্যে তার পিছনে পিছনে একটা খুব মোটা চর্বি-নদ্‌নদে ষাঁড়কে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার গলায় দড়ি বেঁধে।

"মৃত্যুর শুধু একটিই মাত্র জিনিস চাইবার ছিল। তা হচ্ছে, জীবন। যে ঐ ষাঁড়টাকে নেবে, এক বছর পরেও ওয়ানাবেরির নামটা তাকে মনে রাখতে হবে। এক বছর পরেও যদি সে ওয়ানাবেরির নাম মনে না রাখতে পারে, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে যাবে ছিনিয়ে।

"একটা লোক ছিল; ভারী গরিব, খাওয়া জুটত না তার। নাম ছিল তার মাকড়শা।

খিদের জ্বালায় মাকড়টা ঐ ষাঁড়টাকেই ওয়ানাবেরির কাছ থেকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে কেটেকুটে কদিন ধরে সবাই মিলে চর্ব্য-চোষ্য করে খেয়ে তার বউ-ছেলেকে বলল, শোনো, তোমরা আজ থেকে এই গানটি সবসময় গাইবে—ওয়ানাকিরি ওয়ানাবেরি ; ওয়ানাকিনি— ওয়ানাবেরি ; সবসময়, যাতে কখনও—”

হঠাৎ তিতির লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “গাড়ি স্টার্ট করো রুদ্র। চলো বাংলোতে ফিরি। এ-সব গাঁজাখোরি গল্প শোনার সময় নেই।”

গাড়ি স্টার্ট করতেই ওয়ানাবেরি চমকে উঠল। বিরক্ত হয়ে তাকাল আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। দুর্বোধ্য ভাষায় বলে উঠল, “নানি আনি ওনেগা ?”

হঠাৎ তিতির উত্তরে বলে উঠল, “আম্‌বোনা, উনাসেমাসেমা টু ?”

ওয়ানাবেরি চমকে গিয়ে বলল, “পোলেনি।”

তিতির খুব মিষ্টি গলায় বলল, “টোয়েণ্টিনী।”

ওয়ানাবেরি স্টীয়ারিং-ধরা আমার হাতে হাত রেখে বলল, “কাওয়া হেরিনি।”

আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখে।

সেই কিম্ভূতকিমাকার হাওয়া-গাওয়া ভাষার কিছুই না-বোঝায় বোকার মতো আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখে। তিতির বলল, “রুদ্র, ও গুড-বাই করে নেমে যেতে চাইছে। ওকে নামিয়ে দাও।”

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাঁ দিকের দরজা খুলে দিলাম।

ওয়ানাবেরি তখনও অবাক চোখে তিতিরের দিকে তাকিয়েছিল। অবাক আমিও কম হইনি।

লোকটা নেমে, দরজাটা বন্ধ করতে করতে আবার বলল, “হেরিনি !”

“হেরিনি !” তিতির বলল।

ওয়ানাবেরি এবার ভাঙা ইংরিজিতে আমাদের দুজনকেই বলল, “রিমেম্‌বার ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি—ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি—ওয়ানা্‌বেরি। ডোণ্ট উ্য ডেয়ার টু ফরগেট্‌ মাই নেম। বিকজ, আই উ্যাল্‌ কাম ব্যাক—”

আমার গা শিউরে উঠল। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে মিঃ শাহ্‌র বাংলোর সামনের গেটের দিকে চললাম।

তিতির বলল, “দেখলে তো রুদ্র, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ক্রিকেটার হল্‌-এর চেয়ে লম্বা লোকটা। কথা বলছিল না, যেন বাউন্সার দিচ্ছিল।”

“তুমি তো দেখছি, সোয়াহিলিতে রীতিমত পণ্ডিত তিতির। কী কথা বললে ওর সঙ্গে ?”

“নানি আনি ওনেগার মানে হচ্ছে, কে কথা বলছে ? আর আমবোনা উনাসেমাসেমা টু মানে হচ্ছে, মিছিমিছি বকবক করছ কেন ?”

“আর পোলেনি মানে ?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“পোলেনি মানে, সরি। আর টোয়েণ্টিনী মানে হচ্ছে, চলো, আমরা এবার যাই।”

“বাঃ। সত্যিই তুমি এবার আমাদের সঙ্গে থাকায় অনেক সুবিধা হবে।”

“অসুবিধাও কম হবে না। আমি যে মেয়ে !” তিতির আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

আমি জানি, কিছুদিন ও আমাকে এমনি করেই ঠাট্টা করবে, যতদিন না আমিও প্রমাণ করতে পারছি যে, শহরের মধ্যে ব্বাওয়া-খাওয়া করে গরমের দুপুরে তেষ্টা পাওয়া মুরগির

মতো মুখ হাঁ করে দু' কলি সোয়াহিলি বলাতে আর জঙ্গলের মারাত্মক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। তিতির যে মেয়েই, তা ও শিগগিরই বুঝতে পারবে। গর্ব যাবে ওর।

আমরা যখন বাংলোয় ঢুকলাম, আমাদের কেউই লক্ষ করল না। ঋজুদারা তিনজনে এমনই আলোচনাতে ব্যস্ত।

তিতির হঠাৎ বলল, "এজন্যই বলে, মেয়েরা হল গিয়ে বাড়ির লক্ষ্মী। বাংলোটা কেমন লক্ষ্মীছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া দেখতে পাচ্ছ রুদ্র ? সবই আছে, কিন্তু কী যেন নেই। মিঃ শাহ ব্যাচেলর কি না !"

"হুঁ।" আমি বললাম।

ভাবলাম মেয়েটা মায়েদের মতোই পাকা-পাকা কথা বলে। মেয়েরা ঐ রকমই হয়। ছোটবেলা থেকেই। ঋজুদা যে কেন এসব ঝুট-ঝামেলা সঙ্গে আনল। আমার নজর ছিল কিন্তু দেওয়ালের সেই ফোটোটার উপর। আরও অনেক ফোটো ছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর খাবার এল। গরম গরম পুরি, ভাজি, আচার নানারকমের, কাড়াই। দারুণ। কিন্তু খাবার আগেই গ্লাস-গ্লাস জিরাপানি খেয়েই পেট ফুলে গেছিল আমাদের। ঋজুদা খাবার সময় কেমন অন্যমনস্ক ছিল। বলল, "লিলেকাওয়া, আমরা তাড়াতাড়িই যাব একটু। কাল ভোরেই তো চলে যাচ্ছি মোম্বাসা।"

মিঃ শাহ বললেন, "মোম্বাসা ? হোয়াই মোম্বাসা ?" বলেই বললেন, "ওহ্, ইয়েস, মোম্বাসা ! মোম্বাসা !"

হোটেলে লিলেকাওয়া আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন। আশ্চর্য হলাম, ঋজুদা কাল ওঁকে গাড়ির বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে কিছুই না-বলায়। ওঁকে গুডনাইট করে হোটেলের লবিতে ঢুকে ঋজুদা বলল, "আমরা ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাব, বুঝলি ?"

ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্যের গন্ধ পেয়ে কিছু না বুঝেই বললাম, "বুঝলাম।"

প্রথমে ঋজুদার ঘরেই ঢুকলাম আমরা সবাই। ঘরে ঢুকেই ঋজুদা নাক টেনে বলল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ, নতুন গন্ধ পাঁউ।"

আমি বললাম, "সিগারেটের গন্ধ। তানজানিয়ান্ সিগারেটের।"

তিতির বলল, "রাইট্। তার মানে, ঘরে কেউ ঢুকেছিল।"

"নাও হতে পারে। হয়তো ভুল আমাদের।" ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "আমার ঘরে গেলেই বোঝা যাবে।"

"কী করে ?"

"ঘর থেকে বেরুবার আগে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাল করে গায়ে-মাখা কিউটিকুরা পাউডার ছড়িয়ে এসেছিলাম।"

আমি তো শুনে অবাক। ঋজুদা কথা না বলে আমার দিকে তাকাল।

তিতির তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলল, আমিও ওর পিছন পিছন। দরজা খুলতেই দেখা গেল পাউডার ছড়ানো আছে এবং কারোই পায়ের দাগ নেই। কিন্তু ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেই তিতির বলল, "কোনো লোক ঢুকেছিল। কারণ আমার পাউডারের টিনটা দরজা থেকে ছুঁড়ে দিই যখন কার্পেটে, তখন মুখটা ছিল জানালার দিকে, আর এখন আছে দরজার দিকে। তাছাড়া যেখানে ছিল, সেখান থেকে অনেকটা বাঁ দিকে সরে আছে এখন।"

ঘরে ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। তিতিরের ঘরের কাঠের টেবিলটার উপর

ওয়াণ্ডারাবোদের ছোট্ট তীর দিয়ে গাঁথা একটা ছোট্ট চিঠি। বিচ্ছিরি হাতের লেখায় লাল কালি দিয়ে লেখা। "গো হোম ট্যু প্রেটি গার্ল। অর বী বেরিড্ ইন্ দ্যা উইল্ডারনেস্ অব আফ্রিকা।"

আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিতিরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওরও মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এমন সময় ঋজুদা এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে চিঠিটা পড়ল। তারপর বলল, "কী করবি তিতির ? কাল বোম্বে চলে যাবি ?"

তিতির খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, "মাথা খারাপ তোমার ঋজুকাকা ? ইফ্ আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস্, আ সেৎসী ফ্লাই হ্যাজ টেন লাইভস, দেন তিতির হ্যাজ ইলেভেন লাইভস্। চলে যাবার জন্যেই যেন এসেছি ! খুব বললে ত তুমি ! সবে কেস জমে উঠছে আর এখনই যেতে বলছ !" বলেই, ঋজুদার দিকে চেয়েই সোয়াহিলিতে বলল, "আলিনিপিগা কোফি লা উসো ?"

ঋজুদাও খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, "আশান্টে ! আশান্টে !"

আশান্টে মানে, থ্যাঙ্ক ট্যু, আমি বুঝলাম ; কিন্তু তিতির কী যে বলল, তার কিছুই বুঝলাম না। মেয়েটা বড়ই মুশকিলে ফেলছে আমাকে থেকে-থেকেই।

ঋজুদা আমার অবস্থা বুঝে নিয়ে বলল, "কেমন বুঝছ, রুদ্রবাবু ? কিছুই বুঝছ না তো ? কথাটির মানে হল, লোকটা আমার গালে চড় কষিয়েছে। তিতির চড় খেয়েও রা কাড়বে না এমন পাত্রী মোটেই নয় সে ; সুতরাং···ঠিকই আছে। লেট আস বার্ন ওল দ্যা ব্রিজেস বিহাইণ্ড। পিছনে ফেরার কথা আর নয়।"

বললাম, "তিতির, তুমি এত ভাল সোয়াহিলি শিখলে কী করে ?"

তিতির উত্তর না দিয়ে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ঋজুদা প্রশংসার চোখে তিতিরের দিকে তাকিয়ে রইল। আর আমি ঈর্ষা, লজ্জা এবং দুঃখের চোখে। সব দিক দিয়েই একটা মেয়ের কাছে হেরে যাচ্ছি। ছিঃ ছিঃ।

ঋজুদা আমাদের গুডনাইট করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলে চলে গেল। মুখ দেখে মনে হল, এখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করবে। কালকে মোম্বাসা যাব না বলেই আমার বিশ্বাস। মিঃ শাহকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই ঋজুদা ও-কথা বলেছিল। তবে, যেখানেই যাই না কেন, কাল আমরা ডার-এস্-সালাম এয়ারপোর্ট থেকে কোথাও একটা যাবই। এবং শহরের আশ্রয় ছেড়ে জঙ্গলে, যেখানে ভুষুণ্ডা এবং ভুষুণ্ডার মালিকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমাদের, এমনই কোনো জায়গায়। কী প্ল্যান করেছে, তা ঋজুদাই জানে। সময় হলেই জানাবে।

তিতির বলল, "গুড নাইট অ্যাণ্ড স্লিপ টাইট।"

বললাম, "পিস্তল থাকবে বালিশের নীচে। মনে রেখো।"

"ঠিক হ্যায়।" বলে, তিতির ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

॥৩॥

সকাল আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে ঋজুদার ঘরে এলাম আমি আর তিতির। ছদ্মবেশের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছি। বাথরুমের আয়নাতে দাঁতটা লাগিয়ে দেখেও নিয়েছি একবার। দারুণ দেখাচ্ছিল। প্রায় দানুয়া-ভুলুয়ার জঙ্গলের দাঁতাল শুয়োরের মতো। মা তাঁর সাধের ছেলেকে তখন দেখলে নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

রুম-সার্ভিস্‌কে বলে, ঘরেই ঋজুদার জন্যে কফি আর আমাদের জন্যে দুধ আনিয়ে নেওয়া হল। কফির পেয়ালায় সুগার-কিউব ফেলে চামচ নেড়ে মেশাতে মেশাতে হাসতে হাসতে ঋজুদা বলল, "ব্রেকফাস্ট্‌ আর খায় না! যা ঝামেলা বাধালি তোরা আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে না-দিতেই। কী দরকার ছিল ওয়ানাবেরির সঙ্গে টক্কর মারতে যাওয়ার?"

বললাম, "আমরা কি টক্কর মারতে গেছি নাকি? সে-ই তো টরে-টক্কা করে টক্কর বাধাল।"

আমাদের কাছ থেকে কালকের অভিজ্ঞতা এবং মিঃ শাহ্‌র বসবার ঘরের দেওয়ালের ফোটোর কথাও ঋজুদা শুনেছিল। ফোটোর কথা শুনেই ঋজুদা হেসেছিল। মাঝে-মাঝে বেশি-বেশি বিজ্ঞের মতো ভাব দেখায় ঋজুদা। ভুষুণ্ডার গুলি খাওয়ার পর থেকে একটু বোকা-বোকাও হয়ে গেছে যেন। নয়তো, আমি আগের থেকে চালাক হয়েছি।

কফিটা খেয়েই ঋজুদা এয়ার তানজানিয়ার অফিসে ফোন করতে বলল আমাকে। করলাম। আরুশার তিনটে টিকিট পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন পাওয়া যাবে। কিন্তু কালকে ফ্লাইটের কোনো টিকিট নেই। পরশুর আছে।

ঋজুদা বলল, "বলে দে, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে টিকিট নিয়ে নেব।"

তাই-ই বলে দিলাম।

"পনেরো মিনিট সময় দিলাম। যার যার ভেক ধরো নিজেরা।" তারপরই বলল, "নাঃ! সঙ্গেই নিয়ে চল ব্যাগে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ঘরের চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরুবি—রিসেপ্‌শানে জমা দেওয়ার দরকার নেই।"

নীচে নেমে, হোটেলের লবি থেকে চিরুনি কিনল ঋজুদা একটা। দাম কুড়ি টাকা মাত্র। আমি ভেবেছিলাম হাতির দাঁতের হবে বুঝি। হাত দিয়ে দেখি, কেলে প্লাস্টিক।

ঋজুদা বলল, "এমনিতে কি আর এশিয়ানদের উপর এত রাগ আফ্রিকানদের? ভারত থেকে দু' টাকার চিরুনি এনে এখানে কুড়ি টাকায় বিক্রি করলে ওরা যদি এশিয়ানদের অদূর-ভবিষ্যতে কিলিয়ে কাঁটাল পাকায় তাতে আর দোষ কী? বল?

ট্যাক্সি নিয়ে ডাউনটাউনে এসে বেশ বড় একটা জমজমাট রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। এয়ার-কণ্ডিশান্‌ড, স্বপ্নালোকিত রেস্তোরাঁ। কিন্তু ভিড় গিশ্‌গিশ্‌। তারই মধ্যে একটি অন্ধকার কোনায় আমরা গিয়ে বসলাম। কফি, তার সঙ্গে সসেজ উইথ বেকন অর্ডার করল ঋজুদা নিজের জন্যে। তিতির চিকেন ওমলেট আর ড্রিঙ্কিং চকোলেট। আমি মাটন হ্যামবার্গার আর চা। সাতসকালে বড় এক গ্লাস দুধ খেয়ে গা গোলাচ্ছিল। দুধ আবার বড়রা খায় নাকি? সমস্ত প্রাণিজগতে দুধ খায় শুধু দুগ্ধপোষ্যরাই। যেহেতু দুধের-শিশু তিতির সকালে দুধ খায় সুতরাং আমাকেও দুধ গেলাল ঋজুদা। এ-যাত্রা যদি বেঁচে ফিরি কলকাতায়, তাহলে ভট্‌কাই নিশ্চয়ই আওয়াজ দেবে আমাকে। তিতিরের বদলে ভট্‌কাইটা এলে কত মজা হত! কিন্তু কে বোঝে এসব কথা!

কাত্‌লা মাছের হাঁ-করা মুখের মতো একটা হোঁত্‌কা পাইপে জম্পেস্‌ করে তামাক ঠেসে, কালো লেদার-ফোমের চেয়ারে গা এলিয়ে বসল ঋজুদা। তার পর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চাঁদপাল ঘাটের লজ্‌ঝড়ে মোটর-লঞ্চের মতো। বুঝলাম, এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া চলবে। কতক্ষণ চলবে, তা ঋজুদাই জানে।

খাবার এসে গেলেই সোজা হয়ে বসে বলল, "রুদ্র, তুই যেমন পোশাকে আছিস এই পোশাকেই চলে যাবি এয়ার তান্‌জানিয়ার অফিসে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিস।

জাঞ্জিবারের টিকিট কাটবি তিনটে। পরশুদিনের।"

"জাঞ্জিবার? সে তো অন্য দেশ।" আমি বললাম।

তিতির বলল, "তা কেন হবে? জাঞ্জিবার তো তান্‌জানিয়ারই অংশ। মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ আলাদা দেশ। দু' জায়গাতেই মসলা হয় বলেই কি মসলা মেশাবে নাকি?"

বড় ট্যাক্‌-ট্যাক্‌ করে মেয়েটা। ভারী তো একটা সাবজেক্ট। ভূগোল। পড়াশুনায় ভাল বলে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে সবসময়। ভুষুণ্ডা আর ওয়ানাবেরির পাল্লায় পড়লে ভূগোল-জ্ঞান বেরিয়ে যাবে। ট্যাক্‌ট্যাকানি বন্ধ হবে তখন।

ঋজুদা বলল, "তিতির, তুমি খেয়ে নিয়েই রেস্তোরাঁর লেডিজ-রুমে গিয়ে মেক-আপ নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাবে এয়ার তান্‌জানিয়ার অফিসে। পরশুর টিকিট কাটবে তুমিও। তিনটে। তবে জাঞ্জিবারের নয়, আরুশার। একটাই ফ্লাইট আছে, সকালের দিকে। বোধহয় দশটা কি এগারোটা নাগাদ। রিপোর্টিং টাইমটাও জেনে আসবে।" বলেই বলল, "কী কী নামে কাটবে?"

ততক্ষণে খাবার এসে গেছিল। বেয়ারাকে অগ্রিম মোটা টিপ্‌স দিয়ে দিল ঋজুদা। সে বুঝল আমরা অনেকক্ষণ জ্বালাব এখানে। সে চলে যেতেই তিতির বলল, "সর্দার গুরিন্দর সিং, জন অ্যালেন এবং ক্রিস ভ্যালেরি!"

"রাইট্‌!" ঋজুদা বলল, একটা গাব্দা-গোব্দা সসেজকে কাঁটা দিয়ে ধরে, ছুরি দিয়ে কেটে, মাস্টার্ড মাখাতে মাখাতে। তারপর সসেজের টুকরোটি মুখে পুরে দিয়েই বলল, "দুজনেই, টিকিট কেটে আলাদা-আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসবি। রেস্তোরাঁ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছেড়ে দিবি ট্যাক্সি। তিতির ট্যাক্সি থেকে নেমে নিউজ-স্ট্যান্ড থেকে খবরের কাগজ কিনে রেস্তোরাঁতে ঢোকার সময় খবরের কাগজটা মুখের কাছে যথাসম্ভব তুলে ধরে, মুখ আড়াল করে লেডিজ-রুমে গিয়েই মেক-আপ ছেড়ে টেবিলে ফিরে আসবে। ওক্কে?"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "ওক্কে।"

ট্রাভেলার্স্‌ চেকের বইটা পকেটে আছে কি নেই ভাল করে দেখে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তিতির জানে না, কিন্তু আমি জানি যে, এখন একা-একা ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকবে ঋজুদা। একেবারে অন্য জগতে পৌঁছে যাবে। এই ঋজুদাকে আমারই ভয় করে, আর তিতির তো নতুন চিড়িয়া। বেচারি তিতির! কেন যে এখানে এল! কাল রাতের তীর-গাঁথা চিঠিটির কথা মনে পড়ে গেল আমার: 'গো হোম, উ্য প্রেটি গার্ল, অর বী বেরিড্‌ ইন দি উইলডারনেস্‌ অব আফ্রিকা।'

মিনিট-কুড়ির মধ্যে ফিরে এলাম টিকিট নিয়ে। আমি ফেরার মিনিট-পনেরোর মধ্যেই তিতিরও ফিরল, লেডিজ-রুম হয়ে। ঠিক সেই সময়ই একটি ঘটনা ঘটল। কে যেন হঠাৎই ছবি তুললেন আমাদের। ফ্ল্যাশলাইটে।

ঋজুদার চোয়াল মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি দারুণ নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে গেল ঋজুদার মুখে। পোলারয়েড ক্যামেরা। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিণ্টটি বেরিয়ে এসেছিল ক্যামেরা থেকে। বেঁটেখাটো মিশকালো ফোটোগ্রাফার পাখার বাতাস করার মতো দু-তিনবার সেটাকে নাড়তে-চাড়তেই ছবিটা ফুটে উঠল। ফোটোগ্রাফার ছবিটি আমাদের টেবিলে রেখেই আর-একটি ছবি তুললেন।

ঋজুদা এবার শব্দ করে হাসল। বলল, "আশান্টে!"

বলেই তান্‌জানিয়ার শিলিং-এর একটি বড় নোট বের করল তাঁর জন্যে, মোটা পার্স

থেকে।

ফোটোগ্রাফার টাকা নিলেন না। বললেন, "আমি পয়সা নিই না। বিদেশী ট্যুরিস্টদের ছবি তুলি এমনিই। এক কপি তাঁদের দিয়ে দিই আর অন্য কপি ট্যুরিজম্ ডিপার্টমেণ্টে ও পিকচার পোস্টকার্ড কোম্পানিদের কাছে বিক্রি করি।"

"তবু", ঋজুদা বলল, "আমার নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের ছবি তুলে দিলেন। বকশিশ্ আপনাকে নিতেই হবে।"

ঋজুদার কথা শুনে তিতিরের মুখ এবং আমার দুই কান লাল হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক টাকা যখন কিছুতেই নিলেন না, তখন ফোটোর কপিটা চেয়ে নিল দেখবার জন্যে। নিয়েই ফোটোটির পিছনে বল পয়েণ্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে লিখল "টু ভুষুণ্ডা, উইথ্ লাভ। ফ্রম ঋজু, রুদ্র অ্যাণ্ড তিতির।"

লেখাটি পড়তে পড়তে ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকের গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো কালো মুখটি কালোতর হয়ে গেল। অবাক হয়ে, আমতা-আমতা করে তিনি বললেন "ভুষুণ্ডা ? সে কে ? আমি তো চিনি না—"

ঋজুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "চেনেন না ? আপনি তাকে না চিনলেও, সে হয়তো আপনাকে চেনে। অথবা, চিনে নেবে। যাই হোক্, তার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, বাই-চান্স, তবে বলবেন যে, শুধুমাত্র তার সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের এতদূর আসা।"

ফোটোগ্রাফারের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল আমার।

উনি আমাদের সামনে ভক্তিভরে মাথা ঝুঁকিয়ে, বাও করে, চলে গেলেন।

॥ ৪ ॥

আমাদের ফ্লাইট্টা ঘণ্টাখানেক ডিলেড ছিল। বোয়িং। ভিতরে অ্যাকাসিয়া গাছ আর লম্বা-গলা জিরাফের ছবি আঁকা। প্লেনটা ট্যাক্সিইং করে টেক-অফ্ করার পরই সীট-বেল্ট খুলে ফেলে গা এলিয়ে দিলাম। পরশু, সেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে জোর ঘুম লাগিয়েছিলাম। বিকেলে ঋজুদা একাই বেরিয়েছিল কোথায় যেন। রাতে আমরা ঘরের চাবি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ট্যাক্সি করে। পথে তিনবার ট্যাক্সি বদল করে এবং সমুদ্রের পারের বড় বড় পাম গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেক-আপ নিয়ে সমুদ্রপারেরই ছোট্ট একটি হোটেলের কটেজে রাত এবং কালকের সমস্তটি দিন শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে ছদ্মবেশেই আজ সকালে এয়ারপোর্টে পৌঁছে এই ফ্লাইট ধরেছি। আমাদের বেশির ভাগ মালপত্রই রেখে এসেছি মাউণ্ট কিলিম্যানজারো হোটেলে। জাঞ্জিবারের টিকিটগুলো এবং আসল পাসপোর্টও। নেহাত যা না-আনলেই নয়, তা ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। তিতিরের ক্যামেরা, বাইনোকুলার সব-কিছুই রয়ে গেল। ঋজুদা অবশ্য বলেছে, সবই পাওয়া যাবে পরে, খোয়া যাবে না কিছুই। তবে কাজের জায়গায় কাজে লাগবে না, এই-ই যা।

আমরা তিনজন পোর্ট-সাইডে পাশাপাশি তিনটে সীটে বসেছি। ইংরেজিতেই কথা বলছি। তাই খোলসা করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। এয়ার-হোস্টেস্ খবরের কাগজ দিয়ে গেল। কাগজ হাতে নিয়েই চোখ একেবারে ছানাবড়া। ঋজু বোস তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের সঙ্গে বসে আছে। সেই ছবি, কাগজের প্রথম পাতায়।

আমার মনে হল, এর পরে মরে গেলেও আর আমার দুঃখ নেই। খবরের কাগজে

ছবিই যখন ছাপা হয়ে গেল। আর কী ?

ছবির নীচে বড় বড় হরফে খবর। "হোটেল গেস্টস্ মিসিং। ডিস্অ্যাপীয়ারেন্স্ অব থ্রী ইণ্ডিয়ানস্ ফ্রম হোটেল কিলিম্যান্জারো, শ্রাউডেড ইন মিস্ট্রি !"

নীচে সবিস্তারে ধানাই-পানাই।

আমি, সরি, জন অ্যালেন, ভরু কুঁচকে বলল, "হোয়াট ড্যু উ্য থিংক ?"

ক্রিস্ ভ্যালেরি আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। আই ওন্ট বী সারপ্রাইজড্ ইফ্ দে আর ফাউণ্ড ডেড।"

পাশের সীটে বসা একজন তানজানিয়ান পুলিশ-অফিসার তিতিরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে, কায়দা করে বাবার মতো বললাম, "মাই ! মাই ! ওয়েল্ ইট ক্যুড বী !"

ঋজুদা খবরের কাগজের এক কোনায় বলপেন বের করে খস্ খস্ করে কী যেন লিখে আমাদের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিল। দেখি, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা—অত পুটুর-পুটুর কথা কিসের ? চুপচাপ ঘুমো।

ঋজুদার লিখন দেখে মিস ভ্যালেরির পিংক-প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার্ড্ হয়ে গেল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ভারী অসভ্য ঋজুকাকা !"

তিতিরের কানের মধ্যে আমিও প্রায় ঠোঁট ঢুকিয়ে বললাম, "উই ! উই ! মাদমোয়াজেল !"

ফ্রেঞ্চের "উই" মানে যে ইংরিজি 'ইয়েস', মাত্র এইটুকু ফ্রেঞ্চ কৃপণ তিতির এ'কদিনে শিখিয়েছিল আমাকে। একটি শব্দ দিয়েই গুরুবধ করে দিলাম। একেই বলে, গুরু গুড়, চেলা চিনি !

ঘুম লাগাবার আগে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্দার গুরিন্দার সিং-এর সাদা গোঁফ, সাহেব-তেলাপোকার শুঁড়ের মতো ফুরফুর করে উঠছে প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। আর ক্রিস্ ভ্যালেরি যে এতটা সুন্দরী তাও এর আগে কখনও খেয়াল করে দেখিনি। এদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছিরি, ফল্স্-দাঁতের দেঁতো— জন অ্যালেন্ একেবারেই বেমানান। হংস মধ্যে বক যথা !

ঘুম তিনজনেরই বোধহয় বেশ ভালই এসেছিল। এয়ার হোস্টেস সোয়াহিলি অ্যাকসেন্ট-মেশা খ্যান্খ্যানে ইংরিজিতে যখন প্লেনের যাত্রীদের জানাল যে, প্লেন এক্ষুনি কিলিম্যানজারো ইণ্টারন্যাশনাল্ এয়ারপোর্টে নামবে, তখনই সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

এয়ারপোর্টের কাছেই মোশি। পুব-উত্তরে গেলে, কিবো হয়ে, মাউন্ট কিলিম্যান্জারো। পশ্চিম-দক্ষিণে আরুশা। যেখানে আমরা যাব।

প্লেনটা নামতেই, চোখ জুড়িয়ে গেল। একেবারে টারম্যাকের পিছনেই পলুমামার টাক-মাথার মতো গোলগোল বরফ-ঢাকা কিলিম্যান্জারো। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। তিতির, সরি, মিস ভ্যালেরি, উত্তেজনায় আমার কোমরের কাছে কুটুস করে চিমটি কেটে দিল একটা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : স্নোজ্ অব কিলিম্যান্জারো।"

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, নেমে আমরা কেউই কাউকে চিনব না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে মাউণ্ট মেরু হোটেলে গিয়ে পৌঁছোব আরুশাতে। হোটেলে চেক-ইন্ করে কোনো কায়দায় জেনে নেব, কে কত নাম্বার ঘরে আছি। তারপর, ডাইনিংরুমে

আলাদা আলাদা ডিনার খেয়ে ঋজুদার ঘরে রাত দশটার সময় মিটিং।

এয়ারপোর্টের ভিতরটা দারুণ। ঝকঝকে পালিশ-করা কাঠের মেঝে, ঝাঁক-ঝাঁক ফুটফুটে, অল্পবয়সী ইয়োরোপিয়ান ছেলেমেয়ের 'হাই'-'হাই' চিৎকারে ব্লাডপ্রেসার হাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম সকলেরই।

সকলেই দেখি, আমার সামনে এসেই কেমন ভড়কে-যাওয়া মুখ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় পচা-ইঁদুর পড়ে থাকলে আমরা যেমন করি, কলকাতায়। ব্যাপার বুঝলাম, জেণ্টস-রুমে গিয়ে। আমার ফল্‌স্ দাঁতটা আধখানা ঝুলে গেছে। বড়ই ব্যথা পেলাম নিজের মূর্তি দেখে। একসট্রিম্‌লি গুডলুকিং মিস ক্রিস্ ভ্যালেরি এবং সর্দার গুরিন্দার সিং-এর দিকে একবারও না-তাকিয়ে মনের দুঃখে বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে।

আমাদের দেশেরই মতো কুঁড়েঘর, ন্যাংটা ছেলেমেয়ে, ন্যুব্জ, গরিব বুড়োমানুষ, টায়ার-সোলের জুতো-পরা। মকাইয়ের খেত, তেঁতুলগাছ। একই রকম দারিদ্র, হতাশা। তারই মধ্যে জুইক্-জুইক্ শব্দ করে দুধসাদা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড মার্সিডিস্ গাড়ি করে কফি প্লানটেশনের এশিয়ান, আফ্রিকান বা ইয়োরোপিয়ান মালিকরা অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের মতোই চলে যাচ্ছেন।

গতবার ডার-এস-সালাম থেকে সোজা সেরেঙ্গেটিতে ছোট্ট প্লেনে করে পৌঁছে যাওয়ায়, আফ্রিকার জনপদ দেখার সুযোগ ঘটেনি। এবারে সেই সুযোগ ঘটল।

এয়ারপোর্ট থেকে আরুশা অনেক মাইল পথ। পৌঁছোলাম যখন, তখন শেষ-বিকেল। ভাল ঠাণ্ডা। গাছপালা, শহরের মধ্যে খুব একটা বেশি নেই। বেশ উঁচু পাহাড়ি শহর। এখানে-ওখানে আকাশমণি গাছ আছে। সুন্দর কমলা-রাঙা ফুল এসেছে। এই ফুলগুলিকেই বলে আফ্রিকান টিউলিপ্। শান্তিনিকেতনে এই গাছ অনেক আছে। আমাদের বর্ষাকালে আফ্রিকাতে শীতকাল। এ অঞ্চলে তো বেশ ভালই শীত। প্রায় দার্জিলিঙেরই মতো। শহরের দিকে উঁচু মাথা ঝুঁকিয়ে চেয়ে দেখছে মাউণ্ট মেরু। ঐ উঁচু পাহাড়ে মাসাইদের বাস। আমাদের বন্ধু নাইরোবি-সর্দারের কাজিন্‌রাই থাকে হয়তো।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চেক-ইন্ করছি হোটেলে, হঠাৎ এক্কেবারে ভুষুণ্ডার সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা। ভূত দেখলেও এত চম্‌কাতাম না। একটা ছাইরঙা উর্‌স্টেড ফ্ল্যানেলের বিজনেস্-স্যুট পরেছে। মুখে মীরশ্যাম্ পাইপ। আমি তো দেখে থ! হালচালই পালটে গেছে।

ওকে দেখেই আমার হাত নিশ্‌পিশ্ করতে লাগল।

আমার দিকে তাকিয়েই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, রুদ্রকে চিনতে পারেনি ভুষুণ্ডা। জন অ্যালেনের এমন সুন্দর চেহারা দেখে ভিরমি লেগেছে কুৎসিত ভুষুণ্ডারও।

মাউণ্ট মেরু আরুশার সবচেয়ে ভাল হোটেল। সেই হোটেলেও দেখলাম ভুষুণ্ডাকে সকলে বেশ খাতির-টাতির করছে। মোটা বকশিস দেয় সকলকে নিশ্চয়ই।

আড়চোখে তাকালে সন্দেহ হতে পারে, তাই আমি সোজাসুজিই ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম রিসেপশান্ কাউণ্টারে দাঁড়িয়েই। ভুষুণ্ডার এত কাছে কার্পেট-মোড়া হোটেলে দাঁড়িয়ে আছি, বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি পরিচিত স্বর কানে এল আমার। অথচ, খুব চেনা কারো স্বর নয়। লোকটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলতে বলতে কিউরিও-শপের সামনে দিয়ে

আসছিল। এখুনি আমার সামনে বেরোবে এবং বেরুলেই তাকে দেখতে পাব। কোথায় যে তার কথা শুনেছি, মনে করতে পারছিলাম না।

লোকটি দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল লবিতে, অন্য দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ; আর ঠিক সেই সময়ই তিতির নামল ট্যাক্সি থেকে।

আরে, ওয়ানাবেরি ! ওয়ানাবেরি ! আমি দেখলাম, তিতিরও ওয়ানাবেরিকে দেখেই চিনেছে, কিন্তু না-চেনার ভান করে গট্‌গট্ করে স্মার্টলি ওর সামনে দিয়েই হেঁটে এল রিসেপ্‌শানের দিকে। তিতিরকে দেখে আমার মনে হল, মেয়ে মাত্রই খুব ভাল অ্যাকট্রেস্ হয়।

ওয়ানাবেরি তিতিরের হাঁটার ভঙ্গির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে সঙ্গের দুজন লোককে কী যেন বলল সোয়াহিলিতে, চাপা গলায়।

ভুষুণ্ডাকে কিন্তু ওয়ানাবেরি আদৌ চেনে বলে মনে হল না। ভুষুণ্ডাও বোধহয় চেনে না।

সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে একটুও শোভন হচ্ছিল না। কাউন্টারে স্লিপ-প্যাড পড়ে ছিল। তাতে খস্‌খস্ করে লিখলাম, বাংলায়, "চেক-ইন করেই নিজের ঘরে চলে যাও তাড়াতাড়ি। আমার ঘরের নাম্বার একশো তিন। একটুও বাহাদুরি করো না। এই সব জ্যান্ত মানুষরা কোন্‌চৌকির ছোট-ছোট টিনের বাক্স নয়।"

তারপরই আর একটি কাগজে লিখলাম ঋজুদার জন্যে, "বন্ধুরা হাজির। নতুন-পুরনো সব। তাড়াতাড়ি ঘরে যাও।"

লিখেই প্যাড-সুদ্ধ ঐখানেই রেখে তিতির কাউন্টারে পৌঁছতেই কাউন্টার ছেড়ে পেজ-এর সঙ্গে এলিভেটারের দিকে এগোলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই গুড়ুম্ করে একটি শব্দ হল। ফাঁকা জায়গায় শব্দ অন্যরকম শোনায়। শব্দটা প্রচণ্ড জোর মনে হল। ওয়ানাবেরির একজন সঙ্গী অন্যজনকে গুলি করেই কেউ কিছু করবার আগেই বাইরের দরজার দিকে জোরে দৌড়ে গেল। ঋজুদা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সবে দরজা দিয়ে ঢুকছিল। আড়চোখে দেখলাম। লোকটার সঙ্গে ঋজুদার মুখোমুখি ধাক্কা লাগল আচমকাই। ধাক্কা লাগতেই, লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে ঋজুদার বুকে পিস্তল ঠেকাল। ভেবেছিল বোধ হয় ঋজুদা ওকে আটকাতে চাইছে। আমার ঘড়িটা থেমে গেল। ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। দেখলাম, তিতিরের হাত কোমরের কাছে, আমার অজানিতে আমার হাতও কোমরে উঠে গেছিল।

কিন্তু, কিছুই হল না।

ওয়ানাবেরি সংক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল, "বুই বুই ! নেণ্ডা জাকো। মারা মাজা।"

বলতেই, লোকটা এক ধাক্কায় সর্দার গুরিন্দারের সাদা দাড়িটা প্রায় উপড়ে দিয়েই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল দাড়ি উপড়ে গেলে যে কী ক্যালামিটি হত সে আর বলার নয় !

ভুষুণ্ডা তখন বুকে-গুলি-লাগা মাটিতে-পড়ে-যাওয়া মানুষটির দিকে চেয়ে প্যান্টের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে, কাঁধ শ্রাগ করে স্বগতোক্তি করল, "কুনা নিনি হাপা ?"

ওয়ানাবেরি জিরাফের মতো দুখানি লম্বা পা ফাঁক করে রক্তে ভেসে যাওয়া পুরু কার্পেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে হোটেলের কর্মচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যেই মাথা নেড়ে যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে স্বগতোক্তি করল, "সিজুই, সিফাহামু।"

ঘরে ঢুকেই চায়ের অর্ডার দিলাম। এমন সময় ফোনটা বাজল।

তিতির ইংরিজিতে বলল, "হাই ! মিস্টার অ্যালেন। হোয়াট আর ইওর প্ল্যান্‌স্ ফর দ্যা

ইভিনিং ? আই প্রেফার টু স্টে ব্যাক ইন মাই রুম। হাউ বাউট উ্য ?"

আমি বুঝলাম যে, ঋজুদা নিশ্চয়ই ওকে ঘরেই থাকতে বলেছে।

বললাম, "আই অ্যাম ওলসো টায়ার্ড। ডোন্ট ফিল্ লাইক গোয়িং আউট।"

"ওক্কে দেন। গুড নাইট!"

"গুড নাইট।"

আবার ফোন বাজল। এবার ঋজুদা।

চাপা হাসির সঙ্গে বলল, "বোঝতাছেন কি কর্তা ? স্টিক দেহি জইম্যা গেল, আইতে না আইতেই ? একতারাটারে এট্টু ঠিকঠাক রাইখ্যেন। কহন গান গাইতে অইব কওন যায় না। বোষ্টমীরেও এট্টু কইয়া দিয়েন, সময় বুইঝ্যা ! বোজলেন ?"

তারপরই বলল, "প্রেয়োজন অইলে আপনাগো ফোন করুম। দরজায় খিল লাগাইয়া ক্যাবিনেই বইস্যা থাহেন। বদর ! বদর ! আজ আর ছিন্-ছিনারি দেইখ্যা কাম লাই, লদীর গতিক ঠিক মনে অইতেছে না।"

আমি কী বললাম, তা বোঝার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ ! হ ! বেশি কওন লাগব না। বুঝছি !"

আসলে আমি তো বাঙালই। কিন্তু মা বিহারে মানুষ বলে বাঙাল ভাষা বলতে পারেন না। বাবা যদিও বলেন। এর জন্যেই বলে মাদার-টাং। থাকলে টাঙ্গি ; না-থাকলে নেই।

ফোনটা ছেড়ে দিতেই দরজার বেল বাজল। কোমরে হাত দিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করলাম।

দেখলাম, বেয়ারা।

চা-টা ভিতরে নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম। চা খেতে খেতে রেডিওটাও খুলে দিলাম। সন্ধের খবর বলছে: "রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ তিনজন ভারতীয় ট্যুরিস্টদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে যে, ওদের হয়তো খুন করে ফেলেছে কেউ বা কারা। সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েটিরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। কারণ তাঁদের হোটেলের ঘর থেকে এমন এমন জিনিস পাওয়া গেছে, যা সাধারণ ট্যুরিস্টদের কাছে থাকে না। কাল সকাল দশটায় ডার-এস্-সালামের পুলিশের বড়সাহেব ইন্টার-ন্যাশনাল প্রেসের রিপোর্টারদের সামনে এক বিবৃতি দেবেন।"

জলজ্যান্ত মানুষটা কী করে চোখের সামনে পড়ে গেল গুলি খেয়ে, সেই কথাই ভাবছিলাম। খুন তো আমিও করেছি, কিন্তু সে তো নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই খুনটা কোল্ড-ব্লাডেড। মরে গেছে নির্ঘাতি। অত ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে পাকা হাতের গুলি খেয়ে কোনো নিয়মিত গুলিখোরের পক্ষেও বাঁচা সম্ভব নয়।

তিতির কিন্তু অত রক্ত দেখেও ঘাবড়াল না একটুও। আশ্চর্য ! ও আসলে মেয়ে কি না, আমার সন্দেহ হচ্ছে। ও-ও বোধহয় শেষকালে আরেকজন ভুষুণ্ডার মতো আমাদের দুজনকে এবার খতম করবে ! এত সুন্দর মানুষের মেয়ে হয় না। এত গুণেরও হয় না।

ওয়ানাবেরি আর ভুষুণ্ডা যে একে অন্যকে চেনে না এটাও এক নতুন রহস্য। ওরা দুজনে একই দলের লোক হলে, তাও হত। এখন দেখা যাচ্ছে, এরা ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোক। গোদের উপর বিষফোড়া। শত্রু তাহলে দলে-দলে। চিজ-স্ট্র দিয়ে চা খেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

হ্যালোজেন ভেপার-এর কমলা আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে রাতের আরুশা

শহরটিকে। স্থানীয়া ট্রাক যাচ্ছে। বড় বড় স্কাণ্ডিনেভিয়ান ট্রাক। জিপ, নানারকম গোঁয়ার এঞ্জিনে গাঁক-গাঁক আওয়াজ তোলা ঝাঁক-ঝাঁক বিদেশী গাড়ি। রাতের শহরটাকে কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে, রহস্যময় বলেও মনে হচ্ছে। কে জানে? লোকটা বাঁচল না মরল। মরেই গেছে নিশ্চয়ই এতক্ষণ। লোকটা কে? আর যে ওকে মারল, সেই বা কে? ওয়ানাবেরির সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক? ভুষুণ্ডা, ওয়ানাবেরি—সব এখানে কী করতে এসেছে? ওরা কি জেনে গেছে আমাদের আসার কথা? ওয়ানাবেরি কি তিতিরের হাঁটার ভঙ্গি দেখে তিতিরকে চিনতে পেরেছে? না বোধহয়! না হলেই ভাল।

এয়ারপোর্টে ঋজুদা আমাকে এবং তিতিরকে একটা করে খাম দিয়ে বলেছিল, আরুশাতে পৌঁছেই ভাল করে পড়ে নিস।

খামটা বের করে, বিছানার একপাশে শুয়ে বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বেলে কাগজগুলো বের করলাম। বের করতেই, একটা ম্যাপ বেরুল। এবং কিছু ফোটোস্ট্যাট করা কাগজ।

ম্যাপটা, তান্‌জানিয়ার। খুলে, মেলে ধরলাম খাটের উপর।

আমরা যেখানে এখন আছি আরুশাতে, তার উত্তর-পুবে মাউন্ট কিলিম্যানজারো। উত্তর-পশ্চিমে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক— গোরোংগোরো ক্র্যাটার হয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমে টারাঙ্গিরে ন্যাশনাল পার্ক। সেরেঙ্গেটি ছাড়িয়ে আরুশার সমান্তরাল রেখাতেই প্রায় মোয়াঞ্জা। লেক ভিক্টোরিয়ার দক্ষিণ-পুব প্রান্তে। তান্‌জানিয়ার পশ্চিমে রয়াণ্ডা এবং বুরুণ্ডি। তার সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে লেক ট্যাঙ্গানিকা। তারও পরে জায়ের। কঙ্গো নদী বয়ে গেছে যেখানে।

দেখলাম, ম্যাপের মধ্যে লাল কালি দিয়ে "ইরিঙ্গা" বলে একটি জায়গাতে দাগ দিয়ে রেখেছে ঋজুদা। ইরিঙ্গা, আরুশার অনেকটা দক্ষিণে। যেখান থেকে এলাম আমরা, সেই ডার-এস-সালাম থেকে বরং অনেক কাছে। ডার-এস্‌-সালামের সমান্তরালে, সামান্য দূরে ডোডোমা। সেই ডোডোমার দক্ষিণে ইরিঙ্গা। ইরিঙ্গা থেকে লেক নীয়াসা সবচেয়ে কাছে। রুকোয়া বলেও একটি ছোট্ট লেক আছে আরও কাছে। কিলিম্যানজারোর মতো ইরিঙ্গাতেও বড় এয়ারপোর্ট আছে। তবে, কিলিম্যানজারো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এখান থেকে লণ্ডন, প্যারিস, টোরোন্টো, ন্যু-ইয়র্ক, টোকিও, হংকং, ব্যাংকক, ইস্তাম্বুল, বেইরুট, দুবাই, বাগদাদ, মস্কো, লেনিনগ্রাড, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট, বুডাপেস্ট, স্টকহোম, কোপেনহাগেন, অস্‌লো, হেলসিঙ্কি, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন, জুরিখ, ভিয়েনা, ব্রাসেলস্‌, আমস্টারডাম এবং রোমের ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে।

এত লম্বা ফিরিস্তি এই জন্য দিলাম যে, সমস্ত পৃথিবীর চোরা শিকারের সামগ্রী এখান থেকে যে-কোনো জায়গাতেই যেতে বাধা নেই। তবে, হাতির দাঁত, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা এবং নানারকম গ্যাজেল্‌স, ওকাপি, কুডু এসবের চামড়া প্লেনে করে চালান বেশি যায় না। হিপোপটেমাসের দাঁতও ভারী হয় বলে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। প্লেনে বেশি যায় হাতির লেজের চুল, যা দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয়, গণ্ডারের খড়্গর গুঁড়ো ইত্যাদি।

ঋজুদার দেওয়া নোট পড়ে মনে হল, আমাদের এখান থেকে যেতে হবে ইরিঙ্গা। ইরিঙ্গা থেকে হয় ছোট প্লেনে উড়ে গাজরা যেতে হবে, নয়তো পথ দিয়ে, ল্যাণ্ডরোভারে। ঐ অঞ্চলেই গ্রেট রুআহা নদী বয়ে গেছে। রাঙ্গোয়া গেম রিসার্ভ এবং রুআহা ন্যাশনাল পার্ককে লাল কালি দিয়ে গোল করে দাগ দিয়ে রেখেছে দেখলাম।

বুঝতে পারলাম না, ইরিঙ্গাই যদি যাব, তো এখানে এলাম কেন, এমন নাক ঘুরিয়ে কান

ধরার কি মানে হয় ? তবে মানে নিশ্চয়ই হয় ! নইলে ঋজুদা আসবেই বা কেন ?

এক শতাব্দী আগে বহু মিলিয়ন হাতি ছিল এই আফ্রিকাতেই। আয়ান ডগলাস হ্যামিল্‌টন্ প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং আফ্রিকান হাতির উপরে একজন অথরিটি ; যিনি পুব আফ্রিকার ইডালা নদীর পাশে বছরের পর বছর হাতিদের উপর গবেষণা চালিয়েছিলেন একেবারে একা জঙ্গলে থেকে। পরে, উনি অবশ্য বিয়ে করেন আরেকজন প্রাণিতত্ত্ববিদকেই। এবং ঐ জঙ্গলেই তাঁদের একটি সন্তানও হয়। ডগলাস হ্যামিলটনের রিপোর্টে উনি বলেছেন, পুরো আফ্রিকাতে আজকে বোধহয় তেরো লক্ষের বেশি হাতিও নেই। আফ্রিকা তো আর ছোট জায়গা নয় ! কতগুলো ভারতবর্ষকে যে তার মধ্যে হারিয়ে দেওয়া যায় হেসে-খেলে, তা পৃথিবীর ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায়। ঋজুদা আণ্ডারলাইন করে দিয়েছে অনেকগুলো জায়গা। মার্জিনে লিখে দিয়েছে যে, আমাদের ঝগড়া ভুষুণ্ডা আর ওয়ানাবেরির সঙ্গে নয়। ওরা যাদের চাকর-মাত্র, তাদেরই বিরুদ্ধে। যাদের সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছি এবারে, তাদের চর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। কোটি কোটি টাকার মালিক তারা। তাদের স্বার্থহানি যারা করতে চায়, তাদের তারা ক্ষমা করে না। অতএব, সাবধানতা থেকে কোনো সময় একটুও সরে আসা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু। আরও লিখেছে, পিস্তলে তিতিরের হাতই ভাল, না তোর হাত, এই ছেলেমানুষি ঝগড়াতে যাবার সময় এখন নেই। এখানে প্রতিমুহূর্ত মৃত্যুর ছায়ায়, ওয়ানাবেরির, মানে মৃত্যুরই, মুঠোর মধ্যে দিন কাটাতে হবে।

বুঝলাম যে, রুই-কাতলা ধরবে বলেই, ঋজুদা ভুষুণ্ডা আর ওয়ানাবেরিকে দেখার পরও একটুও উত্তেজিত হয়নি।

কেনিয়ার প্রাণিতত্ত্ববিদ কেস হিলম্যান (আফ্রিকান রাইনোগ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনসার্ভেশন অব নেচার অ্যান্ড ন্যাচারেল রিসোর্সেস-এর চেয়ারম্যান), আয়ান পার্কার, বন্যপ্রাণী-বিশারদ, কানাডিয়ান ইকোলজিস্ট রবার্ট হাডসন, বিখ্যাত ন্যাচারালিস্ট, এবং ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের চেয়ারম্যান স্যার পিটার স্কট ইত্যাদির রিপোর্টের কাটিংও ফোটোস্ট্যাট করে দিয়েছে ঋজুদা নিজের নোটের সঙ্গে। বাংলায় হাতে লিখেছে, "তোরা এগুলো না পড়লে, আমাদের উদ্দেশ্যর মহত্ত্ব ও বিপদ সম্বন্ধে ধারণা হবে না। একরকমের যুদ্ধই করতে এসেছি আমরা। যাদের নৈতিক চরিত্র নেই, যারা ন্যায়ের জন্যে লড়ে না, তারা কখনই কোনো যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জেতে না। অন্যায় চিরদিনই হেরে যায় ন্যায়ের কাছে। হয়তো সময় লেগেছে, হয়তো দাম দিতে হয়েছে অনেক ; কিন্তু ন্যায়ই জিতেছে চিরদিন। তোদের যদি আমাকে এখানেই দাহ করে ফিরে যেতে হয়, তাহলেও দুঃখ নেই। দুঃখ করিস না তোরা। তুই আর তিতির, আমি যা করতে পারিনি, তা যদি করতে পারিস তো শুধু আফ্রিকাতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই তোরা দুজনে নায়ক-নায়িকা হয়ে যাবি। তোরা ছেলেমানুষ যদিও, কিন্তু তোদের উপর আমার ভরসা অনেক। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখবি। পিস্তলের নিশানার চেয়েও বিশ্বাসের জোর অনেক বড়। আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাস রাখলে, বিশ্বাস তোদের কখনও অমর্যাদা করবে না।"

এর পরে, কী-ভাবে চোরা-শিকারিরা বিভিন্ন জানোয়ার মারে, কী ভাবে ট্রাকে, স্টিমারে, মানুষের মাথায়, সি-১৩০ কার্গো প্লেনে করে এই সব মাল চালান দেয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে ঋজুদা।

আজ আর সব পড়তে ইচ্ছে করছে না। তবে, পড়ে ফেলতেই হবে। কারণ গতবারে ভুষুণ্ডার গুলিতে ঋজুদা আহত হওয়ার পর একা পড়ে যাওয়াতে যে কি অসহায় হয়েই

পড়েছিলাম তা আমার মতো আর কেউই জানে না। ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, জিজ্ঞেস করবই বা কাকে ? জানার যা-কিছু, তা সবই ভাল ভাবে জেনে নিতে হবে। পথ-ঘাট, নদী-নালা, এয়ারপোর্ট। আমরা তিন কম্যাণ্ডো এসেছি বিরাট, সুগঠিত শক্তিশালী এক চক্র ধ্বংস করতে। যুদ্ধের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার আর তিতিরের জেনে নিতে হবে বইকি !

॥ ৫ ॥

সকালে চান-টান করে আমরা যে যার ঘরে একা একা ব্রেকফাস্ট খেলাম। তারপর ঋজুদার নির্দেশে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে গেলাম হোটেল থেকে।

তিতির তানজানিয়ান এয়ার লাইনস্-এর সামনে আর আমি তানজানিয়া মিরশ্যাম্ কোম্পানির সামনে পায়চারি করব, এমন নির্দেশ ছিল।

যথাসময়ে একটা গাঢ় চকোলেট-রঙা ভোকস্ওয়াগন-কম্বি গাড়ি এসে তিতিরকে এবং আমাকে তুলে নিল। তারপর গাড়িটা জোরে ছুটে চলল। দেখতে দেখতে আকাশমণি গাছে ছাওয়া উঁচু-নিচু পথ বেয়ে আমরা ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়লাম।

হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। যদিও এখানে সেৎসি মাছির ভয় নেই, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা আছে ঝকঝকে রোদের উত্তাপেও। কাঁচ তুলে দিলাম গাড়ির।

ঋজুদা কথা বলছিল না। খুব মনোযোগ সহকারে গাড়ি চালাচ্ছিল। আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পর আমরা যখন খুব চওড়া পথ বেয়ে একেবারে ফাঁকায় পৌঁছেছি, তখন গাড়িটা বাঁ দিকে থামিয়ে ঋজুদা নামল। পথের দু' দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমাকে বলল, "রুদ্র, তুই-ই চালা, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধুয়ো দিতে হবে।"

তিতির বলল, "আমি চালাব ঋজুকাকা। তাহলে তোমরা দুজনে আলোচনা করতে পারবে।"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "আমার সঙ্গে ঋজুদার আবার কিসের আলোচনা ! তুমি তোমাকে আর আমাকে একটু বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ভাবছ তিতির।"

ঋজুদা বলল, "নাউ, স্টপ দ্যাট রুদ্র। তিতিরই চালাক গাড়ি।"

যথারীতি পাইপ ঠেসেঠুসে তাতে দেশলাই ঠুকে শ্মশানের সাধুবাবাজির কঙ্কের ধোঁয়ার মতো ধোঁয়াতে গাড়ি ভরে দিয়ে তারপর ব্যোম্ হয়ে বসে রইল। বুঝলাম, এমার্জেন্সি-থিংকিং গোয়িং অন। এখন কথা বললেই গাঁট্টা-টাট্টা খেতে হতে পারে।

পথে, উল্টোদিক থেকে আসা একটি মার্সিডিস গাড়ি আর একটি সাদা ল্যাণ্ডরোভার চোখে পড়েছিল শুধু। যান এবং জনশূন্য পথ পেরিয়ে চলেছি। দুদিকে ধুধু মাঠ, ঝোপঝাড়, নানারকম প্যাট্রিজ ও আফ্রিকান পাখি পথ পেরুচ্ছে দ্রুতগতিতে।

আরও আধ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর তিতিরই প্রথম কথা বলল। "ঋজুকাকা, আমরা ঠিক যাচ্ছি তো ?"

"ঠিকই যাচ্ছি। তবে, সামনে গিয়ে ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা পাবি। তাতে ঢুকে পড়তে হবে। সেই কাঁচা পথটাই চলে গেছে লেক মানিয়ারা, গোরোংগোরো ক্র্যাটার, ওলডুভাই গর্জ এবং সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর দিকে।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ কী ! এ তো মাকুউনির মোড় !"

"আজ্ঞে !" ঋজুদা বলল। তারপর বলল, "আপনার মনে তো থাকারই কথা রুদ্রবাবু।"

"মনে আছে, মনে আছে।"

মাকুউনিতে এসে ডান দিকে ঘুরেই রাস্তাটা কাঁচা তো বটেই, বেশ খারাপ হয়ে উঠল।

ঋজুদা এবার তিতিরকে উদ্দেশ করে বলল, "মা গো! এবার রুদ্রকে দাও। জঙ্গলে গাড়ি চালানোটা কিন্তু তোমার রুদ্রর কাছেই শিখতে হবে।"

তিতির ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে গিয়ে পেছনে উঠলে, আমি ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে নিচু গলায় বললাম, "শুধুই গাড়ি চালানো?"

ঋজুদা বলল, "কথা কম। কিছুটা আগে গিয়ে একটা ছোট্ট বাজার পাবি। সেখানে শুধু কাঙ্গা-কিটেঙ্গা আর ইয়া-ইয়া কাঁদি কলা বিক্রি হয়। সেই হাটটাকে বাঁয়ে রেখে সরু কাঁচা পথে ঢুকে কুড়ি কিলোমিটার যাবি। মিটার দেখে। তারপর একটা খুব বড় তেঁতুলগাছতলায় গাড়িটা এমনভাবে রাখবি যাতে আকাশ থেকে কোনো প্লেন আমাদের দেখতে না পায়। তেঁতুলগাছটা তোর জন্যেই পুঁতে রেখেছি।"

তিতির বলল, "তারপর কী হবে ঋজুকাকা, বলো না?"

"অধৈর্য হয়ো না মাদাম্। দেখতেই তো পাবে। নিজে দেখবে শুনবে বলেই তো এসেছ!"

"তা তো এসেছি। এদিকে খিদে পেয়ে গেছে যে! কটা বেজেছে জানো? কখন ফিরব হোটেলে? রাত হয়ে যাবে না ফিরতে ফিরতে?"

"হলে, হবে!" আমি বললাম।

এ যেন সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে ভেলপুরি খেতে বা ফুচকা খেতে বেরিয়েছে! সাধে বলে, পথি নারী বিবর্জিতা! ঋজুদার যত্ত সব!

কুড়ি কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে ধুলোয় ধুলোক্কার হয়ে যখন সেই ষড়যন্ত্রর তিন্তিড়ী বৃক্ষের নীচে পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে একটা বাজে। খিদে আমারও পেয়েছে। ঋজুদার হাজারিবাগি নাজিমসাহেবের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে, না-দানা, না-পানি, ক্যা বদ্‌কিস্‌মতি ঔর হয়রানি!

ঋজুদা দরজাটা খুলে পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে বলল, "রুদ্র, নাইরোবি-সর্দারের সেই গোল পাথরটা কোথায়?"

"এই তো! আমার পকেটে!"

"ওটা হারাস না, নাইরোবি-সর্দার চাইতে পারে।" তারপরই বলল, "তিতির তুমি কখনও বাছুরের রক্ত খেয়েছ?"

"কিসের রক্ত?"

অবাক হয়ে তিতির শুধোলো।

"সুন্দর পুরুষ্ট নধর বাছুরের রক্ত।" ঋজুদা বলল।

"হাউ স্যাভেজ!" বলেই তিতির মুখে 'আমি কিন্তু খেলব না' গোছের ভাব ফুটিয়ে ঋজুদার দিকে তাকাল। বলল, "না। নেভার।"

"তাইই! কিন্তু একটু পরেই খেতে হতে পারে। লাঞ্চে কী খাবি রুদ্র? চিকেন মেয়োনিজ, না কোল্ড-মিট?"

"তোমাকে সেৎসি মাছি কামড়ায়নি তো?" বিস্ময়-মেশানো হাসির চোখে ঋজুদার চোখে তাকিয়ে বললাম।

ঋজুদা অন্যমনস্ক চোখে হাতঘড়ির দিকে চকিতে চাইল একবার। স্বগতোক্তি করল, "নাঃ! উই আর রাইট্ অন টাইম।" তারপরই আমাদের দিকে ফিরে বলল, "একটা

এক-এঞ্জিনের ছোট্ট আইল্যাণ্ডার প্লেনের শব্দ পাবি। পেলেই আমাকে বলিস। ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল সারা রাত অনেক হুজ্জোতি গেছে। ঘুম হয়ইনি একেবারে।"

তিতির অবাক চোখে বলল, "কাল রাতে? কী হয়েছিল ঋজুকাকা?"

"বলব, সব বলব। সময়মতো। এখন ঘুমোতে দে।" বলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিতির অবাক গলায় ফিসফিস করে শুধোলো, "সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল যে!"

মাথা নেড়ে উত্তর দিয়ে কান খাড়া করে রইলাম।

মিনিট-দশেক পর ফুলের বনে ভ্রমরের পাটার মতো আওয়াজ শোনা গেল একটা। আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে শব্দটা। ঋজুদা চোখ-বন্ধ হেলান-দেওয়া অবস্থাতেই বসেই বলল, "তিতির, তুই গাড়ি থেকে নেমে তেঁতুলতলায় গিয়ে দাঁড়া। তার আগে, রুদ্র, বাইরে গিয়ে দ্যাখ্ প্লেনের রঙটা হলুদ কি না। হলুদ হলে, তিতির ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়বে, আর তুই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিতিরকে কাভার করবি। যদি ওরা না হয়?"

"কী বলছ, কিছুই বুঝছি না ঋজুদা।" অধৈর্য গলায় বললাম আমি।

"বুঝবি রে সব বুঝবি। এখন চুপ কর।"

আমরা দুজন গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। ঋজুদা ঘুমোতে লাগল।

অদ্ভুত লোক।

নাইন-সিটার একটা হলুদ প্লেনই। আইল্যাণ্ডার। প্লেনটা তিতিরকে দেখতে পেয়েই দুবার ঘুরে ঘাসের মাঝের ফাঁকা মাঠে ল্যাণ্ড করে একটা হলুদ ধেড়ে খরগোশের মতো প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে স্থির হল। এক সাহেব নামল প্লেন থেকে। আর একজন সাত ফিট লম্বা মাসাই সর্দার। নাইরোবি-সর্দার! গুগুনোগুম্বারের দেশের নাইরোবি-সর্দার!

আমি পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে গেলাম তার দিকে। সর্দারকে বললাম "সর্দার! এই যে তিতির! আমাদের নতুন শাগরেদ।"

নাইরোবি-সর্দার বিন্দুমাত্র সময় ও কথা খরচ না করে পিচিক্ করে থুতু ফেলল নিজের কুচকুচে কালো কলার-কাঁদির মতো দশ আঙুলে আর তেলোতে। আর ফেলেই দু' হাতের তেলোতে ঘষে, কষে তিতিরের দু' গালে আর মুখে লাগিয়ে দিল সেই থুতু।

তিতির উ-উ-ব্যাওও গোছের একটা শব্দ করতেই আমি বললাম, "কথাটি কয়েছ কি প্রাণটি গেছে। এটাই ওদের আদর। এবং এই মানুষটির জন্যেই আমি আর ঋজুদা আজকে প্রাণে বেঁচে আছি—।" যা ঘটেছিল সেরেঙ্গেটিতে সেসব তো 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'তেই লেখা হয়েছে সবিস্তারে।

এমন সময় সাহেবটি ঋজুদাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "হাই ঋজু!"

"হাই!" বলে, ঋজুদা গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রথমে নাইরোবি-সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে বলল, "গাড়ির পেছনে একটা বাক্স আছে, নিয়ে আয় তো।"

গিয়ে নিয়ে এলাম। ঋজুদা বাক্সটা খুলে ধরল। দেখলাম, বিভিন্ন রঙের গোটা-পঞ্চাশ মার্বেল। মানে গুলি। বন্দুকের নয়, মাটিতে গাব্বু করে খেলার গুলি।

সর্দারের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাক্সটা দু' হাতে ধরে তিড়িং করে বল্লম হাতেই এক খুশির হুংকার ছেড়ে সোজা এক লাফ দিয়ে জমি থেকে ফিটচারেক অবলীলায় উঠেই আবার নেমে পড়ল।

ঋজুদা সাহেবটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমাদের। বলল, "ইনি হচ্ছেন মাইলস্ টার্নার। সেরেঙ্গেটির গেম ওয়ার্ডেন।"

মিঃ টার্নার তিতিরকে, সরি, পরমাসুন্দরী মিস ক্রিস্ ভ্যালেরিকে দেখে কোনো

ভাই-ভাতিজার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধই করতে যাচ্ছিলেন বোধহয়।

ঋজুদা বলল, "শি ইজ আ কিড মাইলস্। জাস্ট আ কিড।"

তিতিরের মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "সার্টেনলি, আই অ্যাম নট।"

মাইলস্ টার্নার ওর মুখে এক বালতি অদৃশ্য ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল, "ওকে বেবি! উ্য আর নট।"

একে নাইরোবি-সর্দারের দুর্গন্ধ থুতুতে মুখ ভর্তি। তারপর এই সব অপমান, তিতির এতদিন যা করেনি, এবার তাই করবে মনে হল। একেবারে "ভ্যাঁ" করবে বলে মনে হল। বাঙালির মেয়ে বলে কতা!

ইতিমধ্যে প্লেনের ককপিট থেকে আরেকজন সাহেব নেমে এল।

সেই সাহেবটি নেমেই, হুলোবেড়ালের মতো হুঁয়াও হুঁয়াও করে দুবার ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে আড়মোড়া ভেঙেই ঋজুদাকে বলল, "হাই! ঋজু সিং! আই অ্যাম হাংরি! কাম, লেটস্ হ্যাভ লাঞ্চ।"

ঋজুদা হেসে বলল, "হোয়াটস্ দিস কন্‌কক্‌শন? সে-এ-এ আইদার ঋজু, অর গুরিন্দার।"

কিন্তু মাইলস্ টার্নার উত্তরে হেসে বলল, "নাথিং ডুইং। ঋজু সিং সাউণ্ডস্ মাচ্ বেটার।"

তেঁতুলতলার ছায়ার দিকে এগিয়ে চললাম। খিদে কারোই কম পায়নি। তারপর ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে আমরা সকলে বসে পড়লাম। বিরাট লাঞ্চ-বক্স থেকে চিকেন-স্যাণ্ডউইচ, ওয়াইল্ডবিস্ট্-এর কোল্ড মিট, সরি, ভেনিসন্ বেরুল। কী শক্ত রে বাবা! দাঁতে ছেঁড়া যায় না।

তিতিরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী খাচ্ছ? জানো?"

"জানি।"

"কী?"

"ওয়াইল্ডবিস্ট!"

"ওয়াইল্ডবিস্ট মানে কী? জংলি জানোয়ার?"

তিতির লেমোনেডের বোতলটা মুখে উপুড় করে এক ঢোক খেয়ে নিয়ে হাসল। বলল, "তুমি আমাকে কী ভাব বলো তো? আফ্রিকাতে সশরীরে আগে আসিনি বলে বুঝি আমার কিছুই জানতে নেই? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো একবারও না এসেই 'চাঁদের পাহাড়' লিখেছিলেন। তুমি কি পঞ্চাশবার এখানে এসেও একটি ঐ রকম বই লিখতে পারবে?"

"বোকা-বোকা কথা বোলো না। ওয়াইল্ডবিস্ট্ বানান করে বলো তো। তাহলেই বুঝব, ঠিক বলছ কি না।"

তিতির তেমনি হাসি-হাসি মুখেই কেটে কেটে বানান করল, "WILD BEEST, BEAST নয়। ঠিক আছে? তাছাড়া, এদের অন্য একটি নামও আছে। তা হচ্ছে 'ন্যু'।"

ঋজুদা উড়ো-সাহেবদের সঙ্গে বড় বড় কালো বোতলে হলুদ বুড়বুড়ি-ওঠা কী যেন খাচ্ছিল। মুখ দেখে মনে হল ঐ লেমোনেড তেতো খেতে। ঋজুদাকে শুধোলাম তেতো বুঝি? আমার দিকে ফিরে বলল, "খাদ্য-খাদক খাবার সময় ঝামেলি করিস না তো! শুধু

কচকচি।”

এই “খাদ্য-খাদক” কথাটার একটা ভূমিকা ছিল। ‘বনবিবির বনে’তে যখন আমরা গদাধরদার সঙ্গে পার্সোনাল রিভেঞ্জ নিতে গেছিলাম সোঁদরবনের বাঘের বিরুদ্ধে, তখন সুন্দরবনের মাঝিমাল্লাদের ওরকমভাবে কথা বলতে শুনেছিলাম। ‘খাদ্য-খাদক’ বলতে তারা খাবার-দাবার বোঝাচ্ছিল।

তিতির আমার দিকে হাঁ করে তাকাল।

স্যাণ্ডউইচ্ মুখে পুরতে পুরতে বললাম, “বলব বলব, সবই বলব। এত অধৈর্য হলে হবে না।”

নাইরোবি-সর্দারি বাঁশের চোঙে করে বাছুরের ফেনা-ওঠা টাটকা রক্ত এনেছিল। আমরা যে-সব খাচ্ছি সে-সব কুখাদ্য-অখাদ্য মুখে একেবারেই না দিয়ে নিষ্ঠাভরে এঁটোকাঁটা বাঁচিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে গ্যালনখানেক গরমাগরম রক্ত গিলে ফেলে একটা আরামের ঢেকুর তুলল।

নাইরোবি-সর্দারিকে কাছে পেয়ে বড় ভাল লাগছিল। এই মানুষটি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা না থাকলে আমি এবং বিশেষ করে ঋজুদা কি আর গুগুনোগুম্বারের দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতাম গতবারে?

যে সাহেবটি প্লেন থেকে পরে নেমেছিলেন, তাঁর নাম, জানা গেল মারে ওয়াট্‌সন। ভদ্রলোক একজন অনারারি গেম-ওয়ার্ডেন। চোরাশিকারিদের উপর ভীষণ রাগ ওয়াটস্‌নসাহেবের।

খেতে-দেতে, কথা হতে হতে বেলা প্রায় তিনটে বাজল। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে ফেজেন্টস্-এর ডাক ভেসে আসছিল। হাজারিবাগের কালি-তিতিরের ডাকের মতো। গাছ-গাছালির ছায়াগুলো নড়ে-চড়ে বসতে শুরু করেছে। পুব-আফ্রিকার মাটির গন্ধ উঠছে চারধার থেকে। আমাদের দেশের মাটির গন্ধের মতো নয়। দেশের মাটির গন্ধ বড়ই মিষ্টি।

ঋজুদা হঠাৎ বলল, “নাইরোবি-সর্দারের পায়ের ধুলো নে একবার রুদ্র।”

তিতির খাওয়া-দাওয়া করল বটে, কিন্তু সর্দারি থুতু-মাখানোর পর থেকেই সে গুম হয়ে বসে ছিল। আমি নিচু হয়ে নাইরোবি-সর্দারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সর্দারি চমকে উঠে তিড়িং করে সরে গেল এক লাফে। হয়তো পায়ে সুড়সুড়ি লেগে থাকবে। যাদের যা অনভ্যেস!

প্রণাম করা হল না আমার। উল্টে আমার মুখে আর-এক প্রস্থ বাছুরের বোঁটকা রক্তের গন্ধ-মাখা থুতু লাগিয়ে আবার আদর করে দিল সর্দারি। তার পর তিতিরকে কলার কাঁদির মতো বাঁ হাতের আঙুলে সাঁড়াশির মতো ভালবাসায় ধরে তাকেও আবার ডবল জম্পেস করে লাগিয়ে দিল। ফেয়ারওয়েল গিফ্‌ট বলে কতা!

মাইলস্ টার্নার আর ওয়াটস্‌ন যখন প্লেনের দিকে এগোতে লাগলেন তখন ঋজুদা নাইরোবি-সর্দারের কাছে এগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে যেন কী বলল।

সর্দারি ঋজুদার মাথার উপরে দু'হাত তুলে, থুতু-মাখা দু'হাতের তালু প্রথমে ঋজুদার দু'গালে ক্রিম লাগাবার মতো লাগিয়ে আবার মাথার উপরে তুলে অনেকক্ষণ ধরে গম্‌গম্ করে কী সব মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। সেই মেঘগর্জনের মতো স্বরে, ন্যাবা-ধরা বিকেলের হলুদ আলোয় একটি বাজে-পোড়া প্রকাণ্ড বাওবাব গাছের মতো সটান দাঁড়িয়ে কী যে বলে চলল নাইরোবি-সর্দারি, তার কিছুই বোধগম্য হল না। শুধু শিরদাঁড়া বেয়ে এক ভয়মিশ্রিত ঔৎসুক্যের অনুভূতি গাব্বুন-ভাইপার সাপের মতো হিস্-স্-স্ শব্দ করে

দৌড়ে গেল মনে হল। নাইরোবি-সর্দারের সেই দীর্ঘ স্বগতোক্তি শুনতে শুনতে ঋজুদার চোখও যেন ছলছল করে উঠল।

প্লেনের এঞ্জিন স্টার্ট করলেন টার্নার। বুড়ো আঙুল দেখালেন বাঁ হাতের। ঋজুদা ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধরল উপরে। প্লেন মুখ ঘুরল। প্রপেলারের শব্দ জোর হল। ওয়াটসন মুখ বাড়িয়ে বললেন ঋজুদাকে, "সেম টাইম, সেম প্লেস, ডে-আফটার। ওক্কে?"

ঋজুদা ডান হাতের বুড়ো আঙুল তোলা অবস্থাতেই বলল, "রজার। হ্যাপি ল্যাণ্ডিং।"

তারপর প্রপেলারের আওয়াজে আর কিছুই শোনা গেল না। প্লেনটা তামা-রঙা মাঠের মধ্যে কিছুটা ট্যাক্সিইং করে একটা মস্ত হলুদ পাখির মতো নীলচে আকাশে পাক খেয়ে ক্রমশ ছোট হয়ে যেতে লাগল। তারপর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল, প্লেনটা ঠিক যেখানে ছিল, সেই জায়গাটিতেই ওয়াইল্ডবিস্টের একটি ছোট্ট দল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যখন ওদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির ঠাণ্ডা মাংস খাচ্ছিলাম তখন ওরা আমাদের দেখছিল।

ঋজুদা বলল, "বদহজম হবে। নির্ঘাত।"

বললাম, "নিজেরা সব গেম-ওয়ার্ডেন! আর এদিকে তো দিব্যি ওয়াইল্ডবিস্ট-এর কোল্ড মিট খাচ্ছে! তার বেলা?"

"বোকা! গেম-ওয়ার্ডেনরা নিয়মিতই শিকার করে। কোনো বিশেষ প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলেই। পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে..."

তিতির সেনটেন্সটা কমপ্লিট করে বলল, "ব্যালান্সের।"

"রাইট।"

এবার ফেরার পালা। ঋজুদা কেমন গম্ভীর হয়ে ছিল। গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "বুঝলি রুদ্র, সকলের ঋণ বোধহয় শোধা যায় না। পুরোপুরি তো নয়ই। কিছু কিছু ঋণ থাকে, যা শুধু স্বীকার করা যায় মাত্র। যেমন ধর, মা-বাবার ঋণ। দ্যাখ্, যে-মানুষটা জীবন দিল আমাকে, তাকে বদলে দিলাম এক বাক্স মার্বেল। তিরিশ টাকা দাম।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "আসলে বোকারাই টাকাকে দামি মনে করে। টাকা দিয়ে সত্যিকারের দামি কিছুই বোধহয় পাওয়া যায় না। ভুষুণ্ডা তো টেডিকে খুন করল টাকার লোভে, আমাদের ও মারতে চেয়েছিল নিজে, এমন-কী নাইরোবি-সর্দারকেও মারতে চেয়েছিল তোকে দিয়ে জোর করেই গুলি করিয়ে; কিন্তু ও কি কখনও, সর্দারকে আমরা যে-রকম ভালবাসি তেমন কোনো দামি ভালবাসা পাবে পৃথিবীর সব টাকার বদলেও? ভালত্ব, ভালবাসা, এ-সবের দাম টাকা দিয়ে কখনও দেওয়া যায় না।"

তিতির রুমাল দিয়ে ভাল করে ঘষে ঘষে মুখ মুছছিল প্লেনটা চলে যাবার পর থেকেই। তারপর ব্যাগ থেকে টিশু পেপার বের করে। ভেস্‌লিনের শিশিতে ডুবিয়ে আবার ও মুখ মুছতে লাগল।

ঋজুদা বলল, "দেখিস, মুখের চামড়া উঠে না যায়। উঠে গেলে, এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। স্বাস্থ্যবান লোকের ওয়েল-মেন্ট থুতু তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই শুনেছি। কী বলিস রে রুদ্র? এত ঘষাঘষির কী আছে?"

তিতির চুপ করে রইল। বুঝলাম, কলকাতা থেকে বেরুনোর পর এই প্রথমবার জব্দ হয়েছে প্রমত্ত প্রমীলা।

শর্ট-ব্যারেলড় পিস্তলের গুলির আওয়াজের মতো হঠাৎ ফেটে পড়েই, ফাঁসা ভিস্তির

মতো ফেঁসে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তিতির। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আনসিভিলাইজড, ক্রুড, বিস্ট, থু থু। থু-থু-থু—হুঁ হুঁ হুঁ—উ-উ-উ—"

আহা! মেয়েদের কান্নার শব্দ যে এত মিষ্টি আমি তা কখনও খেয়াল করিনি। ছোটবেলা থেকে বড়-ছোট, কচি-বুড়ি কত মেয়েকেই তো কাঁদতে শুনেছি।

তিতিরের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে 'রাইজিং টু দ্যা অকেশান'—আমি ওর পনি-টেইলে এক টান লাগিয়ে বললাম, "ইটস্ ওল ইন দ্যা গেম, বেইবি!"

মনে মনে বললাম, সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে ফুচকা অথবা পার্ক স্ট্রিটে কোয়ালিটির আইসক্রিম, নয়তো পিজ্জা-হাটে পিজ্জা খেলেই তো পারতে খুকি! আফ্রিকার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারে আসা কেন?

মুখে যাই-ই বলি আর মনে মনে যাই-ই ভাবি, তিতিরকে কাঁদতে দেখে এই প্রথম বুঝলাম যে, মেয়েটা মানুষ ভাল। যেসব মানুষ দুঃখ হলে কাঁদে না, অথবা অভিভূত হলে তা প্রকাশ করে না, আমি তাদের সহ্য করতে পারি না। মনে মনে বললাম, ভয় কী তিতির? আমি তো আছি! মিস্টার রুদ্র রায়চৌধুরী, রাইট হ্যাণ্ড অব গ্রেট ঋজু বোস—

"কী ভাবছিস রে রুদ্র?" ঋজুদা বলল, ঠিক সেই মুহূর্তে।

চমকে উঠে বললাম, "কে? আমি? এই-ই, কী ভাবব, তাই-ই ভাবছি?"

"ফাইন। এখন কী ভাববে তা না-ভেবে, গাড়িটা স্টার্ট করো।"

এই সেরেছে। হঠাৎ গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে একটা মাছির ডানার বুঁ-বুঁ-বুঁ-ই-ই আওয়াজ শুনে আমার পিলে একেবারে চমকে গেল।

ঋজুদা বলল, "কী হল? এত কামড় খেয়েও তাদের চিনলি না? এ তোর সেৎসি নয়। এ একটি বিক্ষুব্ধ নীল মাছি।"

"কাঁটালে মাছি।" তিতির বলল।

কথা ফুটেছে!

"রাইট।" ঋজুদা বলল। "মাইনাস্ কাঁটাল।"

গাড়িটা স্টার্ট করে ব্যাক করে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

তিতির বলল, "আচ্ছা ঋজুকাকা, গুম্ গুম্ গুম্ করে অতক্ষণ ধরে তোমার মুখে দু'হাত দিয়ে থুতু মাখিয়ে তোমাকে কী বলল নাইরোবি-সর্দার? কিসের মন্ত্র ওসব? তুক্‌তাক্ করল না তো?"

ঋজুদা অন্যমনস্ক ছিল তখনও। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলল, "ওঃ। ও একটা মাসাই প্রবচন। মাসাই যোদ্ধারা যখন যুদ্ধে যায় তখন ওরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।"

"কী মন্ত্র? বলো না ঋজুকাকা?" তিতির পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

কিন্তু ঋজুদা চুপ করেই রইল। মাঝে মাঝে এমন শক্ত-খোলার কচ্ছপের মুখের মতো নিজেকে গুটিয়ে নেয় এক দুর্ভেদ্য বর্মের আড়ালে। তখন এ-মানুষটাকে যে এত ভাল করে আর এত বছর ধরে চিনি এ-কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

তিতির আহত হল। ঋজুদার নীরবতায়।

অনেকখানি পথ চলে এসেছি ততক্ষণে আমরা। টিকিয়া-উড়ান্ চালাচ্ছি একেবারে।

"যেমন চালাচ্ছিস, তাতে প্রাণে যদি বেঁচে থাকি তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাকুউনির পিচরাস্তাতে এসে পড়ব মনে হচ্ছে।" ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "যদি বাঁচি প্রাণে।" বলেই বলল, "নাইরোবি-সর্দারের মন্ত্রর মানেটা

বলবে না তাহলে ঋজুকাকা ?”
ঋজুদা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “দ্যাখ দ্যাখ, পশ্চিমের আকাশের রঙটা কেমন হয়েছে। আঃ।”
আমরা তিনজনেই মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে রইলাম।
তিতির বলল, “বলবে না তুমি ? বল্লো-না !”
ঋজুদা হঠাৎ তিতিরের দিকে ঘুরে বলল, “মাসাইরা যে-ভাষায় কথা বলে, তার নাম হচ্ছে ‘মাআ’। ভাষার নাম থেকেই তাদের উপজাতির নাম হয়েছে মাসাই। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ওরা যা বলে, সেই কথাই বলছিল নাইরোবি-সর্দার আমাকে।”
“ওরা কী বলে ?”
“ওরা বলে :
মোটোনীই আই মোটোনীই আই এ এন্‌গাই
মারিয়ামারি ইল্‌টাটুয়া লেকেরি ওলোঙ্গোনি
এনেমানানু এটারাকি নাআরিশো
নেমিতা কাটা আকেই এ মোটেনীই আই এন্‌গাই
নিমেরা এনেকিরি।”
তিতির বলল, “মারিয়ামারি কথাটা অবশ্য বাংলাতে ‘মেরে মরব’ গোছের কোনো একটা কথার কাছাকাছি যায়। কিন্তু পুরো প্রবচনটার মানে কী ?”
“মাআ ভাষার মর্মোদ্ধার করতে তো বাবা-বাবা ডাক ছাড়তে হবে ঋজুদা।” একটা গর্ত বাঁচাতে, স্টিয়ারিং কাটাতে আমি বললাম।
ঋজুদা বলল, “দারুণ মানে রে, দারুণ মানে। একটা মস্ত জাত, অতি-বড় যোদ্ধার জাত, পুরুষের জাত, থুড়ি তিতির, সাহসীর জাতই কেবল এমন মন্ত্র বলে তাদের ছেলেদের যুদ্ধে পাঠাতে পারে। যুদ্ধে বেরুবার আগে যোদ্ধারা নিজেরাও যে এমন কথা আবৃত্তি করতে পারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ভাবলেও অবাক লাগে।”
“আঃ, মানেটা কী ?”
“মানে হচ্ছে, ‘ভগবান, আমার শিকারি-পাখি তুমি ! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো এই যুদ্ধে। থেকো, এই কারণে যে, আমি জানি না এই যুদ্ধে মরব না মারব। আমি নিজেও মরতে পারি, মরতে পারে শত্রুও। তবু, তুমি সঙ্গে থেকো সবসময়। আমি মরলে, তুমি আমাকে ঠুক্‌রে খেও। আর শত্রু মরলে, শত্রুকে। তোমার খাদ্যের অভাব হবে না কখনও। যুদ্ধ যখন হবে, তখন এস্‌পার-ওস্‌পার তো হবেই। যুদ্ধ মানেই এক পক্ষের জিত আর অন্য পক্ষের হার। যুদ্ধের মর্যাদা তো যুদ্ধেরই মধ্যে। কে জেতে আর কে হারে তাতে কী-ই বা আসে যায় ? এসো পাখি, আমার মাংসভুক্ পাখি, আমার মাথার উপর উড়তে উড়তে এসো। আমার পথের উপর কম্পমান ছায়া ফেলতে ফেলতে’।”
“খাইছে ! কও কী ঋজুদা ? এ তো দেহি সাংঘাতিক পর্‌বচন। এমন পক্ষীর প্রেয়োজন নাই আমাগো। আমরা ভুষুণ্ডার লাশ ফেলাইব। আমাগো—”
“উঃ ! বাবা রে !” তিতির চেঁচিয়ে উঠল।
“আঃ। কী হচ্ছে কী, রুদ্র !” ঋজুদা ধমকে বলল। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটার লাশকে একটা কিং-সাইজ গাড্ডা থেকে তুলে ফেলেছি আমি। যা রাস্তা, তার আমি কী করব ! সামনেই মাকুউনির পিচের পথ। কটা দোকান। খালি কলার কাঁদি আর অন্যান্য ফল। দেখে মনে হয় কাছাকাছি চিড়িয়াখানা আছে। এত এত বিচিওয়ালা সিঁদুরে-কলা মানুষে

খায় কী করে ভগবানই জানেন।

পিচরাস্তায় পৌঁছে গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে তিতিরকে বললাম, "নাও এবার তুমি চালাও। মাখমের মতো পথ, এক্কেবারে আরুশা অবধি। ড্রাইভিং সিটে বসলে ঝাঁকুনিও লাগবে সবচেয়ে কম।"

তিতির এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট করে তিতির বলল, "পরশু আমরা এখান থেকে কোথায় যাব ঋজুকাকা? আমার এই সব পাঁয়তাড়া আর ভাল লাগছে না। এই বিটিং' বাউট্ দ্য বুশ। আসল জায়গায় কখন গিয়ে পৌঁছব?"

"এটা কি নকল জায়গা?"

ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম আমি।

"জানবে মাদাম্। সময় হলে সবই জানবে। পেশেন্স, প্রেটি গার্ল, উ্য মাস্ট হ্যাভ অব পেশেন্স ইফ উ্য ডু নট ওয়ান্ট টু বি বেরিড ইন দ্য উইল্ডারনেস্ অব আফ্রিকা।"

"ভুষুণ্ডা এবং ওয়ানাবেরি এখনও কি আরুশাতেই আছে? ওরা দুজনে কি একই দলের?" তিতির একটুও না-দমে আবার জিজ্ঞেস করল।

"বলো লেফটেন্যান্ট্।" ঋজুদা আমাকে উদ্দেশ করে বলল।

"আমার মনে হয় ভুষুণ্ডা তোমার ভুজুংটা খেয়েছে। সে এতক্ষণ জাঞ্জিবারে মসলা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাদের মসলা-বাটার সুযোগ দিয়ে। ভুষুণ্ডাকে রান্নার ভার কিন্তু আমার। আমারই একার। প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল যে, ওয়ানাবেরি আর ভুষুণ্ডা একই দলের লোক। কিন্তু—"

"একই দলের লোক হলে মাউন্ট-মেরু হোটেলের রিসেপ্শানে তারা একে অন্যকে দেখেও চিনল না কেন?"

"সেটা তো স্টান্ট্ও হতে পারে। লোক দেখাবার জন্যে।" ঋজুদা বলল।

"হ্যাঁ। তা-ও হতে পারে।" তিতির আর আমি একই সঙ্গে বললাম।

"কিন্তু যে লোকটা মরল, সে লোকটা কে?"

"সেই তো হচ্ছে কতা!"

ঋজুদা বলল, মুখ নিচু করে।

বললাম, "এই তো সবে মরামরির শুরু। এরপর তো কড়াক-পিঙ্ আর টিক্-চুঁই, জুইক্-জুইক্।"

"ওয়ানাবেরি! ওয়ানাবেরি আমাদের যে গল্পটা বলতে গিয়েও শেষ করেনি সেদিন, তুমি তার বাকিটা জানো? জানলে বলো না ঋজুকাকা।" তিতির বায়না ধরে বলল।

"মৃত্যুর গল্প মৃত্যু নিজে এসেই বলবে আবার। মৃত্যু একবার পিছু নিলে কি সহজে ছাড়ে? প্রথমটা যার কাছ থেকে শুনেছিস, তার কাছ থেকে শেষটাও শুনে নিস। তোরা না চাইলেও সে তোদের অত সহজে ছাড়বে না। সবসময় মাসাইদের শিকারি পাখিরই মতো তোদের পথে পথে তার কালো ছায়া ফেলে ফেলে অনুসরণ করবে সে। ওয়ানাবেরি! ওয়ানাকিরি!"

গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল তিতির। সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। হেডলাইটের আলো আর কতটুকু পথ আলোকিত করে? দু'পাশে বড় জঙ্গল নেই। ঝোপঝাড়, ঝাঁটি-জঙ্গল, ঘাসবন, উঁচু-নিচু চড়াইয়ে-উত্রাইয়ে পথ। গাড়ির মধ্যে শুধু ড্যাসবোর্ডের নীল আলোর আভা ও ডিপারের সবুজ ইণ্ডিকেটরের আলোটুকু। হু-হু করে পিচ কামড়ে গাড়ি চলেছে। সকলেই চুপ।

মাঝে-মাঝে এমনই হয়। যখন প্রত্যেককেই ভাবনাতে পায়। অথচ, ভাবনার চাদরগুলোর মাপ, রঙ সবই আলাদা-আলাদা। রকম সব বিভিন্ন।

আধঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ ঋজুদা তিতিরের স্টিয়ারিং-ধরা হাতে হাত ছুঁইয়ে গাড়ি থামাতে বলল।

খুব জোর ব্রেক করে দাঁড় করাল গাড়িটাকে তিতির। আমি ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠে চারধারে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই, কিছুই নেই।

"কী হল?"

ঋজুদা নিরুত্তাপ গলায় বলল, "হয়নি কিছুই। আয়। একটু চুপ করে বসে থাকি অন্ধকারে। আফ্রিকার রাতের গায়ের গন্ধ তিতিরকে দিবি না একটু? আফ্রিকা যে সবে চান করে, নতুন শাড়ি পরে, গন্ধ মেখে অসীম আকাশের নীচে অন্ধকারের কালো আঁচল মেলে দাঁড়িয়ে আছে তারাদের আকাশ-পিদিম জ্বেলে, আমাদেরই জন্যে। তার কী বলার আছে তিতিরকে শোনাবি না একটু? কী করে জঙ্গলের সঙ্গে কথা-না-বলে কথা বলতে হয়, তিতিরকে শিখিয়ে দে। তোর কাছে অনেক শিখবে তিতির।"

তিতির চুপ করে তাকাল আমার দিকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে। আমি আমার নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বললাম।

যেমন জঙ্গলে গেলেই হয়, সে পৃথিবীর যে-জঙ্গলই হোক না কেন, আস্তে আস্তে জলের মতো, ফুলের গন্ধের মতো, ভোরের হাওয়ার মতো এক নিটোল, গভীর সুখের মিশ্র-শব্দ-মেশা ঘ্রাণে আমাদের প্রাণের প্রাণ ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎই মনে হল, আমাদের গাড়িতে শুধু আমরা তিনজনই নেই। এই আদিগন্ত বাদামি আফ্রিকার এক কৃষ্ণপক্ষের নিভৃত রাত তার অস্তিত্বকে আমাদেরই মাপের মতো ছোট্ট করে নিয়ে আমাদেরই মাঝের সিট উঠে এসেছে। আমি স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছি, তার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি জানি, ঋজুদাও জানে যে, আমরা মিথ্যা ভাবছি না, বা মিথ্যা বলছি না। তিতির যেদিন আমাদের এই অনুভূতির শরিক হতে পারবে, সেদিন তাকে আর শেখাবার কিছুই থাকবে না এই বুনো-জীবন সম্বন্ধে। তিতির শুধু সেদিনই জানবে যে, অনেক বই পড়ে, অনেক রাইফেল ছুঁড়ে, অনেক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়েও সমস্ত জানা যায় না। বাকি থাকে কিছু। যা বাকি থাকে, তা কেউই শেখাতে পারে না কাউকে; তা কোনো বইয়ে লেখা থাকে না, সব য়ুনিভার্সিটির হেড-অব-দ্য-ডিপার্টমেন্টদের পাণ্ডিত্যরও বাইরে সেই সহজ অথচ দেবদুর্লভ বিদ্যা। সে-বিদ্যা, সে-জানা অনুভবের, হৃদয়ের। যদি তিতিরের হৃদয় বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেও আমাদের একজন নিশ্চয়ই হয়ে উঠবে। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে।

যেখানে আজ নাইরোবি-সর্দার, ওয়াটসন আর জেনকিনসের সঙ্গে দেখা হল, পরশু আমরা আরুশা থেকে মাকুউনি গিয়ে লেক মানিয়ারার পথে, সেখান থেকেই প্লেনে চলে যাব। কোথায় যাব, তা এখনও অজানা। আন্দাজ করতে পারছি, হয় ডোডোমা, নয় তো সোজা ইরিঙ্গা। দেখা যাক, তরী গিয়ে কোন্ কূলে ঠেকে!

আজও ঋজুদা জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের, ঐ নোটগুলো পড়ে ফেলেছি কি না? আমার এখনও বাকি আছে। তিতিরেরও সামান্য বাকি।

ঋজুদা বলেছিল, ম্যাপ একেবারে মুখস্থ করে ফেলবি। যেন রাতের অন্ধকারেও কম্পাস দেখে পথ চিনতে অসুবিধে না হয়।

চান-টান করে নিজের খাটে শুয়ে আবার কাগজগুলো বের করলাম। ম্যাপটাও। জেনে খুব দুঃখ হল যে, পুব আফ্রিকার পোচিং, এবং পোচিং-করা জানোয়ারদের চামড়া, খড়্গের গুঁড়ো, দাঁত, শিং সব পাচার করার মূলে আছে এশিয়ানরা। পুব আফ্রিকাতে এশিয়ান বলতে ভারতীয়, পাকিস্তানি, সিলোনিজ, বাংলাদেশী সকলকেই বোঝায়। কিন্তু ঋজুদা বলেছিল, এদের বেশির ভাগই ভারতীয় পাসপোর্ট-হোল্ডার নয়। প্রায় সকলেরই ব্রিটিশ পাসপোর্ট। এবং অধিকাংশই পশ্চিম ভারতীয়, গুজরাটি। এদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা কখনও ভারতবর্ষ দেখেননি পর্যন্ত। পড়াশুনা করেছেন ইংল্যাণ্ডে, ছুটি কাটাতে যান সুইট্জারল্যাণ্ডে, এমনি সব 'এশিয়ানস্'।

পোচিং-এর সিংহভাগই হয় সোমালি এবং নানা জাতের যূথবদ্ধ গুণ্ডাদের দ্বারা। যাদের মায়া-দয়া বলতে কিছুই নেই। সব রকম অস্ত্রশস্ত্রই যাদের কাছে আছে। এরা গভীর জঙ্গল অথবা দূর গাঁয়ের এশিয়ানস ও আফ্রিকান দোকানদারদের চোরা-শিকারের জিনিস দিয়ে তাদের সঙ্গে গুলি, খাবার এবং টাকা বিনিময় করে। এই সব দোকানদারের কাছে বেশ ভালরকম চোরা-শিকারের সামগ্রী জমে উঠলে, ধরা যাক কয়েকশো কিলোগ্রাম হাতির দাঁত, ট্রাক ভাড়া করে সেই সব জিনিস পাচার করে ভারত মহাসাগরের তীরে। না, অবশ্যই কোনো বন্দরে নয়। ম্যাংগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে, সুন্দরবনে যেমন ম্যাংগ্রোভ ফরেস্টস আছে, স্টিমার লুকিয়ে নোঙর করে থাকে। সেই স্টিমারে ওঠে সেই সব শিকার করা জিনিস। সেখান থেকে হাতির দাঁত আর নানা জাতীয় হরিণ ও অ্যান্টিলোপের শিং স্টিমারে করে চালান যায় আবুধাবি এবং দুবাইয়ে শেখেদের প্রাসাদ অলংকৃত করতে। আবার সেখান থেকে একাংশ প্লেনে করে চালান যায় পুবে এবং ইয়োরোপে।

আফ্রিকার হাতির দাঁতের বড় একটা অংশ যায় চোরা-শিকারের বড় বড় বিত্তবান কারবারিদের কাছে, ইয়োরোপে, উত্তর আমেরিকাতে এবং ফার-ইস্টে। সেই সব ব্যবসায়ী এই হাতির দাঁত মজুত করে, সোনা অথবা স্টক মার্কেটের লগ্নির বিকল্প হিসেবে। সোনা অথবা শেয়ার-টেয়ারের দাম হঠাৎ-হঠাৎ পড়ে যায়, তাদের মূল্য উবে যায় ; কিন্তু যত দিন যাবে হাতির দাঁতের দাম ততই বাড়বে। সেই অর্থে মজুতদাররা হাতির দাঁতকে সোনা, শেয়ার, ডিবেঞ্চারের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান বলে মনে করে। সমস্ত পৃথিবীতে বড় বড় কোটিপতি মজুতদাররা হাতির দাঁত এমন পরিমাণে মজুত করছে যে, যা তাদের গুদামে আছে তার মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ কারুকার্য বা শৌখিন গয়না বা ফার্নিচার বানাবার জন্যে বাজার ছাড়ে তারা প্রতি বছর। এসব তথ্য ঋজুদার বানানো নয়। অনেক পড়াশুনো করে এই সমস্ত তথ্যের প্রমাণ-সাবুদ হাতে নিয়েই নোটটা বানিয়েছে।

কেনিয়ার একজন ভূতত্ত্ববিদ্, এসমণ্ড ব্রাড্লি মার্টিন, আফ্রিকান গণ্ডারদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও পড়াশুনা করেছেন। যেমন করেছেন ডগলাস-হ্যামিল্টন হাতিদের নিয়ে। তিনি বলেন যে, এখনও ফার-ইস্টের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম রোগের ওষুধ হিসেবে গণ্ডারের খড়্গের বিশেষ চাহিদা। হাকিমি দাওয়াই তৈরি হয় এ থেকে নানারকম। মাথা-ধরা, জ্বর, হৃদরোগ, পিলে-রোগ সব নাকি ভাল হয়ে যায়। 'হাড্ডি-পিল্পিলা' রোগও নিশ্চয়ই সারে। যে সব রোগ হয়, কিন্তু রোগীরা "Zান্তিও পারে না" সে সব রোগও নির্ঘাত সারে ! কে জানে ? গণ্ডারই হয়তো একমাত্র জানে তার খড়্গের গুণের কথা। এক চামচ খড়্গ চেঁচে নিয়ে গুঁড়ো করলেই ছাই-ছাই ঘুঘুরঙের একরকম গুঁড়ো হয়। ফুটন্ত জলের সঙ্গে সেই গুঁড়ো মিশিয়ে একরকমের ক্বাথ তৈরি করে বড় বড় হাকিমরা রোগীকে খাইয়ে দেয়। এক্কেবারে দাওয়া অন্দর ; রোগ বাহার। শরীরে

ওষুধ ঢোকে, আর রোগও সঙ্গে-সঙ্গে বাব্বা মাম্মা ডাক ছাড়তে ছাড়তে পালায়। যে-রোগই হোক না কেন !

কিন্তু আশ্চর্য হলাম পড়ে যে, গণ্ডারের খড়্গের সবচেয়ে বেশি চাহিদা উত্তর ইয়েমেন-এ। ইয়েমেনিরা একরকম লম্বা তরোয়াল ব্যবহার করে। তাদের বলে "জাম্বিয়া"। সেই জাম্বিয়ার হাতল তৈরি করে তারা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে। ইদানীং ইয়েমেনি শ্রমিকরা অ্যারাবিয়ান গাল্‌ফ-এ চাকরি করে এখন এক-একজন বিরাট বড়লোক। তাই পয়সার অভাব নেই। ঋজুদার নোটটা পড়েশুনে মনে হচ্ছে, একটা গণ্ডার হয়ে জন্মালেও মন্দ হত না। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে থাকি বলে আমাদের বদনাম আছে। কিন্তু নিজের নাকটি কেটে পরের হাতে তুলে দিয়ে বাকি জীবন যদি অতি সচ্ছল অবস্থায় কাটানো যেত, তবে নাক-কাটার মতো সুখকর ব্যাপার বোধহয় আর কিছুই হত না।

আজকের মুদ্রাস্ফীতির বাজারে গণ্ডারের খড়্গের এক কিলোর যা দাম, তা একজন জঙ্গলের ও গ্রামের পুব আফ্রিকান অধিবাসীর দু' বছরের রোজগারের সমান। দশ কিলো হাতির দাঁতের যা দাম, তা তাদের তিন বছরের রোজগারের সমান। তাই গরিব লোকগুলোকে এই পথে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে বড় বড় রুই-কাতলা ব্যবসাদারদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বন-সংরক্ষণ, ইকোলজি, পরিবেশতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে একজন গড়পড়তা ভারতীয় যতখানি জ্ঞানহীন, আফ্রিকানরাও তাই। তাই ভারতেও যা ঘটছে, ও দেশেও তাই। তবে আফ্রিকা ভারতের চেয়ে অনেক বড় ও অনেক ছড়ানো দেশ বলে এবং জনসংখ্যার চাপ সেখানে কম বলে ও-দেশের ব্যাপার ঘটছে অনেক বড় মাপে।

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) সই হয়েছে উনিশশো তিয়াত্তর সনে। ওয়াশিংটনে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে। চোরা-শিকারের সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করার জন্যে। আমদানি যারা করে সেই সব দেশ এই চুক্তি মেনে নিয়েছে, কিন্তু সাব্‌-সাহারা কন্টিনেন্টাল আফ্রিকান দেশগুলোর পঁয়তাল্লিশটির মধ্যে মাত্র পনেরোটি দেশ এই চুক্তি মেনেছে, বাকিরা মানেনি। ফলে, জায়ের এবং তান্‌জানিয়াতে চোরা-শিকার করা হাতির দাঁত বুরুণ্ডি থেকে বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌সে যাচ্ছে। ব্রাসেল্‌স থেকে আবার রপ্তানি করার পারমিট নিয়ে যেখানে খুশি তা চালান করা হচ্ছে। রপ্তানির কাগজপত্র জালও করা হয় ঘুষঘাষ দিয়ে। অতএব ঋজুদা সব জেনেশুনেও জ্ঞানপাপীর মতো নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এই এত বড় জোট-বাঁধা পৃথিবীব্যাপী চক্রের সঙ্গে লড়ে নিজে মরতে আর আমাদেরও মারতে কেন নিয়ে এল, তা একমাত্র সে-ই জানে।

আমি ভেবেছিলাম, ভুষুণ্ডা ভার্সাস রুদ্রর এক রাউণ্ড টিসুম্-টিসুম্ টিক্-চুঁই হয়ে যাবে। অ্যামেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবির মতো। পরীক্ষা হবে, হু ক্যান্ ড্র ফার্স্ট ? ভুষুণ্ডার হাত তার কোমরে পৌঁছবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি টিক্-চুঁই করে তার কদমছাঁট চুলের তেলতেলে পোড়া-কপাল ভেদ করে থাড় শব্দ করে পেছনের গাছে গিয়ে গেঁথে যাবে। না। এক্কেবারে অকারণে ঋজুদা একটা সহজ-সরল ব্যাপারকে এরকম ভয়ঙ্কর ও জটিল অপারেশান করে তুলল।

ফোনটা বাজল।

রিসিভার তুলতেই, ঋজুদার গলা।

"কী করেন বাহে ?"

এবার আবার পুব বাংলার ভাষা ছেড়ে উত্তর বাংলায় চলে গেছে। আমাকে বোকা পেয়েছে, ভেবেছে জবাব পাবে না ?

বললাম, "না করি কোনো।"

ঋজুদা হাসল। চমৎকৃত হয়ে। "বাঃ। অ্যাই তো চাই! কিপ্ ইট্ আপ। তোমার কম্‌রেডের অবস্থা তো খারাপ। খুবই খারাপ। সে খোঁজ রাখো ?"

"কেন ?"

"থুতুতে নাকি ইন্‌ফেক্‌শান ছিল। ওর মুখ নাকি জ্বলতে জ্বলতে লাল হয়ে গেছে। মুখখানা একেবারে সাঁতরাগাছির ওলের মতো করে আয়নার সামনে বসে আছে সে।"

"শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো নুনের সঙ্গে বেটে লাগাতে বলো। ভাল হয়ে যাবে। আমার কথা তো শুনলে না তুমি। আমার ঠাকুমা বলতেন, পথি নারী বিবর্জিতা।"

"এই এক টপিক্ আর নয়। আর্মিতে বলে যে, ভাল সৈন্য খারাপ সৈন্যের উপর যুদ্ধ-জেতা নির্ভর করে না। ইটস্ দ্য জেনারেল। জেনারেল যেমন, তেমনই হয় তার সৈন্যরা।"

"কে জেনারেল ?"

"বাঃ। জেনারেল জন এলেন, ভিক্‌টোরিয়া ক্রস, ও-বি-ই, অর্ডার অব মেরিট—এট্‌সেটরা, এট্‌সেটরা। জেনারেল, গুড নাইট স্যার। শাট্ ইওরসেল্ফ ইন্ ইওর রুম। ডোন্ট মুভ আউট। দরওয়াজা বন্ধ না করো, কোই আউন্দা হোয়েগা। তুস্‌সি ইনে অখে কিঁউ হো ?"

হাসলাম। বললাম, "সর্দার গুরিন্দর সিং, ডরিঁয়া কি বান্দা ?"

ঋজুদা হো হো করে হাসতে হাসতে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

"যত হাসি, তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।" আবার ঠাকুমার কথা মনে পড়ল আমার। সত্যি! এত হাসি ঋজুদার আসে কোত্থেকে ?

॥৬॥

পরদিন আমি আর তিতির হোটেল থেকে আর বেরোলাম না। ঋজুদার কথামতো বসে বসে ভাল করে তান্‌জানিয়া এবং বিশেষ করে রুআহা ন্যাশনাল পার্কের ম্যাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

ঋজুদা ব্রেকফাস্টের পরই বেরিয়ে গেছিল। এল প্রায় রাত সাড়ে নটার সময়। বলল, কাল ব্রেকফাস্টের পর আমরা রওয়ানা হব। কিন্তু হোটেল থেকে চেক-আউট্ করব না। যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে আরুশা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কাল থেকেই আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব শুরু হবে— এই ভাবনায় রোমাঞ্চিত হয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে, যার যার ঘরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আগে তিতির, তারপর ঋজুদা এবং সবশেষে আমি পনেরো মিনিটের ব্যবধানে হোটেল ছেড়ে বাইরে এলাম, যেন বেড়াতে বেরুচ্ছি বা শপিং-এ যাচ্ছি। তান্‌জানিয়ান মিরশ্যাম কোম্পানির সামনে আমরা আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছবার মিনিট দশেক পরেই ঋজুদা আজ একটা সাদা-রঙা ভোক্‌সওয়াগন কম্বি গাড়ি নিজে চালিয়ে এল। আমরা খদ্দের সেজে দোকানের ভিতরে মিরশ্যামের পাইপ, অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। তিতির সত্যি খদ্দের হয়ে গিয়ে একটা মিরশ্যামের পাইপ কিনল ঋজুদার জন্য। আর-একটা ওর বাবার জন্য।

বাইরে ঋজুদাকে দেখতে পেয়েই আমরা দাম-টাম মিটিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আবার মাকুউনির রাস্তায়। মাকুউনির মোড়ে যখন পৌঁছেছি এবং মোড় ছেড়ে ডান দিকের কাঁচা রাস্তায় ঢুকব তখন ঋজুদা বলল, "একটু পরেই একটা ব্যাপার ঘটবে, তোরা চম্‌কে যাস না যেন!"

গাড়ি ঋজুদাই চালাচ্ছিল।

কাঁচা রাস্তায় কিছুদূর যেতেই দেখি পথের পাশে একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে ওয়ানাবেরি সিগারেট টানছে, পরম নিশ্চিন্তিতে।

তিতির বলল, "রুদ্র, দ্যাখো।"

আমি আগেই দেখেছিলাম। ব্যাটার কোমরের কাছে বুশশার্টের নীচটা ফুলে ছিল। যন্ত্র বাঁধা আছে, সন্দেহ নেই। আমিও কোমরে হাত দিলাম। তিতির উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠায় ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুত একরকম চুঃ চুঃ শব্দ করতে লাগল। গ্রামের লোক হাঁসকে ধান দিয়ে যেভাবে ডাকে, তেমন করে। ওয়ানাবেরির দিকেই তাকাব না তিতিরের দিকে, বুঝে উঠতে পারলাম না।

ঋজুদা তিতিরকে বাঁ দিকের পেছনের দরজাটা খুলতে বলে ওয়ানাবেরিকে বলল, "জুউ হাপা। কারিবু!"

তিতির ড্যাব্‌ডাব্ করে তাকিয়ে থাকল। ওয়ানাবেরি এসে তিতিরের পাশে বসে বলল, "জাম্বো!"

আমরা বললাম, "সিজাম্বো।"

ঋজুদা ইংরেজিতে বলল, "তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এ আমাদের বন্ধু। এর নাম ডামু। ডামু মানে, তিতির হয়তো জানে; রক্ত। সোয়াহিলিতে।"

তিতির বলল, "ওর নাম তো ওয়ানাবেরি।"

ওয়ানাবেরি হাসল। বলল, "ওয়ানাবেরি! ওয়ানাকিরি!"

যেখানে পরশু আমরা প্লেনের জন্য থেমেছিলাম এবং লাঞ্চ খেয়েছিলাম, সে জায়গাটা এখনও দূরে আছে। তিতির বলল, "তোমার গল্পটা কিন্তু সেদিন পুরো বলোনি আমাদের। আজকে বলো।"

ওয়ানাবেরি হাসল।

"তোমার সিগারেটের বড় বদগন্ধ।" তিতির আবার বলল।

"আমার গায়ে যে আরও বেশি গন্ধ। সেজন্যই সিগারেট খেয়ে গায়ের গন্ধ চাপা দিই।"

ঋজুদা, কোনো গাড়ি আমাদের ফলো করছে কিনা দেখে নিয়ে বলল, "তুইই চালা রুদ্র। অনেকক্ষণ চালিয়েছি একটানা। একটু পাইপ খাই ওয়ানাবেরির পাশে বসে। তুই সামনে চলে যা তিতির। তোকে তুই করেই বলব আজ থেকে। যাকে বলে, তুই-তোকারি।"

আমি গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলাম। তিতির সামনে এল। আমার পাশে।

ঋজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল, "বলো ডামু, তোমার গল্প বলো, শোনাই যাক।"

ওয়ানাবেরি মেঘগর্জনের মতো গলায় শুরু করল, "অনেকদিন আগে, মৃত্যু একটি নাদুসনুদুস মোষের গলায় দড়ি বেঁধে মাঠে-প্রান্তরে হেঁটে যাচ্ছিল। এবং কাকে সে নিয়ে যাবে পরপারে তাই ভাবছিল। একজন খুউব গরিব লোক ছিল সেখানে। তার নাম ছিল বুইবুই। মানে, মাকড়সা।"

"আরেঃ। তুমি যখন হোটেলের শপিং-আর্কেডের পাশ থেকে বেরুলে সেদিন, একটা লোককে বুইবুই বলে ডাকলে না ? যে লোকটা গুলি খেয়ে মরল তার নামও কি বুইবুই ?" আমি শুধোলাম।

"হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ। তবে, সে অন্য বুইবুই।"

"হাঁটতে হাঁটতে মৃত্যুর সঙ্গে বুইবুই-এর দেখা হল। মৃত্যু বলল, এই মোষটা তুমি নিতে পারো, কিন্তু কেবল একটি শর্তে। শর্তটি হল এই যে, আজ থেকে এক বছর পরে আমি যখন ফিরে আসব তখন যদি তুমি আমার নাম ভুলে যাও তাহলে তখন কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। কোনো ওজর-আপত্তিই চলবে না। বুইবুই কতদিন খেতে পায় না, তার বউ-ছেলেও না-খেয়েই থাকে ; তাই সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। ভাবল, নাম মনে রাখা কী এমন কঠিন ব্যাপার ! নাদুসনুদুস মোষকে দড়ি ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে মোষটাকে কেটে কয়েকদিন ধরে জোর ভোজ লাগাল। বুইবুই তার স্ত্রী আর ছেলেকে বলল, তোমাদের একটা গান শেখাচ্ছি। রোজ এই গানটা গাইতে ভুলো না—ওয়ানাবেরি ! ওয়ানাকিরি !

"তারপর ছ'মাস যব আর ভুট্টা গুঁড়ো করতে করতে, গম থেকে খোসা ঝাড়তে ঝাড়তে, কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে, খেতে যব আর বজরার চাষ করতে করতে, মাটি থেকে মিষ্টি আলু খুঁড়তে খুঁড়তে সবসময় ঐ গানটিই গাইতে লাগল বুইবুইয়ের ঘরের মানুষেরা।

"সাত মাসে এসে ওয়ানাবেরি কথাটাই শুধু মনে থাকল তাদের। ওয়ানাকিরি কথাটি ভুলেই গেল।

"আট মাসে সে কথাটিও আর মনে থাকল না। থাকল শুধু সুরটি। আর ন' মাসের মাথায় গান এবং সুর দুই-ই ধুলোর মধ্যে ধুলোর মতোই মিশে গেল। কিন্তু অবশেষে একদিন যেমন সব বছরই শেষ হয়, সেই বছরও শেষ হল। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যখন শেষ হল, শেষ প্রহরে, শেষ মুহূর্তে কে যেন বুইবুইয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিল।

"বুইবুই চেঁচিয়ে বলল, কে রে ! কে ?

"আমি ! মৃত্যু ! আমার নাম কি মনে আছে তোমার ?

"এক সেকেণ্ড। একটু দাঁড়াও। আমি ভাঁড়ারের মধ্যে তোমার নামটি লুকিয়ে রেখেছি। নিয়ে আসছি এখুনি। একটু সময় দাও। দৌড়ে সে বৌয়ের কাছে গিয়ে বলল, সেই গানটা ? গানটা মনে আছে তোমার ?

"বৌ বলল, আছে। ডিন্‌ডিন্—ডিন্‌গুনা।

"বুইবুই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফিরে এসে বলল, তোমার নাম তো ডিন্‌ডিন-ডিন্‌গুনা।

"তাই-ই বুঝি ! আমার নাম তাই ! চলো আমার সঙ্গে'। বলেই, বুইবুইকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলল মৃত্যু। তার বৌ কাঁদতে লাগল। মৃত্যু বুইবুইকে কিছুদূর নিয়ে যাবার পর তার ছেলে পিছন পিছন দৌড়ে এসে একটা গাছে চড়ে তার হাত দুখানি মুখের কাছে জড়ো করে বলল, বাবা, ওয়ানাবেরি ! ওয়ানাকিরি ! ওয়ানাবেরি ! ওয়ানাকিরি !

"ভয়ে আধমরা বুইবুই বিড়বিড় করে উঠল, ওয়ানাবেরি, ওয়ানাকিরি !"

"মৃত্যু বুইবুইকে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল দিগন্তের কুয়াশায়।"

একটু চুপ করে থেকে ডামু বলল, "আসলে সব ভাল ছেলেরাই জানে যে, বাবা মরে গেলে, বাবার ধার তাকেই সব শুধতে হবে। তাই বাবাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, ততই ভাল।"

গল্প শেষ করে ডামু আরেকটা সিগারেট ধরাল।

তিতির বলল, "এটা আফ্রিকার কোন উপজাতিদের মিথ্? মাসাইদের?"

"না। হুসাদের।"

ততক্ষণে আমরা পরশুর জায়গায় পৌঁছে গেছি। গাড়িটা পথ ছেড়ে ভিতরে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখলাম, ঋজুদা যেমন করে রেখেছিল। ঋজুদা ঘড়ি দেখে ট্রাভেলার্স চেকের তাড়া বের করে খসখস করে চেক সই করল। তারপর ডামুকে বলল, "আমরা চলে গেলে তুমি চেকটা ভাঙাবে। গাড়ি ফেরত দেবে না। রাস্তার মধ্যে গাড়ি রেখে গাড়ির মধ্যে গাড়ি ভাড়ার টাকা একটা খামে ভরে রেখে দেবে। গাড়িটা এমন জায়গায় রাখবে যে, কার-রেন্টাল কোম্পানির খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধা যাতে না হয়। তারপর হোটেলে একটা ফোন করে বলবে যে, আমরা লেক মানিয়ারাতে বেড়াতে গেছি। কাল সন্ধে নাগাদ ফিরে আসব। ঘর ছাড়ছি না কেউই। পরশু দিন ডাকে ওদের টাকা পাঠিয়ে দেবে আরুশা থেকেই। কত বিল হয়েছে ফোনে জেনে নিয়ে। তোমার পরিচয় দেবে না যে, এ-কথা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। তারপর কী করতে হবে তা তো সব তোমার জানাই আছে।"

"হ্যাঁ।" ডামু বলল।

"এবার আমাদের নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। প্লেনটা আর গাড়িটা কেউ একসঙ্গে না দেখলেই ভাল। আমরা একটুও দেরি করব না। প্লেন ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ব এবং সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হব।"

ডামু আমাদের 'ওল দ্য বেস্ট' জানিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, "একে আবার কোত্থেকে জোটালে ঋজুদা? আরেকজন ভুষুণ্ডা হবে না তো এ?"

"আশা করছি, হবে না। এ ছাড়া আর কী বলা যায়? ও এক সময় টর্নাডোর দলে ছিল। এই সবই করত। অনেক মানুষ, এমন কী গেম-ওয়ার্ডেনও খুন করেছে। কিন্তু এ বছরের গোড়াতে ওর স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে সাত দিনের মধ্যে ইয়ালো-ফিভারে মারা যাওয়াতে ওর মনে হয়েছে ও পাপ করেছে বলেই এমন সর্বনাশ হল। তাই ও পাপক্ষালন করতে চাইছে তাদের পুরো দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে। ওদের দলের জাল সারা পৃথিবীতে ছড়ানো। বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলারের কারবার করে এরা। বেলজিয়ান, অ্যামেরিকান, আফ্রিকার এশিয়ানস্ এবং অ্যামেরিকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে ওদের। ওরা মাল পাঠায় মাফিয়া আইল্যাণ্ডের উল্টোদিকের দরিয়া থেকে স্টিমারে করে সমুদ্রের চোরা পথে এবং কার্গো প্লেনে করে। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন যে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ওদের দলে শিকারি তো আছেই। তাদের কাছে অটোমেটিক ওয়েপন্স আছে। আর আছে স্নাইপারস্। যাদের হাতের টিপ অসাধারণ। দূর থেকে, গাছ বা পাহাড়ের আড়াল থেকে টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো লাইট রাইফেল দিয়ে তারা গেম-ওয়ার্ডেন, অন্য চোরা-শিকারের দলের লোক এবং তাদের শত্রুদের নিধন করে।"

ঋজুদার কথা শেষ হতে না হতেই দূরাগত প্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। দেখতে দেখতে একটি অতিকায় হলুদ পাখির মতো ছোট্ট প্লেনটি এসে নামল। তারপর ট্যাক্সিং করে এসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তেঁতুলগাছ থেকে কিছুটা দূরে থামল। দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দিল ওয়াটসন। আমরা উঠতেই দরজা বন্ধ করে টেক অফ করল।

ঋজুদা বলল, "ডোডোমাতে কি তেল নেবার দরকার হবে?"

ওয়াটসন বলল, "হবে। তোমাদের অন্য সব বন্দোবস্ত পাকা করা আছে। ডোডোমাতে মিনিট পনেরো-কুড়ি দাঁড়িয়ে চলে যাব ইরিঙ্গা। রাতটা যাতে হোটেলে তোমাদের থাকতে না হয় তারও বন্দোবস্ত করছি। তবে ইরিঙ্গা থেকে অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একটি মেয়েকে দিয়ে দেব। তিতির তো আছেই সঙ্গে, আর একজন মেয়ে থাকলে তোমাদের দলটাকে দেখে কারো সন্দেহ হবে না। যা সব জিনিসপত্র তোমাদের বইতে হবে, তাতে দুটি ল্যাণ্ডরোভার তোমাদের দরকার। আসলে ইবুগুজিওয়ার ফেরি পেরোবার সময় রুআহা পার্কের গার্ডকেই বলে দিতে পারতাম কিন্তু গার্ডদের মধ্যে অনেকেই টর্নাডোর দলের কাছ থেকে রীতিমত মাস-মাইনে পায়। ঘুষে ঘুষে ছয়লাপ করে রেখেছে। সেই ভয়েই তোমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেন্টলিই যেতে হবে এবং অফিসিয়ালি তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করা যাবে না।"

"মেয়েটি ফিরবে কী করে?"

"ওকে তোমরা সেম্বেতে নামিয়ে দেবে। ওখানে দুদিন থেকে ও অন্য একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে ফিরে আসবে। ও সেম্বেতে সকলকে বলবে যে, তোমরা রুআহাতে থাকবে না, জিওগ্রাফিকাল এক্সপিডিশানে এসেছ, রাঙ্গোয়া ন্যাশনাল পার্কে চলে যাবে। সেখান থেকে লেক ট্যাঙ্গানিকা।"

ইরিঙ্গার শহরগুলিতে একটি ছোট্ট বাংলোয় রাতটা কাটিয়ে দাঁড়কাকদেরও ঘুম ভাঙার আগে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আফ্রিকান মেয়েটি আমরা রওয়ানা হবার মিনিট-দশেক আগে আমাদের বাংলাতে এসে পৌঁছল। সে পিকিং-এ (বেজিং) পড়াশুনা করেছে। এখন সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের সেরোনারাতে জুওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে। ওর গবেষণার বিষয় হচ্ছে উটপাখি। মেয়েটির নাম শাশা। বয়সে আমাদের চেয়ে বছর-দশেকের বড়। মিষ্টি দেখতে। কিন্তু চুলে কাঁচালঙ্কার মতো খুদে খুদে বিনুনি বানিয়েছে। ওই নাকি আফ্রিকান হেয়ার-স্টাইলের চূড়ান্ত। ধনেপাতা জোগাড় করা গেলে কয়েকগাছি কাঁচালঙ্কা কেটে নিয়ে ফুলকপি দিয়ে কই মাছ রান্না করে জম্পেশ করে খাওয়া যেত। এখন অনেকদিন এসব খাওয়া-দাওয়া স্বপ্নের ব্যাপার হয়েই রইবে। কী খাব, কোথায় থাকব এবং আমরাই কোনো বন্যপ্রাণী অথবা চোরা-শিকারিদের খাদ্য হব কি না তা ভগবানই জানেন।

ইরিঙ্গা থেকে ইডাডি বলে একটা ছোট্ট জায়গায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন পুবের আকাশে লালের ছটা লাগল। এখন কলকাতায় হয়তো রাত এগারোটা-বারোটা। একটা কফির দোকান সবে খুলেছিল। কফি খেলাম আমরা এক কাপ করে। ঋজুদা একটি ল্যাণ্ডরোভার চালাচ্ছে। তিতির ঋজুদার সঙ্গে। আমার সঙ্গে শাশা। শাশা নানান গল্প করতে করতে চলেছে। ওকে একবার চোরা-শিকারিরা ধরে নিয়ে গেছিল। সাতদিন ওদের খপ্পরে ছিল সে। অনেক অত্যাচারও করেছিল ওরা, তবে প্রাণে মারেনি। কী করে ওদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিল শাশা, তা নিয়ে একটি দুর্দান্ত বই লেখা যায়। তারপর থেকেই পৃথিবীর তাবৎ চোরা-শিকারিদের উপর জাতক্রোধ জন্মে গেছে শাশার। আমাকে বলছিল, "তোমরা যদি এই চক্র ভাঙতে পারো তাহলে প্রেসিডেন্ট নিয়েরে তোমাদের বিশেষ পুরস্কার দেবেন এবং তান্‌জানিয়ার সমস্ত প্রকৃতিপ্রেমী তোমাদের সংবর্ধনা দেবে। তবে, বড় বিপজ্জনক কাজে যাচ্ছ তোমরা। ভগবান তোমাদের সহায় হোন। আর কিছুই আমার বলার নেই।"

ইরিঙ্গা জায়গাটা পাহাড়ি। উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের বেশি। ইরিঙ্গা থেকে ক্রমাগত

পশ্চিমে চলেছি আমরা। ইডাডি ছাড়িয়ে এসে ঝকঝকে আলো-ভরা ভর-সকালে এবারে গ্রেট রুআহা নদীর সামনে এসে পড়লাম। এখানে ফেরি আছে। ইবগুজিয়াতে ফেরি করে আমাদের ল্যাণ্ডরোভারসমেত নদী পেরুলাম আমরা। পেরিয়েই রুআহা ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে পড়লাম। ইরিঙ্গা হচ্ছে আফ্রিকান হেহে উপজাতিদের মূল বাসস্থান। ইরিঙ্গা ছাড়ার পরই আমরা নামতে আরম্ভ করেছিলাম। এই জঙ্গলকে বলে 'মিওম্বো'। ঐ সব অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চাষ করেছে হেহেরা দেখলাম। নানারকম ফসল করে ওরা শিফ্‌টিং কাল্টিভেশান করে। আমাদের দেশে যেমন জুম্ চাষ হয় তেমন। মেইজ, সরঘাম, কাসাভা, কলা, নানারকম ডাল, তামাক ইত্যাদির চাষ আছে দেখেছিলাম পথে।

যে-ফেরিতে করে গাড়িসুদ্ধু নদী পেরুলাম আমরা, সেটা খুব মজার। আমাদের দেশেও অনেক জায়গায় ফেরিতে নদী পারাপার করেছি জিপসুদ্ধু, কিন্তু এমন ফেরি কোথাওই দেখিনি। ফেরিটা মাঝিরাই চালায় কিন্তু পাটাতনটা চুয়াল্লিশ গ্যালন তেলের ফাঁকা টিনের উপর বসানো। অদ্ভুত নৌকো। নদী পেরুনোর পর মাইল-চারেক গিয়েই সেম্বে। রুআহা ন্যাশনাল পার্কের হেড-কোয়ার্টার। নানা জায়গা থেকে পথ এসেছে সেম্বেতে। এখান থেকে গ্রেট রুআহা আর মাওয়াগুশি এবং এম্‌ডনিয়ার উপত্যকায় চলে গেছে সব কাঁচা রাস্তা। গ্রেট রুআহাতে সারা বছরই জল থাকে। কিন্তু এম্‌ডনিয়া আর মাওয়াগুশি শীতকালে শুকিয়ে যায়। তখন এ নদী দুটির বুকে জিপ বা ল্যাণ্ডরোভার চালিয়ে ঘোরাফেরা যায়। কখনও কখনও ফোর-হুইল ড্রাইভের জন্যে স্পেশ্যাল গিয়ার চড়াতে হয় বটে, কিন্তু সাধারণত দরকার হয় না। এখন আফ্রিকাতে শীতকাল। তাই এই দুই বালি-নদীর মধ্যবর্তী কমব্রেটাম্-অ্যাকাসিয়ায় ভরা জঙ্গলের মধ্যে নানা বনপথ আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে এখন সারা জঙ্গলকে কাটাকুটি করে।

বনপথের যে-কোনো মোড়ে এসে দাঁড়ালেই আমার অ্যামেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার সেই লাইনগুলো বারবার মনে পড়ে। ঋজুদার মুখেই প্রথম শুনি কবিতাটি। ঋজুদার খুব প্রিয় কবিতা। 'দ্যা রোড নট টেকেন'।

> "I shall be telling this with a sigh
> Somewhere ages and ages hence
> Two roads diverged in a wood, and I—
> I took the one less travelled by,
> And that has made all the difference."

যে পথে অনেকে গেছে, মানুষের পায়ে পায়ে আর জিপের চাকার দাগে যে-পথ চিহ্নিত সে-পথে গিয়ে কী লাভ ? যে-পথ কেউ মাড়ায় না, যে-পথে চলতে গেলে পায়ের বা জিপের চাকার নীচে পথ-লুকিয়ে-রাখা শুকনো পাতা মচ্‌মচ্ শব্দ করে পাঁপড় ভাজার মতো গুঁড়ো হতে থাকে, যে-পথের বাঁকে বাঁকে বিস্ময়, বিপদ এবং কৌতূহল, সেই রকম পথেই তো যেতে হয়। জীবনেও যেমন দশজনের মাড়ানো পথে গিয়ে মজা নেই কোনো, জঙ্গলেও নেই।

সেম্বেতে শাশা নেমে গেল। এখনও আমরা ছদ্মবেশেই আছি। নিশ্চয়ই ঋজুদার নির্দেশে নিজেদের আসল চেহারায় ফিরে যেতে হবে আমাদের। তবে, কবে, কোথায়, কখন তা ঋজুদাই জানে।

শাশা নেমে যাবার আগে ওর সঙ্গে সেম্বেতে ব্রেকফাস্ট করলাম আমরা।

ঋজুদা বলল, "ভাল করে খেয়ে নে। এর পর কখন খাওয়া জুটবে আজকে তার ঠিক কী ?" ব্রেকফাস্ট সেরে, সেম্বে থেকে বেরিয়ে কিছুটা এসে ঋজুদা গাড়ি থামাল। আমি গাড়ি থেকে নেমে ঋজুদার গাড়ির কাছে গেলাম। ল্যাণ্ডরোভারের বনেটের উপর রুআহা ন্যাশনাল পার্কের ম্যাপটা খুলে মেলে ধরে ভুস্‌ভুস্ করে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাল করে ম্যাপটা দেখতে লাগল ঋজুদা। যখনই খুব মনোযোগের সঙ্গে কিছু করে, তখনই ভীষণ গম্ভীর দেখায় ঋজুদাকে। কপালের চামড়া কুঁচকে যায়। তখন দেখলে মনে হয় মানুষটা একেবারেই অচেনা। তিতিরও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। আমরা তিনজন ঝুঁকে পড়ে ম্যাপটা দেখছিলাম। ঋজুদা পকেট থেকে একটা মোটা হলুদ মার্কার পেন দিয়ে দাগ দিতে লাগল। বলল, "তোদের ম্যাপগুলো বের করে একভাবে দাগ দিয়ে রাখ।"

ম্যাপ-দাগানো শেষ হলে ঋজুদা স্টিয়ারিং-এ বসল। এবার বড় রাস্তা ছেড়ে একটা প্রায়-অব্যবহৃত পথে ঢুকে পড়ল সামনের ল্যাণ্ডরোভার।

ভারী চমৎকার লাগছিল। আফ্রিকার কালো মাটি, আকাশ-ছোঁয়া সব বড় বড় তেঁতুলগাছ। অ্যাকাসিয়া আল্‌বিডা। কিন্তু যত গভীরে যেতে লাগলাম ততই জঙ্গলের প্রকৃতি বদলাতে লাগল। তেঁতুল আর অ্যাকাসিয়া আল্‌বিডা, নদীর কাছাকাছি বেশি ছিল। এবার পথটা পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। বুঝলাম, আমরা কিমিবোওয়াটেঙ্গে পাহাড়ের দিকে চলেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়টা দেখা গেল বাঁ দিকে। দুপুর শেষ হয়-হয় এমন সময় আমরা এম্‌বাগি হয়ে মাওয়াগুশি বালি-নদীর পথ ছেড়ে আরো বাঁ দিকে একটি পথে ঢুকে এসে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যে, তার তিনদিকে তিনটি ছোট পাহাড়। সেই সব পাহাড়ের নাম ম্যাপে নেই। পাহাড়ের খোলের ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে কিছুক্ষণ এগিয়ে পেছিয়ে মনোমতো একটি জায়গা দেখে ঋজুদা বলল, "আজকের মতো এখানেই ক্যাম্প করা যাক।"

সেই অন্ধকার থাকতে স্টিয়ারিং-এ বসেছি। কোমর টনটন করছিল। যাত্রা শেষ হওয়ায় ভাল লাগল। ল্যাণ্ডরোভার দুটিকে এমনভাবে রাখলাম, যাতে ঐ অব্যবহৃত পথ থেকেও কারো চোখে না পড়ে।

তিতির শুধোল, "এই পাহাড়গুলোর নাম নেই ঋজুকাকা ?"

"নাই-ই বা থাকল। দিতে কতক্ষণ ? মধ্যের বড় পাহাড়টার নাম রাখা যাক নাইরোবি। আমাদের নাইরোবি-সর্দারের নামে। ডান দিকেরটার নাম টেডি মহম্মদ, আমাদের বন্ধুর নামে, যে গতবারে গুগুনোগুম্বারের দেশের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিল।

"আর তৃতীয়টা ? মানে বাঁ দিকেরটা ?"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "কী নাম দেওয়া যায় জেনারেল ?"

বললাম, "নাম দাও তিতির। অসীম সাহসী মেয়ে, বাঙালি মেয়েদের গর্ব তিতিরের নামে।"

"ফাইন্।" ঋজুদা বলল।

তিতির খুব খুশি হল। কিন্তু মুখ লাল করে বলল, "আহা !"

ঋজুদা বলল, "আর সময় নেই সময় নষ্ট করবার। তিতির আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে। কিন্তু তাঁবু খাটাতে জানে না। তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে ফেল। তারপর রাতের

খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেই হবে।”

আমি আর তিতির ল্যাণ্ডরোভারের পেছন খুলে একটা তাঁবু বের করছি, ঋজুদা বনেটের উপর উঠে বসে পাইপ খাচ্ছে আর চারদিক দেখছে মনোযোগ দিয়ে, এমন সময় হঠাৎ প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে হাতি ডেকে উঠল কাছ থেকেই।

ঋজুদা বলল, “খাইছে! এরা আবার কী কয় রে? যার জন্যে চুরি করি, সেই কয় চোর!”

আমি তাঁবু ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি রাইফেল বের করতে গেলাম।

ঋজুদা বলল, “তাঁবু খাটা। রাইফেল, গুলি এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম কোথায় কোন্ গাড়িতে রেখেছে তা সব চার্ট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে বের করতে হবে। কোনো ভয় নেই। খুদে হাতিয়ার তো যার যার পকেটেই আছে। ওরা বেশি তেড়িমেড়ি করলে তুই একটা গান শুনিয়ে দিস্। তোর বেসুরো গানের এফেক্ট ফোর-সেভেণ্টি ফাইভ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের গুলির চেয়েও জোরদার হবে। হাতিরা জানে যে আমরা হাতি মারতে আসিনি, হাতিমারাদের মারতে এসেছি। ওরা তোকে আর তিতিরকে গার্ড অব অনার দিল বৃংহণ করে। কিছুই বুঝিস না কেন?”

তিতিরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। স্বাভাবিক। এর আগে চিড়িয়াখানায় পোষা হাতির পিঠে চড়ে আইসক্রিম খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুনো হাতি এত কাছ থেকে এমন জঙ্গলে প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ বাজাবে তা ওর কাছে একটু উত্তেজনা তো হবেই।

একটা তাঁবু খাটানো হলে ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, “অন্যটা কোথায় লাগাব?”

ঋজুদা কী ভাবল। তারপর বলল, “আমার ইচ্ছে আছে, পাহাড়ের কোনো গুহাতে বা পাহাড়ের উপরের কোনো লুকোনো সমতল জায়গায় ডেরা করব। আজ আর বেশি ঝামেলা করিস না। প্রথম রাত। আমি গাড়িতেই থাকব। তোদের পাহারা দেব। তোরা দুজন তাঁবুতে শো। কালকে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে।”

হঠাৎ আমাদের পিছনের ঝোপে খরখর সরসর আওয়াজ হল। একই সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম আমরা। তাকাতেই দেখলাম, কী একটা কালো জানোয়ার গোঁয়ারের মতো ঝোপঝাড় ভেঙে দুদ্দাড় শব্দ করে দৌড়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে মুহূর্তের মধ্যে।

তিতির একদম চুপ। চলে-যাওয়া জন্তুটার পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল ও। আবার হাতি ডাকল প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—করে।

আমি বললাম, “ভাল দেখতে পেলাম না। কী ওটা ঋজুদা? ওয়ার্টহগ?”

“না। সেরেঙ্গেটিতে এই জানোয়ার দেখিসনি। যদিও এদের চেহারাও অনেকটা ওয়ার্টহগের মতো। তবে এদের ওয়ার্টগুলো অনেক ছোট। এদের বলে বুশ্-পিগ্। রুআহা ন্যাশনাল পার্কে এদের প্রায়ই দেখতে পাবি। এবারেও যদি আমাদের গাড়ি নিয়ে কেউ চম্পট দেয় বা আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় প্রাণ নিয়ে, তাহলে এরাই হবে প্রধান খাদ্য। ছোটখাটো চেহারার একটিকে দেখে ঘাড়ে একটি থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলের বা শটগানের বুলেট ঠুকে দিবি—ধপ্পাস্ করে পড়ে যাবে। ফার্স্ট ক্লাস বার-বি-কিউ হবে। তবে বেজায়গায় গুলি লাগলে এরাও আমাদের দিশি শুয়োরের মতো সাংঘাতিক বেপরোয়া হয়ে যায়। দিশি কি বিদেশি সব শুয়োরের জানই খুব শক্ত, কইমাছের প্রাণের মতো, আর ভীষণ একরোখা হয় এরা। জায়গামতো ধরতে না পারলে চিতা, লেপার্ড এবং সিংহকেও এরা বাবা-কাকার ডাক ছাড়িয়ে ছাড়ে।”

তিতির বলল, “ঋজুকাকু, তুমি যে বলেছিলে, উত্তর বাংলার বামনপোখ্‌রিতে আমাদের

প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, মানে লাল্‌জিকে এত ভাল করে চেনো, ওঁকে বলো না কেন আফ্রিকাতে এসে হাতি ধরতে ? এত হাতি এখানে !"

ঋজুদা আমার দিকে তাকাল। বলল, "তিতিরকে বল্‌।"

আমি বললাম, "জেনে রাখো, আফ্রিকান হাতি কখনও পোষ মানে না। কখনও না। আর চেহারায় ভারতীয় হাতিদের থেকে তারা বহুগুণ বড় হয়। হাতি ধরা হয় পোষা-হাতিদের সাহায্য নিয়ে আমাদের দেশে। এখানকার হাতি পোষই মানে না যখন, তখন হাতি ধরা হবে কী করে ? আর যদি খেদা বা অন্য কোনো উপায়েও ধরা হয় তাহলেও একটি হাতিও তো কাজে লাগবে না। বন্দিদশাতে রাখলে ওরা না খেয়ে মরে যাবে তবু ভাল, কিন্তু পোষ কখনোই মানবে না। এই আফ্রিকান হাতিদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় জানোয়ার খুব কম আছে।"

বেলা পড়ে আসছিল। শীতটা বাড়ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তিনদিকের পাহাড় আর পাহাড়তলির জঙ্গল আস্তে আস্তে রাতের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। আমি বললাম, "রাতে খাওয়া-দাওয়ার কী হবে ?"

ঋজুদা পকেট থেকে চার্ট বের করে বলল, "তোর গাড়িতে, পোর্টসাইডে, টিন্‌ড্‌ ফুড আছে। কয়েক ক্রেট্‌ মিনারাল ওয়াটারও আছে। যতদিন না আমরা জঙ্গলে জলের পাশে স্থায়ী আস্তানা গাড়ছি, ততদিন মিনারাল ওয়াটারই খেতে হবে জলের বদলে।"

তিতির বলল, "তোমার লিস্টে স্টোভ আছে ?"

"আছে।"

"চাল-ডাল ?"

"তাও আছে।"

"ঘি ?"

"ঘি !"

চার্টে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি বললাম, "খাঁটি গব্যঘৃত ? ভেবেছটা কি ? কিন্তু তোমার জন্যে দেখছি তাও আছে। মাত্র এক টিন। এক কেজি।"

"ব্যস্‌স্‌। তাহলে আমি খিচুড়ি বানিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।"

"প্রথম রাতেই আগুন জ্বালানো কি ঠিক হবে ? আমাদের বন্ধুরা যে ধারে-কাছেই নেই তা তো বলা যায় না ? আগুন যদি তারা দেখে ফেলে ?"

"ঠিক বলেছিস।" ঋজুদা বলল।

"নো-প্রবলেম। তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর পর্দা বন্ধ করে রেঁধে দেব স্টোভ জ্বালিয়ে। তাঁবুটা গরমও হবে তাতে।" তিতির উত্তর দিল।

ঋজুদা বলল, "দ্যাটস্‌ নট্‌ আ ব্যাড আইডিয়া। তবে ? দ্যাখ, রুদ্র ! তিতির না এলে তোকে এরকম জায়গায় এই কৃষ্ণ মহাদেশে কেউ মুগের ডালের খিচুড়ি খাওয়াতে পারত ?"

"সেটা ঠিক।" বলতেই হল আমায়। আফ্‌টার অল্‌ খিচুড়ি বলে কতা !

প্রথম রাতটা ভালয় ভালয়ই কাটার কথা ছিল। উৎপাতের মধ্যে একটা হাতির বাচ্চা আমাদের তাঁবুর খুব কাছে চলে এসেছিল। হঠাৎই আবার কী মনে করে ফিরেও গেল।

তিতির যখন তাঁবুর মধ্যেই স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি রাঁধছিল, আর সঙ্গে বেকন-ভাজা, টিন থেকে বের করে, দারুণ গন্ধও ছেড়েছিল খিচুড়ির, তখন আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম পেঁয়াজ ছাড়াতে ছাড়াতে। পেঁয়াজ ছাড়ানো কি ছেলেদের কাজ ! এমন

চোখ-জ্বালা করে না !

ঋজুদা পর্দা-ফেলা তাঁবুর বাইরে ল্যাণ্ডরোভারের বনেটের উপরই গায়ে ফারের কলার-ওয়ালা অলিভ গ্রিন জার্কিন পরে মাথায় বেড়ে টুপি চাপিয়ে আমাদের কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে টুকটাক কথা বলে আমাদের কথায় যোগ দিচ্ছিল।

"এই রুআহা ন্যাশনাল পার্কে হিপোপটেমাস্ নেই ঋজুদা ?"

ঋজুদাকে শুধোলাম।

"না থাকলেও বা ক্ষতি কী ? তুই যে পরিমাণ মোটা হচ্ছিস, জোলো জায়গা দেখে তোকে তাতে ছেড়ে দিলেই তিতিরের হিপ্পো দেখা হয়ে যাবে।"

"না। সিরিয়াসলি। বলো না ?"

"এখানে একটা জায়গা আছে, তার নাম ট্রেকিম্‌বোগা। সেখানে প্রায়ই ওদের দেখা যায়। সেখানে আমাদের যেতেও হবে। ট্রেকিম্‌বোগা কথাটার মানে হচ্ছে, হেহে ভাষায়—'মাংস রান্না'। মানেটা বুঝলি তো ? চোরা-শিকারিরা ওখানে রীতিমত মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসত আগে। হয়তো এখনও বসে। তাদের ক্যাম্প পড়ত এবং পট-হান্টিং করে তারা সেই মাংস রান্না করে খেত।"

"পট-হান্টিং মানে ?" তিতির বলল।

"খানার জন্য শিকারিরা যতটুকু শিকার করে তাকে পট-হান্টিং বলে। জঙ্গলে তো আর মাংস বা মুরগির দোকান থাকে না। কোনো জঙ্গলেই থাকে না। অবশ্য চোরা-শিকারিরা কি আর শুধুই পট-হান্টিং করত, তারা ম্যাসাকারই করত রীতিমত।"

হঠাৎ তিতির চিৎকার করে উঠল, "মারো, মারো, মারো, রুদ্র ; শিগগির মারো।"

কী মারব তা বুঝতে না পেরে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলাম আমি কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে।

তিতির বলল, "আঃ, দেখতে পাচ্ছ না ? কী তুমি ?"

তিতিরের মারো-মারো রব শুনে ঋজুদাও পর্দা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকেই, চট করে এগিয়ে গিয়ে পায়ের যোধপুরী বুট দিয়ে মাটির সঙ্গে থেঁতলে দিল দুটো কালো বিছেকে। পেল্লায় বিছে। সাধারণত আফ্রিকাতে যে লাল বিছে দেখেছি তাদের চেয়ে সাইজে এরা অনেক বড় এবং লাল মোটেই নয়। কালো। টর্চ ফেলে ভাল করে দেখি, তাঁবুর মধ্যে অসংখ্য গর্ত। ঠিক গোল নয়, কেমন লম্বাটে-লম্বাটে গর্ত।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, পাণ্ডানাস্ বিছে। তারপর বলল, "এদের বিষ কম। কামড়ালে রে মাম্মা, রে বাব্বা করতে হবে বটে, তবে প্রাণে নাও মরতে পারিস। আরো যদি বেরোয় তাহলে না মেরে সটান খিচুড়ির হাঁড়িতে চালান করে দিস তিতির। নয়তো, বেকনের সঙ্গে ভাজতেও পারিস। ফার্স্ট ক্লাস খেতে। কম্যাণ্ডো ট্রেনিং-এর সময় একবার আমি খেয়েছিলাম, তবে দেশে। দেশের জিনিসের স্বাদই আলাদা। বিছেও বড় মিষ্টি লেগেছিল। বুঝলি।"

আমরা যখন তাঁবুর মধ্যে খেতে বসেছি তখন তিনজনেই কান খাড়া রেখেছিলাম। যেহেতু ডান হাতের কর্ম করার সময় ডান হাতটি ব্যস্ত থাকবে, যার যার ছোট অস্ত্র কোমর থেকে খুলে পাশে শুইয়ে রেখেছিলাম, যাতে প্রয়োজন হলেই খিচুড়ি-মাখা হাতেই তুলে নেওয়া যায়।

খেতে খেতে তিতির বলল, "যাদের খোঁজে আমরা এসেছি, তারা ত্রিসীমানায় নেই। থাকলে এতক্ষণে তারা জেনে যেত।"

আমি বললাম, "ঋজুদা, তুমি অন্ধকারে বসে পাইপ টেনো না। বড় জ্যাঠাকে খেম্‌করনের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি স্নাইপার কেমন সিগারেটের আগুন দেখে কপালের মধ্যিখানে গুলি করে শেষ করে দিল, মনে নেই ?"

"হুঁ !"

হঠাৎ বাইরে কিসের আওয়াজ শোনা গেল। সকলে খাওয়া থামিয়ে কিসের আওয়াজ তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। আওয়াজটা গাছ থেকে আসছে। সঙ্গে ভয়ার্ত পাখির কিচিরমিচির। অনেক পাখির গলা একসঙ্গে। অথচ চিতা বা লেপার্ড গাছে চড়লে এর চেয়ে ভারী হত আওয়াজটা। ঋজুদা একটুক্ষণ উৎকীর্ণ হয়ে থেকে বলল, "খা, খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। দারুণ রেঁধেছে কিন্তু তিতির। যাই-ই বলিস্।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আওয়াজটা কিসের ঋজুকাকা ?"

ঋজুদা খিচুড়ি গিলে বলল, "দ্যাখ, বাঁদরমাত্রই বাঁদরামো করে। কিন্তু এই বাঁদরগুলো শুধু বাঁদরই নয়, রীতিমত ত্যাঁদোড়। এই ধোঁয়াটে-ধূসর রঙের আফ্রিকান বাঁদরগুলোর নাম ভার্‌ভেট। অথবা গ্রিভেট্। এদের জুওলজিক্যাল নাম হচ্ছে, সার্কোপিথেকাস্ অ্যাথিওপস্। সোয়াহিলি নাম, টুম্বুলি। শব্দ শুনে মনে হল ত্যাঁদোড় বাঁদর দুটো গাছে উঠে পাখিদের ডিম খাবার মতলব করছিল।"

"কী পাখি ?" আমি শুধোলাম।

"সে কী রে রুদ্র ! ডাক শুনেও চিনতে পারলি না ? স্টার্লিং। সেরেঙ্গেটিতে এত শুনেছিস।"

ঠিক তো ! মনে পড়ল আমার। তিতিরকে বললাম, "পুব-আফ্রিকায় কত রকমের স্টার্লিং পাখি আছে জানো তিতির ? সাঁইত্রিশ রকমের। তার মধ্যে এই রুআহাতে অবশ্য দু' রকমই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।"

"সুপার্ব আর অ্যাশি।" ঋজুদা যোগ করল।

তিতির বলল, "এই স-ম-স্ত এলাকা আগে হেহেদের ছিল ? ওদের দেশ কেড়ে নিল কারা ?"

"জার্মানরা। আবার কারা ? পুরো পুব-আফ্রিকার নামই তো ছিল আগে জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা। এখন যেখানে রুআহা ন্যাশনাল পার্ক, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পার্ককেই বলা হত সাবা ন্যাশনাল পার্ক। জার্মানরাই করে গেছিল। কিন্তু তারও আগে আঠারোশো আটানব্বুই সনে হেহেদের বিখ্যাত সর্দার মকাওয়ায়ার সঙ্গে জোর যুদ্ধ হয়েছিল জার্মানদের। জার্মানদের কাছে হেহেদের তুলনাতে অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সুতরাং তারাই জিতেছিল। এখন তান্‌জানিয়ান পার্লামেন্টের যিনি স্পিকার, তাঁর নাম হচ্ছে অ্যাডাম সাপি মকাওয়ায়া। তিনি হচ্ছেন সেই হেহে-সর্দারেরই নাতি। অ্যাডাম সাপি মকাওয়ায়া তান্‌জানিয়ান ন্যাশনাল পার্কস-এর জন্যে যে অছি পরিষদ বা ট্রাস্ট আছে, তার একজন ট্রাস্টিও।"

বাইরে হঠাৎ যেন শব্দ হল আবারও। ঋজুদা কান খাড়া করে শুনল। আমরাও। ঋজুদা হঠাৎ এঁটো আঙুল ঠোঁটে লাগিয়ে আমাদের চুপ করতে বলল। তাঁবুর গায়ের চতুর্দিকে কারা যেন ভারী পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একবার তাঁবুর একটা দিক একটু দুলে উঠল। মনে হল তাঁবুটা এক্ষুনি আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়বে। ঋজুদা তাড়াতাড়ি তিতিরের নিভিয়ে-দেওয়া স্টোভটা জ্বালিয়ে হঠাৎ তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দু' হাতে স্টোভটা তুলে ধরে আমাদের ঘুটঘুটে অন্ধকারে এঁটো-হাতে সার-সার বিছের গর্তের উপর বসিয়ে

রেখে চলে গেল। বাংলায় বলতে লাগল, "ও গণেশ ! গণেশ বাবা। বাড়ি যা লক্ষ্মীটি। নইলে আমাদের সাহানিয়া দেবীকে নালিশ করে দেব। যা বাবা। বাবারা আমার। লক্ষ্মী মানিক আমার !"

আশ্চর্য। দেখতে দেখতে ওরা যেন সরে গেল। আরও কিছুক্ষণ বাইরে তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঋজুদা ফিরে এসে বলল, "নে তিতির, আবার গরম কর খিচুড়ি। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

তিতির শুধোল, "বাইরে কী এসেছিল ঋজুকাকা ?"

আমি বললাম, "কটা ছিল ?"

"হাতি। গোটা দশ-বারো। ভারী সভ্য-ভব্য দল।"

স্টোভের আলোতে দেখলাম তিতিরের মুখটা কালো হয়ে গেছে। হঠাৎ বাইরের অন্ধকার রাতকে খান্‌খান্ করে দিয়ে ইদোম উল্লাসে হাঃ-হুঃ-হুঃ-হাঃ হাঃ-হুঃ-হুঃ-হাঃ করে হায়না চিৎকার করে উঠল যেন তিতিরকে আরও বেশি ভয় পাওয়ানোর জন্যে।

বাহাদুরি করার অবশ্য কিছু নেই। আমাদের দেশের মতোই আফ্রিকান হায়নাদের ডাক রাতে যদি কেউ জঙ্গলের মধ্যে বসে শোনে তার ভয় না লেগে পারে না।

ভয় আমারও করছিল। কিন্তু সে কথা আর বলি ! হাসি-হাসি মুখ করে তিতিরকে বললাম, "দাও এবার। গরম হয়ে গেছে এতক্ষণে।"

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল হ্যাঁক হ্যাঁক হ্যাঁক করে ডাকা ধনেশ পাখিদের গলার স্বরে। তাঁবুর দরজা খুললাম। তিতিরের দিকে তাকিয়ে দেখি গুঁড়িসুঁড়ি মেরে অসহায়ের মতো শুয়ে আছে বেচারি স্লিপিং ব্যাগে। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। কপালের কাছে এক ফালি নরম রোদ এসে পড়েছে। ওকে না-উঠিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম। শয়ে-শয়ে স্টার্লিং তাদের ডানায় রোদ ঠিক্‌রিয়ে ওড়াউড়ি করে বেড়াচ্ছে। আরও কত পাখি। সকলের নাম কি জানি ? ঋজুদাকে দেখলাম না। স্কাউটিং করতে গেছে নিশ্চয়ই। জিপের ছাদ আর বনেটটা তখনও শিশিরে ভিজে আছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপ সেই সিক্ততা নিঃশেষে শুষে নেবে।

জিপের সামনে ঝোলানো ভিস্তির জলে মুখ ধুয়ে আমিও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে নিলাম। আমরা একে ছাগল বলি। জল ভরলে এগুলোকে ছাগল-ছাগলই মনে হয়, অনেক মানুষকে যেমন জল না-ভরেও ছাগল-ছাগল দেখায়, তেমনি। মুখ ধোব কী ? এত ঠাণ্ডা হয়ে ছিল জল যে, তা দিয়ে মুখচোখ ধুতেই চোখদুটো সদ্য খোসা ছাড়ানো লিচুর মতো ফ্যাকাসে-সাদা গোল্লু-গুল্লু হয়ে গেল আর সাধের মুখখানি একেবারে আফ্রিকার রিলিফ ম্যাপের চেহারা নিল। জিপের আয়নায় নিজেকে দেখেই এত মন খারাপ হয়ে গেল যে, বলার নয়।

এই ধনেশ পাখিগুলো গাছের গর্তে এবং বিশেষ করে বাওবাব গাছের ফোকরে বাসা বাঁধে। এদের সোয়াহিলি নাম, ঋজুদার কাছে শুনেছি, হণ্ডো-হণ্ডো। জুওলজিকাল নাম হচ্ছে, ভন ডার ডিকেন্‌স্ হর্নবিল। ধনেশের ইংরিজি নাম হর্নবিল। আমাদের দেশের জঙ্গলে দু'রকমের ধনেশ দেখেছি। ওড়িশার মহানদীর দু'পাশের জঙ্গলে, বিহারের সিংভূমের সারাণ্ডার জঙ্গলে—যাকে বলে দ্য ল্যাণ্ড অব সেভেন হান্ড্রেড হিলস্ এবং মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে। আমরা বলি বড়কি ধনেশ, ছোট্‌কি ধনেশ। গ্রেটার অ্যাণ্ড লেসার ইণ্ডিয়ান হর্নবিলস্। জার্মান পূর্ব-আফ্রিকার জার্মান সাহেব ভন ডার ডিকেনস্ বোধ হয় এই পাখি প্রথম দেখেন এখানে। ইংরেজদের যেমন লর্ড, জার্মানদের ভন্।

দু-একটা পাখি-টাখি কি এখনও অনাবিষ্কৃত নেই? থাকলে, ভন্ রুদ্র অথবা মাদমোয়াজেল্ তিতিরের নামে তাদের নামকরণ করা যেত। জার্মানরা কি সে সুযোগ দেবে আমাদের? এমন গুণী এবং পাগল জাত এরা যে, যেখানে গেছে সেখানকার সবকিছুকেই খুঁটিয়ে দেখে, চেখে, আবিষ্কার, পুনরাবিষ্কার করে রেখে গেছে। আমাদের জন্যে কোনো কিছুই রেখে যায়নি তারা, বাহবা নেওয়ার জন্যে।

হঠাৎ দেখি, একদল হল্‌দে-রঙা বেবুন সিংগল ফাইলে মার্চ করে আমার দিকেই আসছে। এমন হলুদ বেবুন যে হয়, তা কখনও জানতাম না। প্রথমে মনে হল জণ্ডিস্ হয়েছে বোধ হয়। লিভারের ন্যাবা রোগেই বেচারিদের এমন ন্যালাখ্যাপা অবস্থা। তারপরই মনে হল তাইই কি? এত বেবুনের একসঙ্গে জণ্ডিস হওয়াটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার।

আমি যখন তাদের স্বাস্থ্যচিন্তায় ভরপুর ঠিক তক্ষুনি লক্ষ করলাম যে, ওঁদের চোখমুখের চেহারা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। বে-পাড়ায় মস্তানি করতে আসা ছোকরার প্রতি পাড়ার ছেলেদের যেমন মনোভাব, বেবুনগুলোর মুখচোখের ভাব অনেকটা সেরকম। ব্যাপার বেগতিক দেখে আমি তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগলাম। আমার ভয় লেগেছে বুঝতে পেরে ন্যাবাধরা হলুদ বেলুনের মতো বেবুনগুলো যেন খুব মজা পেল। খিঁচিক্ চিঁচিক্ চিঁচিক্ খিঁচিক্ করে চেঁচাতে চেঁচাতে তারা আমার দিকে ধেয়ে এল।

মনে-মনে 'ও ঋজুদা গো! কোথায় গেলে গো! এত বড় শিকারিকে শেষে বাঁদরে খেলে গো!' বলে নিঃশব্দ ডাক ছাড়তে ছাড়তে প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে যাব এমন সময় তিতিরের সঙ্গে একেবারে হেড-অন্ কলিশান। তিতির কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে ঠেলে ভেতরে সরিয়ে তাঁবুর দরজা বন্ধ করলাম। ততক্ষণে ইয়ালো বেবুনের প্লেটুন এসে গেছে। তাঁবুর দরজা একটু ফাঁক করে আমি আর তিতির টিকিট না-কেটেই সার্কাস্ দেখতে লাগলাম।

চার-পাঁচজন করে সটান দাঁড়-করানো জিপ দুটোর মধ্যে ঢুকে পড়ল। সর্বনাশ! চোক্, সাইড লাইট এ-সবের সুইচ নিয়ে টানাটানিও করতে লাগল। স্টিয়ারিংটা ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। তারপর টাইট দেখে খিঁচিক্ করে আওয়াজ করে জিপের সামনের সিটে রাখা ঋজুদার পাইপটা একজন গম্ভীরসে তুলে নিল। নিয়ে, প্রথমে বাঁ পায়ের পাতা চুলকোল একটু, তারপর কালো রঙের কলা ভেবে খেতে গিয়েই মুখে পোড়া তামাক ঢুকে যাওয়াতে রেগেমেগে কটাং করে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডানহিলের পাইপ ফটাস্ করে ফেটে গেল। ভাঙা অংশটা বিড়ির মতো দু'বার ফুঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার তারা জিপ থেকে নেমে পড়ল। যে পাইপ খাচ্ছিল সেইই মনে হল পালের গোদা। সব পালের গোদাদের বোধহয় পাইপ খুবই পছন্দ, যেমন আমাদের পালের গোদারও!

তারা একদিক দিয়ে গেল, ঋজুদাও অন্যদিক দিয়ে এল। সাতসকালে এ কী বিপত্তি!

ঋজুদা বলল, "চল্ চল্। তাঁবু তোল। এক্ষুনি আমাদের যেতে হবে। এখান থেকে আধ মাইল দূরেই হাতির রাস্তা। ঐ রাস্তাতে পোচারদের যাতায়াতের চিহ্ন আছে। আজকের মধ্যেই আমরা একটা পাকাপোক্ত ক্যাম্প না করে ফেলতে পারলে একেবারে বোকার মতো ওদের হাতে পড়তে হবে।"

ঋজুদাকে তিতির বলল, "এগুলো কী বেবুন ঋজুকাকা? রুদ্র বলছিল ওদের নাকি জণ্ডিস হয়েছে?"

ডান্‌হিলের পাইপটার অমন দুর্গতি এবং তখনকার টেনশানের মধ্যেও ঋজুদা হেসে ফেলল।

বলল, "রুদ্রটাকে নিয়ে পারা যায় না। কী কল্পনা! ওরা ঐরকমই হয়। ওদের নামই ইয়ালো-বেবুন। সোয়াহিলি নাম হচ্ছে নিয়ানি। জুওলজিকাল নাম, পাপিও সাইনোসেকালাস্‌।'

"পাপী যে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।" তাঁবুর খোঁটা ওঠাতে ওঠাতে আমি বললাম।

সব গোছগাছ হয়ে গেলে ঋজুদা আর তিতির ঋজুদা যে জিপ চালাচ্ছিল তাতে উঠল। পেছনের জিপটাতে আমি।

"তুই আগে যা রুদ্র। দশ কিলোমিটার গিয়ে দাঁড়াবি।"

"কোন্‌ দিকে যাব? রাস্তা বলতে তো কিছু নেই কোনোদিকে।"

"কালকে যে পাহাড়টার নাম রাখলি তুই টেডি মহম্মদ, সেই দিকে যাবি আস্তে আস্তে, খানাখন্দ, কাঁটা-টাঁটা বাঁচিয়ে। খুব সাবধানে যাবি। পিস্তলটার হোলস্টার খুলে রাখিস, যাতে বের করতে সময় না লাগে।"

"ওক্কে!" বলে আমি জিপ্‌ স্টার্ট করে এগিয়ে গেলাম। বোধ হয় পঞ্চাশ গজও যাইনি, আমার জিপের আয়নায় দেখলাম তিতির ঋজুদার পাশে বসে তিড়িং করে লাফাচ্ছে। এমন জোরে লাফাচ্ছে যে, ওর মাথা ঠেকে যাচ্ছে জিপের ছাদে। আর ঋজুদা জিপ থামিয়ে দিয়ে হো-হো করে হাসছে।

ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট্‌ করতে হচ্ছে। এঞ্জিন বন্ধ করে জিপ থেকে নেমে তিতিরের দিকে গিয়ে বললাম, "কী হল? হলটা কী?"

"চুপ করো। অসভ্য!" বলল তিতির।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। এই অসভ্য কথাটা মেয়েরা যে কতরকম মানে করে ব্যবহার করে, তা ওরাই জানে। এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে, অসভ্য বলে ও আমার উপর অহেতুক রাগ দেখাল। রাগকে আবার অহেতুক বললে ওরা চটে যায়। অহেতুক রাগের আর-এক নাম হচ্ছে অভিমান। নাঃ, বাংলা ভাষাটা, বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের মুখে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

এমন সময় তিতির হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে নামল প্রায় আমার ঘাড়েই। অন্যদিক দিয়ে ঋজুদা। ঋজুদা তখনও হাসছিল। হাসি থামিয়ে আমাকে বলল, "রুদ্র, ড্যাশবোর্ডের পকেট থেকে ঝাড়ন বের করে তিতিরের সিটটা ভাল করে মুছে দে। তিতিরকেও একটা ঝাড়ন বের করে দে। বেচারি!"

ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝতে না-পেরে আমি বোকার মতো ঝাড়ন বের করলাম। একটা তিতিরকে দিলাম। অন্যটা দিয়ে তিতিরের সিটটা মুছতে লাগলাম। বিতিকিচ্ছিরি গন্ধ। একেবারে অন্নপ্রাশনের ভাত উগ্‌রে আসবে মনে হতে লাগল। তিতির দেখলাম ঝাড়নটি নিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল।

ঋজুদাকে ফিসফিস করে শুধোলাম, "ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার আইসক্রিম! এতক্ষণ আমার পাইপ ভেঙে দিয়ে গেছে বলে খুব আনন্দ করছিল ও, প্রথম ক্ষতিটার চোট আমার সম্পত্তির উপর দিয়েই গেল বলে, কিন্তু সিটে বসেই বলল, সিটের উপর এত শিশির পড়ল কী করে? তোমার সিটও কি ভেজা ঋজুকাকা?

"না তো ! আমি বললাম।"

"তবে ? আমার সিট ভিজে চুপচুপ করছে। ঈঃ, কী গন্ধ রে বাবা ! মাগো ! কী এসব সিটের উপর ?

"ডান হাতের আঙুল ভেজা সিটে একবার ছুঁইয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ নিলাম। ওকে শুধোলাম, বেবুনরা কি এই সিটেও বসেছিল ?

"তিতির বলল, হ্যাঁ। তিন-চারটে বসেছিল পাশাপাশি—প্যাসেঞ্জারদের মতো !"

"ওদের দোষ কী ? জঙ্গলে তো এমন সুন্দর বন্ধ-টন্ধ বাথরুম পায় না ওরা সচরাচর। তাও তোর ভাগ্য ভাল যে বড় কিছু....

"ম্যাগো ! ব্যাব্যাগো ! ওঃ মাই গড়—বলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল তিতির।"

ঋজুদা থামতেই আমিও বলে উঠলাম "ওয়াক্ থুঃ। তুমি আমাকে দিয়ে মোছালে ? ঈসস্ !"

"তুই তো মুছেই খালাস। তিতিরের কথা ভাব তো ! বেচারির পিঠ-পা সব একেবারে হলদে বেবুনের স্মৃতিবিজড়িত হয়ে গেছে !"

এমন সময় হঠাৎ 'কূঃ' করে সংক্ষিপ্ত চাপা একটা ডাক ভেসে এল আমাদের পেছন দিকের কোনো গাছ থেকে। বাঁ দিকে, আমাদের কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরের কোনো গাছের উপর থেকে 'কূঃ' বলে কে যেন সাড়াও দিল।

ঋজুদার মুখচোখের চেহারা পালটে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ঋজুদাও স্টিয়ারিং-এ বসে তিতির যেদিকে গেছে সেই দিকে জিপটা নিয়ে গেল। জিপ স্টার্ট করেই আমি আয়নায় দেখলাম যে তিতিরও দৌড়ে এসে উঠল ঋজুদার পাশে। যতখানি সাবধানে এবং যতখানি জোরে পারি চালাতে লাগলাম জিপ।

এবড়ো-খেবড়ো পথ। পথ মানে, জিপের চাকা যেখান দিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছি সেই ফালিটুকুই। সামনে নজর রাখছি, টেডি মহম্মদ পাহাড়টা যেন হারিয়ে না যায়। মাঝে মাঝেই গাছগাছালির আড়ালে পড়ে যাচ্ছে পাহাড়টা।

দু' কিলোমিটার মতো আসার পর বাঁ দিকে একটা শুকনো নদী পেলাম। জিপ নদীতে নামিয়ে দেব কি না ভাবছি, কারণ নদীরেখা বারবার চলে গেছে ঐ পাহাড়ের দিকেই। নদীতে নামিয়ে দিলে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। পেছন থেকে 'কূ' দিল কারা ? তাদের 'কূ' যে আমাদের 'কু' বয়ে আনবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

এখন পেছনে তাকালে কিমিবোওয়াটেঙ্গে পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ছে। সামনের বালি-নদীটা নিশ্চয়ই মাওয়াগুশি বালি-নদীর কোনো শাখা হবে।

দেখতে দেখতে ঋজুদাও এসে গেল। আমি আঙুল দিয়ে ইশারা করে শুধোলাম, নদীতে নামাব কিনা জিপ। ঋজুদা ইশারায় পরমিশান দিতেই স্পেশ্যাল গিয়ার চড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দিলাম। একেবারে অধঃপতন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' বইটি বড়দের বই হলেও, কায়দা করে মার লাইব্রেরি থেকে ম্যানেজ করে পড়ে ফেলেছিলাম। তাতে একটি জম্পেস্ ডায়ালগ আছে। সুশোভনকে নুটু মোক্তার বললেন, "ছিঃ ছিঃ তোমার এত বড় অধঃপতন ?" সুশোভন বললেন, "পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় নুটুদা, কে আর কবে উর্ধ্বলোকে পড়েছে বল ?"

তরতর্ করে জিপ চলতে লাগল। এখন আর কাঁটা-টাটার ভয় নেই। তবে টিউব যে

কখন পাংচার হবে তা টিউবই জানে। খারাপ মানুষ স্টিয়ারিং-এ বসলে ওরা জায়গা বুঝে পাংচার হয়। প্রত্যেক গাড়ির টিউবই মানুষ চেনে। সামনেই নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে, হঠাৎ। দূরের টেডি মহম্মদ পাহাড়টা আস্তে আস্তে কাছে আসছে। মনে হচ্ছে বেশ বড় বড় গুহা আছে পাহাড়টাতে। সকালের রোদে দূর থেকে তাদের উপর আলোছায়ার খেলা দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভাল ক্যামেরাম্যান বা আর্টিস্ট আমাদের সঙ্গে থাকলে এই আলোছায়ার খেলা নিয়ে এক আশ্চর্য কবিতা লিখতে পারতেন। ফোটোগ্রাফি বা ছবি সবই তো আলোছায়ারই খেলা। নদীর দু' পাশে আবার অন্ধকার-করা নিবিড় তেঁতুলগাছ। ঠাকুমার চেয়েও বয়সে কত বড় হবে এরা প্রত্যেকে। এদের পায়ে হাত দিয়ে **প্রণাম** করতে ইচ্ছে করে। যে-কোনো মহীরুহ দেখলেই মনে হয়, যেন ইতিহাসের সামনে, কথা-কওয়া অতীতের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। সকলের হয় কিনা জানি না। ঋজুদাই আমার সর্বনাশ করল। তার কাছ থেকে এমন এমন সব রোগের ছোঁয়াচ এল আমার ভিতরে যা এ-জীবনে কোনো ওষুধেই সারবে না আর।

এদিকে অনেক তালগাছও দেখছি। মা টবের মধ্যে নানারকম ক্যাকটাই করেন। ফুলের গাছের মতো সেগুলো বাইরের বাগানে না-রেখে বসবার ঘরে, বারান্দাতে রাখেন। এখানে একরকমের ক্যাকটাই দেখলাম। তাকে, ক্যাকটাই না বলে দ্য গ্রেট-গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার অব ওল্ ক্যাকটাই বলা ভাল। এই গাছগুলোর নাম ক্যান্‌ডালাব্রা। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন, ইউফোর্‌বিয়া ক্যানডালাব্রাম্। আফ্রিকার ইউফোরবিয়াই নতুন সভ্য পৃথিবীর ক্যাকটাই। গণ্ডাররা এর কাঁটা খেতে খুব ভালবাসে। বুদ্ধি মোটা না হলে কি আর অমন চেহারা হয়?

গণ্ডারের কথা ভাবতে ভাবতেই যেই নদীটার বাঁকে পৌঁছেছি এসে, অমনি দেখি, ঠিক সেই বাঁকের মুখেই নদীর বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বিশাল মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গণ্ডারিয়া। তাদের কাঁধে বসে আছে হলুদরঙা এবং লাল-ঠোঁট পোকা-খাওয়া পাখি। **অক্স-পেকার।**

জিপ দেখেই বদ্‌খত্ চিৎকার করে পাখিগুলো গণ্ডারদের পিঠ ছেড়ে উড়ে গেল। এবং গণ্ডার দুটো জিপটাকে আরেকটা সাংঘাতিক গণ্ডার ভেবে খপর্-খাপর্ আওয়াজ তুলে অত্যন্ত আন্‌কুথলি, আন্‌স্মার্টলি নদীর বুক ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেল। পেছনে চেয়ে দেখলাম, ঋজুদার জিপও আমার জিপের হাত-তিরিশেক-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তিতির জিপের মাথার পর্দার জানলা খুলে দাঁড়িয়ে উঠে অনিমেষে দেখছে। গণ্ডারের মতো কুৎসিত জানোয়ারের কুৎসিততম লেজ যে এত কী দেখবার আছে জানি না! পারেও তিতির!

আর একটু এগোলেই টেডি মহম্মদ পাহাড়ের নীচে পৌঁছে যাব। ঋজুদা ঠিক জায়গাই বেছেছে মনে হচ্ছে ক্যাম্পের জন্যে। পাহাড়টা ন্যাড়ামতো উপরে, কিন্তু গায়ে গাছগাছালি আছে নানারকম। আছে গুহার চারপাশেও। অথচ পাহাড়ের নীচে বেশ কিছুদূর অবধি ফাঁকা। কারণটা কী তা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। হয়তো হাতিদের যাতায়াতের পথ আছে—গাছপালা সামান্য যা ছিল পথে, উপড়ে দিয়েছে তারা। যাইই হোক, পাহাড়ের কোনো গুহাতে যদি আস্তানা গাড়ি আমরা, তাহলে নীচটা ফাঁকা থাকাতে ঐ পাহাড়ের কাছে আমাদের চোখ এড়িয়ে কেউই আসতে পারবে না।

গণ্ডারগুলো দৌড়তে দৌড়তে আবার আমাদের দিকেই মুখ করে এগিয়ে আসছে।

আসলে ইচ্ছে করে হয়তো নয় ; নদীটা এমন ভাবে বাঁক নিয়েছে যে, ওদের পথের কাছাকাছি কেটে গেছে সে পথ। এইরকম গণ্ডার কিন্তু গুগুনোগুম্বারের দেশের সেরেঙ্গেটি প্লেইন্‌সে দেখিনি। এদের বলে 'ব্ল্যাক রাইনো'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারদের বলে 'হোয়াইট রাইনো'। আসলে ব্ল্যাক রাইনোর গায়ের রঙ কিন্তু কালো নয়, যেমন নয় হোয়াইট রাইনোর গায়ের রঙ সাদা। 'হোয়াইট' কথাটা 'ওয়াইড'-এর বিকৃতি। এখানকার গণ্ডারদের মুখ অনেক চওড়া হয় সেরেঙ্গেটির, মানে, গুগুনোগুম্বারের দেশের গণ্ডারদের চেয়ে। কেন চওড়া হয়, তা সহজে বোঝা যায়। কারণ এখানকার গণ্ডাররা চ'রে-বরে খায় গোরু-মোষের মতোই, অর্থাৎ যাদের ইংরিজিতে বল 'গ্রেজার'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারের জিরাফের বা অ্যান্টিলোপদের মতো কাঁটাগাছ বা পাতা-পুতা গাছ মুড়িয়ে খায়, যাদের ইংরিজিতে বলে 'ব্রাউজার'। গণ্ডাররা চোখে কম দেখে, ভট্‌কাই-এর দাদুর মতো, কিন্তু ঘ্রাণ এবং শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নাকের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও ভট্‌কাই-এর দাদু কাউকেই চিনতে পারেন না। কিন্তু পাশের বাড়ির মেয়ে বাণ্টি শীতের দুপুরে ধনেপাতা কাঁচালঙ্কার সঙ্গে কদ্‌বেল মেখে খেলে, অথবা ভট্‌কাই ছাদে বসে পরীক্ষার আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচের রিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ভল্যুমে শুনলেও যেমন তিনি ঠিক গন্ধ পান এবং শুনতে পান, গণ্ডারদের ব্যাপার-স্যাপারও অনেকটা তেমনি।

ভট্‌কাইটাকে খুবই মিস করছি। 'অ্যালবিনো'র রহস্য ভেদ করার সময়ও বেচারা আসতে পারল না। আর এবারে উড়ে এসে জুড়ে বসল তিতির। যেন বায়না নিয়ে যাত্রাগান করতে এলাম আমরা। ফিমেল ক্যারেকটার ছাড়া ত' জমবে না।

ওরে ওরে ভট্‌কাই,
আয় তোকে চট্‌কাই
জাপ্‌টিয়ে ধরি তোকে সোহাগে,
তিতির কাবাব হবে,
লিখন কে খণ্ডাবে ?
উইমেনস্ লিব্ ?
যত খট্‌কাই !

আহা ! বাল্মীকির মতোই রুদ্র রায়চৌধুরীর মুখ দিয়েও অকস্মাৎ কবিতা বেরিয়ে গেল। বন-পাহাড়ের এফেক্টই আলাদা ! যে-শাখায় ব'সে সেই শাখাই কাটছিলেন মহাকবি কালিদাস ; সেই শাখারই অন্যদিকে যে রুদ্র নামের কোনো মহাকপি বসে সেই মুহূর্তে লেজ নাচাচ্ছিল না এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই। কপির কবিতা বলে কতা ! এক্কেবারে জমজমাট, ফুলকপিরই মতো।

নদী পেরিয়ে যেখানে এলাম সেখানে পাড়টা কম নিচু এবং গণ্ডারদের যাতায়াতের কারণে প্রায় সমতলই হয়ে এসেছে। পেরিয়ে, টেডি মহম্মদ পাহাড়ের দিকে চলতে লাগলাম। মিনিট-কুড়ির মধ্যেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেলাম। ঋজুদা হর্ন না-দিয়ে জোরে চালিয়ে আমাকে ওভারটেক করে আগে আগে গিয়ে দুটি পাহাড়ের মাঝের সমতল জমির ফালিটুকুর মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে পিছনে আমিও পৌঁছলাম।

চমৎকার জায়গা। এখানে যদি আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্প করি তাহলে এক হেলিকপ্টার

অথবা প্লেন ছাড়া কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। আর পাহাড়ের মাঝামাঝি আমাদের মধ্যে যদি কেউ জঙ্গলের মধ্যে হাইড্-আউট বানিয়ে নিয়ে বাইনাকুলার নিয়ে পাহারা দেয় তাহলে তো কেউ আসতেই পারবে না কাছে। তবে, বিপদ হবে, পাহাড় টপকে কেউ যদি আসে। পাহাড়ের ওপাশে কী আছে ? কেমন জঙ্গল ? নদী আছে কি নেই ? তা পরে দেখতে হবে।

ঋজুদা জিপ থেকে নেমে কোমর থেকে হেভি পিস্তলটা খুলে সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিল। মুলিমালোঁয়ায় অ্যালবিনোর রহস্যভেদের পর থেকে এই পিস্তলটা খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে ঋজুদার। গুহা আছে পর পর তিনটে। একটা বড়। দুটো ছোটো। ঋজুদার পিছন পিছন আমরাও এগোতে লাগলাম পিস্তল খুলে নিয়ে।

বড় গুহাটার দিকে উঠছি এমন সময় বাজ-পড়ার মতো গদ্দাম্ আওয়াজ করে গুহার মধ্যে থেকে সিংহ ডাকল।

খাইছে !

বাজ-পড়ার আওয়াজের মতো ডেকেই, ন্যাদস্-ন্যাদস্ করে আরামে কোমর দুলিয়ে চলা পশুরাজ হঠাৎই বিদ্যুতের ঝল্কানির মতো অতর্কিতে ছুটে বাইরে এল। তার পেছনে পেছনে তিনটি সিংহী। একমুহূর্ত, ঋজুদা একাই নয়, আমরা তিনজনই তা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ঋজুদা, আমি এবং তিতির হাত সামনে লম্বা করে ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কী যে মনে করে, তাঁরাই তা জানেন, বেড়াল-পরিবারের কুলীনরা পোষা বেড়ালেরই মতো সদলবলে পাথর টপ্‌কে-টপ্‌কে নেমে পাহাড়ের খোল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিতির বলল, "একদম ছোটমাসির বেড়ালটার মতো। নেকু-পুষু-মুনু ! আমার মনে হচ্ছিল, কাছে গিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে ঘুঞ্চু-মুনু পুঞ্চু-মুনু করে আদর করে দি !"

আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছিল ওকে দেখে। ঘুঞ্চু-মুনু পুঞ্চু-মুনুরা যে কী জিনিস তা তো তিতিরসোনার জানা নেই ! উঃ ! অসীম ক্ষমতা ওর। দ্য গ্রাণ্ডমাদার অব ওল "নেকুপুষুমুনুজ"।

গুহাটার মুখে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে ঋজুদা ভাল করে দেখেশুনে নিল। তারপর ঢুকে পড়ল।

মনে মনে পূর্ণকাকার মতো বললাম, বোমশঙ্কর।

বেশ বড় গুহা। আমাদের জিনিসপত্র সমেত তিনজনের চমৎকার কুলিয়ে যাবে। ভাবা যায় না ! সেলামি নেই, এমনকী ভাড়াও নেই ; কলকাতার বাড়ির দালালরা যদি এ গুহার খোঁজ পেত ! কোথা থেকে যেন আলোও আসছে মনে হল। একটু এগোলেই বোঝা যাবে। এমন সময় আমার পেছন পেছন আসা তিতির 'ইরি বিবি রে, ইরি মিমি রে, কী ই-ই-ই-ই-দুর পচা গন্ধ রে বাব্বা—আ—আ—আ' বলে প্রায় কেঁদে উঠল।

ঋজুদা এবার ধমকে দিল, "স্টপ ইট তিতির।"

বিরক্ত গলায় বলল, "আমরা কি পিক্‌নিক্ করতে এসেছি বলে তোর ধারণা ?"

তিন-দিক-বন্ধ গুহার মধ্যে সিংহ আর সিংহীদের গায়ের এবং কতদিনের মলমূত্রের গা-গুলোনো বিটকেল গন্ধ, তার উপর আবার ঋজুদার ধমক। তিতির ই-ই-ই-ই করে কাঁদতে লাগল।

হাত না-নাড়িয়ে হাততালি দিলাম মনে মনে। ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

গুহার ভিতরটা সমুদ্র থেকে তোলা গোয়ার পোর্ট-আগুয়াড়া হোটেলের ছবির মতন।

হুবহু এক। সামনেটা গোলাকার—আগুয়াড়া ফোর্টেরই মতো— তারপর একটা হাত চলে গেছে বাঁয়ে, একটা ডাইনে। ডান এবং বাঁ দিক থেকে পাথরের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। অনেক ফাঁক-ফোক আছে। তবে ভরসার কথা, সেগুলো পাশে। বৃষ্টি পড়লে বা শিশির ঝরলে সরাসরি গায়ে পড়বে না। রোদও লাগবে না।

ঋজুদা বলল, "ফার্স্ট ক্লাস। ক্যান্ডালাব্রার ডাল কেটে নিয়ে রুদ্র ও তিতির এক্ষুনি খেজুরের ডালের মতো ঝাঁটা করে নিয়ে গুহাটাকে ভাল করে ঝাঁট দিয়ে বসবাসের যোগ্য করে তোল। আমাদের আজকের মধ্যেই এখানে সব খুলে-মেলে বসে কাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রস্তুতিতেই তো অনেক দিন চলে গেল। আর সময় নেই সময় নষ্ট করবার।"

গুহা থেকে বাইরে বেরোতে বেরোতে তিতির বলল, "সিংহ-সিংহিরা তো ফিরে আসবে সন্ধেবেলায়, তখন ?"

বললাম, "এ গুহা তখন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের দখলে। ফিরে এসে দেখুকই না।"

গুহার মুখে পৌঁছে গেছি প্রায় আমরা, হঠাৎ ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল। বলেই, আমাকে ও তিতিরকে দু'পাশে সরে যেতে বলে, নিজে ঐ দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে শুয়ে পড়ে পিস্তলটা সামনে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে লাগল।

এবারে আমরাও দেখতে পেলাম। একটা খাকি-রঙা জিপ এসে লেগেছে আমাদের জিপদুটোর একেবারে পাশে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ওরা ফলো করেই আসছিল এতক্ষণ। একজন হাতে রাইফেল নিয়ে গুহার মুখের দিকে নিশানা নিয়ে জিপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দুজন লোক, হাতে টুয়েলভ বোরের শটগান নিয়ে গুহার দিকে উঠে আসছে। ওদের মধ্যে একজন বেঁটেখাটো, গায়ে খাকি পোশাক, অন্যজন প্রায় উলঙ্গ, সাড়ে-ছ ফিট লম্বা, মিশকালো, মাথায় রঙিন পাখির পালক-গোঁজা আফ্রিকান। তার যা চেহারা, তাতে আমাকে আর তিতিরকে নিয়ে দু' হাতে লোফালুফি করতে পারে ইচ্ছে করলেই। খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। পথেই যে আমাদের অ্যামবুশ্ করেনি, এইই ঢের।

তিতির ফিসফিস করে বলল, "শ্যাল আই ?"

"নো। নো।" বলল ঋজুদা। গলা আরও নামিয়ে বলল, "এখানে শব্দ করা একেবারেই চলবে না।" তারপরই দু'হাত দিয়ে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ধরে জিপের কাছে দাঁড়ানো বুক-টানটান লোকটার বুকের দিকে প্রথমে নিশানা নিল। পিস্তলের পক্ষে বেশ বেশি দূরত্বেই আছে লোকটা। সে লোকটাও লম্বা-চওড়া, তবে খাকি পোশাক পরা।

কী হল বোঝার আগেই 'ব্লপ্' করে একটা আওয়াজ হল ঋজুদার পিস্তলের মাজ্‌ল্ থেকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল। পড়বার সময় তার রাইফেলের নলের ঠোকা লাগল জিপের বনেটের সঙ্গে। জোর শব্দ হল তাতে।

যে লোকদুটো গুহার মুখের দিকে আসছিল তারা নীচের লোকটার পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে, কোনো গুলির আওয়াজ না-পেয়ে এবং কাছে কাউকে না-দেখে, একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঐ লোকটার দিকে দৌড়ে যেতে লাগল।

বনপাহাড়ের সব লোকেরই ভূত-প্রেতের ভয় আছে। আমাদের দেশের লোকের যেমন আছে, আফ্রিকার লোকদেরও আছে। ঋজুদা, বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়েই, পিস্তলটাকে একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে নিয়ে পরপর ট্রিগার টানল.। ব্লপ, ব্লপ। পেছন থেকে

গুলি খেয়ে লোকদুটো যেন শূন্যে একটু লাফিয়ে উঠে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। ওদের মধ্যে ঐ প্রায়-উলঙ্গ লোকটি পড়ে গিয়েও বন্দুকটা তুলে ধরেছিল গুহার মুখের দিকে, কিন্তু তার বন্দুক-ধরা হাত নেতিয়ে গেল। হেভি পিস্তলের গুলি তার ফুসফুস ভেদ করে গেছিল। অন্য লোকটার নিশ্চয়ই হৃদয়ে গুলি লেগেছিল। সে এমনভাবে বাঁ হাতটা মুচড়ে পড়েছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন জন্মমুহূর্ত থেকেই ঘুমুচ্ছে অমন করে।

তিতির চাপা গলায় বলল, "আই! ঋজুকাকা! তুমি তো দেখছি জেমস্ বণ্ড! ইরিব্বাবা!"

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে বলল, "আমি হাত দিয়ে ইশারা না করলে তোরা বাইরে আসবি না।" বলেই, পিস্তলে তিনটি গুলি ভরে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গুহার মুখটা প্রায় আড়াল করে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল ঋজুদা। তার দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় বাইরের, তাইই দেখছিলাম।

মিনিট-দুই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঋজুদা বাঁ হাত নেড়ে ইশারা করল আমাদের। আমরা বাইরে যেতেই খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, "রুদ্র, অনেক কাজ এখন তোর। যা বলছি, চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোন।"

হাতে সময় বেশি ছিল না। ঋজুদা সংক্ষেপে যা বলল গুহা ছেড়ে নেমে আসতে আসতেই শুনে নিলাম সব। ওদেরই জিপে আমি আর ঋজুদা ধরাধরি করে রক্তাক্ত লোক তিনটিকে তুলে দিলাম। তিতিরও এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে কিন্তু অত রক্ত দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। করেই, সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল দু'হাতে মুখ ঢেকে।

আমি জানতাম এরকম হবে। ওর দোষ নেই। যখন শিকার করি তখনও ট্রফির ঘাড়ে বা বুকে দূর থেকে দারুণ মার্কসম্যানের মতো একখানা গুলি ঠুকে দিয়ে তাকে ধরাশায়ী হতে দেখে ভাল লাগে। নিজেকে নিজেই মনে মনে পিঠ চাপড়াই। কিন্তু তারপর শিকার করা জানোয়ারের কাছে যেতে বড়ই খারাপ লাগে। রক্ত বড় খারাপ দৃশ্য। কতবার মনে হয়েছে, প্রাণ নেওয়া তো সহজ, প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর এ জানোয়ার নয়, এরা যে মানুষ; যারা পাঁচ মিনিট আগেও আমার চেয়েও অনেক বেশি জীবন্ত ছিল।

এত কথা ভাবলাম যতক্ষণে, ততক্ষণে ওদের জিপের স্টিয়ারিং-এ বসে আমি সেই বালিনদীর কাছে চলে এসেছি। কিন্তু আমরা যেখান দিয়ে নদী পেরিয়েছি সেখান দিয়ে পার হলে চলবে না। আমাদের ক্যাম্প ওদের দলের অন্যদের চোখে পড়ে যাবে। তাই নদীর পাড় দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছি, নদীতে নামার মতো এবং উলটোদিকে ওঠার মতো জায়গা দেখলেই নামব। নদী পেরিয়ে গিয়ে তারপর জোর জিপ চালাতে হবে, দুটি কারণে। বেশি দেরি হলে জিপময় রক্ত ভরে গেলে, তা পথে চুঁইয়ে পড়বে। এবং রক্তের চিহ্ন রয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহগুলো সমেত জিপটা অনেক দূরে কায়দা করে ফেলে রেখে আমাকে পায়ে হেঁটেই একা একা পথ চিনে ফিরে আসতে হবে গুহায়। যদি জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাই! পথই তো নেই, তার পথ! সব জায়গাকেই পথ বলে মনে হয় এসব জায়গায়। যে-কোনো জঙ্গলেই।

জিপটা চালিয়ে মোটেই আরাম নেই। বোধহয় শক-অ্যাবসর্বার গেছে। সর্বক্ষণ ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করছে এবং পেছনে মরা মানুষগুলো সমেত যা-কিছু আছে সব কিছুই ঝাঁকাচ্ছে। নদীরেখাকে পাশে রেখে মাইল-দুয়েক গিয়ে একটা পথ পেলাম। একেবারে

ফার্স্ট ক্লাস। কলকাতার রেড রোডের মতো। হাতিদের যাতায়াতের পথ। হাতিদের যাতায়াতের পথ দেখেই তো পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এঞ্জিনিয়াররা পথ বানান।

নদী পেরিয়ে এলাম। একবার পিছনে তাকালাম। টেডি মহম্মদ পাহাড়টা ভাল করে দেখে নিলাম। নদী আর পাহাড়টার মাঝে মস্ত একটা বাওবাব গাছ আছে। ফেরার পথে এই গাছটাকে দেখেই নিশানা ঠিক করতে হবে। পূর্ণিমা চলে গেছে আরুশাতেই। চাঁদ উঠবে সেই অনেক রাতে। তারার আলো আর আমার তিন-ব্যাটারির টর্চই একমাত্র ভরসা। সামনে তাকালে জঙ্গলের মাথার উপরে দিগন্তে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। ঋজুদা বলেছিল, যে পথ ছেড়ে দিয়ে কাল আমরা এসেছি, সেই বড় পথের উপরে জিপটাকে রেখে দিয়ে আসতে। যাতে লোকগুলোর সঙ্গীরা ন্যাশানাল পার্কের লোকেরা তাদের দেখতে পায়। নইলে হায়নায় আর শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে এদের। শকুনও আছে। যদি এরা কাছাকাছি গাঁয়ের লোক হয় তাহলে কবর পাবে অন্তত। ঋজুদার তো বটেই, আমারও খারাপ লাগছিল ভীষণ। প্রথমেই তিন-তিনটি মানুষ খুন করতে হল। অথচ আমরা নিরুপায়। জঙ্গলের নিয়ম হচ্ছে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'। হয় মারো, নয় মরো। মাঝামাঝি রাস্তা এখানে কিছু খোলা নেই।

দু'পাশে ক্যাগুলাব্রা ঝোপ। বড় বড় কম্মিফোরা গাছ। একরকমের কম্মিফোরা আছে তাদের বলে কম্মিফোরা উগোজেন্সিস্। হেহেদের মতো গোগো বলে একরকমের আফ্রিকান উপজাতি আছে। তারা যেখানে থাকে সে অঞ্চলকে বলে উগোগো। ঐ অঞ্চলে এ জাতীয় কম্মিফোরা বেশি দেখা যায় বলে ঐ গাছের ঐরকম নাম হয়েছে। কম্মিফোরা ছাড়াও কম্‌ব্রেটাম, অ্যাকাসিয়া এবং অ্যাডানোসোনিয়া জাতের গাছ আছে। এই অ্যাডানোসোনিয়াই হল বাওবাব। যাদের আরেক নাম "আপসাইড-ডাউন ট্রিজ"। ব্রাকিস্টেগিয়া গাছেদের মতোই বছরের বেশির ভাগ সময়ই এরা পাতাহীন থাকে। কিন্তু বৃষ্টি নামার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টি আসছে। তখন পাতা ছাড়তে থাকে। বৃষ্টির জল যাতে সারা বছরের মতো ধরে রাখতে পারে। প্রকৃতি যে কত রহস্যই গোপন করে রাখেন তাঁর বুকের মধ্যে তার খোঁজ কজন রাখে?

ন্যাড়া-মুখের কতগুলো 'গো-অ্যাওয়ে' পাখি গাছের ডাল বেয়ে কাঠবিড়ালির মতো দৌড়ে উপরে উঠে গেল জিপটা দেখে। এদের গায়ের পালক হালকা ছাই আর সাদাটে-সবুজ রঙের হয়। এরা হচ্ছে টুরাকো জাতীয় পাখি। সামনেই একটা নাম-না-জানা গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটি ইল্যাণ্ড ছবির মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হরিণ নয়। অ্যান্টিলোপ। সোয়াহিলিতে এদের বলে পফু। লম্বাতে প্রায় ছ' ফিটের মতো হবে। ওজনেও কম করে সাত কুইন্টল হবে কম-সে-কম। জিপ দেখেও ইল্যাণ্ডটা পালাল না। একটু নড়েচড়ে উঠল শুধু। ওর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখি, কে বা কারা শটগান দিয়ে গুলি করে তার চোখদুটোকে খতম করে দিয়েছে। বুকেও একটা দগদগে ক্ষত। এক্ষুনি হয়তো পড়ে মরে যাবে। যারা এমন নৃশংস হতে পারে, তাদের মেরে ঋজুদা কিছুই অন্যায় করেনি। মনটা একটু হালকা লাগতে লাগল।

ঋজুদা প্রায়ই একটা কথা বলে। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের কথা। বলে, "ইফ ড্যু পে ইভিল্ উইথ গুড, হোয়াট ডু ড্যু পে গুড উইথ?" আমাদেরও এরকম কথা আছে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। যে শঠ, তার সঙ্গে শঠতা করলে দোষ নেই। যে মন্দ, তাকে মন্দ ব্যবহারই দিতে হয়। আর ভালকে ভাল।

ঘণ্টা-দুয়েক জিপ চালিয়ে আসছি। কেবলই ভয় হচ্ছে, রাস্তা হারালাম না তো! ফিরতে পারব তো পথ চিনে ? এদিকে সেই বড় রাস্তাও একেবারে বেপাত্তা।

জিপটা একটু আড়াল দেখে দাঁড় করালাম। পিঠের রাক-স্যাক থেকে ম্যাপটা বের করে দেখলাম। কম্পাসটা বের করে তার সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল আমি যেন অনেকই বেশি চলে এসেছি ইবিগুজিয়া নদীর দিকে। সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে তো নির্ঘাত ফাঁসিতে লটকে দেবে। আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার কারোই নেই।

এমন সময় হঠাৎ একটা জিপের শব্দ কানে এল।

হৃৎপিণ্ডর ধুকধুকানি থেমে গেল আমার। কম্পাস আর ম্যাপ উঠিয়ে নিয়ে একদৌড়ে গিয়ে আমি ঝোপঝাড়ের ভিতরে লুকিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে জিপের এঞ্জিনের শব্দটা জোর হল। বিজাতীয় ভাষায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে কারা যেন আসছে জিপ চালিয়ে। মড়ার মতো নিস্পন্দ হয়ে দেখতে লাগলাম আমি। লোকগুলো আফ্রিকান। ভাগ্য ভাল যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাখা জিপটাকে অথবা আমাকে ওরা কেউই নজর করল না। জিপটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তার শব্দ পর্যন্ত মরে গেল; পেট্রল-এঞ্জিনের উৎকট গন্ধ, জিপের চাকায়-ওড়া ধুলোর গন্ধ, সব কিছু বুনোফুলের গন্ধে আবার চাপা পড়ে গেল। আমি বেরিয়ে এসে জিপটা যেখান দিয়ে গেল, সেখানে কোনো পথ আছে কি না দেখতে গেলাম। সর্বনাশ! এইটেই ত' বড় পথটা! যে-কোনো মুহূর্তে এখানে ন্যাশনাল পার্কের গাড়ি অথবা বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যুরিস্টভর্তি ভোক্সওয়াগন কম্বি, অথবা ল্যাণ্ডরোভার অথবা জিপ এসে উপস্থিত হতে পারে।

ফিরে গিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকালাম। সেই দৈত্যর মতো দেখতে, মাথায় পালক-গোঁজা আফ্রিকান লোকটি মুখ হাঁ করে রয়েছে। আর একটা নীল জংলি মাছি তার মোটা কোলাব্যাঙের মতো ঠোঁটের উপর উড়ে উড়ে বসছে। হাত-পা ছড়িয়ে জমাট-বেঁধে যাওয়া মেটের মতো রঙের থকথকে রক্তের মধ্যে ওরা তিনজনে শুয়ে আছে। আমার বমি পেতে লাগল। তাড়তাড়ি স্টিয়ারিং-এ বসে জিপটা চালিয়ে বড় রাস্তার উপর এনে দাঁড় করালাম। তারপর রাক্-স্যাক্ থেকে কাগজ বের করে ভট্‌কাইয়ের প্রেজেণ্ট-করা উইলসন কোম্পানির একটা বলপয়েন্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে ইংরিজিতে লিখলাম: চোরা-শিকার যারা করবে তাদের এই শাস্তি। চোরাশিকারিরা সাবধান। নীচে লিখলাম: বুনো জানোয়ারদের দেবতা—টাঁড়বারো।

'টাঁড়বারো' আসলে আমাদের দলের কোড নেম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা, প্রেসিডেন্ট নিয়েরেই জানেন শুধু। এবং জানেন পুলিশের বড়কর্তা।

লেখা শেষ হতে বনেটের উপর একটি পাথর চাপা দিয়ে কাগজটিকে টানটান করে মেলে রেখে ওখান থেকে ভোঁ-দৌড় লাগালাম আমি। ওদের একজনেরও রাইফেল বা বন্দুক আমাকে নিতে মানা করেছিল ঋজুদা। কিন্তু এতখানি পথ আমাকে একা ফিরতে হবে। পথে ভুলে যাব কি না তারও কোনো ঠিক নেই। শুধুমাত্র পিস্তল সম্বল করে যেতেও মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু কী করব ? ঋজুদার কথা অমান্য করার সাহস ছিল না।

শেষবারের মতো একবার ওদের দিকে তাকিয়ে, কেওড়াতলায় যখন শব নিয়ে যায় হরিধ্বনি দিয়ে, তখন পথে পড়লে যেমন **নমস্কার** করি, তেমনই হাত তুলে মৃতদের শেষ নমস্কার জানিয়ে টিকিয়া-উড়ান দৌড়লাম। এখন জিপটা থেকে নিজেকে যত তাড়াতাড়ি

এবং যত দূরে সরিয়ে নিতে পারি, ততই মঙ্গল। তবে বড় রাস্তাতে চোরাশিকারিরা আসবে না কোনোমতেই। এলে আসবে গেম-ওয়ার্ডেন এবং ট্যুরিস্টরা। লোকগুলোকে না মেরে অন্তত একজনকেও ধরতে পারলে তাদের ঘাঁটি কোথায় তা জানা যেত। কিন্তু লোকগুলো যে আমাদের মারতেই এসেছিল। ইরিঙ্গা অথবা ইবিগুজিয়া থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে!

অনেকক্ষণ দৌড়ে যখন হাঁফিয়ে গেলাম তখন একটা গাছতলায় বসলাম একটু। ঘেমে-যাওয়া গায়ে শীতের হাওয়া লাগতে খুব আরাম লাগছিল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। মিনিট-পনেরো না জিরোলে চলবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত সব গা-শিউরানো ঘটনা ঘটে গেল যে বলার নয়। এদিকে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।

জঙ্গলের, বোধহয় পৃথিবীর সব জঙ্গলেরই, একটা নিজস্ব গায়ের গন্ধ আছে। সেই গন্ধ দিনে ও রাতের বিভিন্ন প্রহরে, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন। যার নাক আছে, সেইই শুধু তা জানে। বিভূতিভূষণ তাঁর বিভিন্ন লেখাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির শরৎকালের গায়ের গন্ধর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, শরতের "তিক্ত-কটু-গন্ধ"। কী দারুণ যে লিখেছেন। শরতের আসন্ন সন্ধ্যায় ভারতের সমস্ত বনের গা থেকেই ঐ রকম গন্ধ বেরোয়। শীত, নিঃশব্দে নেমে আসে কাঁধের দু'পাশে—এসে দু'কান মোচড়াতে থাকে। আর নাক ভরে যায় তিক্ত-কটু-গন্ধে। কোথায় বিভূতিভূষণের বারাকপুর আর ঘাটশিলা, ধারাগিরি আর ফুলডুংরি আর কোথায় এই কৃষ্ণ মহাদেশের রুআহা। অথচ কত মিল, অমিলের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে ছন্দোবদ্ধ হয়ে জড়িয়ে আছে একে অন্যকে। আমি তো এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম আফ্রিকাতে। বিভূতিভূষণ তো একবারও আসেননি। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ছেড়ে পূর্ণিয়া আর সিংভূমের সারাণ্ডার জঙ্গলেই ঘুরেছেন বারবার। কিন্তু লবটুলিয়া ছইহার, মহালিখাপুরের পাহাড়, সরস্বতী কুণ্ড, কুন্তী, রাজা দোবরু পান্না—এসব প্রাকৃতিক চিত্র ও চরিত্র সকলে কি আঁকতে পারেন? আর 'চাঁদের পাহাড়'? বাঘা-বাঘা লেখকরাও বারেবারে আফ্রিকাতে এসেও আর একখানি 'চাঁদের পাহাড়' কি লিখতে পারবেন?

'চাঁদের পাহাড়' বলে সত্যিই কিন্তু একটি পাহাড় আছে এখানে। রুয়েঞ্জোরি রেঞ্জে। পাহাড়টির ছবি দেখেছি আমি ঋজুদার কাছে। 'মাউনটেইন অব দ্য মুন'।

একদল স্টার্লিং পাখি ডাকছে, উড়ছে, বসছে। রোদ চমকাচ্ছে ওদের ডানায় ডানায়। শীতের দুপুরের নিবিড়, নিথর, ভারী গন্ধ চারিয়ে যাচ্ছে ওদের ওড়াউড়িতে। ভারী ভাল লাগছে।

কিন্তু আর সময় নেই। উঠে পড়ে, কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়শ্রেণীর দিকে একবার পিছন ফিরে দেখে, টেডি মহম্মদ পাহাড়টা কোন্ দিকে হবে আন্দাজ করে নিয়ে রওয়ানা হলাম। আধঘণ্টা পরে আবার ম্যাপ খুলে কম্পাস্ বের করে পথ শুধরে নিতে হবে।

আমাদের দলের কোড নেমও কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাস 'আরণ্যক' থেকে নেওয়া। "টাঁড়বারো" হচ্ছেন বুনো মোষদের দেবতা। যারা মোষ শিকার করতে আসে টাঁড়বারো তাদের ব্যর্থ করেন মোষদের শিকারীর বন্দুকের কাছে না যেতে দিয়ে। দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন বনপথে। অলগারনন ব্ল্যাকউডের বইয়েও ছোট্টবেলায় এরকম এক দেবতা বা আধিভৌতিক ব্যাপারের কথা পড়েছিলাম। একজন 'মুজ' শিকারী তাঁর কোপে পড়েছিলেন। আমাদের ঋজুদার বিশেষ পরিচিত লালজি—প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই, হাতিদের দেবী "সাহানিয়াকে" দু-তিনবার দেখেছেন নাকি। সেই দেখার কথা ওঁর সম্বন্ধে লেখা 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' বলে একটি বইয়ে উল্লেখও আছে। সাহানিয়া দেবী

অল্পবয়সী একটি সুন্দরী নেপালী মেয়ে। কথা বলেন না, হাসেন শুধু। ঋজুদা এখানে আসার কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের বামনপোখরি ও গোরুমারা স্যাংচুয়ারির কাছে মূর্তি নদীর পাশে লালজির এখনকার ক্যাম্পে গেছিলেন। লালজি নাকি ঋজুদাকে বলেছেন যে, ওঁর ধারণা ঐ নেপালী মেয়েটি রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'জঙ্গল বুক'-এর মংলুরই মতো, হাতিদের দ্বারা ছোট্টবেলা থেকে পালিত কোনো নেপালী মেয়ে। একবার যাব লালজিকে দেখতে ঋজুদার সঙ্গে, ইচ্ছে আছে।

আর সাহানিয়া দেবী ? দেখা কি দেবেন আমাকে ?

কম্পাস বের করে একবার দেখে নিলাম ঠিক যাচ্ছি কি না। যে-নদী চলে গেছে টেডি মহম্মদ পাহাড়ে, আমাদের ক্যাম্প- তার পাশ দিয়ে। নদীরেখা ধরে হেঁটে গেলে বাওবাব গাছটা এবং পাহাড়টা চোখে পড়বেই। আশা করি। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছতেই হবে। খুব জোরে হাঁটতে লাগলাম।

॥৭॥

এই গুহার ক্যাম্পে দু'দিন হল। দু' রাতও। আজ তৃতীয় রাত।

আমরা তিনজনেই রোজ সকালে উঠে তিন দিকে চলে যাই, আগ্নেয়াস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে। জলের বোতল এবং কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে। গলায় বাইনাকুলার ঝুলিয়ে। সারা দিন স্কাউটিং করে বিকেলের আগেই ফিরে আসি। তিনজনের নোটস্ মিলিয়ে দেখি সন্ধেবেলায়। ঋজুদা বলেছে যে, কাল সকালে একটা জিপ নিয়ে একা চলে যাবে। আমি আর তিতির থাকব এই গুহার ক্যাম্পে। তিতির এবং ঋজুদা দুজনেই এ দু'দিনে লক্ষ করেছে যে, সার-সার কুলিরা মাথায় এবং কাঁধে বোঝা নিয়ে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চলেছে। তিতির আগুনের ধোঁয়াও দেখেছে আরও উত্তরে। ওখানে নিশ্চয়ই পোচারদের ক্যাম্প আছে।

এই দু'দিনেও যখন কেউই আমাদের গুহার দিকে আসেনি, ওদের দলের তিনজন লোকের গুলিতে মৃত্যুর পরও, তখন ঋজুদার অনুমান এইই যে, চোরা-শিকারিরা আমরা যে এখানে আছি, সে-খবর পায়নি। এবং খুব সম্ভব পাবেও না।

ঋজুদা চলে গেলে, আমাকে আর তিতিরকে সবসময়ই একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে হবে। ঋজুদার অর্ডার।

কালকে বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা যখন তিনজনে তিন দিক থেকে ফিরে আসছি তখন আমরা তিনজনই আমাদের ফেরার পথে নানারকম জিনিস কুড়িয়ে পাই। জংলী জিনিস নয় কিন্তু। সবগুলি জিনিসই বোধহয় একজন শহুরে লোকেরই ব্যবহারের জিনিস। ব্যাপারটা রহস্যময়। দামি রুপোর ফ্লাস্ক্ পায় তিতির। তার উপরে এনগ্রেভ করা ছিল মালিকের নামের ইনিশিয়ালস্। ইংরেজিতে লেখা ছিল, এস· ডি·।

আমি পাই একটি ছুরি। আমেরিকান। রেমিংটন কোম্পানির। ফার্স্টক্লাস ছুরি। পাওয়ামাত্রই কোমরের বেল্টে ঝুলিয়েছি। তার হাতির দাঁতের বাঁটেও লেখা ছিল এস· ডি·।

আর ঋজুদা পেয়েছে প্যারিসের ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের দুর্মূল্য সুগন্ধি-মাখা একটি সাদা কিন্তু ভীষণ নোংরা রুমাল। তারও এক কোনায় হালকা নীল সুতোয় লেখা ছিল এস· ডি·।

রুপোর কাস্ক-এ কী একটা তরল পদার্থ ছিল। ঋজুদা গন্ধ শুঁকে তারপর একটু ঢেলে ফেলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে। আমরাও সেই লাল পানীয়র দিকে বোকার মতো তাকালে ঋজুদা নিজের মনেই বলেছিল, "আশ্চর্য !"

"কেন ? আশ্চর্য কেন ?"

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঋজুদা বলেছিল, "লণ্ডনের বেইজওয়াটার স্ট্রিটে একটি ছোট্ট অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁতে খেতে গেছিলাম আমরা এক নৃতত্ত্ববিদ বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে আলাপ হয়েছিল অন্য একজন নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে। তাঁর নাম আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, তিনি পুব-আফ্রিকার রিফট্-ভ্যালিতে ডঃ লিকি এবং মিসেস লিকির নেতৃত্বে কিছু কাজ করেছিলেন। কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয় ! কিন্তু মনে থাকার মতো তো সকলে নন। ভদ্রলোকের তরুণ বয়স, সুন্দর চেহারা এবং একটা অস্বাভাবিক অভ্যেসের কারণে ওঁকে মনে আছে এখনও। উনি কখনও জল খেতেন না। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। অনেক ইউরোপিয়ানই জল খান না। কিন্তু উনি স্প্যানিশ ওয়াইন এবং তাও একটিমাত্র বিশেষ ব্র্যাণ্ডের ওয়াইন খেতেন সব সময়। আমার বন্ধুই বলেছিলেন, অন্য কোনোরকম পানীয় তিনি ছুঁতেনই না। সেই পানীয়র নাম "বুল্স্ ব্লাড"। সে রাতে ওঁর অনুরোধে আমিও খেয়েছিলাম। ভাল, তবে দারুণ কিছু একটা নয়।"

"কী বললে ? ষাঁড়ের রক্ত ? বুল্স্ ব্লাড !"

তিতির বলেছিল।

"হ্যাঁ। এই অদ্ভুত নামের জন্যই পানীয়র কথাটা মনে আছে এতদিনের ব্যবধানেও। আমার বন্ধু ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তুমি তো একাই একটা ওয়াইন কোম্পানিকে বড়লোক করে দিলে হে।"

"তোমার সঙ্গে কি তাঁর পুব-আফ্রিকার চোরা-শিকারি বা অন্য কোনো ব্যাপার আলোচনা হয়েছিল ?"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঋজুদাকে।

"মনে করতে পারছি না। বোধহয় হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, লেক লাগাজার কাছে আমি সিলিকার মতো কিছু দেখেছিলাম এবং গোরোংগোরো ক্র্যাটারের একটি জায়গার মাটি দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, ওখানে হেমাটাইট বা ডোলোমাইট থাকলেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে পড়ছে—বলেছিলাম।"

"বললে কেন ? উনি তো ভূতত্ত্ববিদ নন। নৃতত্ত্ববিদ।"

"বলেছিলাম এমনিই গল্পে গল্পে। এও বলেছিলাম যে, কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার জায়েরেই খনিজ পদার্থ বেশি পাওয়া যায় বলে জানে লোক। আসলে আফ্রিকা এত বড় দেশ এবং এত কিছু লুকিয়ে আছে এর অনাবিষ্কৃত বিস্মৃত বুকের ভিতরে যে, একদিন আফ্রিকা পৃথিবীর সব চাইতে বেশি শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে। যদি তার আগেই পারমাণবিক বোমাতে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায়।

"বলেছিলাম বটে। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে মানুষটির কোনো ইন্টারেস্ট ছিল বলে মনে হয়নি।"

আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। কাল আমি ছোট্ট একটি বুশবাক্ মেরেছিলাম। ঋজুদার সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে। যতদিন সম্ভব আওয়াজ না করে পারা যায়।

সেটাকে স্মোক্ করে নিয়েছি শুকনো খড়-কুটো আর ক্যাক্টাই পুড়িয়ে। এখন প্রচণ্ড শীতও। পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে রেখে দিয়েছি। আমাদের কুক তিতির সুন্দর করে কেটে রোস্ট করে দেয়। স্যাণ্ডউইচও করে। কিন্তু নিজে খায় না। বলে, বোঁটকা গন্ধ।

গুহার মুখে, পাথরের আড়ালে বসে ছিলাম। যাতে আমার শিল্যুট দেখা না যায়। টুপি ও জার্কিন চাপিয়ে। পাশে লোডেড রাইফেল রেখে। প্রথম রাতটা আমার পাহারার পালা। শেষ রাতে ঋজুদা। তিতিরকে আপাতত রেহাই দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আদিগন্ত আকাশে তারারা চাঁদোয়া ধরেছে মাথার উপর। হাতির দল চলা শুরু করেছে। খুব আওয়াজ করে হাতিরা। যখন দলে থাকে। শুঁড় দিয়ে ডালপালা ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ তো আছেই। পেটের ভিতরেও নানারকম আওয়াজ হয়। অত বড় বড় পেট তো! যজ্ঞিবাড়ির উনুনের মতোই, তাতে সবসময়ই হজমের প্রক্রিয়া চলছে। অত বড় ব্যাপার, আওয়াজ তো একটু-আধটু হবেই। খল্‌বল্, ছল্‌ছল্ পকাত্—নানারকম মজার মজার আওয়াজ হয় ওদের পেটের মধ্যে।

আমাদের দেশের আকাশের তারাদের কিছু কিছু চিনি। আফ্রিকা তো অনেকই পশ্চিমে। তাই আমাদের দেশের আকাশে বছরের এই সময় যা দৃশ্য, আফ্রিকার আকাশের দৃশ্য তার চেয়ে একটু আলাদা। ঝকঝক করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। কত নাবিক, কত বিজ্ঞানী, কত পর্যটক এই তারামণ্ডলী দেখে পথ চিনে নিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম থেকে। দেখতে পাচ্ছি, পুবে মরীচি। পশ্চিমে ক্রতু। মধ্যে পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত ঋষির সাতজন স্ত্রী। তিতির জানত না। ওকে কাল বলেছিলাম সে-কথা। স্ত্রীদের নাম সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী এবং লজ্জা। সাত ঋষির স্ত্রীদের দেখা যায় কৃত্তিকাতে। কিন্তু খালি চোখে এবং সহজে অরুন্ধতীকে দেখা যায় না। কৃত্তিকাতে। কিন্তু খালি চোখে এবং সহজে অরুন্ধতীকে দেখা যায় না। কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতীই সবচেয়ে বিদুষী এবং খুব বড় তাপসী। অরুন্ধতী কৃত্তিকার মধ্যে না-থেকে রয়েছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলেই। তাঁর মহাপণ্ডিত তাপসশ্রেষ্ঠ স্বামী বশিষ্ঠের পাশে। একটি ছোট্ট তারা হয়ে।

আকাশের তারাদের নিয়ে কত সব সুন্দর সুন্দর গল্প আছে আমাদের দেশে। কী সুন্দর সুন্দর সব নাম তাদের। আমার ইংরেজি নামগুলো ভাল লাগে না। বাংলা নামগুলো সত্যিই ভারী সুন্দর। তন্ময় হয়ে তারা দেখতে দেখতে পটভূমির ভয়াবহতার কথা পুরোপুরি ভুলেই গেছিলাম। এই-ই আমাদের দোষ। এইজন্যেই মা ঠাট্টা করে বলেন কপি-রুদ্র। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মনে মনে কোথায় যে উধাও হয়ে যাই মাঝে মাঝে। নিজেই জানি না।

হঠাৎ নীচ থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় বলল, "হেই কিড্। ডোনট্ শুট। হোল্ড ইওর গান্।"

ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। ভয়ও পেলাম কম না।

কার এত দুঃসাহস যে, আমাকে কিড্ বলে? আর আমার চোখ এড়িয়ে গুহার নীচে মানুষটা এলই বা কী করে? ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাইফেল তুলেছিলাম আওয়াজটার দিকে। ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো টর্চের বোতাম টিপতে গিয়েও কী ভেবে টিপলাম না। বললাম, "হ্যান্ডস্ আপ্।"

লোক তেমনিই হেঁড়ে ডোন্ট-কেয়ার গলায় হেসে উঠল। অন্ধকারে পাহাড়ের গুহায় গুহায় তার হাসি খাঃ খাঃ খাঃ করে আমাকে অপমান করতে লাগল।

আবার বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ। উ্য লাউজি ফুল্।"

লোকটা তবুও হাসি থামাল না। বলল, "মাই হ্যাণ্ডস্ ফুল্। উ্য রিয়্যাল ফুল্।"

বলেই বলল, "টাঁড়বারো।"

দেখেছ্! কী ইডিয়ট, কোড ওয়ার্ড়টা আগে তো বলবে! যদি ইতিমধ্যে গুলি করে দিতাম!

"টাঁড়বারো" কথাটা অদ্ভুত শোনাল ওর মুখে—অনেকটা 'ঠাঁশবাডো' গোছের।

আমিও বললাম, "টাঁড়বারো।"

বলেই, রাইফেল নামিয়ে নিলাম।

ততক্ষণে ঋজুদা ও তিতিরও বাইরে এসে পড়েছে। ওরা বোধহয় এতক্ষণ আড়ালে থেকে কথাবার্তা শুনছিল।

তিতির লাফাতে লাফাতে নীচে নামতে লাগল আমার পেছন পেছন, সোয়াহিলিতে কী যেন বলতে বলতে, ডামুর প্রতি।

ডামু হেঁড়ে গলায় হেসে আমাদের দুজনের পিঠে দুই বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলল, "ওয়াটোটো ওআংগু ওআভাগো।" অর্থাৎ, 'ওরে আমার ছেলেমেয়েরা!'

খুঞ্চুমুনু, পুঞ্চুমুনুটা আর বলল না।

ঋজুদা গুহার মুখেই বসে পাইপ খাচ্ছিল। ওখান থেকে বলল, "ডামু, তোমার সঙ্গের বন্ধু এতক্ষণ কী খাচ্ছিল? জল?"

"হি ড্রিঙ্কস নো ওয়াটার। হি ড্রিঙ্কস সামথিং রাঙ্গি ইয়াকে নিয়েকুণ্ডু কামা ডামু।" মানে, যার রঙ রক্তের মতো লাল।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে রুপোর কাস্কটা হাতে নিয়ে দৌড়ে নেমে এল। ডামুর পাহাড়প্রমাণ শরীরের পিছনে যে অন্য একজন লোক হাত-পা পিছমোড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে তা আমরা কেউই এতক্ষণ লক্ষ করিনি। ঋজুদার সঙ্গে আমরাও তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকটার নাক কেটে রক্ত পড়ে শুকিয়ে কশ বেয়ে জমে ছিল। ডামু বোধহয় ঘুষিটুসি মেরেছে। আমাদের দেখেই লোকটা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। ঋজুদার দিকে বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "কী নাম আপনার?"

"সার্গেসিন ডব্‌সন।"

"হুঁ।"

লোকটি এবার হাসল ঋজুদার দিকে চেয়ে। ইংরেজিতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলে না মিস্টার বোস? সেই লণ্ডনের টিরুলার হট্ রেস্তোরাঁতে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, টম ম্যাক্আইভর-এর সঙ্গে। মনে পড়ে? চার-পাঁচ বছর আগের কথা।"

"মনে পড়ে। কিন্তু আপনি এখানে কী করছিলেন?"

"সেইই ত। সেই কথাই ত বলতে চাইছি। কিন্তু শুনছে কে? আপনিই তো বলেছিলেন লেক লাগাজাতে সিলিকা, রিফ্‌ট ভ্যালিতে হেমাটাইট্ ডলোমাইট্; সেই অবধি প্রফেসর লিকির সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে দিয়ে এইই করে বেড়াচ্ছি। হি-হি।"

লোকটা লাজেগোবরে অবস্থাতেও স্মার্ট হবার চেষ্টা করল। নাকে ঘুষি খাওয়াতে সব শব্দের আগে একটি করে চন্দ্রবিন্দু অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ হয়ে যাচ্ছিল।

ডামু হঠাৎ ওর পিছনে অসভ্যর মত এক লাথি মেরে লোকটাকে উল্টে ফেলে দিল। পড় তো পড় একেবারে নাক নীচে করেই। হাঁউমাউ করে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কেঁদে উঠল

লোকটা।

ঋজুদা বাংলায় বলল, "রুদ্র, ওকে খেতে দে। তবে ও এখানেই থাকবে। একটা ত্রিপল বের করে দে গাড়ি থেকে। বাঁধনও খুলবি না। ডামুকে বলছি, যেন আর মারধোর না করে।"

এই বলে ডামুকে নিয়ে গুহার দিকে উঠে গেল ঋজুদা।

আমি লোকটাকে সোজা করে বসালাম। তিতির গেল ওর জন্যে খাবার আনতে। আমি যখন জিপ থেকে ত্রিপল নামাচ্ছি তখন লক্ষ করলাম, লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে আছে। রোগা-পট্‌কা একজন জ্ঞানী-গুণী সাহেব। দেখে মনে হয়, প্রফেসর বা কবি। ঋজুদা এর উপর বিশেষ প্রসন্ন নয় বলে মনে হল। আমার কিন্তু মায়া হল ভদ্রলোককে দেখে। কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে ঋজুদার।

তিতির খাবার নিয়ে এসে বলল, "এইভাবে একটা মানুষ এই ঠাণ্ডায় বাইরে পড়ে থাকতে পারে ? তাছাড়া, সিংহ বা চিতা খেয়ে নেবে যে।"

"পাহারায় তো থাকবই কেউ না কেউ। তাছাড়া আমি কী করব ! ঋজুদার অর্ডার !"

তিতির জল দিয়ে ওর নাক মুছে দিল। তারপর খেতে দিল। গাণ্ডেপিণ্ডেই খেলেন মিস্টার ডব্‌সন। ধন্যবাদ দিলেন আমাদের। তারপর হাঁউমাউ করে মেয়েদের মতো কাঁদতে লাগলেন।

তিতির বলল, "ঋজুকাকা নিশ্চয়ই ভুল করছে। এ লোকটা খারাপ হতেই পারে না।"

আমারও ত' তাইই মনে হচ্ছে। কিন্তু ঋজুদাকে কে বলবে বল যে, সে ভুল করছে ? এদেশে মানুষ বড় হয়ে গেলে, তার নামডাক হয়ে গেলে, গর্বে বেঁকে গিয়ে তারা ভাবে যে, দে আর ওলওয়েজ রাইট, ইভ্‌ন্ হোয়েন দে আর রং।

ঋজুদা কিছুক্ষণ পর নেমে এল। ডামু বোধহয় জমিয়ে খাচ্ছে। ওর গল্প শুনতে হবে। কী কী হল পথে ? কেমন করে ও এল ? এই ডব্‌সনকেও বা জোটাল কেমন করে ?

তিতির বলল, "ঋজুকাকা, তুমি বোধহয় লোকটার প্রতি অন্যায় করছ !"

ঋজুদা বলল, "হয়তো করছি।"

আমার দিকে ফিরে বলল, "রুদ্রবাবুরও কি তাই-ই মত ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বুঝেছি। লোকটা যে সাহেব ! সাহেবি পোশাক পরনে। অক্সোনিয়ান্ অ্যাক্‌সেন্টে ইংরেজি বলে, সুতরাং সে কি আর চোর হতে পারে, না মিথ্যেবাদী ? এই সায়েব-ভীতি এবং প্রীতিতেই বাঙালি জাতটা গেল। যে-কেউ যদি চোস্ত ইংরেজি বলে বা কারো পিঠ চাপড়ায় অমনি তোরা তাকে পুজো করতে লেগে যাবি। আমি যা বলছি, তাই-ই হবে। আমার কথার উপর কথা নয় কোনো। ডব্‌সন্ এই বাইরেই পড়ে থাকবে।"

তিতির বলল, "সিংহে হায়নায় খেয়ে নেবে যে !"

"নিলে নেবে।"

"এ কী রে বাবা !"

তিতির স্বগতোক্তি করল।

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে ডবসনকে সায়েবদেরই মতো ইংরেজিতে বলল, "আপনার

কাগজপত্র আমি দেখলাম। আপনার জীবনের ভয় নেই কোনো। খেতে-টেতেও পাবেন। সকালে আধ ঘণ্টার জন্য আপনার দড়ি খুলে দেওয়া হবে। বিকেলেও তাই। পালাবার চেষ্টা করবেন না। পালাবার চেষ্টা করলেই মেরুদণ্ডে গুলি খাবেন।"

"মিস্টার বোস! আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না!! আপনার বন্ধু মিঃ ম্যাক্আইভরের আমি এত বন্ধু! আপনি এমন একজন চমৎকার লোক!"

ঋজুদা বলল, "আমি জানি যে, আমি চমৎকার লোক। আপনার সার্টিফিকেটের দরকার নেই আমার।"

তারপর বলল, "আমি ছেড়ে দিলে, ফিরে গিয়ে ফিল্মের সিনারিও লিখবেন। খুব নাটকীয়ভাবে কথা বলতে পারেন আপনি। কিন্তু জীবনে এ-সবের কোনোই দাম নেই।"

ঋজুদা গুহায় চলে গেল ডামুকে নিয়ে। আমি আর তিতির সার্গেসিন ডব্সনকে মরা শুয়োরের মতো ত্রিপল চাপা দিয়ে মুখের কাছে একটা বোতল রেখে দিয়ে চলে এলাম।

গুহায় গিয়ে দেখি, ওয়্যারলেস্ সেট সামনে নিয়ে ঋজুদা ও ডামু খুব চিন্তিত মুখে বসে আছে। ন্যাশনাল পার্কের হেডকোয়ার্টার্সে বোধহয় মেসেজ পাঠিয়েছে কোনো। জবাব পাচ্ছে না। ন্যাশনাল পার্ক হেডকোয়ার্টার্স তো আর লালবাজার নয়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও নয় যে, সারারাত তারা চোর-ডাকাতি-খুনির মোকাবিলা করবার জন্যে হাঁ করে ওয়্যারলেস সেটের সামনে বসে থাকবে!

আমি আর তিতির নীরব দর্শকের মতো ঋজুদা আর ডামুর দিকে চেয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ ব্লিপ্ ব্লিপ্ আওয়াজ আসতে লাগল। ঋজুদা বলল, "টাঁড়বাড়ো, টাঁড়বাড়ো।"

ওপাশ থেকে কেউ কথা বলল। হেডফোনে কান লাগিয়ে ঋজুদা উদ্গ্রীব হয়ে কী সব শুনল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল, "থ্যাঙ্কস্ আ লট। রজার!"

তারপর বলল, "তিতির, ডামুকে ভাল করে খাওয়া। রুদ্রকেও। কারণ এর পর কদিন খেতে পাবে না ওরা তার ঠিক নেই।"

আমার খিদে নেই। আমি বললাম, "একটু আগেই তো খেলাম। খামোকা খাব কেন?"

"খেতে বলছি। খাবি।"

"যাঃ বাবা। বমি হয়ে যাবে যে।"

"ঠিক আছে। তবে তোর হ্যাভারস্যাক ঠিক করে নে। খাবার, জল, গুলি, কম্পাস, দূরবিন, যা যা নেবার নিয়ে নে। এবার তোর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ডামু, চিয়ার আপ্।"

ঋজুদার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল, আমি আর তিতির যখন নীচে ছিলাম তখন ডামু আর ঋজুদার মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয়েছে।

ঋজুদা বলল, "তোর পিস্তল এবং রাইফেলটাও নিতে ভুলিস না। ডামু তোমারটা কোথায়?"

ডামু বলল, "কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। হ্যাভারস্যাকে রেখে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি কোমরকে।"

"বেশ করছ।"

ডামু খাওয়া-দাওয়ার পর ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে একটা নেপোলিয়ন ব্রাণ্ডির বড় বোতল নিয়ে, ঢুকঢুক করে কিছুটা খেয়ে বোতলটাকে ট্যাঁকস্থ, থুড়ি, হ্যাভারস্যাকস্থ করল। বলল, "বড়ই ধকল গেছে। শরীরটাকে একটু মেরামত করে নিলাম।"

আমাদের গোছগাছ হয়ে গেলে আমরা সকলে নীচে নেমে এলাম। নীচে এসে, ঋজুদা ডব্‌সন-এর কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে ক্ষমা চাইল। তারপর তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, "আপনি মুক্ত। এখন আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই এরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"আমি আর যাব কোথায় ? আমি তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছি। হেমাটাইটের সন্ধানও পেয়েছি। ডোলোমাইটেরও। তাছাড়াও এমন কিছু পেয়েছি যে, শুনলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

"কী ?"

"ইউরেনিয়াম।"

আমি আর তিতির একসঙ্গে অবাক হয়ে বললাম, ই-উ-রে-নি-য়া-ম্ !

"হ্যাঁ।"

ঋজুদা বলল, "তোরা কথা বলিস না, ওঁকে বলতে দে।"

"আপনি জানেন যে, তান্‌জানিয়া কম্যুনিস্ট দেশ। এখানে ইউরেনিয়ামের এত বড় ডিপোজিট আছে তা জানাজানি হয়ে গেলে সারা বিশ্বে হৈহৈ পড়ে যাবে। ভারত মহাসাগরের মধ্যে যে সেশেল্‌স দ্বীপপুঞ্জ আছে তাও কম্যুনিস্ট দেশ।"

আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "জানি। চমৎকার জায়গা। একেবারে স্বর্গ। আমিও গেছি।"

ঋজুদা ধমকে বলল, "চুপ কর্।" ডব্‌সনকে বলল, "বলুন, কী বলছিলেন।"

"সেই সেশেল্‌স-এর রাজধানী মাহেতে শিগগিরই 'ক্যু' হবে। ক্যাপিটালিস্ট দেশরা চাইছে, যেন-তেন-প্রকারেণ সেশেল্‌সকে কব্জা করতে, কারণ আমেরিকার যেমন ডিয়েগো-গার্সিয়া, রাশিয়ারও তেমন সেশেল্‌স। সাবমেরিন আর জাহাজের আড্ডা সেটা। তানজানিয়াতে ইউরেনিয়ামের এত বড় ডিপোজিট আছে জানতে পারলে তান্‌জানিয়ার ওয়াইল্ড-লাইফ-এর চেয়েও তার দাম অনেক বেশি বলে তান্‌জানিয়ানরাও বুঝবে। যেমন বুঝবে রাশিয়া ও আমেরিকা। আমার দুঃখ এই-ই যে, ব্যাপারটা জানাজানি হলেই তান্‌জানিয়ার এই বন্য-প্রাণীদের সর্বনাশ হবে।"

"বাঃ। আপনি দেখছি বন্য-প্রাণীদের মস্ত বন্ধু।"

ডামু বলল উৎকট-গন্ধ সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

"বন্ধু নয় ? কোন্ সহৃদয় মানুষ এদের এই নিধন চোখ বুজে সহ্য করতে পারে ?"

"তাহলে আপনি রওয়ানা হন। জিপে করে ছেড়ে দিয়ে আসবে এরা আপনাকে। যেখানে যেতে চান।" ঋজুদা ডব্‌সন-এর কথা থামিয়ে বলল।

"রাতটা আপনাদের সঙ্গেই থেকে যাই না কেন !"

"না, তা হয় না, মিস্টার ডব্‌সন। আপনি ম্যাক্‌আইভরের বন্ধু। তাই আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে, আমরা যা খুঁজতে বেরিয়েছি, তা আমাদের আগেই আপনি খুঁজে পেয়েছেন ; এ কথা জানবার পরও আপনাকে আমাদের বন্দী করে রাখাই উচিত ছিল। তবে আপনার সমস্ত কাগজপত্র ও ম্যাপ যখন আমরা পেয়ে গেছি তখন আপনাকে বন্দী করে রেখে বা প্রাণে মেরে আমাদের লাভ নেই কোনো।"

ডামু বলল, "আপনার কাছে ঐ ম্যাপের কোনো কপি-টপি নেই তো ?"

"কপি করার সময় আর পেলাম কোথায় ? তার আগেই তো—"

"না পেয়ে থাকলেই ভাল। এখন বলুন, কোথায় আপনাকে ছাড়ব। আমরা আপনার

ভাল চাই। যাতে ইয়ালো বেবুনে আপনার কান ছিঁড়ে না নেয়, অথবা হায়নার দল আপনার নাক চোখ খুবলে না নেয়, অথবা সিংহের দল আপনাকে কিমা না করে দেয়, সেইজন্যেই আপনাকে নিরাপদে পৌঁছনোর ব্যবস্থা।"

ডব্‌সন একটুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমার পাসপোর্ট ইত্যাদি তো আমাকে ফেরত দেবেন ?"

"নিশ্চয়ই। এই নিন।" বলে ডামু একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল ওঁর হাতে।

"এখানে আপনাদের সঙ্গে থাকলেই কিন্তু আমি নিরাপদে থাকতাম। আমার অনেক শত্রু।"

ডামু বলল, "কিন্তু আমাদের তাতে বিপদ। তাছাড়া আপনিও আমাদের মিত্র নন।"

"ও।"

ডব্‌সন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তাহলে আমাকে পার্ক-হেডকোয়ার্টার্সের কাছেই পৌঁছে দিন। সেখানে আধ মাইলের মধ্যে ছেড়ে দিলেই হবে। আপনারা ফিরে আসতে পারেন। আমার সঙ্গে আপনাদের কেউ দেখলে বিপদ হবে আপনাদেরই।"

"আপনি খুব বিবেচক।"

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, "তাই-ই হবে।"

ইতিমধ্যে ঋজুদার কথামতো তিতির গুহাতে গিয়ে একটা তলায় স্পাইক বা কাঁটা লাগানো জুতো নিয়ে এল। জুতোটা আমারই তা দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, "আপনার জুতোটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। ওটাকে ছেড়ে এটা পরে ফেলুন। আপনার পায়ের মাপ নিশ্চয়ই সাত।"

ডব্‌সন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বললেন, "আশ্চর্য! আপনি..."

পরক্ষণেই বললেন, "ছিঃ ছিঃ, তা কেন, কী দরকার ? বেশ তো আছে জুতো জোড়া। আপনাদের জুতো দিয়ে দিলে আপনাদের কষ্ট হবে না! এখনও চলবে কিছুদিন এ জুতোজোড়া। আমাকে দিলে আপনাদের জুতো কমে যাবে না ?"

ডামু বলল, "আমরা সবসময়ই যথেষ্ট জুতো নিয়ে চলাফেরা করি। কিছু পরার জন্যে, আর কিছু মারার জন্যে।"

বলেই ডব্‌সনসাহেবকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে বসিয়ে প্রায় জোর করেই তাঁর সরব আপত্তি না-শুনে জুতো-জোড়া তাঁর পা থেকে খুলিয়ে আমার নীরব আপত্তি না-শুনে আমার জুতো-জোড়া তার পায়ে গলিয়ে, ভাল করে ফিতে বেঁধে দিল।

মিস্টার ডব্‌সনের জুতো-জোড়া অদ্ভুত। বেঁটে লোকেরা তাঁদের লম্বা দেখাবার জন্যে উঁচু হিলের জুতো পরেন বটে, কিন্তু ওঁর জুতো-জোড়া আশ্চর্য। নীচে রাবার। তার উপরে কাঠের খড়মের মতো একটা ব্যাপার—তারও উপরে আবার রাবার।

জুতো-জোড়া খোলার পর ঋজুদা বাংলায় অতি নরম এবং স্বাভাবিক গলায় টেনে টেনে বলল, "রুদ্র তৈরি হয়ে নে। যন্ত্র বার কর্। এই দুটোই আমাদের যম। এক্ষুনি এদের বেঁধে ফেলতে হবে।" ঋজুদার এই হঠাৎ-কথাতে মিঃ ডব্‌সন যেন চমকে উঠলেন। ডামুর কোনোই ভাবান্তর হলো না। বাংলায় বলেছিল ঋজুদা।

এমন ভাবে হাসি-হাসি মুখে বাঁ হাতটা ডামুর কাঁধের উপর রেখে কথাগুলো বলল ঋজুদা যে, ডামু দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারল না যে, ওয়ানাবেরিরও বাবা আছে।

ঋজুদা কী যে বলছে, তা যেন আমার মাথায়ই ঢুকল না। ডামু! ওয়ানাবেরি! যম ?

তবে, তাকে দলে আনা···

তিতির কিন্তু এমনভাবে ব্যাপারটাকে নিল যেন, কিছুই হয়নি। অবাক হলাম আমি। ডামু কিছু বোঝবার আগেই তিতির তার পিস্তল বের করে ডামুর পিঠে ঠেকিয়ে দিল। ঠেকাতে ঠেকাতেই কক্ করে নিল। আমি টিঙটিঙে ডব্‌সনের দু-পায়ের গোড়ালির কাছে একটা জব্বর জুডোর লাথি কষালাম। "ওঃ মাই গড!" বলে ডব্‌সন চিত হয়ে পড়লেন। ওঁর বুকে চেপে বসে আমি পিস্তল ঠেকিয়ে রাখলাম ওঁর গলাতে। ঋজুদা তড়িৎগতিতে নাইলনের দড়ি দিয়ে ডামুর দু-হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

কয়েক সেকেণ্ড ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে রইলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডামু ঋজুদাকে এমন এক লাথি মারল যে, ঋজুদা ছিটকে পড়ল দূরে। এবং একই সঙ্গে তার পাহাড়প্রমাণ পিছন দিয়ে এক ধাক্কা তিতিরকে। হালকা-পল্‌কা তিতির চিতপটাং হয়ে ছিটকে গেল কিছুটা। পরক্ষণেই ডামু আমার দিকে দৌড়ে এল হাত-বাঁধা অবস্থাতেই। পাছে, ডব্‌সন উঠে পড়ে, তাই আমি তাড়াতাড়ি ওর বুকের উপর বুট-পরা পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে এক পা বুকে আর এক পা মুখে রেখে চেপে থাকলাম। পিস্তলটা ডামুর দিকে ঘুরিয়ে চিৎকার করে বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ ডামু।"

কিন্তু ঐ পাহাড়প্রমাণ সাংঘাতিক লোকটা সত্যিই যমদূত। যমের ভয় ওর নেই। ও যখন আমার চিৎকারে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না তখন ওর বুকের বাঁ দিকে নিশানা নিয়ে পিস্তলটা সোজা করে ধরলাম আমি। কোনো জীবন্ত জিনিসকে মারতে আমার কখনই ভাল লাগে না। যদিও শিকার করেছি অনেক, কিন্তু মারবার মুহূর্তে বড়ই খারাপ লাগে। তেলাপোকাকেও মারতে ভাল লাগে না। আর আমারই মতো একজন মানুষকে মারা নিয়ে কথা। যাকে চিনি, জানি···। কিন্তু আমার নিজের জীবন ছাড়াও তিতির আর ঋজুদার জীবনেরও প্রশ্ন। একবার যদি ও পিস্তলটা আমার হাত থেকে ফেলে দিতে পারে তাহলেই···

ডামুর পিছন থেকে ঋজুদা একটা চিতাবাঘের মতো দৌড়ে আসছিল। দৌড়ে আসছিল না বলে, উড়ে আসছিল বললেই ভাল হয়। তিতিরও তাই। তিতির আর ঋজুদা যেন একসঙ্গেই ওর ঘাড়ে মাথায় এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফটাস করে একটা আওয়াজ হল।

তিতির পিস্তলের নল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মেরেছে। কিন্তু ঐ সাংঘাতিক সময়েই সেম্‌সাইড হয়ে গেল। তিতিরের পিস্তলের নল গিয়ে পড়ল ঋজুদার মাথার পিছনে।

'আঃ!' বলে একটা অস্ফুট শব্দ করে ঋজুদা ডামুর পিঠের কাছ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘটনাটার অভাবনীয়তায় তিতির, 'এ মাঃ, কী করলাম আমি! কী করলাম!' বলে হাতের পিস্তলটা ডামুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ঋজুদার কাছে গিয়ে ঋজুদার মাথাটা কোলে নিয়ে বসল।

আমি আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম ডামু হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থাতেই পিছন ফিরে পিস্তলটা তুলে নিল। নিয়েই, ক্রিকেটের পেস্-বোলাররা বল করবার সময় যেমন জোরে হাত ঘোরান তেমন করে এক ঝট্‌কাতে জোড়া-হাতকে মাথার উপর দিয়ে সামনে নিয়ে এসে হাতটা আমার দিকে তুলতে লাগল।

অনেক সুন্দর গল্প শুনিয়েছিলে তুমি ডামু। ওয়ানাবেরি-ওয়ানাকিরির গল্প। ভেবেছিলাম, আরও অনেক গল্প শুনব তোমার মুখ থেকে এই উদাম, উন্মুক্ত, কৃষ্ণ মহাদেশের নক্ষত্রখচিত শীতার্ত রাতে। আগুনের পাশে বসে; কিন্তু···

আমার হাতটা তোলাই ছিল, কব্জিটা আর একটু শক্ত করলাম। তারপর তর্জনী দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলাম। আমার শর্ট-ব্যারেল্‌ড পিস্তলের আওয়াজ টেডি মহম্মদ পাহাড়ে আর অন্যান্য পাহাড়ে, রুআহা ন্যাশনাল পার্কের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা মৌন সাক্ষীর মতো বাওবাব গাছেদের নিশ্চল নির্বাক বাকলে পিছলে গিয়ে আবার ব্যুমেরাং-এর মতো গম্‌গমিয়ে ফিরে এল। ডামু মাটিতে পড়ে যেতে যেতেও জোড়া-হাতে ধরা তিতিরের পিস্তলটা আরেকবার উঁচু করে গুলি করল আমার দিকে। আমার দ্বিতীয় গুলির শব্দের সঙ্গে ওর গুলির শব্দ মিশে গিয়ে অন্ধকার রাতের নীলাভ তারাদের কাঁপিয়ে দিয়ে গেল যেন।

ডামু শেষ কথা বলল জড়িয়ে জড়িয়ে, "হে কিড়, ডোণ্ট শুট্।"

ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে গেছিল। মরেই গেল কি না, তাইই বা কে জানে! মাথার পিছনে পিস্তলের নলের এমন প্রচণ্ড বাড়ি খেলে মরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ডামু পড়ে যেতেই ডব্‌সনকে ছেড়ে দিয়ে তিতিরের পিস্তলটা তুলে নিলাম আমি। ডব্‌সন বোধ হয় আমাকে আর তিতিরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিলেন। মনে হল, এখন হুঁশ হয়েছে। ওঁকে বললাম, "উঠে চুপ করে বসে থাকুন। নইলে গুলিতে আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

মনে হল, কথাটা উনি বুঝলেন।

ডামুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হিপ-পকেট থেকে টর্চ বের করে ওর মুখে ফেললাম। ভেবেছিলাম, ওকে একটু জল খাওয়াব মরার আগে। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। ভয়ে নয় আনন্দে নয়; দুঃখে। ভাবছিলাম, আমি কী খারাপ! একটি ছোট মৌটুসকি পাখি, কি একটা প্রজাপতিও তৈরি করতে শিখিনি আমরা, অথচ কত সহজে ডামুর মতো এমন দৈত্যাকার প্রাণোচ্ছল হাঃ হাঃ হাসির একটা মানুষকে মেরে ফেললাম।

তিতির আমাকে জড়িয়ে ধরল। এখন তিতিরের চোখে জল নেই, তিতির এখন আমাদেরই একজন, ও আর শুধু উৎসাহী ছোট্ট, মিষ্টি মেয়েমাত্রই নয়, একজন বুদ্ধিমতী, সাহসী, অ্যাডভেঞ্চারার হয়ে উঠেছে।

"রুদ্র! তুমি এত ঘামছ কেন, এই শীতে? গরম লাগছে তোমার?"

"গরম? না তো! উত্তেজনায় শরীর গরম হয় বটে কিন্তু ঘামবার মতো তা নয়।"

"তোমার হাতটাও চ্যাটচ্যাট করছে ঘামে।"

"বাঁ হাতে একটু যেন ব্যথা-ব্যথা করছে। কী ব্যাপার বুঝছি না।"

তিতির টর্চ জ্বেলে আমার হাতে ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল। "রক্ত! রক্ত! তোমার গুলি লেগেছে।"

আমি ভাল করে দেখলাম। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করলাম। গুলিটা লেগেছে বটে কিন্তু কনুই আর বগলের মাঝামাঝি বাঁ হাতের বাইরের দিকে ছুঁয়ে গেছে শুধু। হাতের মধ্যে লাগলে তিতিরের বলার অপেক্ষায় থাকতে হত না। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমার আঘাতটা যদি গুরুতর হত, তবে ডব্‌সনের হাতে পড়ত তিতির একা।

আমার ব্যথাটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। সুন্দরবনের মাঝিদের কাছে শুনেছিলাম, হাঙরে যখন পা কেটে নিয়ে যায়, তখন নাকি বোঝাই যায় না। বাবার বন্ধু মিলিটারির ব্রিগেডিয়ার মুখার্জিকাকুর কাছে শুনেছি, যুদ্ধে যখন গুলি লাগে, কিন্তু যদি ভাইটাল জায়গায় না লাগে, তখন উত্তেজনার সময় নাকি বোঝাই যায় না। বোঝা যায় পরে।

তিতিরকে বললাম, "বেশি কিছু হয়নি আমার। পরে দেখো। এখন ঋজুদার কাছে যাও।" ডবসনকে আমি পাহারা দিতে লাগলাম আর তিতির লাগল ঋজুদার পরিচর্যায়। মাথার পিছনে ওয়াটার বটল্ খুলে থাবড়ে-থাবড়ে জল দিচ্ছিল ও। ভাবছিলাম, ঠাকুমা এখানে থাকলে শ্বেতপাথরের খল-নোড়াতে মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খাইয়ে দিত একটু। আর ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পড়ত।

ডবস্‌ন, মনে হল, ঘুমিয়েই পড়েছে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জানি না, হয়তো চোখ বন্ধ করে মট্‌কা মেরে মড়ার মতো পড়ে কোনো মতলব ভাঁজছে। মিনিট-পনেরো পরে, তিতির বলল, "জ্ঞান আসছে ঋজুকাকার।"

"ভাল।"

অনেকক্ষণ আমরা ডামু আর ডবস্‌নকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। ভুলেই গেছি যে, আফ্রিকার এক নামী ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে রাতের বেশ অন্ধকারে খোলা জায়গায় রয়েছি। কথাটা মনে হতেই আমি বেল্টে ঝোলানো টর্চটা ক্ল্যাম্প থেকে এক টানে খুলে, সুইচ টিপে চারদিকে তাড়াতাড়ি করে ঘুরিয়ে ফেলতেই এক সার লাল-লাল ভুতুড়ে চোখ জ্বলে উঠল। হায়না। হায়নাদের হাত থেকে গুগুনোগুম্বারের দেশ থেকে ঋজুদাকে যে কী ভাবে বাঁচিয়ে এনেছিলাম তা ভগবানই জানেন। চোখে আলো পড়তেই অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল একটা হায়না এবং পরক্ষণেই পুরো দলটা গা-হিম-করা হাসি হাসতে হাসতে হুড়োহুড়ি করে এ-ওর গায়ে পড়ে একটু সরে দাঁড়াল মাত্র। রক্তর গন্ধ পেয়েছে ওরা। ডামুর তো বটেই, নাক-ফাটা ডব্‌সন ও হাতে-গুলি-লাগা আমারও। সারা রাত এখন বাকি। কী যে করব, তা ভেবেই পেলাম না। হায়নার হাত থেকে ডামুর মৃতদেহ বাঁচাব, না নিজেদের? এখানে তো গুলি করা বারণ। যদিও ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার খান্-খান্ হয়ে গেছে গুলির শব্দে।

কিছুক্ষণ পরে ঋজুদা উঠে বসল। উঠে বসেই, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে তিতিরকে বলল, "কনগ্রাচুলেশনস্। মোক্ষম মার মেরেছিলি তুই। শুধু মারখানেওয়ালা ভুল করে ফেলেছিলি। মারটাই আসল, কাকে মারবি সেটা বাহ্য।"

তিতির এবার দৌড়ে গেল গুহাতে। ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি নিয়ে আসতে। তারপর ঋজুদা আর তিতির দুজনে মিলে টর্চ জ্বালিয়ে দেখে, ভাল করে মারকিওক্রম লাগিয়ে, ব্যথা কমার ওষুধ লাগিয়ে, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাইয়ে দিল পটাপট আমাকে। যন্ত্রণাটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। এবার কমতে লাগল। ঠিক যন্ত্রণা নয়, একটা গরম-গরম, জ্বালা-জ্বালা ভাব।

উঠে দাঁড়িয়ে ঋজুদা ডামুর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, "বেচ্চারা!"

ডবসনের চোখে মুখে মৃত্যুভয়। অন্তত আমার তাই-ই মনে হল। সে কথা বললামও ঋজুদাকে।

"তুইও যেমন! এর জান সেৎসি মাছিদের চেয়েও, আমাদের দেশের কচ্ছপের জানের চেয়েও শক্ত। এর কথা বলব তোদের। একে নিয়ে চল গুহাতে।"

"ডামু এখানেই পড়ে থাকবে?"

"হ্যাঁ। ভাল করে ত্রিপল চাপা দিয়ে বেঁধে রাখ। কাল নদীর বালিতে ওকে আমরা কবর দিয়ে যাব। আর রুদ্র যখন পাহারাতে বসবি, পয়েন্ট টু-টু পিস্তল দিয়ে হায়না তাড়াবি। যখনই তারা আসবে।"

হায়নারা তো আসবেই, শেয়ালরাও আসবে। পশুরাজও আসতে পারেন

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে। আমার মনে হয় আমাদের সুখের দিন এবং প্রতীক্ষার দিনও শেষ হয়ে গেছে। কাল থেকে এখানে আর থাকা চলবে না। রাতেও হয়তো টর্নাডোর দল এসে পড়তে পারে। ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো হেলিকপ্টারে করে লোক পাঠিয়ে এই গুহাসুদ্ধু বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে যাবে।

আমরা ডামুকে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে বেঁধে-ছেঁদে গুহাতে এলাম। ডব্‌সন গুহার মধ্যে ছোট্ট আগুনের সামনে পা জড়ো করে আমাদের মতো করেই বসল।

ঋজুদা ডব্‌সনের বুটের গোড়ালির মধ্যে থেকে পাওয়া ম্যাপ এবং অন্যান্য কাগজপত্র বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দেখা হয়ে গেলে মুখ তুলে বলল, "ডামুকে কত টাকা দেবেন বলে লোভ দেখিয়েছিলেন ? আর এমন নাটকীয়ভাবে দুজনের একসঙ্গে আসাটার প্ল্যানটা কার ?"

ডব্‌সন গলা-খাঁকারি দিল একবার।

"আমাদের সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। সোজা কথা, সোজা করে, তাড়াতাড়ি বলুন।" ঋজুদা বলল।

"ফিফ্‌টি-থাউজ্যাণ্ড তান্‌জানিয়ান শিলিং! দুজনের একসঙ্গে আসার প্ল্যানটা আমারই।"

"একটা লোক সৎপথে ফিরে এসেছিল প্রায়, তাকে আবারও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন আপনারা! টর্নাডো, ভুষুণ্ডাদের কথা বুঝি। কিন্তু আপনার মতো মানুষও! ভাবা যায় না। অবশ্য আমাকে সাহায্য করার অপরাধে আপনারা কাজ ফুরোলে ওকে টাকাও দিতেন না, প্রাণেও মারতেন। ওর কপালে ছিল আমাদের গুলি খেয়ে মরার, তাই-ই বোধহয় মরতে এখানে এসেছিল এ বছরে। গ্রাম, ঘর, মা-মরা মেয়ে ছেড়ে।"

ডব্‌সন হঠাৎ বলল, তিতিরের দিকে চেয়ে, "আমার কাস্কটা একটু দেবে। গলা শুকিয়ে গেছে।"

তিতির ঋজুদার দিকে চেয়ে ওটা এগিয়ে দিল। বলল, "খেয়ে, কাস্কটা ফেরত দেবেন।"

ডব্‌সন ভয়, বিস্ময় এবং আতঙ্কের চোখে তিতিরের দিকে চেয়ে রইল। তিতির আমার দিকে চোখের কোণ দিয়ে একটু গর্ব-গর্ব ভাব করে তাকাল।

ঋজুদা হঠাৎ বাংলায় বলল ডব্‌সনকে, "আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কে ? টর্নাডো ? না আপনার নিজেরই ব্রেইনওয়েভ এটা ?"

আমি আর তিতির দুজনেই ঋজুদার দিকে তাকালাম। তিতিরের মুখে আতঙ্ক। মাথার পিছনে পিস্তলের নলের মোক্ষম মার খেয়ে বোধহয় ঋজুদার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।

ডব্‌সন ইংরেজিতে বোকা-বোকা মুখে বলল, "বেগ ইওর পার্ডন, মিস্টার বোস ?"

ঋজুদা বলল, আবারও বাংলায় "বলুন, বলুন সার্গেসিন, মিস্টার ডবসন।

ডবসন কথা ঘুরিয়ে ইংরিজিতে বললেন, "বাঃ আপনার পাইপের তামাকের গন্ধটা খুবই সুন্দর। আমার সিগার সব ফুরিয়ে গেছে।"

"ডামুর পকেটে নিশ্চয়ই অনেক আছে এখনও। পকেটে কেন, ব্যাগেও আছে। ব্যাগ তো এখানেই।" বলে, আমি যেই ডামুর ব্যাগ খুলতে যাব, অমনি ঋজুদা বারণ করল। বারণ করে, ব্যাগটা চাইল। ব্যাগটা ঋজুদাকে এগিয়ে দিতেই, ঋজুদা তাতে হাত ঢুকিয়ে এক বাক্স সিগার বের করল। হাভানা সিগারের বাক্স। তারপর বাক্সটার ঢাকনি খুলে

ধরল। আমরা দেখলাম অনেকগুলো সিগার, মানে চুরুট, সার সার সাজানো আছে।

ঋজুদা আমার আর তিতিরের দিকে তাকিয়ে ঐ বাক্স থেকে একটি সিগার তুলে আমাদের দেখিয়ে বলল, "এই একটি ডিনামাইটই আমাদের সকলকে এই গুহার মধ্যেই জীবন্ত-কবর দিতে পারে। অন্য দুটি আমাদের সমস্ত মালপত্র এবং আমাদের সমেত দুটি জিপকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতে পারে।" বলেই, ডব্‌সনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতগুলোর কী দরকার ছিল? আপনারা আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে এত উঁচু ধারণা করেছেন তা জেনে পুলকিত হলাম।"

"এগুলো ডিনামাইট!"

তিতির চোখ বড় বড় করে বলল। সত্যিই তো সিগারের মতোই দেখতে।

"আমি তিতিরকে বললাম, "থামো তুমি। ঋজুদার নিশ্চয়ই মাথার গোলমাল হয়েছে। মিস্টার ডব্‌সনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে, ডামুর সিগারকে ডিনামাইট বলছে।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "না। মাথা খারাপ হয়নি। এগুলো ডিনামাইটই। আর মিঃ ডব্‌সন খুব ভাল বাংলা জানেন। এবং জানেন বলেই, টর্নাডো বাংলা-জানা লোককে খুঁজে বের করে আমাদের পিছনে লাগিয়েছে। ভুষুণ্ডা নিশ্চয়ই আমাদের বাংলায় কথা বলাতে ওর অসুবিধার কথা জানিয়েছিল টর্নাডোর দলকে।"

আমাকে আর তিতিরকে একেবারে চমকে দিয়ে মিস্টার ডব্‌সন বাংলায় বললেন, "হ্যাঁ। তাই। তবে, আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই।"

আমরা এবারে আরও বেশি চমকালাম। বাংলা বলার ধরনটা দাদুর বন্ধু কলকাতার সেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার ফাঁলোর মতন। আমাদের ছেলেবেলায় ফাদার ফাঁলো ফণীদাদুর বাড়িতে খুব আসতেন।

ঋজুদা বলল, "আমরা কেউই খুনী নই যে, কাউকে মারতে হলে আমাদের খুব আনন্দ হয়। আপনার প্রাণ আপনারই থাকবে। কিন্তু বদলে যদি ভুষুণ্ডার প্রাণটি আমরা পাই। সে আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু টেডি মহম্মদকে মেরেছে নিষ্ঠুরভাবে, সে আমাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমাকেও গুলি করে আহত করেছে। আমি আর রুদ্র যে গতবারে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি এটাই আশ্চর্য। তার প্রাণটি আমাদের ভীষণই দরকার। এবং তার সঙ্গে টর্নাডোর খবর।"

"কিন্তু...।"

"কোনোই 'কিন্তু' নেই এর মধ্যে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবুন। এ-ছাড়া কোনো শর্ততেই আপনাকে বাঁচাতে পারব না। কাল আমরা এই জায়গা ছেড়ে যাবার সময় আপনাদেরই আনা ডিনামাইট ডিটোনেট করেই আপনার প্রাণের সঙ্গে এই গুহাতেই আপনার বাংলা, ইংরিজি, নৃতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদির সব কিছুর জ্ঞান সমেত কবর দিয়ে চলে যাব। বাজে কথা বলার সময় আমাদের নেই। বলুন।"

সার্গেসিন ডব্‌সন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর অধ্যাপক-সুলভ ভালমানুষ কমলা-রঙা মুখটা আগুনের আভাতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। নাকের নীচে এবং থুতনিতে জমাট-বাঁধা কালো রক্ত লেগে থাকা সত্ত্বেও। হঠাৎ তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে জল ঝরতে লাগল।

অবাক কাণ্ড! সাহেবরাও কাঁদে!

আমিঅ ার তিতির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

মিঃ ডব্‌সন বললেন, "মিস্টার বোস, আপনি বরং আমাকে এখানে কবরই দিয়ে যান।

যে জীবন মাথা উঁচু করে স্বাধীন মানুষের মতো, নিজের ইচ্ছা ও খুশিমতো, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে কাটানো যায় না, সে জীবনের চেয়ে মরণ অনেক ভাল। টর্নাডো যদি জানতে পারে যে, আমিই তার খবর এবং ভুষুণ্ডার খবর আপনাদের জানিয়েছি তবে তার শাস্তি হবে ভয়ংকর। মৃত্যু তার চেয়ে অনেক বেশি কাম্য। জীবনের যেমন অনেক রকম আছে, মৃত্যুরও আছে। স্বাধীনতাহীন, অন্যর কথায় ওঠা-বসার জীবন আমি চাই না। আর যেই চাক।"

"তাহলে আপনি আমাদের কিছুই বলবেন না?"

"না। মিস্টার বোস। আপনি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কথা এবং ব্যথা আপনি অন্তত বুঝবেন। ভদ্রলোক হয়ে কথার খেলাপ বা বিশ্বাসঘাতকতা করি কী করে? খারাপ লোকদের মধ্যেও ভাল লোক থাকে। আমি খারাপের মধ্যে ভাল। প্রাণ যায় যাক, আমার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না।"

"খুবই মহৎ আপনি। অতি উত্তম। তাই-ই হবে। এখানেই কাল সকালে কবর দিয়ে যাব আমরা আপনাকে।" ঋজুদা বলল।

॥৮॥

রাতটা ভালয় ভালয় কাটল। হায়নারা বার-তিনেক এসেছিল। পিস্তল দিয়ে ওদের কাছে মাটিতে গুলি করাতে আবার হাঃ হাঃ করে ফিরে গেছিল। শর্ট্-ব্যারেলড্ পিস্তলের এই মজা। প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। তারপর এই ফাঁকা, পাহাড়ি জায়গাতে তো কথাই নেই।

ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতে গুহা থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে জিপে তুলে তৈরি হয়ে নিলাম। তিতির তাড়াতাড়ি করে একটু পরিজ, মিল্ক-পাউডারের দুধের সঙ্গে বানিয়ে দিল। আর গ্যাজেল-এর স্মোক-করা টুকরো তো ছিলই। মিস্টার ডব্সনকে খেতে দেওয়া হল। তাঁর কাছে খাওয়ার জল, টিনের মাছ, সসেজ, ফল, মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেটস্ এবং যতখানি স্মোক-করা মাংস ছিল, সব কিছু আমরা দিয়ে গেলাম। ডামুর মৃতদেহ শক্ত হয়ে ফুলে গেছিল ত্রিপলের মধ্যে। ডাব্সনকেও বলা হয়েছিল সাহায্য করতে। একটু আগে জিপে করে আমরা সকলে নদীতে গিয়ে একটা বড় গাছের গোড়ার কাছে বালি খুঁড়ে ডামুকে কবর দিলাম। ওয়ানাকিরি-ওয়ানাবেরির নাম ভুলে-যাওয়া ডামুকে। মনটা বড় ভারী লাগছিল।

তিতির আমার হাতের পরিচর্যা করছিল যখন, তখন ঋজুদা সার্গেসিন ডব্সনকে নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। জিপের পেছন থেকে জিনিসপত্রর ম্যাপ দেখে একটি চারকোনা চকচকে বড় টিন বের করল। সেই টিনটার ঢাকনি খুলে তাতে জল মেশাবার পর রাজমিস্ত্রিরা যেমন জিনিস দিয়ে ইটের গাঁথুনিতে সিমেন্ট লাগায় সেই রকম একটি জিনিসও জিপ থেকে বের করল। তারপর আমাদেরও ডাকল। গুহার মুখে, গুহার উপর থেকে এবং দু'পাশ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড বড় বড় গোলাকার পাথর হাঁসফাঁস করতে করতে নিয়ে এলাম আমরা। পাথরগুলো দিয়ে গুহার মুখ পুরো ভরে দেওয়া হল। বয়ে আনতে হলে একটিও আনার ক্ষমতা আমাদের তিনজনের ছিল না। তারপর সেই সিমেন্টের মতো জিনিসটি দিয়ে পাথরগুলোর মুখে মুখে জোড়া দিতে লাগল ঋজুদা কাদের মিঞা রাজমিস্ত্রির মতন। সিমেন্ট, বালি, চুন-সুরকি শুকোতে সময় লাগে। কিন্তু সিমেন্টের মতো ঐ জিনিসটি ঐ চ্যাপ্টা চামচের

মতো জিনিসে করে লাগানো মাত্রই শুকিয়ে যাচ্ছিল। ভিতর থেকে ডব্‌সন বাঁধা হাত দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। ঋজুদা ফোকর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বলল ইংরিজিতে, "ধাক্কা দিয়ে কোনো লাভ নেই। তবে ভয়ও নেই। আমরা যদি টর্নাডোকে ধরতে পারি, তাহলে আমরাই এসে তোমাকে উদ্ধার করব। আর টর্নাডো যদি আমাদের ধরে, তবে তাকে বলব আপনার কথা। বলব, এমন বিশ্বাসী অনুচর টর্নাডো কেন, কারো পক্ষেই মেলা সম্ভব ছিল না। তখন সেই-ই নিশ্চয়ই লোক পাঠিয়ে বা নিজে এসে আপনাকে উদ্ধার করবে। আপনি যদি আমার অনুচর হতেন, তাহলে তো নিজেই এসে আপনাকে মুক্ত করতাম, আপনার মতো অনুচর তো অনেক তপস্যা করলেই মেলে ?"

ভিতর থেকে ডব্‌সন বারবার বলতে লাগলেন, "আমাকে বাঁচান, আমাকে এভাবে রেখে যাবেন না, প্লিজ ; মিস্টার বোস, প্লিজ।"

ঋজুদা বলল, "তা হয় না। আপনি তো মরেননি। সাপ বা বিছের কামড় অথবা জলাভাব বা খাদ্যাভাব ছাড়া মরার আর কোনো কারণ রইল না। কোনো জানোয়ারই ঢুকতে পারবে না ভিতরে। তবু, মরতে হয়তো পারেন। তবে, সে সম্ভাবনা নিতান্তই কম।"

"তবে, একটা কথা। একটা কথা শুনুন।"

ঋজুদা হঠাৎ খুব মনোযোগী হয়ে উঠল, যেন এই কথাটা শোনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। পাথরের ফাঁকে কান লাগিয়ে বলল, "বলুন মিস্টার ডব্‌সন, আমি শুনছি।"

ডব্‌সন বললেন, "আমার ব্যাগের মধ্যে একটি ফ্লেয়ার গান আছে।"

"দেখেছি, আছে। এখন সিগন্যালটা কী তাই বলুন।"

"ওয়ান গ্রিন, ফলোড বাই টু রেড, দেন টু বি কনক্লুডেড বাই ওয়ান গ্রিন।" ডব্‌সন এক নিঃশ্বাসে বললেন।

"প্লিজ রিপিট।" ঋজুদা বলল। ডব্‌সন রিপিট করলেন।

"কিসের সিগন্যাল এটা ?"

"আমি বিপদে পড়লে আমাকে সাহায্য করার সিগন্যাল। টর্নাডোর দলের লাক আমার ফ্লেয়ার গান থেকে এই সিগন্যাল পেলেই আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।"

"কিন্তু তারা আপনার বেয়ারিং জানবে কী করে ? আমরা তো অন্য জায়গা থেকেই ছুঁড়ব, যদি ছুঁড়ি।"

"ওরা বেয়ারিং বের করে নেবে ; ওদের কাছে কমপ্যুটার আছে। সে ভাবনা আপনার নয়।"

"ঠিক আছে। আপনার চিন্তা নেই। আমরা এই গুহা থেকে দু-তিন বর্গ-কিলোমিটারের মধ্যেই ছুঁড়ব ফ্লেয়ার। এখন আমরা বলি। ওল্ দ্যা বেস্ট।"

ভিতর থেকে আওয়াজ হল, "ওল্ দ্যা বেস্ট।"

আমার মনে হল শুনলাম, খোল্ দ্যা খেস্ট্।

রওয়ানা হলাম আস্তানা ছেড়ে। এই অল্প কদিন গুহাটাতে থেকে এটাকেই ঘরবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। এমনই বোধ হয় ঘটে। রেলগাড়ির কামরাতে একরাত-একদিন কাটিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে সেই কামরা ছেড়ে নেমে যাবার সময় মনখারাপ লাগে। ঋজুদা একদিন বলছিল আমাদের জীবনটাও রেলগাড়ির কামরারই মতো। যারা এই অল্পদিনের ঘর-বাড়ি ছেলে চলে যাবার সময় মনখারাপ করে, তারা আসলে বোকা।

ঋজুদার নির্দেশমতো আমরা জিপ চালিয়ে নদীর দিকে চললাম, তারপর নদীর ওপারে যেখানে জঙ্গল খুব গভীর সেখানে পৌঁছে, বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে জিপ দুটোকে ক্যামোফ্লেজ করে রাখা হল। ঋজুদা আমার এবং তিতিরের রাক্‌স্যাক্ চেয়ে নিল। বলল, "এতে অতি প্রয়োজনীয় সব জিনিস আমি ভরে দিচ্ছি। তোরা ততক্ষণে আগে যেখানে লোক-চলাচল দেখেছিল তিতির, সেই দিকে নজর রাখ্ দূরবিন নিয়ে উঁচু গাছে চড়ে। বিকেল হলে নেমে এসে আমার কাছে খবর দিবি, কী দেখলি না-দেখলি। দিনের বেলা প্রসেশান করে জিপের ধুলো উড়িয়ে যাওয়ার দিন আমাদের আর নেই। কখন কী ঘটে তার জন্যে সবসময়ই তৈরি থাকতে হবে।"

তিতির আর আমি ঋজুদার কথামতো রাক্‌স্যাক্ নামিয়ে রেখে চলে গেলাম। যাবার আগে ঋজুদাকে বললাম, "ফ্লেয়ার গান থেকে ফ্লেয়ার ছুঁড়লে না তুমি ?"

ঋজুদা বলল, "ফ্লেয়ার গান ছুঁড়তে হয় রাতের অন্ধকারে, নইলে আলো দেখা যাবে কী করে ? তাছাড়া, ডব্‌সনের কথামতো ফ্লেয়ার গান আমি মোটেই ছুঁড়ব না। ডব্‌সন আমাদের মিথ্যা কথা বলেছে। ডব্‌সন আসলে টর্নাডোর দলের লোকই আদৌ নয়। ও একটি বড় দল নিজে তৈরি করেছে। ডামুর টর্নাডোর দলের উপর রাগ ছিল, বিশেষ করে ব্যক্তিগত রাগ ছিল টর্নাডোর উপর। এই পাজি লোকটা ডামুকে বুঝিয়েছিল যে, আমাদের আর ওদের উদ্দেশ্য এক, টর্নাডোর দলকে শেষ করা ; কিন্তু টর্নাডোর দল শেষ করার পর ডামু কী করে খাবে ? বাঙালি বাবুরা কি তার সারাজীবনের দায়িত্ব নেবে ? তারা তো ভারতবর্ষে ফিরে যাবে। তার চেয়ে ওর দলে ভিড়ে ডামু টর্নাডোর উপর প্রতিশোধও নিতে পারবে এবং তারপর ডব্‌সনের সঙ্গে মিলে ওরা একাই চুরি করে পশুশিকারের ঢালাও ব্যবসা শুরু করবে। ডামুকে পঞ্চাশ হাজার তান্‌জানিয়ান শিলিং আদপে দিয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভকে যে কেবলই বাড়িয়ে চলে তার এমন করেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আমি ডামুকে পঁচিশ হাজার শিলিং অগ্রিম দিয়ে রেখেছিলাম। বাকি আরও পঁচিশ দেব বলেছিলাম আমাদের কাজের শেষে। ডামু ভাবল আমাদের টাকাটা মেরে আবার ও ডব্‌সনের টাকা পাবে এবং ভবিষ্যতেও তার কোনো অভাব থাকবে না। ডব্‌সন জানে না, ওর ফ্লেয়ার গান আমাদের এমন কাজে লাগবে এবং এমন সময় যে ভগবান সদয় হলে আমাদের কাজই হাসিল হয়ে যাবে।

ঘড়িতে তখন বারোটা। আমরা এগিয়ে গেলাম। গলায় বায়নাকুলার ঝোলানো। কোমরে পিস্তল, ছুরি, ছোট্ট জলের বোতল ইত্যাদি। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড় গাছ দেখতে লাগলাম।

বাওবাব গাছগুলো যে শুধু বড় তাই-ই নয়, এতই বড় যে ভয় লাগে। কত যে তাদের বয়স ! অদ্ভুত দেখতে। সাধে কি নাম হয়েছে 'আপসাইড-ডাউন ট্রিজ' ! অনেক দূরে একটা বড় বাওবাব গাছ ছিল। একটু এগোতেই দেখলাম, জংলি মৌমাছি উড়ছে তাদের চারপাশে। বাসা বেঁধেছে অনেক। একটা র‍্যাটল্ দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে। এই কালো গলার র‍্যাটল্ বা হানি-ব্যাজারদের সঙ্গে রুআহা ন্যাশনাল পার্কের মধুচোরদের খুব ভাব। র‍্যাটল্ প্রায় কুকুরের মতো কিন্তু তার চেয়ে অনেক ছোট একরকমের জানোয়ার। এরাও আমাদের দেশের ভাল্লুকের মতো মধু খেতে খুব ভালবাসে। তাই চোরা-মধুপাড়িয়েরা মৌচাক ভেঙে মধু পেয়ে নিয়ে কিছুটা রেখে যায় এদের জন্যে। একরকমের পাখি আছে, তাদের নাম ব্ল্যাক-থ্রোটেড় হানি-গাইড। এরা খুব সহজে চোখে পড়ে না কিন্তু এরাই

মধুপাড়িয়েদের পথ-প্রদর্শক। এরা মধুপাড়িয়েদের সোজা নিয়ে হাজির করে মৌচাকের কাছে। তাই, মধু পাড়া হলে মৌচাকের একটি অংশ রেখে যায় হানি-গাইডের খাবার জন্যে। ওরা ভয় পায়। পথপ্রদর্শককে খাজনা না দিলে, পরে কখনও যদি সে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সোজা তাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করে কোনো চিতা বা লেপার্ড বা সিংহর দলের সামনে।

আমাদের সুন্দরবনে, গরান ফুলের মধু খেয়ে যেই মৌমাছি ওড়ে অমনি সেই মৌমাছির পিছু নেয় মৌলেরা। এরা এখানের দারুণ এই হানি-গাইডের সার্ভিস পায়! অবশ্য, সুন্দরবনে মৌমাছির দিকে চোখ রেখে গরান-হ্যাঁতালের বনে বনে নাক উঁচু করে হেঁটে যেতে গিয়েই তো অনবধানে বাঘের খাদ্য হয় বেচারি মৌলেরা। বিপদ এখানেও অনেক। কিন্তু সুন্দরবনের মধুপাড়িয়েরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ঐ ভাবেই জঙ্গলে ঢোকে। এখানের মধুপাড়িয়েরাও নিশ্চয়ই সুন্দরবনের মৌলেদের মতোই গরিব। নইলে হাতি, সিংহ, সাপ, চিতা, লেপার্ড, গণ্ডারের ভয় তুচ্ছ করে এমন সাংঘাতিক ভয়াবহ বনে কি তারা একটু মধু পাড়বার জন্যে ঢুকত! ক' শিলিংই বা রোজগার করে মধু পেড়ে!

বাওবাব গাছটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হঠাৎই মানুষের গলার স্বর কানে এল।

আমি তিতিরকে ইশারাতে দাঁড়াতে বলে তাড়াতাড়ি একটা কমব্রেটাম্ ঝোপের আড়ালে ওকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম।

ঠিকই তো! দূরের বাওবাব গাছের কাছে কয়েকজন মানুষ কথা বলছে। তিতির ততক্ষণে যে-দিক থেকে কথা আসছিল সেদিকে দূরবিন তুলে ধরেছে। কিছুক্ষণ দেখে ও দূরবিন নামিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"কী ?"

"কতকগুলো পাখি! একেবারে মানুষের গলার মতো আওয়াজ।"

আমিও দেখলাম। দেখি, অনেকগুলো বড় বড় পাখি, বড়দিনের আগে নিউ মার্কেটে যেসব সাইজের টার্কি বিক্রি হয় তার চেয়েও বড়, কালো গা, লাল গলা-বুক। ডানার দিকটা সাদা আর তাদের ইয়া বড় বড় লম্বা কালো কালো ঠোঁট— আমাদের দেশের ধনেশ পাখির মতো। পাখিগুলো পাতা ও মাটিতে কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ কী। একটার মুখে যে একটা সাপ! পেটের কাছে কামড়ে ধরেছে সাপটাকে বিরাট সাঁড়াশির মতো ঠোঁটে আর সাপটা কিলিবিলি করছে এঁকেবেঁকে। কী যে ব্যাপার কিছুই বোঝার উপায় নেই। একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড। ঠোঁট ফাঁক করে যেই না কথা বলছে, অমনি মনে হচ্ছে মানুষই বুঝি! হুবহু! এ-দেশী মানুষেরই মতো গলার স্বর। এ কোন্ পাখি আমি জানি না। ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ফিরে।

ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটল। তিতির আমার কোমরে হাত দিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে ওর চোখকে অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি, একটি চমৎকার বুশ-বাক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। সোয়াহিলিতে এদের বলে পোঙ্গো। চমৎকার বাদামি গা, গলার কাছে আর শরীর আর গলা যেখানে মিলেছে সেখানে কেউ যেন তুলি দিয়ে সাদার পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। পিছনের পা দুটির উপর সাদা রঙের ফোঁটা। দুটি সুন্দর সজাগ কান ; আর মাথার উপরে বাঁকানো প্যাঁচানো শিঙের বাহার, অনেকটা আমাদের দেশের কৃষ্ণসার অথবা চৌশিঙ্গার মতো।

কী হল, বোঝার আগেই পোঙ্গো বাবাজি মাংগো বলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সাপে

কামড়াল কি ? নাঃ, সাপে কামড়ালে অমন করে পড়ত না। গুলিও কেউ করেনি। শব্দ হত তাতে। তবে ?

আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তিতির মাথা তুলতে যাচ্ছিল। ওর পনি-টেইলে হ্যাঁচ্‌কা টান লাগিয়ে মাথা নামিয়ে দিলাম। নিজেও মাথা নামিয়ে নিলাম। কমব্রেটাম ঝোপের লাল টাসল্ আর চাইনিজ-ল্যাণ্টার্নের মতো ফুলের ঝাড়ের সঙ্গে একেবারে নাক লাগিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। কী যেন নাম এই ফুলগুলোর ! কমব্রেটাম তো ঝাড়ের নাম। এদের একটা বটানিকাল নামও আছে। মনে পড়েছে। পার্‌পার্‌ফালিয়া। ঋজুদা বানানের কারণে ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল পুর্‌পুর্‌ফুলিয়া। তাই-ই মনে আছে। বর্ষাকাল ছাড়া সব সময় ফুল ফোটে এই ঝোপে।

বুশ-বাকটা পড়েই রইল। নিথর হয়ে। এমন সময় একজন রোগা টিঙটিঙে নিগ্রো লোক দেখা গেল। তার পরনে আমাদের দেশের জঙ্গলের লোকের মতোই একটি নেংটি কিন্তু তফাৎ এই যে, তা রঙিন। তার হাতে একটি ধনুক। লোকটি এসে বুশ-বাকটির পাশে দাঁড়াল। তারপর যে বাওবাব গাছে চড়ে আমরা চারদিকে দেখব ঠিক করেছিলাম, সেই দিকেই তাকিয়ে কাকে যেন ডাকল। আমাদের দিকে পিছন ফিরতেই আমরা সাবধানে, নিঃশব্দে আরও একটু পেছিয়ে গিয়ে একটি দোলামতো জায়গায় গড়িয়ে গিয়ে আড়াল নিলাম। নিতে নিতেই কোমরে হাত দিয়ে দুজনেই পিস্তল বের করে ফেললাম। লোকটার ডাকে সাড়া দিল অন্য দুটো লোক। তারা এগিয়ে আসতে লাগল বুশ-বাকটার দিকে। প্রথম লোকটার হাতে কিন্তু শুধু ধনুকই ছিল। তীর ছিল না। অন্যদের হাতও খালি। ওরা তিনজনে বুশ-বাকটাকে দেখে আনন্দে দু'বার নেচে উঠল। ওদের হাতগুলো হাঁটুরও নীচে পড়ে। হাতের আঙুলগুলো কাঁচকলার কাঁদির মতো। বাইরের দিকটা চাইনিজ ইংকের মতো কালো, ভিতরের দিকটা সাদা।

আমরা চুপ করে দেখতে লাগলাম। লোকগুলো বুশ্-বাকটাকে ফেলে রেখে বাওবাব গাছটার কাছে ফিরে গেল। আমরা এবার বুকে হেঁটে-হেঁটে ওদের দিকে এগোতে লাগলাম আড়াল নিয়ে নিয়ে। তিতির, দেখি কোথায় আমার কাছে কাছে থাকবে, কিন্তু আশ্চর্য ! চোখের সামনে বিষের তীরের শক্তি দেখার পরও একটুও ভয় না-পেয়ে আমাকে ছেড়ে বাঁ দিক দিয়ে বুকে হেঁটে ঐ লোকগুলোর কাছেই এগিয়ে যেতে লাগল। কী করতে চায় ও ? এখনও জানে না ও ঐ ছোট্ট বিষের তীরের একটু যদি গায়ের কোথাওই লাগে তাহলে কী হবে !

কিন্তু এখন সামলানোর বাইরে চলে গেছে ঘটনা। লোকগুলোর প্রায় পঁচিশ মিটারের মধ্যে চলে গিয়ে তিতির উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। দেখলাম, পিস্তল ধরা ডান হাতটা রেখেছে পেটের নীচে, যাতে পিস্তলটা লোকগুলোর নজরে না-পড়ে।

ডানদিকে, লোকগুলোর থেকে একই দূরত্বে আড়াল নিয়ে আমিও সরে গেছি। এবার গাছের গুঁড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তিতিরের থেকে আমি এখনও অনেক দূরে। গাছের গুঁড়ির নীচে একটা পুঁটলি, কাঠ খুদে তৈরি গোল কলসি মতো একটা। বোধহয় মধু পাড়বে তাতে। দু' জোড়া তীর-ধনুক। আর গোটা দশেক তীর একসঙ্গে বাঁধা। লোকগুলো প্রায় আধা-উলঙ্গ। গায়ে দেওয়ার জন্যে একটা করে রঙিন কিটেঙ্গে। ওরা বোধহয় এই-ই এসে পৌঁছল। মধু পাড়বার আগেই বোধ হয় রাতের খাওয়ার সংস্থান করে নিল বুশ্-বাকটা মেরে। ওরা যে খুবই গরিব তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

হঠাৎ মেয়েলি কান্নার কুঁই-কুঁই-কুঁই শব্দ কানে এল। সর্বনাশ। তিতির ! কী, করতে

চায় কী মেয়েটা ? নিজেও মরবে। আমাকেও মারবে।

সোয়াহিলিতে কেঁদে কেঁদে কী যেন বলছিল তিতির। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। লোকগুলো ঐ মেয়েলি কান্না শুনে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর তিতিরকে যখন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখল, তখন আরও চমকে উঠল। একজন তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর লাগাল। মাটিতে বর্শা শোয়ানো ছিল, এতক্ষণ দেখিনি, বর্শা তুলে নিল অন্য একজন। কিন্তু ওদের মধ্যে যে বয়স্ক, সর্দার গোছের, সে-লোকটা ওদের যেন বারণ করল। তীর-ধনুক নামিয়ে রাখল বটে, কিন্তু অন্যজন বর্শা ধরেই থাকল তিতিরের দিকে লক্ষ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তিতির কী বলছে। কেঁদে কেঁদে বলছে, "নিমেপোটিয়া, নিমেপোটিয়া, নিমেপোটিয়া—" এই কথাটা আমাকেও ঋজুদা শিখিয়েছিল। এর মানে হচ্ছে, আমি হারিয়ে গেছি।

লোকটা তিতিরের কাছে গেল, গিয়ে তিতিরের হাত ধরে ওঠাল। আশ্চর্য ! তার হাতে পিস্তল নেই। গেল কোথায় ? ম্যাজিক জানে নাকি ? নিশ্চয়ই পেটের নীচের কোনো পাথরের আড়ালে বা ঝোপে ও লুকিয়ে ফেলেছে। চালু পার্টি ! এমন ঝুঁকির মধ্যেও মাথা একদম কুল্‌ফির মতো ঠাণ্ডা।

লোকটা তিতিরের সঙ্গে অনেক কথা বলতে বলতে ওকে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে এল। কাঠখোদা কলসি থেকে ওকে কাঠের মগে করে জল খেতে দিল। একটা ইয়া গোদা কলাও খেতে দিল। তিতির তখনও কাঁদছিল, নাক-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। একবার মাথা নাড়ছিল আর বারবার বলছিল, আমেফুকা, আমেফুকা ! শুনে তো আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। বলছে কী ? নিশ্চয়ই আমার কথাই বলছে। আমেফুকা মানে, সোয়াহিলিতে, হি ইজ ডেড্। আমাকে মেরে ফেলে ওর লাভ কী হল ? এখন আমি মরিই বা কেমন করে আর তিতিরকে এখানে ফেলে যাই-ই বা কী করে ? এমন বিপদে জীবনে পড়িনি। মেয়ে সঙ্গে করে আফ্রিকায় যিনি এসেছিলেন সেই গ্রেট মিস্টার ঋজু বোস তো দিব্যি কফি-টফি খাচ্ছেন বোধ হয়, সসেজের সঙ্গে। অথবা, পাইপ ফুঁকছেন। আর আমার কী বিপদ ! বিপদ বলে বিপদ !

সর্দারমতো লোকটি তিতিরের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "পোলেনি !" মানে, সরি !

লোকটা ভাল। কিন্তু যে লোকটা বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে লোকটার চোখমুখের ভাব আমার ভাল মনে হচ্ছিল না। তার চোখ ঢুলুঢুলু, মুখ কেমন যেন বেগ্‌নে-বেগ্‌নে। লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলেই বলল, "ভুয়া।" তারপর আবার বলল, "ভুয়া"। বলেই চলল—ভুয়া, ভুয়া, ভুয়া।

কথাটার মানে আমি বুঝলাম না। কিন্তু তিতির যেন বুঝল। ওর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হল। আমি যেদিকে আছি সেদিকে একবার চোখ ফেললে ও। পিস্তলটা আমার হাতেই ছিল। বুড়ো আঙুলটা সেফ্‌টি-ক্যাচের উপর ছুঁইয়ে রাখলাম। ওরা তিনজন, আমি একা।

কিন্তু আমার কিছুই করতে হল না। সর্দার গোছের লোকটি এবং যে লোকটি বুশ্‌-বাকটি বিষতীর দিয়ে মেরেছিল তারা দুজনে মিলে সেই বল্লমধারীর উপর পড়ে এমন মার লাগাতে লাগল কলার কাঁদির মতো হাতে যে, সে জিবা, জিবা, জিবা করে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল।

এমন সময় তিতির আবারও সোয়াহিলিতে কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ বাংলায় টেনে টেনে

বলল, "ওঁহ্। রুদ্র তুঁমি এঁখান থেঁকে চঁলে গিঁয়ে এঁকটু পঁরে হেঁটে হেঁটে এঁএঁসো যেঁন কিঁছুই দেঁখোঁনি আঁর আঁমাকে ভীষঁণ খুঁজঁছ ? আঁমি তো হাঁরিয়েঁ গেঁছি বুঁঝেছ—ওঁ-ওঁ-ও-ও—"

ওরা অবাক হয়ে তাকাল তিতিরের দিকে। আবার তিতির সোয়াহিলিতে ফিরে যাওয়াতে ভাবল, বেশি দুঃখে নিজের ভাষা বেরিয়ে পড়েছিল। চাপতে পারেনি।

তবু, সর্দার একজনকে কী যেন বলল। বলতেই, দেখলাম ঐ বল্লমধারী লোকটাই তরতর করে বাওবাব গাছে উঠতে লাগল। আরে। দেখলাম বড় বড় গজালের মতো কী সব পোঁতা আছে বাওবাবের নরম গুঁড়িতে। তার উপরই পা দিয়ে দিয়ে উঠছে লোকটা। ও আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল, তাই ও উঠতে না উঠতেই যেদিকে উপরে উঠলেও আমাকে ও দেখতে পাবে না সেই দিকে আড়াল নিয়েই আমি জঙ্গলে নিঃশব্দে দৌড় লাগালাম। দুশো মিটার মতো গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই অ্যাবাউট-টার্ন করে 'তিতির, তিতির' বলে ডাকতে ডাকতে বাওবাব গাছের দিকে আসতে লাগলাম; সোজা নয়—এঁকেবেঁকে, পাছে ওরা সন্দেহ করে। তারপর গাছটার কাছাকাছি এসেও ডান দিকে ইচ্ছে করেই ঘুরে ওদের বাঁয়ে রেখে 'তিতির তিতির' করে দৌড়তে লাগলাম, কাঁটা-পাথরে হোঁচট খেতে খেতে। তিতিরের নাম করে এতবার বোধহয় ওর মাও ডাকেননি ওকে জন্মের পর থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য। ওরা কেউই আমাকে ডাকল না। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। ঐ তিতিরের পাকামির জন্যেই আমার কোমরে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও যে-কোনো মুহূর্তে আমার পাঁজরে নিঃশব্দে একটি বিষতীর এসে লাগতে পারে।

এমন সময় হঠাৎ মেঘগর্জনের মতো পেছন থেকে কে যেন ডাকল: জাম্বো! আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই বললাম, "সিজাম্বো।"

পিছন ফিরে দেখি পত্রশূন্য বাওবাব গাছের একটি ডালের উপরে প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে একজন লোক বসে, মাথার উপর হাত তুলে রয়েছে আমার দিকে, সম্ভাষণের ভঙ্গিতে। তার গায়ের লাল আর কালো চাদর হাওয়াতে উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। তার কুচকুচে কালো রঙ, প্রকাণ্ড চেহারা, আর বাওবাব গাছে চড়া তার অদ্ভুত মূর্তি আমাকে ভুষুণ্ডির মাঠের কাঁড়িয়া পিরেতের কথা মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দিল। কাঁড়িয়া পিরেতকে চোখে দেখিনি যদিও, কিন্তু কল্পনায় দেখেছি অনেক। সে ছিল রোগা টিঙটিঙে, আর এ তো তাগড়াই। হাতি জিরাফ এলাণ্ড-এর মাংস খায়! এ তো আর পোস্ত তরকারি আর কলাইয়ের ডাল খাওয়া ভূত নয়।

আমি বাওবাব গাছের দিকে এগোতে এগোতে লোকটাও নেমে এল। এ আবার কে ? এ তো আগে ছিল না।

আমি যেতেই তিতির দৌড়ে এসে আমার উপরে আছড়ে পড়ল। তার চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে। হায় আম্মা! কী অ্যাক্‌টিং, যেন শাবানা আজ্‌মীর মা!

সেই মুহূর্তের পর থেকে আমি নীরব হয়ে গেলাম। কারণ তিতির আর কাঙ্গা-ফিটেঙ্গে পরা লোকগুলো অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও ওরা অনেক কথা বলছিল।

মহা মুশকিলেই পড়লাম! এতদিনে তিতির আমাকে জব্দ করল। ও যদি এখন আমাকে মেরে ফেলতেও বলে, ঐ লোকগুলো বোধহয় তাও ফেলবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিতির হেসে, কেঁদে, গম্ভীর হয়ে লোকগুলোর নেতাই যেন বনে গেল।

কোনো কথাই বুঝতে পারছিলাম না বলেই সন্দেহ হচ্ছিল যে, ওরা বোধহয় সোয়াহিলি নয় ; অন্য কোনো উপজাতিক ভাষায় কথা বলছিল। তবে, লোকগুলোর মুখে ভুষুণ্ডা এবং টর্নাডো এই নাম দুটো বারবার শুনছিলাম। একটু পর ওরা আমাকেও একটু জল আর এক হাত সাইজের একটা কলা খেতে দিল। তারপর সবাই মিলে বুশ-বাকটির চামড়া ছাড়াতে লাগল। অবাক হয়ে দেখলাম, তিতিরও ওদের সাহায্য করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিতির রক্ত-টক্ত মেখে একেবারে ভয়ংকরী চেহারা ধারণ করল। বুশ্-বাকের চামড়া যত্ন করে একপাশে মুড়ে রেখে ওরা আগুন করল।

এদিকে বেলাও আস্তে আস্তে পড়ে আসছে। ঋজুদাও নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে চিন্তা করছে। আমি নিজেও নিজের জন্যে কম চিন্তা করছি না। কিন্তু যেভাবে তিতির লোকগুলোকে অর্ডার করছিল, এমনকী দেখলাম, একজনের নাকও মলে দিল বাঁ হাত দিয়ে এবং যেভাবে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল তাতে ব্যাপার-স্যাপার তিতিরের কল্যাণে যে ভালর দিকেই এগোচ্ছে তাতে আর সন্দেহ রইল না।

আগুন জোর হলে ওরা বুশ্-বাকটার সামনের একটি রাং বার্বিকিউ করতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পাশের আগুনের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে আরেকজন ভুট্টা আর ডাল ফেলে, বুশ্-বাকের মাংস ডুমো ডুমো করে কেটে তাতে দিয়ে 'উগালি' অর্থাৎ আফ্রিকান খিচুড়ি রাঁধতে শুরু করল। টেডি মহম্মদের কথা মনে পড়ে গেল। ও-ও উগালি রেঁধে খাইয়েছিল আমাদের।

আমি বাওবাব গাছে হেলান দিয়ে বসে সামনে চেয়ে ছিলাম, যেদিকে ঋজুদাকে রেখে এসেছি আমরা। সন্ধের ছায়া পড়ছে লম্বা হয়ে বনে প্রান্তরে। দড়াম্ দড়াম্ করে সিংহ ডাকতে লাগল আমাদের পিছন থেকে। নানারকম পাখির আর জন্তু-জানোয়ারের ডাকে সূর্যাস্তবেলার আদিম আফ্রিকা সরগরম হয়ে উঠল।

ওদের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে হাত-গায়ের রক্ত মুছল তিতির। তারপর আমার কাছে এসে বলল, "কী খোকা ? ভয় পেয়েছ ?"

বললাম, "কী, হচ্ছে কী ? তুমি করতে চাইছটা কী, একটু খুলে বলবে দয়া করে ?"

তিতির বলল, "ছেলেমানুষদের সব কথা বলতে নেই ; বললে বুঝবেও না।"

তারপরই বলল, "খোকাবাবু, লেবুঞ্চুস খাবে ?"

বলেই ওর জিনস্-এর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সত্যিই একমুঠো লজেন্স বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, লোকগুলো কুমিরের মতো ড্যাব্‌ড্যাবে চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। নিলাম একটা। ওদেরও দিল তিতির। তারপর পা ছড়িয়ে বসে ওদের সঙ্গে আবারও গল্প জুড়ে দিল। আবারও মাঝে-মাঝেই ভুষুণ্ডা আর টর্নাডোর নাম শুনতে পেলাম।

এদিকে উগালি আর বুশ্-বাকের বারবিকিউ বেশ এগিয়েছে বলে মনে হল। ওদের মধ্যে যে বুড়োমতো সর্দার গোছের, সে একফালি পোড়া মাংস কেটে মুখে ফেলে এমন বীভৎস মুখভঙ্গি করল যে মনে হল অজ্ঞানই হয়ে গেল বুঝি। পরক্ষণেই বুঝলাম যে, স্বাদটা যে দারুণ হচ্ছে তারই লক্ষণমাত্র। অন্য একজন একটি কাঠের পাত্রে করে পাথুরে নুন আর ধেড়ে ধেড়ে শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসে ঠিকঠাক করে রাখল একপাশে। ঠিক সেই সময় তিতির হাসিমুখে আমাকে বলল, "খোকাবাবু, এবারে গিয়ে তোমার গুরুদেবকে ডেকে নিয়ে এসো। দুজনে মিলে দুটি জিপই চালিয়ে নিয়ে এসো, তবে হেড-লাইট জ্বেলো না। টর্নাডো এবং তোমাদের পরমপ্রিয় ভুষুণ্ডা কাছাকাছি আছে। যা শুনলাম

আর বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে দিন তিন-চারেকের মধ্যেই মামলার নিষ্পত্তি হবে। অনেকদিন টুবুলটাকে দেখি না। কলকাতা ফিরব এবারে। বাঙালির মেয়ে, বেশিদিন কি কলকাতা ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে!"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম ও ঠাট্টা করছে কি না।

কিন্তু আমার সন্দেহভঞ্জন করে ও বলল, "যাও খোকা, আর দেরি নয়।"

আমি যখন এগোলাম প্রায়ান্ধকারে তখনও লোকগুলো কোনো আপত্তি করল না।

নাঃ! মেয়েটা আমারই শুধু নয়, ঋজুদারও প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার করে দিল। ওই-ই কিনা নেতা বনল শেষে! কী খিট্‌ক্যাল, কী খিট্‌ক্যাল! ছিঃ!

অন্ধকারে পড়েই পিস্তলটা বের করলাম। কখন কোন বাবাজির ঘাড়ে গিয়ে পড়ি তার ঠিক কী! সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি। সিংহর বা অন্য জানোয়ারের ভয় আমার নেই, আমার ভয় কেবল সাপের। দেখলেই গা কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে। তাছাড়া গতবারে এখানে গাব্বুন ভাইপার যা শিক্ষা দিয়েছিল! তার উপর অ্যালবিনোর সেই পেল্লায় সাপ।

বেশিদূর এগোইনি, তখনও জিপ থেকে বহুদূরে, এমন সময় সামনের একটা গাছ থেকে কেঠো ভূতের মতো ঋজুদার গলা পেলাম। একটি চাপা, সংক্ষিপ্ত শব্দ।

"ইডিয়ট্!"

চমকে বললাম, "কে? কোথায়?"

"তুই! এইখানে!"

"গাছ থেকে নামো!"

"কোথায় ফেলে এলি মেয়েটাকে?"

"মেয়ে!"

"তার মানে?"

"ব্রহ্মদত্যি। তুমি গুরু, গুড়ই রয়ে গেলে, চেলা তোমার চিনি হয়ে বেরিয়ে গেল।"

ঋজুদা রাইফেলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "ধর্।"

রাইফেলটা নিতেই, গাছ থেকে ধপ করে নামল। তম্বি করে বলল, "কোথায় সে?"

"রান্না করছে। তোমারও নেমন্তন্ন। আমারও। চল, জিপ দুটো নিয়ে আসি। তিতির যা বলল, তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হতে আর বিশেষ দেরি নেই।"

"তিতিরকে কাদের হাতে দিয়ে এলি? আচ্ছা বে-আক্কেলে তো তুই!"

"কাদের হাতে আবার? হার প্যাল্স্। ওল্ড ফেইথফুল প্যালস্। নাইস, ওয়ার্ম গাঈজ; য়ু নো!"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম ঋজুদাকে।

এবারে জেবড়ে যাওয়া ঋজুদা ধমক লাগাল। বলল, "দেখ্ রুদ্র! বড় ফাজিল হয়েছিস। সবসময় ফাজলামো ভাল লাগে না।"

"আমি কী ফাজলামি করলাম?" জিপের স্টিয়ারিং-এ বসতে বসতে বললাম। "একেই বলে খাল কেটে কুমির আনা! দুগ্ধপোষ্য মেয়েকে অ্যাডভেঞ্চার করাতে এনে তুমি নিজের ক্যাপটেনসিই খুইয়ে বসলে।"

জিপটা স্টার্ট করে বললাম, "হেডলাইট জ্বালিও না। ফলো মি!"

অন্ধকারে ঋজুদার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যিস, পাচ্ছিলাম না। ঋজুদা

বোধহয় জীবনে এমন অবিশ্বাস্য অবস্থায় কখনও পড়েনি। ব্যাপার-স্যাপার সব তার নিজের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে এ কথা বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া ঋজুদার পক্ষে যে কত কষ্টের তা বুঝি আমি। শুধু নেতারাই একমাত্র বোঝে, গদি হারানোর যন্ত্রণা !

জিপটাকে অনেকখানি ঘুরিয়ে আনলাম। কারণ মধ্যে একটা নালামতো ছিল এবং বড় বড় পাথরও ছিল। খুব আস্তে আস্তে অন্ধকারে সাবধানে চালিয়ে যখন সেই বাওবাব গাছের নীচে এসে পৌঁছলাম তখন নাটক পুরো জমে গেছে। দেখলাম, তিতির একটা উঁচু পাথরে বসে আছে রানীর মত আর ঐ তিনটি লোক তার পায়ের কাছে বসে গল্প শুনছে। ফুট্-ফাট্ শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। কোনো বুড়ির অভিশাপের মতো বিড়বিড় শব্দ করে উগালি শুকোচ্ছে উনুনের হাঁড়িতে।

আমরা জিপ থেকে নামতেই তিতির লাফিয়ে নামল পাথরটা থেকে। এবং ওর সঙ্গে ঐ তিনজন লোকও চলে এল ঋজুদার কাছে। তিতিরের নির্দেশে, লোকগুলো ঋজুদাকে জাম্বো, জাম্বো করে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু জবাবে সিজাম্বো বলার পর ঋজুদাকেও চুপ মেরে যেতে হল। আবারও তিতির ওদের সঙ্গে কল্‌কল্ খল্‌খল্ করে কথা বলতে লাগল অনর্গল। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঋজুদা অস্ফুটে বলল, "ওরা হেহে ডায়ালেক্টে কথা বলছে রে রুদ্র ! তিতির এমন অনর্গল হেহে বলতে পারে ? আশ্চর্য !"

আমি হেসে বললাম, "হেঁ হেঁ ! হেহে ! স্যার, নিজের নীচে কখনও নিজের চেয়ে বেশি ওস্তাদ লোককে রাখতে নেই। এবার বোঝো। দেশেও মেয়েমানুষ প্রধানমন্ত্রী, এই আফ্রিকার জঙ্গলে এসেও মেয়েদের কাছেই ছোট হওয়া। ছিঃ ছিঃ। আমারও আর দরকার নেই তোমার এই যাত্রাদলে থেকে। ইন্দিরা গান্ধী আর মার্গারেট থ্যাচারের অধীনস্থ হয়ে অনেক পুরুষ মন্ত্রী হয়ে থাকলে থাকুন ; আমি থাকব না। ভট্‌কাইকে নিয়ে আমি নতুন যাত্রাদল খুলব। কী লজ্জা। কী লজ্জা।"

ঋজুদা একটু সামলে নিয়ে জিপ থেকে দু-তিনটে বোতল এনে ঐ লোকগুলোকে দিল। বলল, "ওরা নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছে, বদলে তো ওদেরও কিছু দিতে হয় !"

বললাম, "কী ওগুলো ?"

"মৃতসঞ্জীবনী সুরা।"

"খেলে কী হয় ?"

"মরা মানুষও জেগে ওঠে।"

"তাহলে আমাকেও দাও একটু। আমি আর বেঁচে নেই। এমন কাটা সৈনিক হয়ে আমি বাঁচব না।"

ঋজুদা এবার পাইপটা জম্পেশ করে ধরিয়ে বোতলগুলো ওদের দিতেই ওরা আনন্দে আড়াই পাক টুইস্ট নেচে নিল। ঋজুদাকে ধন্যবাদ দিল।

আমি বললাম, "দেবে না আমাকে ?"

"দেব। তোর জন্যেও এসেছি। সারিবাদি সালসা। খেতে খুব তেতো। নাই-ই বা খেলি। এখন তিতির দেবী কী বলেন আর করেন তা দেখলেই চাঙ্গা হয়ে যাব আমরা।"

ওরা যখন মহোল্লাসে বোতলগুলো নিয়ে মৃতসঞ্জীবনী সুরা খেতে শুরু করল তখন তিতির বলল, "ঋজুকাকা, কেল্লা ফতে ! এই লোকগুলো টেডি মহম্মদ, ভুষুণ্ডা, টর্নাডো এবং ওয়ানাবেরিকেও চেনে। ভুষুণ্ডা ওদের আরেক বন্ধুকেও অমন করে মেরেছে গোরোংগোরো ক্র্যাটারের কাছে। টর্নাডো ওদের দিয়েই সব করায় অথচ পয়সা দেয় না কিছুই। জেল খাটবার সময় ওরা, মার খাবার সময় ওরা, আর পয়সা লুটবার সময়

টর্নাডোরা। ভুষুণ্ডা নাকি তিনদিন আগে এখানে এসেছে। ওরা চোরা-শিকারের কাজ শেষ করে একটু মধু পেড়ে বাড়ি যাবে বলে এসেছিল এদিকে। ওদের আস্তানাতেই ভুষুণ্ডা আছে। ওদের সঙ্গে মেশিনগানও আছে। এদিকে হাতি মারাই ওদের আসল কাজ। গত এক মাসে চুরি করে তিরিশটি টাস্কার মেরেছে ওরা। সব দাঁত এখনও চালান দিতে পারেনি। ওদের ডেরাতে এখনও পনেরো জোড়া মস্ত মস্ত হাতির দাঁত আছে। ওরা একটা পাহাড়ের গুহাতে ক্যাম্প করে আছে। এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে।"

"মাত্র মাইল ছয়েক দূরে? বলিস কী রে? আর তা জেনেও তোরা এখানে আগুন করে বারবিকিউ করছিস আর হুল্লোড় করছিস? টর্নাডো নিজে যদি ছ' মাইল দূরে থেকে থাকে, তাহলে তার চারদিকে তার চর আর স্নাইপার্সরাও আছে। বারবিকিউ করা বুশ্-বাক আর উগালি যখন খাবি, তখনই স্নাইপারদের টেলিস্কোপিক-লেন্স লাগানো রাইফেলের গুলি এসে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে আমাদের সবাইকে। ওরাও তো বোকা নয়, তুইও নোস্। এমন মূর্খামি কেউ করে? আমি হেহে বুঝি না—কিন্তু আমার ভয় করছে এরাও বোধহয় আমাদের ট্রাপ করছে। যদি তাই-ই করে, তাহলে এবারে আর কাউকেই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না এখান থেকে।"

এই কথাতে, তিতিরের মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল। ও একদৃষ্টে ঐ তিনটি লোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকগুলো বোতল থেকে ঋজুদার দেওয়া মৃতসঞ্জীবনী সুরা খাচ্ছিল আর ছেলেমানুষের মতো হাসছিল। আগুনের আভা ওদের চকচকে কুচকুচে কালো হাঁড়ির মতো মুখ আর সাদা সাদা বড় বড় দাঁতে ঝিলিক মেরে যাচ্ছিল।

তিতির মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, "না ঋজুকাকা। ওরা মানুষ ভাল। মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে গেলে কি অন্য মানুষ বাঁচে?"

আমি বললাম, "বিশ্বাস তো আমরা ভুষুণ্ডাকেও করেছিলাম গুগুনোগুম্বারের দেশে। লাভ কী হল? ডামুকেও ত ঋজুদা আবার বিশ্বাস করেছিল।"

"তোমরা মানুষ চেনো না। আমি বলছি এরা মানুষ ভাল। সন্দেহ নিয়ে জীবনে কেউই কিছু পায় না। আওরেঙ্গজেবের এত বড় সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে গেল শুধুই সন্দেহ করে করে। তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহলে ওদেরও করতে হবে।"

তিতির কী বলে, দেখবার জন্যে বললাম, "আমি ভাবছি আজ রাত্রেই এই তিনটেকে ঋজুদার সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা দিয়ে সাবড়ে দেব।"

তিতির ফুঁসে উঠল। বলল, "ডোণ্ট বি সিলি! যদি ওদের বিশ্বাসই না করো, তাহলে তুমি আর ঋজুকাকা চলে যাও। আমি ওদের সঙ্গে আছি। আমাকে শুধু কটা ডিনামাইট দিয়ে যাও, আর শিখিয়ে দিয়ে যাও কী করে তা ডিটোনেট করতে হয়। আমি একাই টর্নাডো আর ভুষুণ্ডাকে শেষ করে তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

ঋজুদা তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "হুম্‌ম্।"

"কী?"

"হুম্‌ম্‌ম্‌ম্।"

"ওদের বিশ্বাস করছ তো?"

"হুঁ। তুই যখন বলছিস। তাছাড়া এখন তুই-ই তো কম্যাণ্ডার। তুই যা বলবি, তাই-ই হবে।"

পনি-টেইল দুলিয়ে তিতির আবার আমাদের তিতির হয়ে গিয়ে হাসল। বলল, "ঠাট্টা

কোরো না। তুমি ভাল করেই জানো কে কম্যাণ্ডার ; আর কে নয় !"

এর পর তিতির আবার ওদের কাছে ফিরে গেল। রাক্স্যাক্ থেকে কাগজ বের করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাথরে বসে একটা ম্যাপ করতে লাগল।

ঋজুদা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "কী বুঝলেন মিস্টার রুদ্রুদ্দরবাবু ?"

"বেশি পেকেছে ! পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।"

ফুক্ করে একটু হেসে উঠল ঋজুদা। বলল, "তুই একটা পাক্কা মেল শভিনিস্ট্। মেয়েদের তুই মানুষ বলেই গণ্য করতে চাস না। এটা কুশিক্ষা। আমি তো ভাবছি তিতিরের কথা। যখন ওকে আনব বলে ঠিক করি, তখন কি একবারও ভেবেছিলাম যে, ওর মধ্যে কর্তৃত্ব দেবার এতখানি ক্ষমতা ছিল ? আশ্চর্য ! কতটুকু মেয়ে।"

আমি রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লাম। বললাম, "এ কথার মানেটা কী ? তুমি কি তিতিরকে এই ক্রিটিকাল সময়ে নেতা বানিয়ে দিতে চাও নাকি ? তাহলে আমি নেই।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "নেতা কেউ কাউকে বানাতে পারে না রে রুদ্র ! নেতা আর নেতৃত্বর দাবিতেই নিজের থেকেই নেতা হয়ে ওঠে। বানানো নেতারা কোনোদিনও ধোপে টেঁকে না। নেতা হওয়ার চেয়েও অনেক বড় গুণ কী জানিস ?"

"কী ?"

"উদারতার সঙ্গে, নিজে বাহাদুরি না নিয়ে অন্যর নেতৃত্ব খুশি মনে মেনে নেওয়া। আমাদের সকলেরই যা উদ্দেশ্য, যে কারণে আমরা সকলে আফ্রিকাতে এসেছি এবারে, তা যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে নেতাগিরি আমি করলাম কি তুই করলি তাতে কিছুই যায় আসে না। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হলেই হল।"

একটু চুপ করে থেকে বলল, "রুদ্র, যখন বড় হবি, তখন বুঝতে পারবি, আমাদের চমৎকার দেশ, আমাদের ভারতবর্ষ কত বড় হতে পারত, যদি দেশে নেতা-হতে-চাওয়া লোকের সংখ্যা বেশি হত। এ নিয়ে আর কথা নয়। তিতিরকে আমি এবং তুই হাসিমুখে নেতা বলে মেনে নিচ্ছি। উই উইল জাস্ট ওবে হার কম্যাণ্ডস্। তাতে যা হবার তা হবে। আমাকে ভুষুণ্ডা গুগুনোগুম্বারের দেশে গুলি করার পর তুই-ই তো নেতা হয়েছিলি নিজের থেকেই। মনে নেই ! আমার দেওয়ার অপেক্ষায় কি ছিলি তুই ? ওরে পাগলা, নেতৃত্ব কেড়ে নিতে হয়। সম্মানে আর শ্রদ্ধায়। নেতৃত্ব ভিক্ষা চেয়ে কেউই কোনোদিন পায় না। এবারে তিতির আমার এবং তোর কাছ থেকে নেতাগিরি কেড়ে নিয়েছে ; আমাদের সকলের ভালর জন্যে, ওর যোগ্যতার দাবিতে। এ নিয়ে আর একটিও কথা নয়। অ্যাডভেঞ্চারার হবি, স্পোর্টস্‌ম্যান হবি আর ক্যাপ্‌টেনের ক্যাপটেইন্‌সি মানতে সম্মানে লাগবে ? ছিঃ। তা যারা করে, তারা নামেই খেলোয়াড়, নামেই অভিযাত্রী ; আসলে নয়। খেলার মাঠ, অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি আর মানুষের জীবন আসলে সবই এক। যে লোক খেলার মাঠে ফাউল করে, চুরি করে পেনাল্টি কিক্ নেয়, সে জীবনেও তাই-ই নেয়। তার ছবি বেরোতে পারে একদিন, দুদিন, তিনদিন খবরের কাগজে কিন্তু সে কারো মনেই থাকে না কখনও। পাকা কিছু, বড় কিছু পেতে হলে, তার ভিত গাঁথতে হয় পাকা করেই। বিবেকানন্দ বলেছিলেন পড়িসনি ? চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না।"

আমি ভাবছিলাম, বড় জ্ঞান দেয় ঋজুদাটা ! কখন টর্নাডোর আর ভুষুণ্ডার গুলি এসে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেবে সে চিন্তা নেই, শুধু জ্ঞানই দিয়ে যাচ্ছে। নন্‌স্টপ জ্ঞান।

তিতির এসে খেতে ডাকল আমাদের। প্লাস্টিকের প্লেট আর গ্লাস বের করল ও

জিপের পেছন থেকে। বলল, "এসো রুদ্র, এসো ঋজুকাকা।"

মনে মনে বললাম, ইয়েস ম্যাম্।

মুখে কিছুই বললাম না।

তিতিরের পিছু পিছু হেঁটে গেলাম।

কেন জানি না, হঠাৎ মনে দারুণ এক গভীর আনন্দ আর শান্তি পেলাম। এখানে এসে অবধি, এসে অবধি কেন, তার আগে থেকেই তিতিরের ব্যাপারে আমার মনে বড় একটা প্রতিযোগিতার ভাব ছিল। কে জেতে ? কে হারে ? কে বড় ? কে ছোট ? এমন একটা ভাব। এই প্রথম, তিতিরের পিছনে পিছনে ঋজুদার পাশে পাশে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎই আমার মনে হল যে, মেনে-নেওয়ার মধ্যে যতখানি বড় হওয়ার ব্যাপার থাকে, জোর করে মানানোর মধ্যে বোধহয় কখনোই তা থাকে না। তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম যে, এই হেলাফেলায় নিজেকে ছোট করার ক্ষমতা আছে বলেই ঋজুদা আমার অথবা তিতিরের চেয়ে আসলে অনেক অনেক বড়।

মিথ্যে নেতাদের সত্যি নেতা।

ঋজুদা খেতে খেতে তিতিরকে বলল, "সবই ভাল, শুধু কথাবার্তা একটু আস্তে আস্তে বলতে বল, আর আগুনটা যত তাড়াতাড়ি পারিস নিবিয়ে দে।"

তিতির ওদের সে কথা বলল। ওরা যে সোয়াহিলি জানে না তা নয়, কিন্তু তিতির ওদের সঙ্গে হেহে ভাষায় কথা বলছে ওদের কনফিডেন্স উইন করার জন্যে। হেহে জানাতে ও যত তাড়াতাড়ি ওদের কাছে চলে যেতে পারল, তা সোয়াহিলি হলে সম্ভব হত না।

খেতে খেতেই তিতির বলল, "আই রুদ্র! আমার পিস্তলটার কথা একদম ভুলে গেছিলাম। নিয়ে এসো না প্লিজ।"

"পিস্তল ? কোথায় সেটা ? কী বিপদ। তোদের বলেছিলাম না, এক মিনিটও হাতছাড়া করবি না!"

তিতির বলল, "সময়কালে পিস্তলটি হাতছাড়া না করলে আমার প্রাণটিই খাঁচাছাড়া হয়ে যেত ঋজুকাকা।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "কোথায় শুয়েছিলাম আমি তা মনে আছে তো ? নাকি যাব আমি ?"

"আছে আছে" বলে টর্চটা নিয়ে গিয়ে তিতিরের পিস্তলটা নিয়ে এলাম। একটা পাথরের নিচে রেখেছিল।

তিতির সেটাকে এঁটোমুখেই একটা চুমু খেল, চুঃ করে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে হোল্স্টারে ভরল।

খাওয়া-দাওয়া হতে হতেই আগুন নিবিয়ে দেওয়া হল। বুড়োমতো লোকটা বাওবাব গাছের উপরে চড়ে গেল একটা কম্বল কাঁধে নিয়ে। রাতে চারধার দেখবে ও।

ঋজুদা বলল, "তিতির যাইই বলুক, আমি অন্ধ বিশ্বাস করতে রাজী নই এদের। সেটা নেহাতই বোকামি হবে। তিতির ওদের বল্, ওরা যেমন বাওয়াব গাছের পেটের মধ্যের বাড়িতে শুয়ে ছিল তেমনই শুতে। আমরা বাইরে থেকে ওদের পাহারা দেব। বুড়ো তো রইল গাছের মাথায়। আমি আর তুই থাকব একটা জিপে। আর রুদ্র পাশেরটায়। আমার বাঁ চোখটা ক্রমাগত নাচছে। মন বলছে আজ রাতে আমাদের কারোই ঘুমুনোটা

ঠিক হবে না।"

"যেমন বলবে।" তিতির বলল।

"রুদ্র, জিপ থেকে আমাদের রাইফেলগুলোও বের কর। সময় হয়েছে। এখনও বের না করে রাখলে, হয়তো বোকাও বনতে হতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

বলে, আমি ঋজুদার অর্ডার ক্যারি আউট করতে চলে গেলাম। ফিরে এসে, যার যার রাইফেল স্লিং-এ ঝুলিয়ে অ্যামুনেশন বেল্টসুদ্ধ বুঝিয়ে দিলাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "চাঁদ উঠবে শেষ রাতের দিকে। তিতির, বুড়োকে বলে দে ; সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলে যেন কথা না বলে। ও যেন স্টার্লিং-এর ডাক ডাকে।"

আমি বললাম, "খুব বললে তো ! রাতে কি স্টার্লিং ডাকে নাকি ? এ ডাক শুনেই তো স্নাইপার ওকে কড়াক্-পিঙ করে দেবে।"

"দ্যাট্স্ রাইট্ ! ঠিক বলেছিস। তবে ?"

ঋজুদা যেন খুব সমস্যায় পড়েছে এমন মুখ করে বলল।

আমি বললাম, "তোমার পিস্তলের কার্টিজের এম্প্‌টি শেল্‌গুলো আমি জমিয়ে রেখেছি। ওকে সেগুলো দিয়ে দাও। বলে দাও, কিছু দেখলে ও যেন ঐ এম্পটি শেল্ জিপের বনেটের উপর ছুঁড়ে মারে। তাতে যা শব্দ হবে, তা দূর থেকে শোনা যাবে না।"

তিতির বলল, "চমৎকার ! ধাতব শব্দ জঙ্গলে স্বাভাবিক নয়। সামান্য শব্দ হলেও তা অস্বাভাবিক শোনাবে। সে শব্দ ত যারা আসবে তারাও শুনতে পাবে। অত কায়দার দরকার নেই। ওকে বলেছি, গাছ থেকে নেমে এসে আমাদের বলবে।"

ঋজুদা বলল, "বাওবাব গাছে তো ডালপালা বেশি নেই। ঐ গাছ থেকে কোনো কিছু দেখে নামতে গেলে, ঐ নড়াচড়া রাতের আকাশের পটভূমিতে চোখে পড়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। নাইলনের দড়ি তো আছেই আমাদের কাছে। ওর ডানপায়ে বেঁধে নিতে বল এক প্রান্ত, আর রুদ্রর বাঁ পায়ে অন্য প্রান্ত।"

তিতির বলল, "রুদ্রর নাকের সঙ্গেই বেঁধে দাও না ঋজুকাকা।"

কিছু বললাম না। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। দেখাব ওকে আমি। তাইই করা হল। তবে অন্য প্রান্ত আমার পায়ে না বেঁধে একটা সাদা তোয়ালের সঙ্গে বেঁধে সেটা গাছতলায় নামিয়ে দেওয়া হল। তোয়ালেটা আমাদের দিক থেকেই শুধু দেখা যাবে। দড়ি ধরে নাড়লেই তোয়ালেটা নড়বে। ফার্স্ট-ক্লাস বন্দোবস্ত।

ভাল ঠাণ্ডা আছে। পরিষ্কার তারাভরা আকাশ। নানারকম পশু আর পাখির আওয়াজে চতুর্দিক চম্‌কে চম্‌কে উঠছে।

কত কোটি বছর ধরে এই কৃষ্ণমহাদেশের গভীর গহনে কতরকম জন্তু-জানোয়ার আর পশুপাখি রাজত্ব করছে কে জানে ! একদিন ছিল, যেদিন মানুষ আর পশুপাখির মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক থাকলেও তার মধ্যে ব্যবসায়িক মুনাফার কোনো ব্যাপার ছিল না। মানুষের মস্তিষ্ক যত মারণাস্ত্র তৈরি করছে, ততই তা প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের নিজেরই মৃত্যুর জন্যে এবং অর্থলোলুপতায় পশুপাখিদের অর্থহীন বিনাশের জন্যে, অগণ্য সংখ্যায়।

ভারী চমৎকার লাগে এই উদোম রাতে বাইরে কাটাতে। এই উদলা জীবন আমাদের দেশেও চমৎকার লাগে। আমাদের দেশের কর্ণাটক, গুজরাটের কোনো কোনো অংশ, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ ছাড়া অন্য বিশেষ কোথাওই আফ্রিকার মতো এমন দিগন্তবিস্তৃত

দৃশ্য চোখে পড়ে না।

তিতির কম্বলের তলায় নিজেকে মুড়ে কাড়লি-বেবি হয়ে ঋজুদার পাশে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আদুরে গলায় বলল, "ঋজুকাকা, একটা গল্প বলো না, ওয়ানাবেরি ওয়ানাকিরির মতো কোনো গল্প—মিথোলজিকাল।"

ঢং দেখে আমার হাসি পেল। কলকাতায় ঠাকুরমার কোলের কাছে শুয়ে নীলকমল লালকমলের গল্প শুনলেই হত! যত্ত সব!

ঋজুদাও তেমন। বলল, "গল্প? দাঁড়া ভেবে নি।" বলে, পাইপটা ভাল করে ঠেসেঠুসে নিয়ে, যাতে মাঝরাত অবধি চলে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। পাইপের একটা সুবিধে এই যে আগুনটা খোলের মধ্যে থাকে বলে দূর থেকে বা পাশ থেকে রাতের বেলা তা দেখা যায় না সিগারেটের আগুনের মতো। যদিও, আলো থাকলে ধোঁয়া দেখা যায়। হাওয়া থাকলে পাইপের পোড়া তামাকের গন্ধ উড়ে যায় অনেক পথ। হাওয়ার তীব্রতা এবং গন্তব্যের উপর নির্ভর করে তার ওড়া।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "শোন্, তবে বলি। রুদ্র, তুইও শোন। কিন্তু ডানদিকে চোখ রাখিস একটু।

অনেকদিন আগে একজন কালাবার শিকারী ছিল। তার নাম ছিল এফিয়ং। এফিয়ং বুশ্-কানট্রিতে থাকত। অনেক জন্তু-জানোয়ার শিকার করে সে পয়সা করেছিল। ঐ অঞ্চলের সকলেই তাকে জানত-চিনত। এফিয়ং-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল ওকুন্। উকুন নয় রে, বুঝলি তো তিতির!"

"বুঝলাম। ওদের নামগুলোই তো উদ্ভট উদ্ভট। তারপর?"

"ওকুনের বাড়ি ছিল এফিয়ং-এর বাড়ির কাছে। এফিয়ং ছিল একনম্বরের উড়নচণ্ডি, প্রায় আমারই মতো। খেয়ে এবং খাইয়ে এত পয়সাই সে নষ্ট করল যে, দেখতে দেখতে সে একদিন গরিব হয়ে গেল। খুবই গরিব। শেষে অভাবের তাড়নায় তাকে আবার শিকারে বেরোতে হল। কিন্তু হলে কী হয়, তার ভাগ্যদেবী তাকে ছেড়ে গেছেন বলে মনে হল ওর। যতদিন মানুষের ভাগ্য ভাল থাকে, ততদিন মানুষ ভাবে, তার যা-কিছু ভাল হয়েছে তার সব কৃতিত্ব তারই; তারই একার। কিন্তু ভাগ্যদেবী যেদিন চলে যান ছেড়ে, সেদিন সে বুঝতে পারে তার সব কৃতিত্ব নিয়েও সে মোটেই বেশিদূর এগোতে পারল না। সকাল থেকে সন্ধে অবধি ঝোপেঝাড়ে চুপিসারে ঘুরে ঘুরেও কোনো কিছু ধরতে বা শিকার করতে পারল না ও।

কিছুদিন আগে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এফিয়ং-এর সঙ্গে একটি লেপার্ডের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এবং একটি বুশক্যাট-এর সঙ্গেও। একদিন খিদের জ্বালায় এফিয়ং সে তার বন্ধু ওকুনের কাছে গিয়ে দুশো টাকা (রড্স) ধার চাইল। ওকুন এককথায় সে টাকা দিয়ে দিল। এফিয়ং ওকুনকে এক বিশেষ দিনে তার বাড়িতে আসতে বলল টাকা ফেরত নেওয়ার জন্যে। এও বলল যে, যখন আসবে, তখন যেন তার বন্দুকটা নিয়ে আসে সঙ্গে করে এবং গুলি ভরেই যেন আনে।

এফিয়ং যেমন করে লেপার্ড ও বুশক্যাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল তেমনভাবেই একদিন শিকারে গিয়ে একটা খামারবাড়িতে রাতে থাকাকালীন সে একটা মোরগ আর একটা ছাগলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করেছিল। যখন এফিয়ং ওকুনের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় এবং যখন তাকে তার বাড়িতে তা শোধ নিতে আসতে বলে, তখনও কী করে সে এ ধার শুধবে তা জানত না। কিন্তু সে অনেক ভেবে ভেবে বুদ্ধি বের করল একটা। দুর্বুদ্ধি।

পরদিন সে তার বন্ধু লেপার্ডের কাছে গেল এবং তার কাছ থেকেও দুশো রড্‌স ধার চাইল। যেদিন ও যে সময়ে ওকুনকে আসতে বলেছিল, সেদিন লেপার্ডকেও বলল তার বাড়ি এসে টাকাটা নিয়ে যেতে। বলল যে, এফিয়ং নিজে যদি বাড়িতে না থাকে, তবে ওর বাড়িতে লেপার্ড যা কিছু পাবে তাইই যেন খায়। এবং তারপর যেন এফিয়ং-এর জন্য অপেক্ষা করে। এফিয়ং এসে টাকা দিয়ে দেবে।

লেপার্ড বলল, ঠিক আছে।

এরপরে এফিয়ং ওর বন্ধু সেই ছাগলের কাছে গেল। গিয়ে তার কাছ থেকেও দুশো টাকা (রড্‌স) ধার চাইল এবং তাকেও ঐ দিনে ঐ সময়ে তার বাড়িতে যাবার কথা বলল এবং তাকেও বলল, এফিয়ং বাড়ি না থাকলে, তার বাড়িতে যা থাকে তা যেন সে খায় এবং যেন ওর ফেরার অপেক্ষা করে।

এমনি করে বুশক্যাট এবং মোরগের কাছ থেকেও এফিয়ং টাকা ধার করে ওদেরও ঐ একই দিনে টাকা নিতে আসতে বলল একই রকম ভাবে।

সেই দিনে, মানে যেদিন ওকুনের এবং অন্য সবারই আসার কথা, এফিয়ং তার উঠোনে কিছুটা ভুট্টা ছড়িয়ে রাখল। তারপর বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

সে চলে যাবার পরই মোরগ এল। এসে দেখে, এফিয়ং বাড়ি নেই। এদিক-ওদিক ঘুরতেই তার চোখে পড়ল উঠোনে ভুট্টা ছড়ানো আছে। মোরগ এফিয়ং-এর কথা মনে করল, তার বাড়িতে যা পাবে তা খেতে বলার কথা। ভুট্টা খেতে শুরু করল মোরগটা। এমন সময় বুশক্যাটটা এল। সেও দেখে বাড়িতে এফিয়ং নেই, কিন্তু একটা মোরগ আছে। একমুহূর্তে কুঁক্ কুঁক্ করা মোরগের ঘাড়ে পড়ে সে মোরগকে মেরে, তাকে খেতে লাগল। এমন সময় ছাগলটা এল। এসে দেখে এফিয়ং নেই, কোনো খাবার-দাবারও নেই, থাকার মধ্যে একটা রক্তাক্ত মোরগ-খাওয়া বুশক্যাট। এফিয়ং বাড়ি না থাকায় ছাগল চটে গিয়েদৌড়ে এসে বুশক্যাটটাকে এমন গুঁতোন গুতোল শিং দিয়ে যে সে একটু হলে প্রাণে মরত। বিরক্ত হয়ে সে আধ-খাওয়া মোরগটা মুখে করে এফিয়ং-এর বাড়ি ছেড়ে ঝোপের দিকে দৌড় লাগাল। কিন্তু এফিয়ং-এর জন্যে ওর বাড়িতে অপেক্ষা না করায় ওর শর্তভঙ্গ হল—টাকাটা ফেরত পাবার কোনোই সম্ভাবনা আর ওর রইল না। এমন সময় লেপার্ডটা এল। এসে দেখে এফিয়ং বাড়ি নেই। একটা ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেপার্ডের খিদেও পেয়েছিল। সে ভাবল, এফিয়ংই বুঝি তার জন্যে বন্দোবস্ত করে গেছে। ছাগলটাকে ঘাড় মট্‌কাল লেপার্ডটা। এবং খেতে লাগল। ঠিক এমন সময় এফিয়ং-এর বন্ধু ওকুনও এফিয়ং-এর কথা মতো বন্দুক-হাতে এসে পৌঁছল। সে দূর থেকে দেখল লেপার্ড উঠোনে বসে ছাগল ধরে খাচ্ছে। শিকারী ওকুন তখন চুপিসারে এসে ভাল করে নিশানা নিয়ে ঘোড়া দেবে দিল। লেপার্ড চিতপটাং হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় এফিয়ং ফিরে এসে ওকুনকে বকাবকি করতে লাগল, তার বন্ধু লেপার্ডকে সে মেরেছে বলে। এফিয়ং এও শাসাল যে, রাজার কাছে সে নালিশ করে দেবে।

ওকুন ভয় পেল এবং রাজাকে বলতে মানা করল।

এফিয়ং বলল, তা কি হয় ? বলতেই হবে।

তখন ওকুন আরো ভয় পেয়ে বলল, যাক্ গে যাক্ আমার টাকা তোমাকে শোধ দিতে হবে না, রাজাকে তুমি বোলো না শুধু।

এফিয়ং অনেক ভেবেটেবে কান চুলকে বলল, আচ্ছা। তুমি যখন বলছ। যাও তুমি। এখন আমার বন্ধু লেপার্ডের মৃত শরীরকে কবর দিতে হবে আমায়।

এই ভাবে এফিয়ং মোরগ, বুশক্যাট, ছাগল, লেপার্ড এমন-কী ওকুনের টাকাটাও মেরে দিল।

ওকুন চলে যেতেই, এফিয়ং মরা লেপার্ডকে টেনে এনে তার চামড়া ছাড়াল। তারপর তা শুকিয়ে তাতে নুন ফট্‌কিরি ছড়িয়ে ঠিকঠাক করে রেখে দিল। দূরের গ্রামের হাটে পরে সেই চামড়া নিয়ে গিয়েও বিক্রি করে এফিয়ং অনেক টাকা পেল।"

"তারপর ?"

তিতির বলল ফিসফিস করে।

"তারপর আর কী ? ঋজুদা বলল, "এখন, যখনই কোনো বুশক্যাট কোনো মোরগকে দেখে, সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে খায়। মেরে খেয়ে এফিয়ং-এর না-শোধা টাকা উশুল করার চেষ্টা করে।"

"তারপর ?"

"তারপর কী ?" এই গল্পের একটা মর‍্যাল আছে। সেটা হচ্ছে কখনও কোনো মানুষকে টাকা ধার দিবি না।"

"কত টাকা আমার !"

হাসল তিতির।

ঋজুদা বলল, "যখন রোজগার করবি, টাকা হবে যখন, তখন।"

"কেন দেব না ?"

"দিবি না এই জন্যে যে, যদি তারা তোর টাকা না শুধতে পারে, তাহলে তোকে তারা মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। অথবা নানাভাবে তোর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করবে। হয় বিষ খাইয়ে, নয় তোর উপরে নানা জুজুর ভর করিয়ে।"

"জুজু ? জুজু কথাটা বাংলা নয় ?"

"সে কোলকাতায় ফিরে সুনীতিদাদুকে জিজ্ঞেস করিস। আমি জংলি লোক, অতশত জানি না। তবে, নাইজেরিয়ার এই এফিক ইবিবিও উপজাতিদের গল্পগাথাতে জুজুর নাম তো পাচ্ছি। জুজু আর জুজুবুড়ি এক কি না, সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিস কোলকাতা ফিরে।"

কতগুলো হায়না এল বুশ্‌-বাক্‌টার মাংসের গন্ধ পেয়ে একটু পরেই। গুগুনোগুম্বারের দেশের অভিজ্ঞতার পর, হায়না জাতটার উপরই ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই এখন। ঋজুদার অর্ডার নেই গুলি করার। আজ রাত থেকে এই অর্ডার কার্যকর হয়েছে। ওদের দিকে পাথর ছুঁড়ে এবং ঋজুদার খাওয়া মৃতসঞ্জীবনী সুরার বোতল ছুঁড়ে ভাগালাম ওদের।

হায়নাগুলো চলে যাবার পর অনেকক্ষণ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। তিতিরের ঘুম এখন গভীর। একপাশে আমি, অন্য জিপে ও। আমার ওর জিপের ডানদিকে ঋজুদা থাকায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে তিতির। কম ধকল যায়নি বেচারির। যাই হোক, মেয়ে তো ! তবে মেয়ের মতো মেয়ে বটে ! ওর পাতলা নিশ্বাসের শব্দ, বনের কোনো উড়াল মাছির ডানার শব্দের মতো ভেসে আসছে আমার নাকে ওর সোয়েটারে স্প্রে করা হালকা পারফ্যুমের গন্ধের সঙ্গে। ভাগ্যিস, গুগুনোগুম্বারের দেশের মতো এখানে সেৎসি মাছির অত্যাচার নেই। থাকলে, আর খোলা জিপে বসে এমন আরামে ঘুমোতে হত না ওকে। আমারও ঘুম-ঘুম পেয়ে গেছে। কাছাকাছি কেউ ঘুমালে বোধহয় ঐ রকম হয়। ঋজুদা,

দেখলাম জিপের সিটে সোজা হেলান দিয়ে বসে, রাইফেলের নলটা ডান পায়ের উপর দিয়ে সিটের বাইরে বের করে দিয়ে রাইফেলের বাঁটের উপর ডান হাত রেখে বাঁ হাতে পাইপ ধরে বসে আছে ডানদিকে চেয়ে।

ঠিক এমন সময় দড়িবাঁধা সাদা তোয়ালেটা যেন একবার নড়ে উঠল। ঘুমে দু' চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, অনেক সময় গাড়ি চালাতে চালাতে যেমন হয়, যখন মনে হয় গাড়ি যেখানে খুশি যাক, আমার যা খুশি হোক, একটু শুধু দু'চোখের পাতা বুঁজে নি। ঠিক তেমন। সেই রকম ঘোরের মধ্যেই তোয়ালেটা জোরে বারবার আন্দোলিত হতে লাগল। আমার মাথার মধ্যে ঘুমপাড়ানিয়া কে যেন বলল, "ঘুমের মতো বিনা পয়সার আশীর্বাদ ভগবান আর দুটি দেননি। ঘুমিয়ে নাও, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।'

ঘুমিয়ে পড়তাম্ সেই মুহূর্তেই যদি না কতগুলো শেয়াল ডানদিক থেকে হঠাৎ ডেকে উঠত! ধড়মড়িয়ে ঘুমভাব ছেড়ে উঠতেই দেখি, সাদা তোয়ালেটা তখনও সমানে নড়ে যাচ্ছে মাটি থেকে আধহাত উপরে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। তোয়ালেটা ক্রমশ মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল এবং আমাদের জিপের উইণ্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে তাকে আর দেখা গেল না। ব্যাপারটা যে কী হল, তা কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ দেখি, ঋজুদার জিপ থেকে তিতির নেমে পড়েই অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় নিঃশব্দে গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড বাওবাব গাছটার গুঁড়ির এ-পাশে একেবারে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধপ্ করে একটা শব্দ হল। ততক্ষণে ঋজুদা রাইফেলটা তুলে নিয়ে তিতিরকে কভার করেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে জিপের পাশেই—তিতিরের কাছে যাওয়ার কোনো চেষ্টা না করে।

ঐ আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দেখলাম গাছের মসৃণ গুঁড়িতে গা ঘষে ঘষে তিতির গাছের অন্য দিকটাতে যাবার চেষ্টা করছে খুব সাবধানে। পৌঁছেও গেল। তারপর কী হল বোঝার আগেই গাছের ওপাশে দু-তিনজন লোকের গলা শুনলাম। তাদের মধ্যে একজন ইংরিজিতে বলল, "ড্যাম ফুল।"

পরক্ষণেই বলল, "লেটস্ শোভ্ অফ্ফ। কুইক্।"

অন্য কে একজন বলল, "হাউ বাউট্ হিম ?"

"কাম অন ড্যু সিলি গোট। লিভ হিম বাহাইণ্ড। ড্যু উইল বি অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম্। উই হ্যাভ অ্যাকসিডেন্টালি এনটার্ড দ্য টেরিটেরিজ অব সামওয়ান।"

ঐ লোকগুলোর মধ্যে একজনের গলাটা ভীষণ চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল আমার। কিন্তু চিনতে পারলাম না।

লোকগুলোর আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তিতির আমাদের কাছে এল। তখন দেখলাম ওর হাতে ঐ হেহে লোকদের একটি বেঁটে ধনুক আর ছোট্ট তীর।

"খুন করলি তিতির ?" ফিসফিস করে ঋজুদা শুধোল।

"কী করব ? রাইফেল তো ছুঁড়তে বারণ ছিল !"

"লাগাতে পারলি তীর ?"

"লেগে গেল তো ! ঈস্স্, বুড়োটাকে মেরে ফেলল ওরা। পেছন থেকে আসা তীরটা ওর পিঠে বিঁধেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ও পেছনে হেলে পড়ায় ওর শরীরের চাপে তোয়ালেটা উঠে আসছিল। যাক্, ওকে যে মেরেছিল, তাকেও আমি মেরেছি, এইটেই মস্ত কথা।"

ইতিমধ্যে গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে অন্যরা বেরিয়ে আসায় ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল ওদের। ওরা রেগে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে, শব্দ না-করে বলল,

কথা তো তোমারই বলছ !

ঋজুদা তিতিরকে বলল, "ওদের মধ্যে একজনকে নিয়ে আমি আর রুদ্র ঐ লোকদুটোর পিছু নিচ্ছি। তুই অন্যদের সঙ্গে এখানে সাবধানে থাকিস। আশা করছি, রাত ভোর হবার আগেই আমরা ফিরে আসব।"

তিতির ওদের একজনকে ফিস্‌ফিস্ করে কী বলল। সে লোকটা এগিয়ে এল। রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে ঋজুদার পিছু পিছু এগোলাম। লোকটা তার বেঁটে তীর-ধনুকটা সঙ্গে নিল।

গাছের ছায়া ছেড়ে বেরিয়েই আমরা একটা পাথরের আড়ালে থেকে কিছুক্ষণ চারধার দেখে নিলাম। অন্ধকারে আমাদের চোখের চেয়ে জঙ্গলের মানুষদের চোখ অনেক বেশি কাজ করে। লোকটা ভাল করে চারধারে দেখে, আঙুল তুলে আমাদের দেখাল। দেখলাম দুটো লোক জোরে হেঁটে চলছে বাওবাব গাছটার উলটোদিকে।

ঋজুদা লোকটাকে সোয়াহিলিতে আর আমাকে বাংলাতে বলল, ফ্যান-আউট করে লোকদুটোকে ফলো করতে। দরকার হলে ওদের ডেরার ভিতরে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

তাই-ই করলাম আমরা। আসবার সময় ঋজুদা বুড়ো লোকটার পা থেকে খুলে দড়িটা নিয়ে এসেছিল। সেটা কোন্ কাজে লাগবে, কে জানে ?

লোকদুটো উঁচু-নিচু জংগলাকীর্ণ পথ বেয়ে চলেছে। নিচু জায়গায় বা নদীর খোলে ঢুকে গেলে দেখা যাচ্ছে না—আবার উঁচু জায়গায় গেলেই দেখা যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

একটু পর হঠাৎ ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়তেই, আমরাও শুয়ে পড়লাম। ঋজুদা ওদের সবচেয়ে কাছে এবং একেবারে পিছনে। আমি আর একটু পিছনে, ডানদিকে। এবং হেহে লোকটি বাঁ দিকে, আমার চেয়ে একটু পিছিয়ে।

ঐ লোকদুটো কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করতে লাগল এবং ঠিক সেই সময়ই তিতির চিৎকার করে উঠল বাওবাব গাছের তলা থেকে। তারপর গোঙানির মতো করে হেহে ভাষায় কী সব বলতে লাগল টেনে টেনে। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এক সেকেণ্ড লোকদুটো দাঁড়িয়ে পড়ে তিতিরের ঐ চিৎকার শুনল। যে লোকটা ট্রাউজার আর শুটিং জ্যাকেট পরে ছিল সে এগিয়ে আসতে গেল বটে কিন্তু তার সঙ্গী তাকে জাপটে ধরল এবং উলটোদিকে টানতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তিতির আবার ঐ রকম আর্তনাদ করে উঠল। তখন দুজনেই একসঙ্গে জোরে দৌড় লাগাল।

আমরাও ওদের পেছনে চললাম। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। একটু গিয়েই ওরা একটি টিলার নীচে থেমে গেল। সেখানে একটি গুহামতো আছে। সেই গুহা থেকে আরও একটি লোক নেমে এসে খুব উত্তেজিত ভাবে কী সব কথাবার্তা বলতে লাগল। কথা শুনে মনে হল ওরা সকলেই ইংরিজি জানে এবং এই অঞ্চলের জঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের মতোই অনভিজ্ঞ। যে লোকটাকে তিতির বিষের তীর দিয়ে মারল, সেইই বোধহয় স্থানীয় লোক। ওদের পথপ্রদর্শক। কে জানে ? সবই অনুমান।

লোকগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের হাতের রাইফেল দিয়ে তাদের এখুনি সাবড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শব্দ করা চলবে না এখন। ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মনে হল কেন ঋজুদা দড়িটা এনেছিল সঙ্গে করে। দড়িটা ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে অনেকখানি ডি-ট্যুওর করে আমি টিলাটার পিছন দিকে চলে গেলাম। ঋজুদার কথামতো হেহে লোকটি সাবধানে লেপার্ড-ক্রলিং করে টিলাটার

দিকে এগোতে লাগল। কারণ ওর বিষের ধনুক-তীরের পাল্লা বেশি নয়। এবং বিষের তীরই এখন মোক্ষম জিনিস। নিঃশব্দ। তাৎক্ষণিক!

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। টিলাটার উপরে পৌঁছে দম নিয়ে নিলাম। তারপর নাইলনের দড়িটাতে একটা ফাঁস লাগালাম বড় করে। আমার শিল্যুট যেন ওদের চোখে না পড়ে এমন করে এগোতে লাগলাম শরীর ঘষে ঘষে। ফোটোগ্রাফিতে যেমন আলো-ছায়ার খেলা বোঝাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস, ক্যামোফ্ল্যাজিং-এও তাই। এই আলো-ছায়ার ইনটার-অ্যাকশান যে রপ্ত করতে পারে তার পক্ষে জঙ্গলে লুকিয়ে চলাফেরা করা কোনো ব্যাপারই নয়। ঋজুদা পারে। আমিও হয়তো পারব কোনোদিন।

ওরাও তিনজন, আমরাও তিনজন। আমি জায়গামতো গিয়ে পৌঁছতে লক্ষ করলাম, কিছুটা দূরে ঘনতর ছায়ার মধ্যে ঘন ছায়ার মতো ঋজুদা একটা উইয়ের ঢিবির আড়াল নিয়ে বসে আছে। আমি ঐ জায়গাতে একটু আগে ছিলাম বলেই আমার পক্ষে ঋজুদাকে স্পট করা সম্ভব হল। হেহে লোকটি চিতারই মতো নিঃসাড়ে টিলাটা থেকে মাত্র পনেরো হাত দূরে একটা ক্যাণ্ডালাব্রাম ঝোপের আড়ালে এসে পৌঁছেছে। এমন সময় সাহেবি পোশাক পরা লোকটা, যে লোকটা টিলার গুহা থেকে বেরোলো একটু আগে, তাকে বলল, "হুকুম্না ফেধা?" মানে, ওদের টাকা দাওনি?

লোকটা বলল, "এনিডিও, বাওনা।" অর্থাৎ, না স্যার, দিইনি।

বলতেই সাহেবি পোশাক পরা লোকটা দুটো হাত জড়ো করে ঐ লোকটার মাথায় প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল কারাটের মারের মতো। কটাং করে একটা শব্দ হল এমন যে মনে হল, লোকটার মাথার খুলিই বা বুঝি ফেটে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দারুণ আনন্দ হল। এতক্ষণে লোকটার গলার স্বর, লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, লোকটার—লোকটাকে আমি চিনেছি। একে যখন হাতের কাছে পেয়েছি, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। প্রাণ যায় তো যাক। ঋজুদা টনার্ডো-ফনার্ডো, আর ডব্‌সন, আর তানজানিয়ান প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নীয়েরে-টিয়েরে বড় ব্যাপার নিয়ে থাকুক। আমি একা ভুষুণ্ডাকে হাতের কাছে পেলেই খুশি। ওকে নিয়ে আমি পুতুল খেলব।

ঐ লোকটা মাথায় বাড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোঁ-গোঁ করে পড়ে গেল। মাথার খুলিটা নারকেলের মতো সত্যিই ফেটে গেল কি না কে জানে! ভালই হল। হারাধনের ছেলেদের মধ্যে এখন বাকি রইল দুই।

ভুষুণ্ডা বাওবাব গাছটা যেদিকে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, প্যান্টের দু' পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে। তারপরই ও নিজের মনে বলল, "ওয়েল, সামথিং হ্যাজ গান অ্যামিস্!"

খুব ইংরিজি ফোটাচ্ছে বিনা কারণে।

ফাঁসটা আমার করাই ছিল। মাথাটা নিচু করে, টিলার নীচে দড়িটা নামিয়ে দিয়ে বার চারেক দুলিয়ে নিয়ে ভুষুণ্ডার মাথা লক্ষ করে আমি সেটাকে ছুঁড়ে দিলাম। তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে টেডি মহম্মদ পাহাড়টি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করল যেন। ফাঁসটা ঠিক উড়ে গিয়ে ভুষুণ্ডার মাথা গলে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও সেটাকে খুলে ফেলার চেষ্টা করল বটে দু' হাত দিয়ে, কিন্তু আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আমার শরীরের সমস্ত ওজন সমেত ঝুলে পড়লাম টিলার পেছনে। তারপর মাটি থেকে প্রায় হাত-পনেরো উঁচুতে পাথরের গায়ে ঝুলতে থাকলাম। আমার শরীরের ওজন এবং হ্যাঁচকা টানে ভুষুণ্ডা বেশ কিছুটা হিঁচড়ে চলে এসে কোনো পাথর-টাথরে আটকে গেল। ওপাশ থেকে একটু দৌড়োদৌড়ির শব্দ শোনা

গেল। তারপরই কী হল বোঝার আগেই হঠাৎ ভারশূন্য হয়ে গেলাম আমি। এবং পরক্ষণেই পপাত ধরণীতলে ! কে যেন দড়িটা ওপাশে ছুরি দিয়ে কেটে দিল। পড় তো পড়, একেবারে কাঁটাঝোপের উপর।

ঐ অধঃপতিত অবস্থা থেকে প্রাণপণে উত্থান করার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার পিছনে ঋজুদার পরিচিত ঠাট্টার হাসি শোনা গেল। বলল, "রাইফেলটা আমাকে দে। নিজের গুলি খেয়ে যে নিজে মরিসনি, এই ঢের !"

কোনোরকমে উঠে, কাঁটার কামড়ের কথা ভুলে গিয়ে, মুখে সপ্রতিভ হাসি এনে বললাম, "ব্যাপারটা কী হল ?"

"ব্যাপার অতীব গুরুতর ! ভুষুণ্ডা আমাদের কেসের এগজিবিট নাম্বার ওয়ান। আর তুই তাকেই ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলছিলি ? তুই কি ভাবিস, তোর শরীরের ওজন চড়াই পাখির সমান ? গলার শিরা-ফিরা বোধহয় ছিঁড়ে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। জ্ঞান নেই। এমন করিস না।"

বললাম, "আহা ! এ পর্যন্ত কত লোককে নিজে ফটাফট সাবড়ে দিলে আর ভুষুণ্ডার বেলা তোমার যত প্রেম ! ও কিন্তু আমার সম্পত্তি। গড়ের মাঠে ভেড়াওয়ালারা যেমন করে ভেড়ার গায়ের লোম কাটে আমি তেমন করেই ওর মাথার কোঁকড়া কালো ঘন চুল ছাঁটব, ওর মাথাটা কোলে নিয়ে। ওর সঙ্গে অনেক হিসেব-নিকেশ আছে আমার।"

ঋজুদার পাইপটা নিভে গেছিল। আগুন জ্বেলে, হেসে বলল, "আহা ! যেন ঠাকুমা-নাতির সম্পর্ক ! তোর যে কোন্‌টা রাগ আর কোন্‌টা ভালবাসা, বুঝতেই পারি না।"

ঋজুদার গলা শুনে বুঝলাম, খুবই খুশি ঋজুদা।

তারপরই বলল, "নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের। চল্‌। যা বলব, তা মনোযোগ দিয়ে করবি।"

টিলাটার ওপাশে গিয়ে দেখলাম, ভুষুণ্ডা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। আর অন্য লোকটা বিষের তীর খেয়ে টেঁসে গেছে। অজ্ঞান হলেও তার হাত-পা বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে।

ঋজুদা ঘড়ি দেখল। নিজের মনেই বলল, 'বারোটা ! ঠিক আছে। যথেষ্ট সময় আছে। এখানে আয় এক মিনিট।'

টিলাটার ভিতরের গুহাতে গিয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখি দুটো মেশিনগান দোপায়ায় বসানো। ঝকঝক করছে টর্চের আলো পড়ে। ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "ছুঁড়েছিস কখনও ?"

"এন-সি-সিতে একবার ছুঁড়েছিলাম। এল-এম-জি।"

"সে তো যত কনডেমড় মাল, আর্মির। অ্যাই দ্যাখ, এইটা হচ্ছে ব্রিটিশ ব্রেনগান। ওরিজিনাল ডিজাইনটা চেকোস্লোভাকিয়ার ছিল। ব্রনোর নাম শুনেছিস তো। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল দেখেছিলি না একটা, মনে আছে ? 'অ্যাল্‌বিনোর' রহস্য ভেদের সময় বিষেনদেওবাবুর কাছে, হাজারিবাগের মুলিমালোয়াঁতে ?"

"হুঁ !"

"ব্রেনগান কেন বলে তা বুঝলি ?"

"কেন ?"

"চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রনোর ডিজাইনের উপর ইংল্যাণ্ডের এনফিল্ড মক্সো করে এই জিনিস তৈরি করেছে। তাই দুজনের নামই এতে জড়ানো আছে। ব্রনোর বি আর এবং

এনফিল্ডের ই এন। বি· আর· ই· এন—ব্রেন। তাই ব্রেনগান।”

“আর ঐটা কী মেশিনগান ? কী সুন্দর ! এর তো স্ট্যাণ্ডেরও দরকার হয় না, না ?”

“না। এটা আমিও এর আগে দেখিনি। নাম শুনেছি, ছবি দেখেছি। এই টর্নাডো আর ভুষুণ্ডাদের দল যে কত সম্পদশালী আর ওয়েল-ইকুইপড়, ওয়েল-কানেকটেড় তা এখানে না এলে বুঝতাম না। এইটা ইজরায়েলি লাইট মেশিনগান। নাইন মিলিমিটারের। অত্যন্ত পাওয়ারফুল। এক-একটা ম্যাগাজিনে পঁচিশটা গুলি নেয়। উনিশশো একান্ন সনে ইজারায়েলিরা অন্য দেশের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্যে প্রথম এই উজি তৈরি করে। এই মেশিনগান এমনই কাজের যে, সারা পৃথিবীর মারদাঙ্গা-যুদ্ধবাজদের কাছে এর চাহিদা অসাধারণ। পশ্চিম জার্মানি, ওলন্দাজ এবং অনেক আফ্রিকান দেশের আর্মি এখন এই উজি এল-এম-জিই ব্যবহার করে।”

বলেই বলল, “দেখে নে, কী করে ব্যবহার করতে হয়। দুটোই। তিতির ব্রেনগানটা চালাবে শুয়ে শুয়ে। তুই চালাবি উজিটা। আমাদের রাইফেলগুলো দিবি হেহে লোকগুলোকে, তিতিরের কম্যাণ্ডে।”

“আর তুমি ?”

“আমি একা যাব টর্নাডোর বেস ক্যাম্পে। এখন আর কোনো কথা নয়। তুই এক্ষুনি এই লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যা। তিতির এবং ওদের নিয়ে এখানে ফিরে আয়। এলেই সব বুঝিয়ে বলব। আর শোন্ ! আমার জিপটা চালিয়ে আনবি হেডলাইট না-জ্বেলে। তাতে জিনিসপত্র আছে জরুরি।”

বলেই সার্গেসন-এর জুতোর মধ্যে থেকে ম্যাপটা নিয়ে গুহার মধ্যে টর্চ জ্বেলে বসল।

আমি ফিরে না-গিয়ে রাক্-স্যাক্ থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করলাম।

ঋজুদা বিরক্ত হয়ে বলল, ম্যাপের দিকেই চোখ রেখে, “গেলি না তুই ?”

ঋজুদাকে গ্রাহ্য না করে ওয়াকি-টকিতে মুখ রেখে সুইচ্ অন করে বললাম, “হ্যাল্লো।”

ওপাশ থেকে তিতিরের রিনরিনে গলা ভেসে এল, “টাঁড়বারো। টিটি।”

বললাম, “টাঁড়বারো—। রুফাস্।”

“গো অ্যাহেড।” তিতির বলল।

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, টাঁড়বারো কোড ওয়ার্ড। তিতিরের কোড নেম টিটি। পাখির নাম। আমার কোড নেম রুফাস। রুফাস বাঁদরের নাম। আমাকে এই কোড নেম দেবার পেছনে তিতির এবং ঋজুদারও গভীর চক্রান্ত ছিল বলেই বিশ্বাস আমার। ঋজুদার নিজের কোড নেম রিৎজ্, প্যারিসেরে রিৎজ্ হোটেলের নামে। ঋজুদা এও বলে দিয়েছিল যে, কথাবার্তা সব বাংলায় বলতে হবে।

তিতির আবার বলল, “বল রুফাস্। শুনছি।”

“ঋজুদার জিপটা নিয়ে ওখানের অন্য সবাইকে নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে এসো। হেড-লাইট জ্বালাবে না। সোজা উত্তরে এসো আধ মাইল। তারপর, আমি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে থাকব। সেই আলো দেখে আসবে। সাবধান ! গর্তে জিপ ফেলো না। এখন মোক্ষলাভের কাছাকাছি আমরা।”

“আসছি। কোনো খবর আছে ? নতুন ?”

“আছে। দারুণ খবর। এলেই জানবে। রজার। ওভার।”

টিলার উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ বোঝার উপায় রইল না যে, তিতির আদৌ রওয়ানা হয়েছে কিনা। মিনিট দশেক পর রানী মৌমাছির ডানার আওয়াজের মতো

জিপের এঞ্জিনের গুনগুনানি ভেসে এল। আমি টর্চটা জ্বেলে, যাতে উল্টোদিক থেকে না দেখা যায় এমন করে টিলার নীচে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে তিতির এসে গেল। ভুষুণ্ডার ততক্ষণে জ্ঞান এসেছে।

আমি বললাম, "হ্যালো, ভুষুণ্ডা! চিনতে পারছ?"

ভুষুণ্ডা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

তিতির তার মাথার দুর্গন্ধ কদমছাঁট চুল দু'হাতে নেড়ে দিয়ে বলল,

"ওরে আমার বাঁদর নাচন
আদর গেলা কোঁৎকারে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল,
ওরে আমার হোঁৎকা রে।"

ঋজুদা বলল, "এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয় তিতির। ভিতরে যা। রুদ্র, তুই শিগগির ওকে ব্রেনগানটা চালানো শিখিয়ে দে। ততক্ষণে আমি জিপটাকে টিলার এ-পাশে এনে লুকিয়ে রাখছি। আপাতত।"

একটু পরে ঋজুদা যখন ফিরে এল, তখন আমরা প্রায় তৈরি। জিপ থেকে ঋজুদা একটা ব্যাগ নিয়ে এল। তার মধ্যে থাক-থাক তানজানিয়ান শিলিং-এর নতুন করকরে নোট।

"এই ব্যাগটা ওদের দিয়ে দে। বলে দে, এখন রেখে দিতে। ওদের কাছেই থাক। আমরা যে টর্নাডো বা ভুষুণ্ডার মতো খারাপ নই তা ওরা জানুক। ভোরবেলা সমানভাগে ভাগ করে নেবে। তার আগে যুদ্ধ করতে হবে ভাল করে ; যদি টর্নাডো যুদ্ধ করে। সামনাসামনি যুদ্ধ করার মতো বোকা সে নয়। তাকে তার ঘাঁটি থেকে বের করে আনতে হবে।" গম্ভীরমুখেই ঋজুদা বলল, "এই সব খুনোখুনি আমাদের কাজ নয়। কিন্তু এবারে প্রথম থেকেই ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমরা যেন প্যারা-মিলিটারি কম্যাণ্ডোজ সব। যুদ্ধ করবে তারা ; আমাদের কি এসব মানায়? ভবিষ্যতে এরকম ঝামেলাতে যাব না আর।"

তারপর আমার হাতে ফ্লেয়ারগানটা দিয়ে বলল, "আমি জিপ নিয়ে চলে যাচ্ছি টর্নাডোর ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের যত কাছে যেতে পারি, গিয়ে, তারপর হেঁটে যেতে হবে। জানি না, জিপ নিয়ে কত কাছে যেতে পারব।"

তিতির বলল, "তোমার সঙ্গে উজি এল-এম-জিটাও নিয়ে যাও ঋজুকাকা। একেবারেই একা যাচ্ছ!"

"না। বড্ড ভারী হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার দুটো হাতই খালি থাকা চাই। টর্নাডো আর তার দলবলকে আমি এমন শিক্ষা দিতে চাই যে, সারা পৃথিবীর পোচাররা যেন জানে যে, যত বড় বলবান আর অর্থশালীই তারা হোক না কেন, তাদের সমানে সমানে টক্কর দেবার লোকও আছে। শোন রুদ্র। ঘড়িতে যখন ঠিক রাত তিনটে বাজবে, তখন এই ফ্লেয়ারগানটা থেকে আকাশে ফ্লেয়ার ছুঁড়বি। সিগন্যালটা মনে আছে তো?"

"আমাদের সিগন্যাল?"

"আঃ। আমাদের কেন? কোথায় যে মন থাকে তোর! ডবসনের সিগন্যাল। ডবসনের ডিস্ট্রেস সিগন্যাল দিয়ে আমরা টর্নাডোকে এই টিলার কাছে নিয়ে আসব। এবং টর্নাডো যখন তার আস্তানা ছেড়ে তোদের দিকে আসবে, তখন সেই আস্তানাকেই আমি

উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব ডিনামাইট দিয়ে। আর তোরা ঐ ব্রেন-গান আর উজ্জি আর তিতিরের হেহে চ্যালারা আমাদের রাইফেল দিয়ে ওদের কচুকাটা করে দিবি। বুঝেছিস ? এবার বল দেখি সিগন্যালটা কী !"

"ওয়ান গ্রিন, ফলোড বাই টু রেড। দেন টু বি কনক্লুডেড বাই ওয়ান গ্রিন।" তিতির মুখস্থ বলল।

ঋজুদা বলল, "ফাইন্। তাহলে আমি এগোচ্ছি।" বলে, বুড়ো আঙুল তুলে থাম্বস্-আপ করল।

আমরাও থাম্বস্-আপ্ করলাম।

তখন বাজে প্রায় সোয়া একটা। ঋজুদার জিপের এঞ্জিনের গুড়গুড়ানির আওয়াজ মিলিয়ে গেল বন-পাহাড়ে। এমন সময় ভুষুণ্ডা বলল, "ওয়াটার !"

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে তিতিরকে বললাম, "তোমার একজন চ্যালাকে বলো তো ওর মুখে এটা পাকিয়ে পুরে দেবে।"

"তুমি কি নিষ্ঠুর !"

তিতির আবার বলল, "জল দেব ওকে ? আমার ওয়াটার বট্‌লে আছে কিন্তু।"

"আমারও আছে। কিন্তু দেবে না। দয়ামায়া আমারও কম নেই তিতির। কিন্তু এ যে ব্যবহারের যোগ্য সেই রকম ব্যবহারই এর সঙ্গে আমাকে করতে দাও। ও আমার চোখের সামনে যদি 'জল জল' করে মরেও যায়, একফোঁটা জলও দেব না ওকে। মরুক।"

তিতির বলল, "যাকগে। মরুকগে ও। কিন্তু কচুকাটার ঠিক ইংরিজি কী, জানো ? ঋজুকাকা কচুকাটা করে দিতে বলে চলে গেল। এরকম অর্ডারের কথা তো কখনও শুনিনি।"

"কচুকাটার আবার ইংরিজি কী ? সাহেবদের দেশে কি কচু হয় ? কচু পুরোপুরি স্বদেশী জিনিস। ওরা বলে, মো-ডাউন ; ঘাস-কাটার জাত তো। আর আমরা বলি, কচুকাটা। কেমন জবরদস্ত কথাটা বলো ?"

"তা ঠিক !"

এদিকে তিতিরের হেহে চ্যালারা টাকার গন্ধ শুঁকে রীতিমত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার উপর মৃতসঞ্জীবনীর প্রভাব এখনও বোধহয় আছে। লোকগুলো একটু বেশি পরিমাণ সঞ্জীবিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কড়া ওষুধের এই দোষ। ডোজের গণ্ডগোল হলেই গলগণ্ড !

যে বুড়োটা মরল গাছের মগডালে ব্রহ্মদৈত্যের মতো বসে বসেই, সে যে বিশেষ বেশি সঞ্জীবিত হয়েছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই আমার। নইলে, দড়ি ধরে তোয়ালে নাড়তে পারল মগডালে বসে, আর তীর ছুঁড়তে পারল না একটা ! বেচ্চারা ! ঋজুদা তো ঐ বুড়োটাকে কিছুই দেয়নি। নিশ্চয়ই ওর বৌ-ছেলেদের দেবে কিছু। সব ভালয়-ভালয় মিটুক। ভুষুণ্ডা যে আমাদেরই হেপাজতে এ-কথাটা এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আড়াইটে এখন ঘড়িতে। আমাদের টেনসান বাড়তে লাগল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ঋজুদা যেদিকে গেছে সেদিক থেকে হাতির বৃংহণ আর আমাদের বাওবাব গাছের দিক থেকে হায়নার বুক-কাঁপানো অট্টহাসি ভেসে আসছে।

তিনটে বাজতে দশ। পাঁচ। তিন।

"হিন্দিতে কাউন্ট-ডাউনকে কী বলে বলো তো ?"

তিতির আমাকে শুধোল, ঠিক আড়াই মিনিট যখন বাকি আছে তিনটে বাজতে

তখন—।

রাগ ধরে গেল আমার। ফ্লেয়ারগানটা নিয়ে, শেলগুলো ঐ অর্ডারে সাজিয়ে গুহার বাইরে এলাম আমি। উত্তর দিলাম না। ফাক্‌সা-আলাপের আর সময় পেল না!

তিতির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, নিজের মনে, "উল্‌টি-গীন্‌তি।"

ফ্লেয়ারগানটা হাতে করে দাঁড়ালাম। আর ষাট সেকেণ্ড। উনষাট, আটান্ন, সাতান্ন…চলতে লাগল উল্‌টি-গীন্‌তি।

টেনসান একেকজনের মধ্যে এক-একরকম কাজ করে। কেউ স্থির হয়ে যায়, কেউ অস্থির ; কেউ আবার ঘুমিয়েও পড়ে। তিতির বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।

সবুজ আলোয় ভরে গেল আকাশ। তারপর লালে, তারপর আবার সবুজে। ফ্লেয়ারগান ছুঁড়েই আমি এসে জায়গা নিলাম। তারপর তিতিরকে বললাম, "তুমি আর আমি একই জায়গায় থাকলে আমাদের ফায়ারিং-পাওয়ার কার্যকরী হবে না। তুমি এখানে থাকো। আমি টিলার উপরে পাথরের আড়ালে গিয়ে থাকছি। তোমার কাছে একজন হেহেকে রাখো রাইফেল হাতে। আমি অন্যজনকে নিয়ে যাচ্ছি। টিলার উপরে থাকলে চারদিক দেখাও যাবে। টর্নাডোর দল, ঋজুদা যে পথে গেছে, সেই পথ দিয়েই আসবে তার কী মানে ?"

"ঠিকই বলেছ। তাই-ই যাও।" তিতির বলল।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বেস্ট অব লাক। গুড হান্টিং। সাবধান রুদ্র।"

একটু থেমে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে সব সময় ঝগড়া করি, তোমার পিছনে লাগি বলে তুমি রাগ করো না তো রুদ্র ? আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে জ্যাঠামশায়ের মতো গলায় বললাম, "এ সব মেয়েলি কথাবার্তা, ঢং-ঢাং পরে হবে। এখন এসবের সময় নেই। সাবধান থেকো। লুক্ আফটার ইওরসেলফ্ !"

"সো ডু উ্য !" বলল তিতির।

অন্ধকার কি কেটে যাচ্ছে ? নাঃ। দেরি আছে অনেক এখনও ভোর হতে। সব প্রতীক্ষার রাত, সবচেয়ে দীর্ঘতম রাতও ভোর হয় এক সময়। আমাদের এই রাতও আশা করি ভোর হবে। আবার পাখি ডাকবে। আমাদের গায়ে রোদের চিকন বালাপোশ এসে আলতো করে জড়িয়ে নেবে নিজেকে।

বেশ শীত এখন। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। কী করে যে এতক্ষণ সময় কেটে গেল ! আশ্চর্য ! হঠাৎ, সামনের প্রায়-নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকার রাতের বুক চিরে দু' জোড়া হেডলাইটের আলো ফুটে উঠল। এবং আস্তে আস্তে আলো যেমনই জোর হতে লাগল, তেমনই জিপের এঞ্জিনের আওয়াজও জোর হতে লাগল। কাছে আসতেই বুঝলাম, জিপ নয়, ল্যাণ্ডরোভার। তখনও গাড়িগুলো টিলা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আছে, ঠিক সেই সময়ই মনে হল পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল। নাকি কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হল ? অনেক দূরে, আকাশ লালে-লাল হয়ে উঠল। পেট্রলের ড্রাম ফাটার আওয়াজ আর লক্‌লকে আগুনের শিখা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল আকাশে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ল্যাণ্ডরোভার দুটো আমাদের দিকে আর না এসে, মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই তীব্রগতিতে ফিরে চলল, অন্ধকার জঙ্গলে আলোর চাবুক মেরে মেরে।

এইবার শুরু হল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পালা। টর্নাডোর অ্যামুনিশান ডাম্প ফাটল নিশ্চয়ই। আগুনে গুলিগোলা ফাটার নানারকম আওয়াজ। এতদূরে বসেও আমরা রাইফেলের বাঁট ছেড়ে দু'হাতে কান চেপে ধরলাম। কালা করে দেবে যে! ওখানে কি যুদ্ধ লাগল নাকি? ঋজুদা একা গেল। কী হচ্ছে তা কে জানে!

আমার প্রচণ্ড রাগও হল। আমাদের লড়াই করার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে। পুরো ক্রেডিটটা ঋজুদা একাই নিয়ে নিল! বেশ!

এমন সময় দেখা গেল একজোড়া আলো দ্রুতগতিতে এদিকে আসছে আবার। হাত ঘেমে গেছিল। ট্রাউজারে হাত মুছে নিয়ে আমি উজির বাঁট আবার চেপে ধরলাম। আমার পাশের হেহে লোকটা উত্তেজনায় এমন অদ্ভুত কুঁই কুই আওয়াজ করছিল আর কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল ও বোধহয় মানুষ নয়, অন্য কোনো গ্রহের জীব। ও কিন্তু ভয় পায়নি। ছেলেবেলা থেকে যারা বল্লম দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সিংহ মারে, তারা ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। তাদের মায়েরা তাদের পুতু পুতু করে মানুষ করে না। আসলে বিপদেরও একটা দারুণ আনন্দ আছে। বিপদের তীব্র আনন্দেই ও অমন করছিল।

জিপটা কাছে আসতেই ওয়াকিটকি ব্লিপ ব্লিপ করতে লাগল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরো চার জোড়া হেডলাইট দেখা গেল। তারা সেই প্রথম জোড়া আলোর চোখকে দ্রুত ফলো করে আসছে।

তিতির প্রথম কথা বলল, "টাঁড়বারো! টিটি।"

"টাঁড়বারো। রিৎজ্। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়া করেছে। ওরা প্রচণ্ড রেগে রয়েছে। সাবধান। খুব সাবধান। তোরা আগে গুলি করবি না! আমি তোদের টিলার সামনে দিয়ে জিপ চালিয়ে টিলার পিছনে চলে গিয়ে পাকদণ্ডী কাটার মতো করে ওদের পিছনে চলে আসব। শোন্। ওদের কাছে কোনো এল-এম-জি নেই। থাকলে এতক্ষণে আমার চিহ্ন থাকত না। আমাকে গুলি করিস না। মনে রাখিস, ওদের গাড়িগুলো ল্যাণ্ডারোভার। শুধু আমারটাই জিপ। রজার। গড ব্লেস। ওভার!"

"রিৎজ্। শুনেছি।" তিতির বলল, "রুফাস্‌কে বলে দেব। রজার। ওভার।"

এতক্ষণে নাটক জমেছে। এই নইলে হয়! কী এত্তদিন টুকুস-টাকুস করে চলছিল দুস্‌স্। পায়ে গেঁটে বাত হয়ে যাচ্ছিল। এখন হয় এস্‌পার, নয় উস্‌পার।

গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওরা পাগলের মতো গুলি ছুঁড়ছে ঋজুদার দিকে। চারটি গাড়ি ওদের। অনেক লোক। আর ঋজুদা একা; তাও নিজেই চালাচ্ছে গাড়ি। এঁকেবেঁকে আর খুব স্পিডে চালিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বও বাড়িয়ে ফেলেছে অনেকখানি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে এবার সত্যিই চিন্তা হতে লাগল।

কিন্তু চিন্তা শেষ হতে না-হতেই প্রচণ্ড হুঙ্কারে আর বেগে গুলি-খাওয়া বাঘের মতো ঋজুদার জিপ আমাদের গুহার মুখ অতিক্রম করে চলে গেল। পিছনের গাড়িগুলো আসছে। আসছে, আসছে; এসে গেল।

উপর থেকে আমি বললাম, "ফা-য়া-র।"

সঙ্গে সঙ্গে তিতিরের ব্রেন-গান আর আমার উজি বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। ট্যা-র‍্যা—র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা— র‍্যা—র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-ট্যা— মধ্যে মধ্যে ম্যাগাজিন রাইফেলের গুলির আওয়াজ। টিক্-চুঁই, টিক্-চুঁই, ক্যাট্-ক্যাট্।

প্রথম গাড়িটা উল্টে গেল। আগুন লেগে গেল গাড়িটাতে। বোধহয় ড্রাইভার মরেছে। উল্টোতেই ঐ স্পিডে সামলাতে না পেরে পিছনের গাড়িটাও তার ঘাড়ে এসে

পড়েই উল্টে গেল। লোক বেরিয়ে পড়ল তার থেকে। আগুনে ওরা আমাদের পজিশান পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বিপদ! প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। কিন্তু এদিকেও গুলির বন্যা বয়ে চলেছে। খা, খা, কত গুলি খাবি খা! তোদেরই এল-এম-জি; তোদেরই ম্যাগাজিনে-ঠাসা শ'য়ে শ'য়ে গুলি—খা! পেট পুরে খা পাজি শয়তানগুলো! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! খা!

এমন সময় হঠাৎ আর একজোড়া আলো কোথা থেকে ওদের পেছনে এসে হাজির হল। বাঙালির পো ঋজুদা সোঁদরবনের কেঁদো বাঘের চাল চেলেছে। এ-চালের খোঁজ তোরা জানবি কী করে? হেডলাইট নিবিয়ে দিয়ে ডামাডোলের মধ্যে পাকদণ্ডী কেটে জিপ নিয়ে একেবারে পিছনে। বঙ্গদেশের জোঁক! চেনোনি তো বাপু!

এদিকে আমাদের কাছেও অজস্র গুলি এসে পৌঁছেছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল শিলাবৃষ্টি, যখন দূরে ছিল। এখন মনে হচ্ছে, অনেকগুলো শিলকাটাইওয়ালা দূর থেকে পেল্লায় পেল্লায় ছেনি নিয়ে আমাদের সমস্ত টিলাটা কেটে কেটে মস্ত শিল-পাটা বানাচ্ছে। কী কাটবে এখানে, এত বড় শিলে গাবুক-গুবুক করে কোন যজ্ঞি বাড়ির রান্না করবে যে তারা, তা তারাই জানে।

কিন্তু আমাদেরও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরাও সকলে মিলে চালিয়ে যাচ্ছি দে-দনাদ্দন্ দে-দনাদ্দন্। তিতির ঠিকই বলে। আমাদের সঙ্গে ন্যায় আছে, ওদের সঙ্গে অন্যায়। দেরি হতে পারে, কিন্তু অন্যায়কে হারতেই হয় ন্যায়ের কাছে। আমাদের হারাবে কে? কে হারাবে?

এমন সময় ঋজুদা যা করল, তা একমাত্র ঋজুদার পক্ষেই সম্ভব। একেবারে শ্রীকৃষ্ণের রথের মতো একা জিপ নিয়ে চলে এল ঐ ল্যাণ্ডরোভারের মারাত্মক দঙ্গলের মধ্যে। তার জিপ এক-একটা গাড়িকে পেরোয়, আর গদ্দাম্ গদ্দাম্ করে আওয়াজ হয়। হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। ঠিক। হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে, অন্য হাতে গ্রেনেড ধরে, দাঁত দিয়ে পিন্ খুলে জিপ চালাতে চালাতেই ছুঁড়ে দিচ্ছে ঋজুদা গ্রেনেডগুলো। ভট্‌কাই এ দৃশ্য দেখলে বলত: "শোলে-টোলেকে জলে ধুয়ে দিলে র‍্যা! কী ফাইটিং!"

গাড়ির ছাদ-ফাদ আকাশে উড়িয়ে দিয়ে ওদের ল্যাণ্ডরোভারের টায়ার ওদের হাত পা মুণ্ডু নিয়ে গ্রেনেডগুলো টাগ-ডুম্ টাগ-ডুম্ শব্দে ডাংগুলি খেলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটল। আমাদের টিলার গুহার ভিতর থেকে গড়াতে গড়াতে ভুষুণ্ডা বাইরে বেরিয়ে এল, তারপর "পোলে পোলে", "পোলে পোলে" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গড়িয়ে নেমে যেতে লাগল দ্রুত।

আমার ট্রিগার ছোঁওয়ানো হাত হঠাৎ থেমে গেল। এক মুহূর্ত। টর্নাডোর দলের লোকেরা প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল তাদেরই হাইডআউট থেকে, তাদেরই এল-এম-জি থেকে, তাদেরই উপর মুড়ি-মুড়কির মতো গুলি-বৃষ্টি হতে দেখে। দ্বিতীয় ধাক্কা খেয়েছিল ঋজুদার টিপিক্যাল সোঁদরবনি পাকদণ্ডীর দণ্ডে। তৃতীয় ধাক্কা খেল তাদেরই পেয়ারের দিগ্বিজয়ের ভুষুণ্ডাকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থাতে এমন করে গড়িয়ে নামতে দেখে।

কিন্তু মুখ দিয়ে "পোলে পোলে" অর্থাৎ "আস্তে আস্তে" বলল কী করে ভুষুণ্ডা! তার মুখে তো রুমাল ভরা ছিল! এ নিশ্চয়ই তিতিরের কাজ। মেয়েলি দয়া দেখিয়ে মহৎ হতে চেয়েছিল ও। ভুষুণ্ডাকে চেনে না, তাই!

ভুষুণ্ডাকে পড়তে দেখেই ঐ গুলির বৃষ্টির মধ্যেই দুটো লোক দৌড়ে এল ওর দিকে। আমি উজির ব্যারেলটা সামান্য ঘোরালাম। তারপর প্রায় খালি-হয়ে-আসা ম্যাগাজিনটা

খুলে নিয়েই নতুন একটা ম্যাগাজিন ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রিগার টানলাম। আমার হাতের ঘেন্না-মাখা গুলিগুলো সার-সার গিয়ে ভুষুণ্ডাকে ঝাঁঝরা করে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে যেন উপরে ধাক্কা দিয়েই মাটিতে ফেলে দিল। বাঁধা হাত-দুটো উপরে তুলে কী যেন বলল ভুষুণ্ডা। শুনতে পেলাম না। সে মাটির উপর লম্বা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমার হাতের ইজরায়েলি উজি, ভুষুণ্ডাকে একেবারে সুজির হালুয়া বানিয়ে দিল।

চার-চারটি ল্যাণ্ডরোভারই ছেড়ে পালিয়ে গেছে হতভম্ব টর্নাডোর দল। ভুষুণ্ডা ছাড়াও প্রায় পাঁচ-সাতজন লোক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে মাটিতে, মরে ভূত হয়ে। অনেকের হাত-পা-মাথা হ্যাণ্ড-গ্রেনেডে ছিন্নভিন্ন, বাকিরা পালিয়েছে অন্ধকারে।

ততক্ষণে পুবের আকাশ লাল হয়ে এসেছে। সেই লালকে আরও লাল করে তুলে তখনও টর্নাডোর বেস-ক্যাম্পের আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। হঠাৎই লক্ষ করলাম, একটা মোটাসোটা কিন্তু দারুণ লম্বা সাহেবকে তাড়া করে নিয়ে ঋজুদা চলেছে। লোকটা বাওবাব গাছের দিকেই দৌড়চ্ছে। ঋজুদার কোমরে পিস্তলটা আছে বটে ; কিন্তু রাইফেল নেই। আর ঐ লোকটার হাত একেবারেই খালি। তিতিরও ব্যাপারটা দেখেছে বুঝলাম, যখন তিতিরের সঙ্গের হেহে লোকটাই কাটা দড়ির টুকরোটা হাতে নিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঋজুদার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে দেখলাম। নিশ্চয়ই তিতিরেরই ডিরেক্শানে। তখন আমিও আমার সঙ্গের লোকটিকে রাইফেল নিয়ে যেতে বললাম ওদিকে।

দেখতে দেখতে ওরা দুজন ঋজুদাদের ধরে ফেলল। আমার সঙ্গে যে-লোকটা ছিল, সে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঐ লম্বা লোকটার মাথায় এক বাড়ি কষাল। লোকটা ঘুরে পড়ে গিয়েই ওঠবার চেষ্টা করল।

কে লোকটা ? ঐ কি টর্নাডো ?

ততক্ষণে ঋজুদা এবং ওরা দুজন মিলে তার হাত বেঁধে ফেলেছে পিছমোড়া করে। রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রেখেছে আমার সঙ্গীটি তার পিঠে। সে দু'হাত উপরে তুলে হেঁটে আসছে। এই-ই তাহলে টর্নাডো ! নইলে ঋজুদা এত ইম্‌পর্ট্যান্স দিত না অন্য কাউকে।

সামনে ছড়ানো-ছিটানো নানা জাতের মানুষের লাশ আর দূরের আগুনের দিকে চেয়ে আমার মনে ঐ হেঁটে-আসা টর্নাডো-নামক লোকটার উপর ভীষণ রাগ কুণ্ডলি পাকাচ্ছিল। ওই-ই এতগুলো লোক খুনের জন্যে দায়ী। এবং দায়ী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পশুপাখির অহেতুক খুনের জন্যে।

ভুষুণ্ডার থুবড়ে-পড়া মুখে এখন সকালের রোদ এসে পড়েছে। তিতির গুহার ভিতর থেকে বাইরে এল। আমি নেমে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। আমার দিকে চেয়ে ও বলল, "হাই ! রুফাস্ ! গুড মর্নিং।"

হাসলাম। বললাম, "ভেরি গুড মর্নিং, ইনডিড্।"

ভুষুণ্ডার মুখের উপর রোদ এসে পড়েছিল। রোদ পড়েছিল টেডি মহম্মদ পাহাড়ের গায়েও। ওদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি। তিতির তো আর আমাদের বন্ধু টেডিকে দেখেনি ! ভুষুণ্ডার ভয়াবহতার কথাও তার জানা নয়। ও কী করে জানবে "গুগুনোগুম্বারের দেশের" ব্যাপার-স্যাপার !

তিতিরও দেখলাম পড়ে-থাকা ভুষুণ্ডার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ও আস্তে আস্তে বলল, "রুদ্র ! তোমার মনের সাধটা তাহলে মনেই রইল।"

"কী ?"

"গড়ের মাঠের ভেড়াওয়ালার মতো ভুষুণ্ডার মাথাটা কোলের উপর শুইয়ে নিয়ে চুল কাটা আর হল না !"

বললাম,"সাধ পূরণ হবার অসুবিধে তো দেখি না ! চুল কাটতে চাইলে মাথার অভাব কি ? তোমার চুল তো ভুষুণ্ডার চুলের চেয়েও অনেক ভাল ও লম্বা। তোমার চুল কেটেই না হয় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে।"

তিতির বসে পড়ে বলল, "হুঁ ! তাই-ই ভাবছ বুঝি ? কত্ত সাধ ! এবার একটু কফি-টফি খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করো মিস্টার রুদ্দরবাবু। একজন মহিলাকে দিয়ে তো যা নয় তাই করিয়ে নিলে !"

দ্য গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার মিস্টার ঋজু বোস এগিয়ে আসছিলেন, সাদা পাহাড়ের মতো টর্নাডোকে নিয়ে ; আমাদেরই দিকে।

তিতির দু' হাত জড়ো করে বলল, "ঋজুকাকা ! প্লিজ একটু কফি খেতে দাও এবারে। আসতে না-আসতেই নতুন অর্ডার কোরো না কোনো কিছু।"

ঋজুদাও এসে বসল আমাদের পাশে। পাইপের পোড়া-ছাই খুঁচিয়ে ফেলতে লাগল। মুখে কোনো ক্লান্তি নেই। ভূত না ভগবান, বুঝি না কিছু !

তিতির লোকগুলোকে বলল টর্নাডোর হাত ও পা বেঁধে গুহার মধ্যে ফেলে রাখতে। তারপর নিজের সুগন্ধি রুমালটাও বের করে দিল আমার দিকে চেয়ে। বলল, মুখে ঢুকিয়ে দিতে।

ঋজুদা বলল, "রুদ্র ! যা তো আমার জিপটা কাছে নিয়ে আয়। এইখানে। আর জলদি কফি। কফি খেয়ে, সার্গেসিন ডব্সনকে উদ্ধার করে আন্ গিয়ে। আমি ততক্ষণে দেখি পার্ক হেডকোয়ার্টার্সে আর নীয়েরে সাহেবের সঙ্গে ডার-এস্-সালামে একটু যোগাযোগ করা যায় কি না ! ওয়্যারলেস সেটটাও বয়ে নিয়ে আয়। এখন আর ভয় নেই। ডব্সনের সব ডিনামাইট লাইন করে লাগিয়ে, আমাদের কালীপুজোর চিনেপটকার মতো ঠুকে দিয়ে এসেছি। ওদিকে সব সাফসুফ। নট নড়নচড়ন নট কিছু !"

"পটকা তোমার ফার্স্টক্লাস, ঋজুকাকা। আওয়াজটা একটু বেশি, এই-ই যা।"

আমিও তখনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎই, আমাকে জোর ধমক দিল ঋজুদা। "কী, করছিসটা কী তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ! যা না ! সাধে কি তোকে রুফাস্ বলি !"

নেমে যেতে যেতেও দাঁড়ালাম। বললাম, "শোনো ঋজুদা, একটা প্রমিস্ করতে হবে।"

"প্রমিস্ ? এই সময় ? কিসের প্রমিস্ ?"

"না। আগে বলো যে করবে !"

"আহাঃ। কী তা বলবি তো। কী মুশকিল রে বাবা।"

"এর পরেরবার যখন কোথাও যাব আমরা, তখন আমাদের সঙ্গে কিন্তু ভট্‌কাইকেও নিয়ে আসতে হবে।"

"তোমার অর্ডার ?"

"আমার আর্জি।"

তিতিরের দিকে ফিরে ঋজুদা বলল, "তুই কী বলিস, তিতির ?"

"নাইস্ কম্পানি ; ভট্‌কাই। যা শুনেছি রুদ্রর মুখে। আমাদের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড় ; এই যা। ভালই তো। তিনজনের টিমটা কেমন অপয়া-অপয়াও ঠেকে।"

ঋজুদা বলল, "অপয়া ? তিনজনের টিমই তো সবচেয়ে পয়া বলে মনে হচ্ছে।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভট্‌কাই টিমে এলে, ভট্‌কাই-এর উকিল বাদ যাবে। উকিল মক্কেল দুজনকে একসঙ্গে তো আর আনা যাবে না।"

নামতে নামতে বললাম, "বাঃ। তা তো বলবেই। কাজের বেলায় কাজি! কাজ ফুরোলে পাজি!"

ঋজুদা আর তিতিরের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম পিছন থেকে।

আমারও খুব হাসি পাচ্ছিল। আনন্দের স্বস্তির হাসি। কত্ত দিন কলকাতা ছেড়ে এসেছি। কাজ শেষ হওয়াতেই মনটা ভীষণ বাড়ি-বাড়ি করছে। মা, বাবা, গদাধরদাদা, মিস্টার ভট্‌কাই। কত্ত দিন মায়ের হাতের রাঁধা শুক্তো খাই না, বাবার সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং খেলি না; গদাধরদাদার হাতের মুগের ডালের খিচুড়ি খাই না; আর চটকাই না ভট্‌কাইকে!

কত্তদিন!

নিনিকুমারীর বাঘ

॥ ১ ॥

তিতির বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি আর নাই পারি, বল ঋজুকাকা, নিনিকুমারীর বাঘের কথা ভাল করে শুনে তো নিই।

ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে বসে পুজোর পরের এক বিকেলে কথা হচ্ছিল। আমি তিতির আর ভট্‌কাই গেছিলাম ঋজুদাকে বিজয়ার প্রণাম করতে। বাঘটার এমন নাম কেন হল ? নিনিকুমারীর বাঘ ? ভট্‌কাই শুধোল।

ভট্‌কাই খুবই সাবধানে কথাবার্তা বলছে। কারণ ও অলিখিত অ্যাপ্লিকেশনটা আমি বিনা কালিতে রেকমেণ্ড করে ফরোয়ার্ড করে দিয়েছি ঋজুদার কাছে। ওর নিজের তো বটেই, আমারও অনেকদিনের ইচ্ছে যে ভট্‌কাই একবার ঋজুদার সঙ্গে যায় কোনো অ্যাডভেঞ্চারে। আমাদের এই সব অ্যাডভেঞ্চারের অবশ্য অন্য নাম আছে ভট্‌কাই-এর পরিভাষায়। ও বলে, কড়াক্-পিঙ-ডং-ডিং।

ওদিকে ওর অ্যাপ্লিকেশনের কী গতি করবে তা ঋজুদাই জানে ! ঝুলিয়ে রেখেছে এখনও। এবং শেষ পর্যন্ত রাখবেও। এই ঋজুদার তরিকা ! অপ্‌টিমিস্ট ভট্‌কাই রাইট অ্যান্ড লেফ্‌ট তেল দিয়ে যাচ্ছে ঋজুদাকে। কিন্তু ও জানে না তেল দেওয়াটাও আদৌ সহজ কর্মের মধ্যে পড়ে না। তেল দিতে হলে তেল-বিশারদও হতে হয়। তাছাড়া কত্ত রকমের তেল আছে। মাল্টিগ্রেড, অর্ডিনারি ! চল্লিশ নাম্বার, ষাট নাম্বার। পেট্রল, নাইনটি-থ্রি অকটেইন ; এ সব ভালমত জানতে হবে। তার পরেও দেওয়ার সময়ে যদি ডিফারেনশিয়ালের ফুটোতে ব্রেক অয়েল দিয়ে দেওয়া হয় তা হলেও চিত্তির ! তাই আমি মাঝে মাঝেই ঋজুদার অলক্ষে ভট্‌কাইকে চিমটি কাটছি। কিন্তু এমনই হাবা-গবা যে, বুঝেও বুঝছে না। সাধে কি ওর শ্যামবাজারের বন্ধুরা ওকে নিয়ে গান বেঁধেছে ‘ওরে ওরে ভট্‌কাই আয় তোরে চটকাই ?’

ঋজুদা বলল, কীরে রুদ্র ! এই তিতির, ভট্‌কাই, তোরা খা। লুচিগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাবড়ি দিয়ে লুচিগুলো খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।

ভট্‌কাই রাবড়ি সহযোগে লুচির লোভ নস্যাৎ করে দিয়ে আবারও শুধোল, বাঘটার নাম “নিনিকুমারীর বাঘ” কেন, তা কিন্তু বলোনি ঋজুদা।

ঋজুদা পাইপে আগুন ধরিয়ে বলল, বুঝলি না ! রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার ! সব রাজপরিবারেই রেওয়াজ ছিল যে রাজকুমারীরাও, বয়স বার-তের বছর হলেই তাঁদের প্রথম বাঘটি শিকার করবেন রাজকুমারদেরই মত। সে গোয়ালিয়র, রাজস্থান, ভূপাল বা কুচবিহার, যে রাজ্যই হোক না কেন ! মহারাজা এবং বড় রাজাদের দেখাদেখি ছোট ছোট

কদর রাজ্য এবং নকলনবিশ জাগিরদার, জমিদারদের পরিবারেও এই নিয়ম চালু হয়েছিল। নিয়ম না বলে বলা ভাল ঐতিহ্য! ট্রাডিশন! ভারতবর্ষ হচ্ছে ট্র্যাডিশনের দেশ!

বলেই একটু থেমে পাইপে লম্বা টান লাগাল একটা।

তারপর বলল, সান্বপানি, যেখানে আমাদের যাওয়ার নেমন্তন্ন এসেছে নিনিকুমারীর বাঘের মোকাবিলা করতে, সেটি ছিল ওড়িশার একটি ছোট্ট, অখ্যাত রাজ্য। সেই রাজ্যের ছোট রাজকুমারীর নাম ছিল নিনি। কিন্তু যে বাঘের নাম "নিনিকুমারীর বাঘ" তা কিন্তু তার জীবনের প্রথম বাঘ নয়; শেষ বাঘ। সান্বপানির নিনিকুমারী আজ বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত প্রায় নব্বই বছর। বছর দশেক হলে উনি গত হয়েছেন। তাঁর বয়স যখন আশি টাশি তখন শীতকালে অষ্টমী পুজোর সময় বাপের বাড়ি এসে হঠাৎ তাঁর শখ চাপল যে নিজেদের খাস জঙ্গলে উনি একটি বাঘ মারবেন। প্রমাণ করবেন যে তিনি আদৌ বুড়ি হননি। কুড়িতে বুড়ি হয় মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়েরাই। এই নিয়ম কি আর রাজকুমারীদের বেলায় খাটে!

তারপর? আমি বললাম, জম্পেশ করে রাবড়ি মাখিয়ে একটি লুচি মুখে পুরে দিয়ে।

বাঘ তো মারবেন ঠিক করলেন নিনিকুমারী কিন্তু বাঘ শিকার তো সারা দেশেই তখন বেআইনী হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজা-রানীদের বেলা কোনো আইনই খাটে না। করদ রাজ্যের রাজা-রানীদেরও বেলাতেও নয়; গণতন্ত্রের রাজা-রানীদের বেলাতেও নয়। রাজা-রানীদের পায়ে মাথা ঠেকানোই আমাদের ঐতিহ্য।

ভট্‌কাই বলল, ট্র্যাডিশন।

অতএব রাজত্ব থাক আর নাই থাক, প্রজারা বাঘ-শিকারের সব বন্দোবস্তই পাকা করে ফেলল।

উঁচু পাহাড়ের উপরে একটি দুর্গ ছিল। ওড়িয়াতে বলে 'গড়'। সেটি শুটিং-লজ' হিসেবে ব্যবহৃত হত। তার নাম ছিল 'শিকার-গড়'। খবর গেল শিকার-গড়-এ। ধুলো পড়ে লাল হয়ে যাওয়া ঝাড়-লণ্ঠন যতখানি সম্ভব পরিষ্কার করা হল। শতচ্ছিদ্র গালচে নতুন করে পাতা হল। শিকারের পর সন্ধেবেলা সেখানে নাচ-গান হবে। পার্টি হবে। করদ রাজ্যের পুরনো শিকারীরা তাদের প্রায় মরচে ধরে যাওয়া বন্দুক রাইফেল বের করে একটি খুব বড় বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখে তার চলাফেরার খোঁজ খবর নিয়ে হাঁকোয়া শিকারের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। শিকারের দিন লাঞ্চ খাবার পর নিনিকুমারী একটি কুরুম গাছে বাঁধা মাচাতে এক্কেবারে একা গিয়ে বসলেন। মই বানিয়ে রেখেছিল ওরা। সিল্কের ওয়াড়-পরানো ডানলোপিলোর গদীমোড়া মোড়া পেতে। অন্য কোনও শিকারীর সাহায্য নিতে তিনি একেবারেই রাজি হলেন না সেদিন।

হাঁকা শুরু হবার একটু পরই হঠাৎ তাড়া খেয়ে নালার পাশের গুহার মুখে শীতের দুপুরের রোদে ভরপেট খেয়ে আরামে ঘুমিয়ে-থাকা বাঘ বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে শিকারীদের পরিকল্পনা মতই চলতে লাগল একেবারে সোজা নিনিকুমারীর মাচা যেদিকে, সেদিকেই। আগের রাতে বাঘটি একটি দারুণ শম্বর মেরে তার অনেকখানিই খেয়েছিল। চলতে কষ্ট হচ্ছিল বেচারার। চলতে যে হবে তা জানাও ছিল না। বাঘ মাচার সামনে আসা মাত্র নিনিকুমারী গুড়ুম করে গুলি করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রচণ্ড গর্জন করে লাফ মেরে কুরুম গাছের পেছনের দুর্ভেদ্য কন্টা-বাঁশ আর হরজাই জঙ্গলের মধ্যে বাঘ তো ঢুকে গেল। নিনিকুমারীর হাতে ডাবল-ব্যারেল রাইফেল থাকা সত্ত্বেও আর গুলি করলেন

না উনি। কোনো শিকারীকেও তিনি বাঘের রক্তর দাগ দেখে অনুসরণ করতে মানা করলেন। মাচা থেকে নেমে বাইফোকাল চশমাটি খুলে সুগন্ধী সিল্কের রুমালে কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন যে গুলি লেগেছে বাঘের বুকে। হার্টে। থ্রি-সেভেনটি-ফাইভ ম্যাগনাম্-এর গুলি। বাঘ মরে পড়ে থাকবে। কাল সকালে পোড়ো নিয়ে গিয়ে খুঁজে বের করে বাঘকে নিয়ে এসো রাজবাড়িতে। বকশিস্ দেব তোমাদের।

পোড়ো কী, ঋজুদা ? তিতির বলল।

ও। পোড়ো মানে মোষ। ওড়িয়াতে। উচ্চারণটা পোড়্হো।

গুলি হয়েছিল দুপুরে। পরদিন ভোরেই শিকারীরা রক্তর দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে দেখল বাঘ 'শিকার-গড়'-এর উঁচু পাহাড়ে উঠে গেছে। রক্তর বা পায়ের দাগও পাওয়া গেল না। ঐ রাইফেলের গুলি বুকে লেগে থাকলে বাঘের পক্ষে অত উঁচু পাহাড় চড়া সম্ভব হত না আদৌ। রক্তর রকম এবং পরিমাণ দেখেই অভিজ্ঞ শিকারীরা বুঝেছিল যে নিনিকুমারীর গুলি হয় বাঘের গা ছুঁয়ে গেছে, নয়ত সামনের দুই পায়ের এক পায়ের থাবাতে বা কব্জিতে লেগেছে। বুকে কখনই নয়।

ঐ 'খণ্ডিয়া' বাঘকে হারিয়ে ফেলে শিকারীরা খুবই চিন্তায় পড়েছিল। পরে কী হবে তা ভেবে। এবং তাদের চিন্তা যে অমূলক ছিল না আদৌ তা তো আমরা এখন দেখছিই।

খণ্ডিয়া মানে ? ভট্‌কাই শুধোল। ঋজুদাকে।

"খণ্ডিয়া" ওড়িয়া শব্দ। খণ্ডিয়া মানে আহত ; উন্ডেড। গুলি লেগেছিল বাঘের ডান কব্জিতে সামনের দিকে। বেচারার কব্জিটাই হেভি রাইফেলের গুলিতে ভেঙে যায়। তারপর থেকেই সে যাকে বলে কব্জি-ডুবিয়ে মানুষের হাড় মাংস খেয়ে যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, দেশীয় রাজন্যবর্গর বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক এক জান্তব বিদ্রোহ হয়ে উঠে সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে যাচ্ছে সাম্বপানি রাজ্যের নিনিকুমারীর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের আমলের মাটিতে উবু-হয়ে-বসে দু-হাতে ভক্তিভরে "দণ্ডবৎ" জানানো অগণ্য অভুক্ত ছিন্ন-বাস প্রজাদের অনেক এবং অনেক রকম অপমানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, সর্বংসহ বোবা, বড় গরিব প্রজাদেরই খেয়ে। বাঘটা নিজেও তো প্রজাই ছিল সে রাজ্যের ! আমরা তো নিজেরাই নিজেদের খাই। এটাও আমাদের ঐতিহ্য।

ভট্‌কাই রাবড়ির প্লেটটা ট্রেতে নামিয়ে রেখে বলল, ট্র্যাডিশন !

তিতির হেসে উঠল।

ঋজুদা বলল, আশ্চর্য ! জানিস, বাঘটা পুরনো সাম্বপানি রাজ্যের এলাকার বাইরে একজনও মানুষ ধরেনি আজ অবধি। যদিও গত দশ বছর ধরে সমানে সে মানুষ খেয়ে চলেছে।

কত বর্গ কিলোমিটার হবে এই রাজ্যের এলাকা ঋজুকাকা ?

দুর্গম সব পাহাড় আর ঘন বনের রাজ্য। পাহাড়ী ঝরনা আর নালাতে কাটাকুটি। নদী বলতে একটাই বয়ে গেছে অন্য রাজ্য থেকে এসে সাম্বপানির মধ্যে দিয়ে। গেছে অন্য রাজ্যে। নদীর নাম কন্‌সর। ভারী সুন্দর নদী। জেঠুমণির সঙ্গে আমি একবার বাম্‌রা করদ রাজ্যে শিকারে গেছিলাম, তখন দেখেছিলাম। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য পুরো অঞ্চলেরই ! ঋজুদা বললো।

আমি বললাম, গত দশ বছরের মধ্যে এই বাঘকে মারতেই পারল না কেউ ? না কি, কেউ চেষ্টাই করেনি ?

না না। তা কেন ? অনেক শিকারীই গেছেন এর আগে। আমাদের চেয়ে অনেকেই ভাল ভাল শিকারী। তাছাড়া, কলকাতায় কজন আর ভাল শিকারী আছেন ? আমাদের কান ধরে শিকার শেখাতে পারেন এমন শিকারী ভারতের যে-কোনো বনাঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে গণ্ডা-গণ্ডা আছেন। মফস্বল শহরগুলিতে তো আছেনই। নিনিকুমারীর বাঘকে মারতে বন বিভাগের বিভিন্ন অফিসার, জেলার বিভিন্ন সময়ের ডি এম এবং পুলিস সাহেবরাও চেষ্টা করেছেন। বাইরে থেকেও অনেক শিকারীকে ওঁরা নেমন্তন্ন করেও নিয়ে গেছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। স্থানীয় সকলেরই ধারণা হয়ে গেছে যে এ বাঘ, ঠাকুরানীর বাঘ। একে মারা কারওই সাধ্য নেই। ঠাকুরানীর কৃপাধন্য সে। ঐ শিকার-গড়-এর মধ্যে নাকি চণ্ডীমূর্তি আছে। কটক শহরের কটকচণ্ডীর মতই নাকি অত্যন্ত জাগ্রত দেবী তিনি। সাম্বপানির রাজারা আগে খুব ধুমধাম করে শিকার-গড়ে তাঁর পুজো করতেন। মোষ বলিও হত। এখন এই বাঘ নাকি সেই জাগ্রত দেবীরই কৃপাধন্য হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করে। মানুষ-খেকো বাঘই এখন চণ্ডীর একমাত্র উপাসক। তাই ভয়ে অন্য কেউ সেখানে আর যায়ই না।

এই সব ওরা এখনও বিশ্বাস করে ? এরকম সুপারস্টিশানে ? তিতির বলল।

ভট্‌কাই তিতিরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, না কেন ? কেন না ? একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যদি রাজস্থানে এখনও ষোল বছরের মেয়ে রূপ কানোয়ার সতী হতে পারে, যদি পাকিস্তানে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে দোষীর প্রাণ বের করা হয়, প্রকাশ্য স্থানে, নিজের দেশকে ভালবাসেন এই অপরাধে ভুট্টোকেও যদি বিচারের প্রহসন করে ফাঁসি দেওয়া হয়, তবে ঠাকুরানীর বাঘে বিশ্বাস করে গভীর জঙ্গলের গরিব বাসিন্দারা বেশি দোষ কী করেছে ? এই উপমহাদেশেই আবার সুপার-কম্প্যুটারও বসে ! সত্যই সেলুকাস ! কী বিচিত্র এ দেশ !

আলোচনাটা অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে আমি ঋজুদাকে বললাম, বাঘটাকে মারবার জন্যে আর কী করা হয়েছিল এই দশ বছরে ?

কী করা হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর বরং। ঋজুদা বলল।

পাঁচ ব্যাটেলিয়ন আর্মড পুলিসও নাকি একবার পোস্ট করা হয়েছিল সমস্ত সাম্বপানিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সি আর পি-ও দু ব্যাটেলিয়ন। তাদের প্রত্যেককে অটোম্যাটিক রাইফেল দেওয়া হয়েছিল। রাতের পর রাত অনেকগুলি জিপে ও ভ্যানে স্পটলাইট ফিট করে পুরো এলাকাতে তন্নতন্ন করে সরষে দানার মত বাঘ খুঁজে খুঁজে বেড়াত তারা। মানুষখেকো হয়ে যাবার পর বাঘটার ওপর নাকি কমপক্ষে পঁচিশবার গুলিও চলেছে। অনেক শিকারীই মারাত্মকভাবে তাকে আহত করার দাবি করেছেন। গুলি করার পর আহত বাঘের গর্জনও শুনেছেন নাকি তিনজন শিকারী। তবুও নিনিকুমারীর বাঘ বহাল তবিয়তেই আছে এবং বাংলার গ্রামের শেয়াল গরমের দিনে যেমন কপাকপ্ কই মাছ খায়, তেমন করেই অবলীলায় মানুষ ধরে খেয়ে চলেছে।

ভট্‌কাই বলল, এ তো মহা গুলিখোর বাঘ। দেখছি রীতিমত অ্যাডিক্ট হয়ে গেছে।

ভট্‌কাই-এর কথা বলার ধরনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, সাম্বপানি জায়গাটা নাকি গমগম করত একসময়। হাট বসত সপ্তাহে দুবার। কাঠ, বিড়িপাতা, তামাক এ সবের কারবার ভাল ছিল। সার্কাস কোম্পানি আর যাত্রাপার্টি আসত প্রতি বছর শীতকালে ধান কাটার পর। চাষাবাদ এখন প্রায় বন্ধ। যাদেরই উপায় আছে কোনো, তারাই সাম্বপানি ছেড়ে চলে গেছে অন্যত্র বাড়ি-ঘর ফেলে

রেখে। মহামারী লাগলে যেমন হয় তেমনই অবস্থা নাকি ! ক-বছরের মধ্যে এই গম্‌গম্‌ করা রমরমে জায়গাটা কঙ্কালসার শ্রীহীন বসতিতে পরিণত হয়েছে। দিনে রাত্রে মাত্র দুটি আপ আর দুটি ডাইন ট্রেন ছোট লাইনের এই স্টেশনটিতে এসে দাঁড়ায়। কোনও কারণে ট্রেন লেট হলে সন্ধের পরে প্ল্যাটফর্মে কেউ থাকে না। ট্রেনও দাঁড়ায় না সেদিন। স্টেশন মাস্টার সবুজ আলো দেখান না। সিগন্যালম্যানরা আউটার সিগন্যাল থেকে নেমে দিনে দিনে চলে আসে। কখনও কখনও নিনিকুমারীর বাঘকে সূর্য ডোবার আগে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতেও দেখা যায়। বাঘটার নাকি ভয়ডর নেই। কিন্তু শিকারীদের ধারে কাছে আসে না। কিল্‌-এও কখনই ফেরে না।

আমি স্বগতোক্তি করলাম, খুউব কঠিন হবে তো এই বাঘকে মারা।

ঋজুদা যেন নিজের মনেই বলল, খুউবই কঠিন।

॥২ ॥

এবারে মিষ্টিদিদিদের বাড়ির ভাইফোঁটার নেমন্তন্নটা মাঠেই মারা গেল। সঙ্গে ধাক্কাপাড়ে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবিটাও। ওগুলো হয়তো কলকাতায় ফিরে (যদি আদৌ ফিরতে পারি) পেলেও পেতে পারি, কিন্তু খাওয়াটা ! বিশেষ করে মিষ্টিদির হাতে রান্না বড় বড় কইমাছের হর-গৌরী ! একপাশে ঝাল আর অন্য পাশে মিষ্টি। ঈ-শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌। রিয়্যালি, গ্রেট লস্‌।

এখন গভীর রাত। হেমন্তের রাত। বন-বাংলোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল। অবশ্য গা ছমছম করার কারণ ছিল যে না, তা নয়। আছি যে মানুষখেকো বাঘের খাস-তালুকের মধ্যেই।

বনে-পাহাড়ে হেমন্তের দিন রাতের সৌন্দর্যই আলাদা। আলাদা তার ব্যক্তিত্ব। শীতের তাপস এ আদৌ নয়। এর নেই বসন্তর চাপল্য। বর্ষার ঘনঘোর মেঘের দাড়িগোঁফের পুরুষও এ নয়, নয় গ্রীষ্মের উদাঘ রুখু রূপের কেউ। হেমন্ত ঠিক হেমন্তরই মত। এর কোনো বিকল্প নেই। হেমন্তর রাত আর হেমন্তর দিন। আহা ! শিশিরের আর রাতপাখির ডানার গন্ধ। মেঠো ইঁদুরের নরম কোমল পেলব তলপেটের মত হেমন্তর বিকেল। কাছিমের পিঠের মত কালো উজ্জ্বল হেমন্তর এই স্তব্ধ শিশিরভেজা রাত। তুলনাহীন !

শেষ রাতের এক ফালি চাঁদ উঠেছে সেগুন জঙ্গলের মাথা আর কন্‌সর নদীর পাশেই যে কুচিলাখাই পাহাড়, তার ঠিক মাঝখান দিয়ে দিগন্ত ঘেঁষে। অমাবস্যার পরের ঘন কালো রাতে ঐ একফালি চাঁদ তো নয়, মনে হচ্ছে যেন অর্ডার দিয়ে বানানো রুপোর একটি ছোট্ট বাঁকা তলোয়ার। বনে জঙ্গলে এসে এই কলুষহীন স্নিগ্ধ সুন্দর চাঁদকে দেখে মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় যে মানুষ চাঁদে পা না দিলেও পারতো। খুবই বোকা-বোকা ভাবনা। সন্দেহ নেই।

ভট্‌কাই এখন ঘুমোচ্ছে। ওর বিছানাতে। একেবারে কেষ্টনগরের চূর্ণি নদীর কাদা হয়ে, কম্বল মুড়ে। একই ঘরে আমাদের দুজনের বিছানা। মধ্যে বাংলোর ডাইনিং-কাম-সিটিং-রুম। আর ও পাশের ঘরে ঋজুদা শুয়েছে। যে কোনো বন-বাংলোরই ঘরগুলো কেমন, মানে, ভাল কী মন্দ তা ধর্তব্যই নয়। আসল হল, বারান্দা। সারা দিন সারা রাত বারান্দাতে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। আহা ! কী সব

চওড়া চওড়া বারান্দা। কী সব পুরনো দিনের ইজিচেয়ার! বারান্দার সাইজ যে বাড়ির যত ছোট সেই বাড়ির মানুষদের মনই ঠিক সেই সাইজের। কথাটা অবশ্য মিস্টার ভট্‌কাই-এর। উনি মধ্যে মধ্যেই এরকম বাণী দিয়ে থাকেন।

ঋজুদার সঙ্গেও ও সমানে ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করে যাচ্ছে। ওর কথা শুনে আমি তো ভয়ে মরি। ঋজুদার সঙ্গে অমন ভাবে কথা বলার সাহস তিতিরের তো বটেই, আমারও কখনও হবে না। পূর্ব-আফ্রিকার সেই "রুআহা" নদীর উপত্যকাতে আমি যখন প্রায় হাতে-পায়ে ধরেই পরের বারের অভিযানে ভট্‌কাইকে সঙ্গে আনতে রাজি করাই ঋজুদাকে, তখন কি আর জানতাম যে ও এমন ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবে? ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখাবে? কিন্তু এমন সবজান্তা ভাব করলে ওর মামাতো দাদা ঘন্টেদার কাছে কোনোক্রমে পটিয়ে-পাটিয়ে আনা জিনস্ আর নর্থ-স্টার জুতো সুদ্ধ ও নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যাবে। কোনো দেবতাই ঠেকাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে আমার অবস্থা হবে মরারও বাড়া। মাসীমাকে গিয়ে কোন্ মুখে বলব যে মাসীমা, আমা-হেন বীর এবং বিশ্ববিখ্যাত ঋজু বোস সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভট্‌কাই নিনিকুমারীর বাঘের মেনু কার্ডে উঠে গেছে! আইটেম-এর নামটা কাল্লকে ভট্‌কাই নিজেই ভেবে-টেবে ঠিক করেছে। "স্পেশ্যাল ফ্রেশ-ডিলাইট; কেষ্টনগর সিটি/শ্যামবাজার।"

ফোক্কড় বলে ফোক্কড়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেষ্টনগর সিটিই তো যথেষ্ট ছিল! আবার শ্যামবাজার কেন? ও ঠোঁটদুটো গোল করে ছোট করে ফেলে বলেছিল, মা-ন-তু! মেয়েরা আজকাল লেখে না? শ্যামলী চট্টখণ্ডী ঘোষ? অথবা নমিতা বোস বাইসন?

আমি বললাম, সে তো বিয়ে হয়ে গেলে! বাপের বাড়ি আর স্বামীর বাড়ির পদবি আলাদা আলাদা বোঝাতে। তুই কি মেয়ে? ভট্‌কাই বলেছিল, ইডিয়ট। ব্যাপারটা হচ্ছে বাড়ির। সেটাই আসল। কেষ্টনগর সিটি ছিল বাপের বাড়ি। এখন শ্যামবাজারের মামাবাড়িই আমার নিবাস, সাকিন দাগ নম্বর, খতেন নম্বর যাই-ই বল। তবে? বাপের বাড়ির পরিচয় হাপিস করতে বসিস কোন্ আক্কেলে?

আমি আর কথা বাড়াই নি।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল একটা ক্রো-ফেজেন্ট পাখির জবরদস্ত ডাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কম্বলের পায়ের কাছে। ক্লোরোফিল ভরপুর ঘনসবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে পড়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে সে রোদ আসছে। কী গভীর শান্তি চারদিকে। কে বিশ্বাস করবে আমরা এখানে এসেছি মৃত্যুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে! চোখ-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দাতে এসেই দেখি ঋজুদা। বারান্দায় যেখানে রোদ লুটিয়ে পড়েছে, সেইখানে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়িয়ে বসে দূরের পাহাড়ের মাথায় যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে ঝক্‌ঝকে রোদে-মোড়া নীল আকাশের ফ্রেমে-বাঁধানো কোনো ছবিরই মত, সেই পোড়ো-দুর্গটির দিকে চেয়ে বারান্দার থামে দু'পা তুলে দিয়ে পাইপ খাচ্ছে।

মিস্টার ভট্‌কাই বন্দুক রাইফেলগুলো নিয়ে পড়েছে। রাইফেলগুলোর নল থেকে পুল-থ্রু দিয়ে টেনে টেনে তেল পরিষ্কার করছে আর দো-নলা বন্দুকগুলোর নল পরিষ্কার করছে ফ্ল্যানেল-জড়ানো ক্লিনিং-রড দিয়ে।

আমাকে দেখেই ভট্‌কাই তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কীরে রুদ্রবাবু! আমার যোগব্যায়াম তো শেষই, মায় সর্ষের তেল গায়ে মেখে চান পর্যন্ত শেষ। আর তোর এতক্ষণে ঘুম

ভাঙল ? ম্যান-ইটার বাঘ মারতে এসেছিস তুই ? ফুঃ !

ঋজুদা কী যেন ভাবছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, এই ! তোরা সকাল থেকেই দুজনে মোরগা-লড়াই শুরু করিস না তো ! যা রুদ্র। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে চান সেরে নে। আমিও যাচ্ছি আমার বাথরুমে। ঠিক আটটাতে ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি জগবন্ধুকে। তুই চান করতে যাবার সময় একটু তাড়া দিয়ে যাস। বালাবাবুও খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।

চা ঢাললাম আমি কাপে পট থেকে। ঋজুদাকে বললাম, তুমি নেবে আর ?

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, দে এক কাপ।

ঐ পাখিটার ওড়িয়া নাম জানিস ? বল্ তো কী ? ভট্‌কাই ক্রো-ফেজেন্টের ডাকের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল।

সাহস কত্ত ! যেন পরীক্ষা নিচ্ছে আমার ! "দু'দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় অন্ন।" যার দৌলতে এখানে আসা তারই লেগ-পুল্ করছে।

জানি না। আমি তাচ্ছিল্যের গলায় বললাম। জানলেও...

হুঁ। হুঁ। কন্তাটুয়া ! আমি জানি।

ভট্‌কাই চোখে-মুখে অসীম কৃতিত্ব জাগিয়ে বলল।

ঋজুদা আমাদের ঝগড়াতে কোনো পক্ষকেই সমর্থন না করে চুপ করে কী যেন ভাবছিল।

সামনের ঐ পাহাড়টার নাম যে কুচিলা-খাঁই তা তো জানিস, কিন্তু "কুচিলা-খাঁই" মানে কী বল তো ?

অদম্য এক্স-কেষ্টনগর সিটি, অধুনা শ্যামবাজারের রক্‌বাজ, কলকাতার আড্ডাবাজ ভট্‌কাইচন্দ্র আমায় বলল।

মানেটা আমি জানি। ঋজুদার জন্যে চা ঢালতে ঢালতে বললাম আমি। তারপর বললাম, কুচিলা-খাঁই মানে, ওড়িয়াতে ধনেশ পাখি। ধনেশ পাখি দেখেছিস তো চিড়িয়াখানায় ? এবারে বল্ তো 'কুচিলা' শব্দটার মানে কী ? উল্টে শুধোলাম আমি।

ভট্‌কাই মনে হল মুশকিলে পড়ে গেল। মুশকিলে সে পড়তে পারে কিন্তু কোথাওই বেশিক্ষণ পড়ে থাকার পাত্রই সে নয়। কিন্তু আশ্চর্য ! ভট্‌কাই-এরও সুমতি হল। দু'দিকে মাথা নেড়ে বাধ্য ককার-স্প্যানিয়েলের মত সে জানাল, জানে না।

তারপর বলল, বলে দে আমাকে তুই।

কুচিলা একরকমের ফল। যে গাছে ঐ ফল ধরে তার নামও কুচিলা। ঐ ফল খেতে ধনেশ পাখিরা খুব ভালবাসে বলেই ধনেশ পাখিদের নাম এখানে কুচিলা খাঁই। আমি বললাম।

ভট্‌কাই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, হাউ ডেঞ্জারাস।

এবার অবাক হবার পালা আমার। বললাম, এতে ডেঞ্জারের কি দেখলি ?

ডেঞ্জার নয় ? তুই কাউঠ্যা খেতে ভালবাসিস, মাসীমা কদ্‌বেল খেতে ভালবাসেন বলেই তোদের নাম হয়ে যাবে কাউঠ্যা-খাঁই আর কদবেল-খাঁই ?

ঋজুদা ওর কথায় এত জোরে হেসে উঠল যে কাপ থেকে চা চল্‌কে পড়ল ভাল শালটার ওপর।

আমার আর ঋজুদার হাসি থামলে আমি বললাম, কুচিলা ব্যাপারটা কী তা জানিস ?

ঋজুদার হেভি রাইফেলটার তেলমোছা শেষ করে চেয়ারের দুই হাতলের ওপর রেখে

ও বলল, ব্যাপার আবার কী ? কুচিলা কুচলারই খুব কাছাকাছি। কুচলা তো হিন্দি শব্দ। ময়লা-কচলা। বলে না ?

কুচ্‌লা ঠিকই আছে। কিন্তু কুচিলার সঙ্গে কুচ্‌লার সম্পর্ক নেই। ওড়িয়া শব্দ এটি।

তাই ?

ইয়েস স্যার ! আর এই ধনেশ কিন্তু বড় ধনেশ যার ইংরিজি নাম "দ্য গ্রেটার ইন্ডিয়ান হর্নবিলস্‌।"

সে যাই হোক, কিন্তু কী বিট্‌কেল নাম রে বাবা ! কুচিলা খাঁই।

নাম বিট্‌কেল হলে কি হয় এ বড় গুণের গাছ। এই কুচিলা।

কেন ? কিসের গুণ ?

এই গাছের ফল দিয়ে যে ওষুধ তৈরি হয় তা খাইয়েই তো মাসীমা তোর মত ছিচ-রুগীকে দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ব্যামো একেবারে টাইট।

আমার ব্যামো ? যেন গাছ থেকে পড়ে বলল ভট্‌কাই।

ওষুধটা কি তা তো বলবি ?

নাক্স-ভমিকা।

হি রে। বলিস কি তুই ! নাক্স-ভমিকা থার্টি ?

ঋজুদা আবারও হেসে ফেলল, ভট্‌কাই-এর কথা শুনে। বলল, নাক্স ভমিকার বুঝি থার্টি ছাড়া আর স্ট্রেংথ হয় না ? কি রে ভট্‌কাই ?

ভট্‌কাই ক্ষণকালের জন্যে অফ্‌-গার্ড হয়ে হেসে নিজের বোকামি মেনে নিল।

ভারী সুন্দর জায়গাটা কিন্তু। চায়ের কাপে আর এক চুমুক দিয়ে আমি বললাম ঋজুদার দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ ! ভয়াবহ্‌ বলেই হয়ত বেশি সুন্দর। এবারে চল ওঠা যাক। ঠিক আটটায় খাবার টেবলে দেখা হবে।

আমরা যখন ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে জগবন্ধুর ভাজা গরম গরম লুচি, বেগুনভাজা, ওমলেট্‌ আর রেঞ্জার বেহারা সাহেবের দিয়ে যাওয়া অতি উপাদেয় পোড়-পিঠা দিয়ে প্রাতরাশ সারছি, সেই সময়ে বাইরে একটি জিপ-এর শব্দ শোনা গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হতেই সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন রঘুপতি বিশ্বল সাহেব—ডি. এফ ও.।

ঋজুদা খাওয়া থামিয়ে বলল, নমস্কার। আসন্তু আঁইজ্ঞা। বসন্তু বসন্তু।

বিশ্বল সাহেব হেসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বসিবি নিশ্চয়। কিন্তু কিচ্ছি খাইবা-পীবা পাঁই কহিবেনি আঁপ্পনি মত্বে।

কাঁই ? গুট্রে কাপ চা পীইবাকু টাইম হেব্বনি কি ? এত্বে তাড়া কাঁই আপনংকু ? ঋজুদা বললো।

গম্ভীর মুখ করে বিশ্বল সাহেব বললেন, সে বাঘ্‌টা কালি মধ্যরাতিরে গুট্রে হিউম্যান কিল করিলা।

ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে খাওয়া থামিয়ে বলল, সত্য ?

সত্য না হেব্বে মুই শুনিনি এটি দৌড়িকি এমিত্বি আসিলি কি ?

আমি দেখলাম, ভট্‌কাই-এর মুখে লুচি-বেগুন ভাজা আটকে গিয়ে ওর চোখ গোল গোল হয়ে গেল হিউম্যান কিল্‌-এর কথা শুনে।

কুয়াড়ে করিলা ? কিল্‌ ?

ঋজুদা শুধোল।

বিশ্বল সাহেব চেয়ারে ঘুরে বসে ডান হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গরাদেহীন জানালা দিয়ে বাইরে দেখিয়ে বললেন, পর্বতোপরি যে গড়টা দিশিছি...

হাঁ। সে গড়কু কোন্ পাখেরে?

সেটু যীবাবেলে শুট্টে সাম্ব গাঁ মিলিব সে পর্বতর নীচেরে। গড়টু যাইবা পথকু বাম পাখেরে। তা নাম ঝিংকপানি। আট-দশ ঘর কাবাড়ি রহিছি সেটি। সেই গাঁ টারু শুট্টে ঝিওংকু ধরি সারিলা বাঘ টা।

ঋজুদাকে চিন্তিত দেখাল। তাকে এত উত্তেজিত কখনও দেখিনি। উত্তেজিত হলেই চিন্তিত দেখাল। এ চিন্তা অন্যরকম।

আমাদের বলল, চল। তাড়াতাড়ি খেয়েনে রুদ্র, ভট্‌কাই। বলেই নিজে নাকে মুখে খাওয়া সেরে চেয়ার ছেড়ে উঠল। জামা-কাপড় পরতে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়ে বিশ্বল সাহেবের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করেই এক টুকরো পোড়-পিঠা আর এক কাপ চা ঢেলে দিয়ে গেল তাঁকে।

একটু পরই আমরা তিনজনে তৈরি হয়ে বারান্দাতে এলাম। বনবিভাগ আমাদের যে জিপটি দিয়েছিলেন সেটি মাহিন্দ্রর জিপ। বলতে গেলে, নতুনই। বনেট খুলে ব্যাটারির জল, মবিল সব নিয়ে দেখে নিল ঋজুদা। আমি ড্রাইভিং সিটে উঠে ইগনিশন সুইচ্ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। পেট্রলের ট্যাঙ্ক প্রায় ভর্তিই আছে। তেলের দরকার হলে আমাদের যেতে হবে সাম্বপানিতে। এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিমি মত পথ। পথটা আগাগোড়াই কাঁচা। গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। নালাও পেরতে হয় তিনটে। ফেয়ার ওয়েদার রোড। সবে খুলেছে। জুন মাসের শেষে বন্ধ হয়ে যাবে। ওর চেয়ে কাছে আর কোনও পেট্রল-পাম্প নেই।

ঋজুদার ইশারাতে আমি এঞ্জিন স্টার্ট করলাম। ঋজুদা বিশ্বল সাহেবকে বললেন গোটা দুই ড্রামে করে যদি পেট্রল আনিয়ে বাংলোতে রাখবার বন্দোবস্ত করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।

বিশ্বল সাহেব বললেন, ঠিকাদারের ট্রাকে করে কালই পাঠিয়ে দেবেন পেট্রল।

ঋজুদা হাত জোড় করে বিশ্বল সাহেবকে নমস্কার করে বললেন, "কালি কী পড়শু আপনংকু সেঠি যাইকি ভেটিবি।"

বিশ্বল সাহেবও নমস্কার করে বললেন, হঁ আঁইজ্ঞা।

জিপ এগিয়ে নিয়ে গেলাম আমি। বিশ্বল সাহেব নিজের জিপের দিকে যেতে যেতে বললেন, "টেক কেয়ার।"

আমি বললাম, কী ভাল, না?

ভট্‌কাই শুধলো, কী?

এই বিশ্বল সাহেব।

ঋজুদা বলল, আমাদের দোষ কী জানিস? আমরা বাঙালীরা নিজেরা নিজেদের মস্ত বড় বলে মনে করি। আমাদের প্রতিবেশীদের—ওড়িয়া, অহমীয়া, বিহারী এঁদের কাউকেই ভাল করে জানারও প্রয়োজন বোধ করিনি আমরা কোনওদিন! আমি তো ওড়িশা আর ওড়িশার সংস্কৃতি, নাচ, গান, সাহিত্য সব কিছুরই দারুণ অ্যাডমায়রার। অনেক কিছুই শেখার আছে আমাদের ওঁদের কাছে। বিনয় তো অবশ্যই। আমরা ছেলেবেলায় শিখেছিলাম, "লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়, নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়।"

কিন্তু ঐ মুখস্থই করেছিলাম। জীবনে কাজে লাগাইনি।

আমি চুপ করে থেকেই সায় দিলাম ঋজুদার কথায়।

রেঞ্জার সাহেব একজন ফরেস্ট গার্ডকে আমাদের গাইড হিসেবে এবং বন-বিভাগের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সেতু হিসেবে এই বন-বাংলোতেই পোস্ট করে দিয়েছেন। উনি জিপও চালাতে জানেন। ভদ্রলোকের নাম হরেকৃষ্ণ বালা। কাল রাতেও উনি বাংলোতেই ছিলেন। জগবন্ধুরই কোয়ার্টার্সে।

ঋজুদা নিজের ফোর-ফিফ্‌টি-ফোর হাণ্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল্ রাইফেলটা নিয়েছে সঙ্গে। জেফ্‌রি নাম্বার টু। আমার হাতে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানালিকার শুনার। সিঙ্গল ব্যারেল ম্যাগাজিন রাইফেল। ভট্‌কাই শিকারি নয়। তবে ওর মেজমামার বন্দুক চালিয়ে বহরমপুরের বিলে-বাদায় কাগা-বগা-জলপিপি-কামপাখি যে দু-চারটে মারেনি এমন নয়। ঋজুদার ডাবল-ব্যারেল্ বন্দুকটা ভট্‌কাই-এর হাতে। যতটা এবারে ব্যবহার করার জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি মরাল-সাপোর্ট-এর জন্যে। বালাবাবু আর ভট্‌কাই পেছনে বসেছিলেন। আর ঋজুদা আমার পাশে।

ঋজুদা বালাবাবুকে শুধোলেন সামনে যে দুর্গটা দেখা যাচ্ছে তার নাম কী হরেকৃষ্ণবাবু ?

সে গড়টা, তার নাম শিকার-গড়।

ও। এই তাহলে সেই বিখ্যাত শিকার-গড়। অনুমান করেছিলাম অবশ্য।

শিকার-গড়-এর নাম শুনে আমরা সকলেই তাকালাম, ভাল করে সেদিকে। মানুষ আর হাতিতে পাথর বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়-চুড়োর গড় বানিয়েছিল। কত মানুষের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে ঐ গড়-এর পাথরে পাথরে, তা ঠাকুরানীই জানেন। আর...

এখন ? এখন কারা থাকে ঐ গড়ে ? কেউই থাকে না ? ঋজুদা হরেকৃষ্ণবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল সামান্য অধৈর্য গলাতে।

জায়গাটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়নি ঋজুদার এখনও। বিশ্বল সাহেবের কাছে আগেই একটি ম্যাপ চেয়েছিল এই ফরেস্ট ডিভিশনের। সমস্ত গ্রাম এবং ফরেস্ট ব্লক-এর এবং বিট-এর ডিটেইলস্ চেয়ে। বিশেষ করে কোন্ কোন্ জায়গায় বাঘ মানুষ ধরেছে তা লাল কালিতে চিহ্ন দিয়ে। এবং কোন্ কোন্ তারিখে ধরেছে তাও। বিশ্বল সাহেবের অফিস সেই ম্যাপটা এখনও দিয়ে উঠতে পারেনি বলে ঋজুদা একটু বিরক্ত আছে মনে মনে। এই ম্যাপটা কলকাতাতেই ঋজুদার কাছে যাতে পৌঁছয় তারই অনুরোধ করেছিল ঋজুদা। আর এদিকে বাঘে মানুষ মেরেছে, সেই কিল্-এর দিকে এগোচ্ছি আমরা অথচ নানারকম গল্প, কিছু প্রেস-কাটিং এবং চিল-সেক্রেটারির পাঠানো একটা নোট ছাড়া অন্য কিছুই হাতে আসেনি।

ঋজুদার প্রশ্নর উত্তরে হরেকৃষ্ণবাবু বললেন, এখন ঐ গড়ে ভূত-প্রেত বাস করে। সাপ, নানারকম। একটি ভাল্লুক পরিবার। আর নিনিকুমারীর বাঘও থাকে মাঝে মাঝে। গড়-এর ভেতরের ঘরে বাদুড়দেরও বাস আছে। আগে কখনও কখনও মানুষজন আসত দূর থেকে। কোনও স্কুল-কলেজের বা অফিসের ছেলেমেয়েরা বা বাবুরা পিকনিকে আসত শীতকালে। কিন্তু পরপর দুটি পিকনিক পার্টির একজন পুরুষ এবং একজন মেয়েকে বাঘে ধরার পর কেউই আর ঐ দিকই মাড়ায় না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ্ ওঠেনি ঐ গড়ের পথে আজ বহু বছর। পাহাড়ের ওপরে শিকার-গড়ে যাওয়ার পথটাও আর পথ নেই।

জঙ্গলে আর কাঁটা ঝোপে ছেয়ে গেছে।

ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ পথের পাশের সেগুন প্ল্যানটেশানে। প্ল্যানটেশান যত্ন করেই করেছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু বাঘের জন্যে তলার আগাছা পরিষ্কার করা হয়নি কম করে তিন-চার বছর। গরমের আগে দাবানলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নালাও কাটা হয়নি। ফলে পথটাকে আগাছা আর ঘাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। জিপও আজকাল আসে কালে-ভদ্রে। পায়ে-চলা পথটি আগের চওড়া পথের মধ্যে এঁকেবেঁকে জেগে রয়েছে কোনওক্রমে। তাতে সৌন্দর্য আরও বেড়েছে বই কমেনি।

জিপটা চলেছে পাহাড়ী ঝর্ণা পেরিয়ে, হীরেকুচির মত জল ছিটিয়ে টায়ারে, লালমাটি ভিজিয়ে। প্রায় হারিয়ে-যাওয়া পথ ছুটেছে ক্রমাগত চড়াইয়ে-উতরাইয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শিকার-গড়ের দিকে।

মিনিট কুড়ি জিপ চালানোর পর একটা সমকৌণিক বাঁক ঘুরতেই নাকে এল হেমন্তর পাহাড় বনের এক ঝলক প্রভাতী গন্ধ। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও একটি ঝলক চোখে ঝিলিক মেরে গেল। তারপরই পথটা আবার বাঁক নিতেই গ্রামটা মুছে গিয়ে গন্ধটা জোরদার হল। তার একটু পরেই পথটা আবার সোজা হয়ে ঝিংকপানি গ্রামের দিকে মুখ করল।

নামেই গ্রাম। অল্প কয়েকটি ঘর। ভেরাণ্ডার বেড়া লাগানো। পেঁপে গাছ। আম, লিচু, কাঁঠাল। গোবর লেপা উঠোন। স্নিগ্ধ ছায়া। গরু-ছাগলের ডাক। মন্থর, ঢিলে-ঢালা চাল এখানের জীবনের। উলঙ্গ শিশু, অপুষ্টির শিকার-হওয়া হাড়-লিকলিক পিলে-বের-করা সব যুবকেরা। অন্ধ বৃদ্ধ। চারিদিকে চরম দারিদ্র। আর হতাশা। অসহায় মানুষের করুণ সমর্পণ, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ; সমাজের পায়ে, সমাজ ব্যবস্থার পায়ে। নিনিকুমারীর বাঘেরও পায়ে।

ঋজুদা বলল, দ্যাখ রে, কলকাতার ভট্‌কাই। এই হল আমাদের ভারতবর্ষের গ্রাম। এই গ্রামই আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের আয়না।

আমি বাইনাকুলারটা তুলে দুর্গটাকে ভাল করে দেখছিলাম।

এই ঝিংকপানি গ্রাম থেকে শিকার-গড় সামান্যই দূর। তবে এই গ্রামের সমতা থেকে প্রায় তিন-চার শ ফিট উঁচুতে হবে। গড়-এর তোরণটি ব্যাসাল্ট্ পাথরে তৈরি। কোথাও কোথাও এবং বিশেষ করে তোরণের কাছে কোয়ার্ট্‌জাইটও ব্যবহার করা হয়েছে। আর দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে রেড-স্টোন আছে। বোগোনভিলিয়া লতা আর জ্যাকারান্ডা গাছে পুরো এলাকাটাই জঙ্গল হয়ে আছে। গড়-এর দেওয়ালের পাশে পাশে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, অমলতাস ইত্যাদি গাছ। একটা ময়ূর হঠাৎই ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে গড়ের দিক থেকে।

ঋজুদা বলল, আমাকে দে তো একবার বাইনাকুলারটা, রুদ্র।

বুনো ময়ূরের অতর্কিত তীক্ষ্ণ ডাক শুনে ভট্‌কাই চমকে উঠেছিল। জঙ্গলে প্রথমবার ময়ূর বা হনুমানের ডাক শুনে না চমকানোটাই আশ্চর্য!

আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, ময়ূর!

ভট্‌কাই-এর মুখে তখন ঠাট্টা ছিল না। জঙ্গল, পাহাড়, এই গ্রাম, নরখাদক বাঘের জান্তব অস্তিত্ব এবং সামনের রহস্যময় নিথর হয়ে-যাওয়া শিকার-গড় এই সব কিছুরই প্রভাব ভট্‌কাই-এর ওপরে এরই মধ্যে বেশ গভীরভাবে পড়েছিল। আমি ভাবছিলাম, ঝিংকপানি গ্রামের মানুষেরা এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে কিসের জন্যে পড়ে আছে?

চাষ-বাসের কোনো চিহ্নই তো দেখলাম না। খড়ের চালে দু-একটা লাউ-কুমড়ো গাছ। তাকে চাষ বলে না। এখানে চাষ-বাস হলে এতদিনে সর্ষে, বিরি-ডাল, রাঙা আলু, তামাকপাতা এসব লাগানো হত। হেমন্তর সকালের রোদে উজ্জ্বল দেখাত তামাকের খেতকে।

হরেকৃষ্ণবাবুকে ঋজুদা কি আমার মনের কথাটাই শুধলো।

উনি বললেন, এরা সব কাবাড়ি। কাবাড়ি মানে কাঠুরে। ওড়িশাতেও তো অন্য অনেক রাজ্যেরই মত ফরেস্ট কর্পোরেশান হয়ে গেছে। ফরেস্ট কর্পোরেশান হবার আগে এরা সবাই ঠিকাদারদেরই কাঠ কাটত। তাদের এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে চলে যেত, ভাল ঝর্ণা দেখে, হাতি ও বাঘের চলাচলের পথ এড়িয়ে। থাকত সেখানে যতদিন না কাজ শেষ হত। কোথাও সেগুন, কোথাও শাল, কোথাও হরজাই জঙ্গল, করম, কুসুম, গেণ্ডুলি, সাজা, চার, হলুদ, জংলি আম, আরও কত কাঠ। কাঠ কেটে পাহাড়ের ওপর থেকে বা নিচ থেকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে এসে ঠিকাদারদের বানানো পথের পাশে গাদা দিয়ে রাখত। তারপর সেখান থেকে ট্রাক-এ করে ঠিকাদারেরা নিয়ে যেত সেই সব কাঠ করাত-কলে, কাঠ-গোলায়। বামরা, ভুবনেশ্বর, কটক, রাইরাঙ্গপুর, বারিপদা, ঢেন্‌কানল, অঙ্গুল এবং আরও কত বিভিন্ন জায়গাতে। মহাজনেরা সেখানে থেকে নিলামে কাঠ কিনে নিয়ে আবার চালান করত কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, পাটনা, মাদ্রাজে। কোথায় না কোথায়!

জিপ থেকে আমরা নামার পরই গ্রামের ঘর ও সংলগ্ন জঙ্গল থেকে তিন-চারজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দু'হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, প্রণাম আঁইজ্ঞা। তাদের মধ্যে একজন শব্দ না করে কাঁদছিল। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। লোকটির চোখদুটো হলদেটে। দেখে মনে হয় যেন ন্যাবা হয়েছে।

হরেকৃষ্ণবাবু এগিয়ে গেলেন ওদিকে। ঐ লোকটির বউকেই কাল সন্ধের একটু আগে বাঘে নিয়ে যায়। গ্রামে কারও ঘরেই বাথরুম থাকে না। সূর্য ডোবার আগে গ্রামের সকলেই সান্ধ্যকৃত্য সারতে গ্রামের আশপাশেই আড়াল দেখে বসে। লোকটি বলছিল, হাতে ঘটি নিয়ে সে সন্ধের আগে যখন বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল তখন ঐ কাঁঠাল গাছটার নিচে, প্রায় বাড়ির উঠোন থেকেই বলতে গেলে, আমার বউকে ধরে নিয়ে গেল।

অন্য একজন বলল, কড়িবি কঁড়্‌ব ? সে বাঘ্‌বটা তো এমিত্তি বাঘ্‌ব না। সেট্‌বা হেম্বা ঠাকুরানীর বাঘ্‌ব।

একটু এগিয়ে গিয়ে পথের লাল ধুলো আর ঝাঁটি জঙ্গলের সবুজ পাতায় পাতায় রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ দেখাল ওরা আমাদের। যেখানে মেয়েটিকে ধরেছিল সেখানকার জমিতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং বাঘের পায়ের দাগও স্পষ্ট দেখা গেল। প্রকাণ্ড পুরুষ বাঘ। সেখান থেকে ঘাড়-কামড়ে ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে লোকটির বউকে বাঘ গড়ের দিকে। গাঁয়ের কোনও লোকই তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। কাল সন্ধের মুখে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টার কথা ছেড়েই দিলাম, সকালবেলাতেও কেউই যেদিকে বাঘ মেয়েটিকে নিয়ে গেছে সেদিকে যায়নি। শুধু তাই নয়, যায়নি বলে কারও কোনও অপরাধবোধও নেই। যেন না-যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ বউটির শরীরের যে-কোনো একটি অংশ অন্তত পাওয়া দরকার দাহ করার জন্যে। জাতে হিন্দু এরা সকলেই। হিন্দুর মৃতদেহ, অন্তত মৃতদেহের কোনও অংশও দাহ করা না গেলে তো সৎকার হবে না। আত্মা মুক্ত হবে না। আর মানুষখেকো বাঘের হাতে যেসব মানুষের

প্রাণ যায়, অপঘাতে মৃত্যু হয়, তারা ভূত-প্রেত হয়ে যায় এমনই বিশ্বাস করে এরা।

ঋজুদার কাছে শুনেছিলাম যে ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার গভীর বন-পাহাড়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে মানুষখেকো বাঘের হাতে মৃত্যু হলে সেই মানুষ 'বাঘ্‌বডুমবা' বলে একরকমের ভূত হয়ে যায়। রাত-বিরেতে গাছের মগডাল থেকে তাবড় তাবড় সাহসী লোকেদেরও হার্টফেল করিয়ে "কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধুপ্‌-ধুপ্‌-ধুপ্‌-ধুপ্‌" করে চেঁচিয়ে ওঠে নাকি!

এদিকে সময় নেই। তখন সাড়ে নটা বাজে ঘড়িতে। বালাবাবু আর ভট্‌কাইকে ঋজুদা এই গ্রামেই থাকতে বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগোল। বালাবাবু গ্রামের লোকদের একজনকে আমাদের সঙ্গে যেতে বললেন। কিন্তু আশ্চর্য! কেউই রাজি হল না। একজনও নয়। এমনকি যার স্ত্রী বাঘের পেটে গেছে সেও নয়। অথচ এরা কেউই তেমন ভীতু নয়। তাই ভারী অবাক হলাম আমি। মানুষের স্নায়ু কতখানি অত্যাচারিত হলে, ভয় মানুষের মজ্জার কত গভীরে সেঁধিয়ে গেলেই যে ঐ সব অসমসাহসী মানুষেরাও এমন লজ্জাকর অবস্থাতে নিজেদের নামিয়ে আনতে পারে তা অনুমান করা যায়।

ঋজুদা মাথার টুপিটা চেপে বসিয়ে নিল। তারপর অলিভ-গ্রীন বুশশার্টের সাইড পকেট থেকে বের করে দুটো ঝকঝকে সফ্ট-নোজড় বুলেট ভরে নিজের রাইফেলটা লোড করে নিয়ে আমাকে বলল, ব্যারেলে একটা আর দুটো ম্যাগাজিনে রাখ গুলি। মিছিমিছি সব গুলি ম্যাগাজিনে ভর্তি করে রাইফেলটাকে ভারী করিস না। তারপর এগোবার ঠিক আগে একবার হাতঘড়ি দেখে বালাবাবুকে বলল যে তোমরা একটা অবধি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। হরেকৃষ্ণ, তোমাকে আমি তুমিই বলছি। আশা করি মনে কিছু করবে না।

বালাবাবু বললেন, না, না, খুশিই হব স্যর।

একটার মধ্যে আমরা না ফিরলে বা আমাদের গুলির আওয়াজ না শুনলে তোমরা বাংলোয় ফিরে যাবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে আমাদের দুজনের জন্যে কিছু খাবার ও জলের দুটো বোতল নিয়ে এখানেই ফিরে এসে আবার অপেক্ষা করবে। যদি সন্ধের মধ্যেও আমরা না ফিরি তাহলে তোমরা আবার বাংলোতে ফিরে যাবে। একটু থেমে ভট্‌কাইকে বলল, শুনেছিস তো! সন্ধের আগেই! ভাল করে দরজা জানালা বন্ধ করে বাইরের বারান্দাতে একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়বে রাতের খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে। আর আমরা যদি রাতেও বাংলোতে না ফিরি তো কাল সকালে আবারও এখানে আসবে।

ভট্‌কাই আতঙ্কিত গলায় বলল, জিপ তো আমরা নিয়ে যাব। অন্ধকার রাতে বাংলোয় হেঁটে ফিরবে কী করে?

ঋজুদা বলল, তা নিয়ে তোর চিন্তা নেই।

বালাবাবু আর ভট্‌কাই কি একটা বলতে গেল প্রতিবাদ করে একই সঙ্গে।

ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বলে জিপটা দেখাল আঙুল দিয়ে। মানে ইশারা করল জিপে গিয়ে বসতে।

ভট্‌কাই দৌড়ে জিপে গিয়ে ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে এল।

ঋজুদা হাত নেড়ে মানা করল।

মানুষখেকো বাঘের বা চিতার মোকাবিলা করার সময় নিজেকে যতখানি সম্ভব হালকা রাখার চেষ্টা করে ঋজুদা। গুলি, রাইফেল, পাইপ এবং টোব্যাকো ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই

থাকে না। আমার গলার সঙ্গে ঝোলানো থাকে ঋজুদার জাইস্ এর বাইনাকুলারটি। আর রাইফেল-গুলি। ব্যাকস্-স্-স।

আমরা দুজনে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। এগোতে লাগলাম মানে চড়াই উঠতে লাগলাম। খুবই আস্তে আস্তে। আগে-পিছনে নয়, পাশাপাশি।

এখন এমন সময় ঋজুদার চোয়ালদুটি শক্ত হয়ে ওঠে। সবসময় হাসি-ঠাট্টা করা যে মানুষকে আমি খুব কাছ থেকে জানি তার সঙ্গে এই মানুষটার কিছুমাত্রই মিল থাকে না আর। কিছুদূর এগোতেই মনে হল যেন কবরস্থানে এসে পৌঁছেছি। যেন কোনো 'সাসানডিরি'। কোনো প্রাণের সাড়া তো নেইই, এমনকি গাছপালা মাটি পাথর তারাও যেন মৃত। ঠাণ্ডা। হেমন্তের রোদেও উষ্ণতা নেই কোনখানেই।

আমরা এক পা এক পা করে এগোচ্ছি। পঞ্চাশ মিটার মত যাবার পর হঠাৎই আমার সামনের একটা পুটুসের ঝোপের বাইরের দিকে রক্তের দাগ দেখা গেল। শুকিয়ে রয়েছে। তারপরই একটি লালপেড়ে শাড়ির রক্তমাখা অংশ। দাঁড়িয়ে পড়ে শিস দিলাম বুলবুলির মত, ঋজুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। ঋজুদা শিস শুনে এদিকে তাকাতেই থুতনি তুলে ইশারা করলাম। এবং এগিয়ে গিয়ে জায়গাটাতে দাঁড়ালাম। ঋজুদাও আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। পরক্ষণেই একটা বনমোরগ ডানদিকের বেজাত গাছের ঝুপড়ি থেকে হঠাৎই ভয় পেয়ে মুখে কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্ আওয়াজ করতে করতে আর ডানাতে ভর্-ভর্-ভর্-ভর্ আওয়াজ করতে করতে উড়ে গেল আরও ডাইনে শিকার-গড়-এর সীমানার ডান প্রান্তের দেওয়ালের দিকে। এবং পরক্ষণেই আমাদের দুজনের চোখ একই সঙ্গে পড়ল সাদা শাঁখা আর লাল গালার চুড়ি পরা একটি ফরসা হাতের দিকে। কনুই থেকে হাতটি যেন কেউ ইলেকট্রিক করাতে কেটেছে এমনই পরিচ্ছন্ন ভাবে কাটা সেটি। কোনো মেয়ের হাত। হাতের পাশেই একটি সবুজ রঙা কাঁচের চুড়ি ভেঙে রয়েছে।

ঋজুদা রাইফেল কাঁধে তুলে নিল। আমিও। দুজনেরই বুড়ো আঙুল সেফটি-ক্যাচে এবং তর্জনী টিগার-গার্ডের ওপরে। খুবই সাবধানে সেই হাতটিকে ছাড়িয়ে আমরা এগোলাম। কনুইয়ের একটু ওপরে, যেখান থেকে হাতটিকে কাটা হয়েছে এক কামড়ে, সেইখানে রক্ত শুকিয়ে গিয়ে বাদামী রঙা হয়ে গেছে। মেয়েটির হাতের আঙুলগুলি ভারী সুন্দর। এমন যার আঙুল সে নিশ্চয়ই ভাল আলপনা দিত। বা ছবি আঁকত নয়তো কবিতা লিখত নিশ্চয়ই। হঠাৎই আমার গা গুলিয়ে উঠল। বমি-বমি পেল ভীষণ। আর তক্ষুণি শিকার-গড় পাহাড়ের ডানদিকে গভীর জঙ্গলে ভরা উপত্যকার গড়ানো আঁচলের সবুজ প্রান্তরের শেষ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে একটি কোট্‌রা হরিণ পাগলের মত ডেকে উঠল। ডাকতে ডাকতে দৌড়ে যেতে লাগল। নদীর এদিকের পার বরাবর।

আশা ভঙ্গ ঋজুদা একটা বড় পাথরের চাঁই-এর ওপরে বসে রাইফেলটা পাশে রেখে পাইপটা ধরাল। আমাকে বলল আজকের চান্সটা মিস্ করলাম আমরা।

কী করে বুঝলে ?

কোট্‌রাটার ডাক শুনলি না ? বাঘ এখানেই ছিল। আমাদের আসতে দেখে অথবা আওয়াজ শুনেই সরে যায়। সরে যাওয়া মাত্রই মোরগটা বাঘকে দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠে। কতটুকু সময়ের মধ্যে বাঘটা কতখানি দূরত্ব নিঃশব্দে অতিক্রম করল, দেখলি তা ? সে নিশ্চয়ই অনেকখানি নিচে চলে গেছে, নইলে কোটরাটা তাকে দেখতে পেয়ে হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচাত না। বলেই বলল, আমার কিন্তু মনে হয় না যে এই বাঘের সামনের

পায়ের ডান কব্জি বা পাঞ্জার ওপরের হাড় একেবারেই ভাঙা। একেবারেই ভাঙা থাকলে তার গতি এতখানি দ্রুত হত না। না, তা হতেই পারে না।

ঋজুদা বলল, এদিকে ওদিকে খুঁজে দ্যাখ সম্ভাব্য জায়গায়, লাশের অন্য কোনো অংশও দেখা যেতে পারে।

নিরুপায়েই বললাম আমি ঋজুদা, আমার গা গোলাচ্ছে।

মার খাবি তুই। যা বললাম, কর।

কাছের মোরগের আর দূরের কোট্‌রার চকিত ভীত পিলে-চমকানো অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মত ডাক শুনে না হয় জ্যোতিষীর মতই বলে দিতে পারে ঋজুদা যে বাঘ চলে গেল, তাই বলে আমি তো আর জ্যোতিষী নই! তাছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার বিশ্বাসও নেই। তাই আমার মোটেই 'পেত্যয়' হল না, যে সাঙ্ঘাতিক মানুষখেকো বাঘ, যার দাঁতে-ছেঁড়া সুন্দর হাতখানি একটু আগেই ঝোপের নিচে দেখে এলাম ; সে এই পাড়া ছেড়ে সত্যিই চলে গেছে। প্রমাণ নেই কোনো। কিন্তু মন বলল। তাই রাইফেলটাকে বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে তুলে রেখেই এগোলাম। একটু এগোতেই একটা জায়গা দেখে মনে হল এরই আশে-পাশে বাঘ ছিল। বনে জঙ্গলে এরকম অনেকই ব্যাখ্যাহীন 'মনে-হওয়ার' ব্যাপার ঘটে! যাঁরা জানেন তাঁরা আমার কথা মানবেন।

এদিকে কোথাওই পরিষ্কার মাটি বা ধুলো নেই যে বাঘের পায়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাবে। তেমন জায়গা হয়তো আছে কিন্তু এখনও চোখে পড়েনি আমাদের। কিন্তু এতখানি চড়াইয়ের পথ আমরা ক্বচিৎ-রক্ত এবং ঘষ্টানোর দাম দেখে দেখেই এগিয়েছি। পরিষ্কার চিহ্ন দেখা গেলে নিনিকুমারীর বাঘ আদৌ অশক্ত কিনা অথবা সত্যিই কতখানি অশক্ত তা বোঝা যেত কিছুটা। ঋজুদা সবসময়েই বলে, কখনও পরের মুখে ঝাল খাস না। এই সব ব্যাপারে তো নয়ই। দশজনের কাছে শোনা কথাও নিজে না দেখে বা না শুনে কখনও মেনে নিবি না। গল্প-গাথাতে আর সত্যে অনেকই তফাত থাকে। বিশেষ করে বনে জঙ্গলে।

সামনেই মস্ত একটি চাঁর গাছ। চিরাঞ্জীদানাও বলে চাঁরকে বিহারে। এর ওড়িয়া নাম জানি না। গাছটা উঠেছে একটা পাথরের চাঁই-এর জগাখিচুড়ি থেকে। পূর্ব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্-এ এমন "রক আউটক্রপ্"কে বলে "কোপ্‌জে।" সিংহের আড্ডাখানা সে সব জায়গাতে। বড় কালো পাথরের স্তূপের মত হঠাৎই মাটি-ফুঁড়ে-ওঠা পাথরের খিচুড়ি। এটি সেই রকমই প্রায়। তফাত এই যে এটির মধ্যে একটি অগভীর গুহা। মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠকাতে যেমন আছে। খুবই ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি তিরতিরে ঝরনা গেছে ছায়ায় ছায়ায়। স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে জায়গাটা এবং রৌদ্রালোকিত জায়গা থেকে অনেকই বেশি ঠাণ্ডা। নিজেকে এবং অন্যকেও লুকিয়ে রাখার পক্ষে অতি চমৎকার জায়গা। চোখের আড়ালে বসে এক জোড়া রক-পিজিয়ন ডাকছে ভুকু-ভুকু-ভুকু-ভুকুম্ ভুকু-ভুকু-ভুকু-ভুকুম। খুব সাবধানে একটু একটু করে এগোতে লাগলাম ওদিকে। সেই গুহামত জায়গাটাতে পৌঁছবার আগে একটু বাঁদিকে চেপে গেলাম। ঋজুদার ওপরে রাগ হচ্ছিল খুব। এই সাঙ্ঘাতিক বাঘের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে পাইপ খাচ্ছে রাজার মত। একটুও কমোনসেন্স নেই ঋজুদার। সাহস ভাল, দুঃসাহস ভাল নয়। আর দুঃসাহস থাকলেও তা নিজের আত্মহত্যার কাজে লাগানোই ভাল, পরস্য পরকে বাঘে-খাওয়ানোর জন্যে ব্যবহার করা অত্যন্তই অনৈতিক কাজ।

এবার নিচু হয়ে একটা ছোট্ট পাথর ছুঁড়ে দিলাম গুহামুখের দিকে। খটাং করে আওয়াজ তুলেই পাথরটা গুহার ভিতরে গিয়ে থিতু হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চাঁর গাছের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটার পাথুরে খিচুড়ি নৈঃশব্দ্য স্তব্ধতর হয়ে গেল। এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম গুহার দিকে। এই গুহা কিন্তু গুহা বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সেরকম একেবারেই নয়। মানে, গভীর তো নয়ই, সুড়ঙ্গের মতোও নয়। একে গুহা না বলে প্রস্তরাশ্রয় বা রক্‌শেলটারই বলা ভাল। ভীমবৈঠকাতে এইরকম অসংখ্য প্রস্তরাশ্রয়ের ভিতরে ভিতরেই আদিম মানুষদের আঁকা নানারকম গুহাচিত্র আছে।

গুহামুখে পৌঁছেই চমকে গেলাম। চমকে গেলাম না বলে আঁতকে উঠলাম বলাই ভাল। সেই লাল-পাড় ছেঁড়া শাড়িটির আরও কিছুটা। রক্তমাখা চেবানো হাড়-গোড়। মানুষের মেয়ের হাড়-গোড়। ইঃ বাবাঃ। এবং একটি করোটি। তার গায়ে মাংস লেগে আছে এবং একটি মাত্র চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে হাঁ করে, কর্তিত-কঙ্কালের সেই কুৎসিত করোটি থেকে।

মানুষখেকো বাঘের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম : ঋজুদা!

ডেকেই, গুহামুখের পাশের একটি পাথরে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম যাতে এদিকে আর না দেখতে হয়। আমার ঐ হঠাৎ চিৎকারে চমকে উঠে রক্‌-পিজিয়নের দলটি শক্ত ডানা ফট্‌ফটিয়ে উড়ে গেল। এক জোড়া ছিল ভেবেছিলাম আগে। তা ভুল। ঝাঁকে ছিল।

আশ্বাস-ভরা ঋজুদা মুহূর্তের মধ্যে রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে লাফাতে লাফাতে উদিত হল। উত্তরমেরুর স্বাগতম সূর্যেরই মত বলল, কোথায়?

আমি গুহার দিকে আঙুল তুলাম। ঋজুদা গুহামুখে গিয়ে দারুণ বিরক্তিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, স্টুপিড।

আমি খুবই আহত হলাম।

বললাম, ঐ দৃশ্যে তুমি ভয় পেতে না?

না। আমি ভেবেছিলাম বাঘ বুঝি তোকে ধরেই ফেলেছে। ভবিষ্যতে কক্ষনো এরকম করিস না আর। রাখালের পালে বাঘ পড়ার গল্পের মত হবে তা হলে কোনদিন। তোর সত্যি-বিপদেও আমি ভাবব, না গেলেও চলে!

বলেই বলল, যা। দৌড়ে যা। পাইপটা পাথরের উপরেই পড়ে রইল। হারিয়ে যাবে এখুনি না তুলে আনলে। তোর সেন্স নেই কোনো। মনমরা এবং আতঙ্কিত অবস্থাতেই আমি যখন ঋজুদার পাইপ হাতে করে এখানে ফিরলাম দেখি ঋজুদা রাইফেলটাকে আমি যে-পাথরে বসেছিলাম তার গায়ে শুইয়ে রেখে ঐ করোটির প্যাঁটপ্যাঁট করে তাকিয়ে থাকা চোখটির প্রায় গা ঘেঁষেই বসে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে।

দেখেই ঘা ঘিন ঘিন করে উঠল। মানুষটার ভয় নেই না হয় মানলাম। কিন্তু ঘেন্না-পিত্তি? তাও কি নেই কোনো?

পাইপটা হাতে দিতেই বলল, বোস্ পাশে।

খুব রেগে গেছিলাম। বসলাম না তাই।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাখ্।

ঋজুদার চোখকে অনুসরণ করে চেয়ে দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য। এই প্রস্তরাশ্রয় যেন কোনো দূরবীনেরই চোখ। অন্ধকার ঘরের দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দূরের আলোকিত

কোনো ঘর বা বারান্দা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, সামনের ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড় বন এবং উপত্যকা তেমনই দেখাচ্ছে। এমনকি নদী এবং নদীর ওপারে আবারও চড়াইতে উঠে-যাওয়া গভীর বনাবৃত ধুঁয়োধুঁয়ো পাহাড়শ্রেণী সবকিছুই চমৎকার দেখা যাচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা এই ঝিংকুপানি গ্রামে আসার পথটি যেখানে কন্সর-এর শাখা নদীটি পেরিয়ে এসে ডাইনে বাঁক নিয়েছে তাও পরিষ্কার চোখে পড়ছে এখান থেকে। স্কাউটিং-এর এমন 'ভান্টেজ-পয়েন্ট' আর হয় না। এবং বাঘের চেয়ে ভাল স্কাউট তো কেউই নয়। মানুষখেকো বাঘ হলে তো কথাই নেই!

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম ঐ দিকে। পাথরের গুহাতে বসে বাইরের রৌদ্রালোকিত প্রান্তর ঝাঁটি আর গভীর জঙ্গলে, ইন্দ্র দুগার এর আঁকা ছবি নদীর মত নদী, দূরের রহস্যময় ধোঁয়া-ধোঁয়া পাহাড়শ্রেণী ; সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে।

ঋজুদা বলল, চল্ এই শিকার-গড় জায়গাটাকে আজ ভাল করে সার্ভে করি। এই কিল্-এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই যে বাঘ এখানে ফিরে আসবে। বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিস না? এই হল নিনিকুমারীর বাঘের একটা বড় ঘাঁটি। এখানে সে প্রায়ই থাকে। আমরা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিতে একটা ভুল করে ফেললাম। বিনা-নিমন্ত্রণে তার বাড়িতে আমাদের আসা উচিত হয়নি। কারণ সে দেখে গেল যে আমরা তার অন্দরমহলের খোঁজ পেয়েছি। দেখে গেল বলেই এখানে সে আর ফিরে নাও আসতে পারে। কিছুদিন যে আসবেই না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অথচ এই বাঘের যা রেকর্ডস তাতে ওর পেছনে দৌড়ে বেড়ানো প্রায় অসম্ভবই। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত ব্যাপার। দৌড়ে বেরিয়েছে বলেই কেউ তাকে বাগে পাননি। আমরা দৌড়ে না বেড়িয়ে তার বাড়িতেই চৌকি বসাব। যে সময়ই সে চায়, নিক। বাড়িতে সকলকেই ফিরতে হয় কখনও না কখনও। সে খুনী, ডাকাত বা মানুষখেকো বাঘ যেই হোক না কেন!

আমি বললাম, নিনিকুমারীর বাঘের বাড়িতে আছেটা কোন্ আপনজন? মা, না বৌ, না ছেলেমেয়ে?

ঋজুদা হেসে, নাক তুলে গন্ধ নিল। মানুষের পচা মাংসের গন্ধ ছাপিয়েও বাঘের গায়ের গন্ধ ভাসছিল। বলল, আছে। নিজের গায়ের গন্ধ। বাঘই হোক কী মানুষ, কারও কাছেই তার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসার জন আর কেউই নেই। বাঘ বেঁচে থাকার জন্যে আর কারও দয়ার বা সঙ্গর বা ভালবাসার বা সেবার ওপরে নির্ভর করে না। সে বলতে পারিস নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। নিজের গায়ের গন্ধ নিতে সে আবার ফিরে আসবে। দেখিস। বলেই, উঠে পড়ে বলল, চল্।

আমরা ঐ জায়গাটা ছেড়ে আসার আগে গাছটার দিকে ভাল করে চাইলাম নিচ থেকে। মাচা বাঁধলে কোথায় বাঁধা যায় তাই দেখতে।

ঋজুদাও আমার চোখ অনুসরণ করে দেখল। বলল, এখানে বসতে হলে শুধু দিনের বেলাতেই। মানে, সকাল থেকে প্রথম বিকেল অবধি। রাতে বসতে হলে বাইরের দিকে কোনো গাছে বসতে হবে যাতে তার যাওয়া আসার পথে তাকে গুলি করা যায়।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঋজুদা বলল, দ্যাখ রুদ্র।

চেয়ে দেখি, শিকার-গড়-এর সীমানার পাঁচিলের একটা অংশ সরে গেছে একেবারে এই চাঁর গাছটিরই গা ঘেঁষে। পাঁচিলটা ভেঙে ভেঙে গেছে অনেক জায়গাতেই। অশ্বত্থ আর বটের চারা গজিয়েছে জায়গায় জায়গায়। নানারকম বুনো ফুলের লতা, যারা পাথরের কাছ থেকেও জল চায়, জল নিংড়ে নিয়ে ফুল ফোটায়। লাল, হলুদ, হালকা-বেগুনি,

ছেলেবেলার সুন্দর সব স্বপ্নর মত।

বললাম, বাঃ।

বাঃ কী রে রুদ্র! বল বাঃ বাঃ বাঃ। এর চেয়ে বড় বাঃ আর কিছুই নেই। বাঘ শিকার-গড়ে ঢোকে তার এই গুহার ডেরা ছেড়ে এই পাঁচিল পেরিয়েই। তার কোন্ দায়টা পড়েছে যে তাকে শিকার-গড়ের প্রধান ফটক দিয়ে যাতায়াত করতে হবে? ওরা তো আর মানুষের মত স্ট্যাটাস সিম্বলের শিকার নয় যে গরমের শহর কলকাতায় গলায় বো লাগিয়ে, ডিনার জ্যাকেট পরে, ক্লাবের ডাইনিং রুমে গিয়ে বসবে! দেশ স্বাধীন হবার চল্লিশ বছর পরেও ইংরেজদের বাঁদর সাজার মত কোনরকম হীনম্মন্যতায় ভোগে না তারা! বাঘেরা নিজেরাই নিজেদের মালিক। দিল্লির লালকেল্লা বা সাউথ ব্লক তাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা নয়। ওর যেখান খুশি সেখান দিয়েই যাবে ও। এবং এইখান দিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক বলে আমার মনে হয়, এইখান দিয়েই ও যায়। চল্। একটু এগোলেই বোঝা যাবে।

বেশিদূর এগোতেও হল না। একটু যেতেই বাঘের এবং হয়তো অন্যান্য জানোয়ারেরও চলার চিহ্ন পরিষ্কার দেখা গেল। 'গেম-ট্র্যাক'। সেই গেম-ট্র্যাকটি সত্যিই পাঁচিল টপকে শিকার-গড়ের চত্বরে গিয়ে পড়েছে। ঠিকই। কিন্তু আমাদের দুজনের কারওই লেজ না থাকায় অতখানি উঁচু পাঁচিল দাঁড়ানো অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে পেরোনো অসম্ভব ছিল। দাঁড়ানো অবস্থাতে কেন, হাই জাম্পের দৌড়বার মত সমান জায়গা থাকলেও ওলিম্পিকে প্রথম হওয়া হাই-জাম্পারও এই পাঁচিল পেরোতে পারত না। তাই ঘুরেই গেলাম আমরা। একটু ঘোরা পথ। তারপর শিকার-গড়ের মধ্যে ঢুকে যেখানে গেম-ট্র্যাকটি চত্বরে ঢোকার কথা সেখানে এসে আবার পথটিকে দেখা গেল। চত্বরের এক জায়গায় নরম মিহি মাটি ছিল। সুরকি মেশা। যেখানে বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট। অনেক দাগ। নতুন এবং পুরনো।

ঋজুদা বলল, পরে এখানে ফিরে আসব। এখন এগিয়ে চল্।

গেম-ট্র্যাক ধরেই আমরা সাম্বপানির রাজাদের একসময়ের বিলাস-বহুল শিকার লজে ঢুকলাম। সদর দরজার একটা পাল্লা খোলা।

দরজার সামনের ধুলোতে কত জানোয়ারের আর সাপের চলাচলেরই যে চিহ্ন তার ঠিক নেই। কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘের পায়ের দাগ ছিল না। দেখা গেল যে তার নিজস্ব গেম-ট্র্যাক প্রধান দরজাকে অনেক দূর থেকে এড়িয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে নহবৎখানাতে। মন্দিরের সানাই বাজত যেখান থেকে, কটক থেকে আসা নামকরা সানাইওয়ালারা যখন সানাই বাজাতেন তখন প্রভাতী সূর্যের আলোয় কেমন লাগত সাম্বপানির রাজাদের শিকার-গড়ের এই গা-ছমছম জায়গাটিকে, কে জানে!

ঋজুদা বলল, কী রে রুদ্র! নিনিকুমারীর বাঘের আরেক আস্তানা তাহলে এই নবহৎখানা! সেখানে উঠেই দেখলাম চমৎকার বন্দোবস্ত থাকার। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা এমন সুন্দর আস্তানার কথা ভাবাই যায় না। চাঁদ, রোদ ইচ্ছে করলেই হাতের মুঠোয়। আর ইচ্ছে না করলে তাদের মুখ দেখারই দরকার নেই।

সেখান থেকে নেমে আমরা চণ্ডীমন্দিরের দিকে এগোলাম। এই সেই জাগ্রত ঠাকুরানী। যাঁর কৃপাধন্য হয়ে বাঘ অমরত্ব লাভ করেছে বলেই বিশ্বাস করেন এখানের মানুষেরা।

ঋজুদা বলল, ভট্‌কাই-এর কাছ থেকে শটগান্‌টা নিয়ে এলে ভাল হত।

—কেন ?

—মন্দিরে নিশ্চয় সাপের আড্ডা থাকবে। কেন জানি না। আমার মন বলছে। মানুষের পরিত্যক্ত মন্দিরে কেন যে সাপ থাকে তা আমি জানি না। কিন্তু বহু জায়গাতেই দেখেছি যে, থাকে।

বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম চণ্ডীমন্দিরের সামনে। মন্দিরের দরজার পাশে বড় বড় দুটো জবা গাছ। না বলে দিলে কেউ বিশ্বাসই করবে না জবা বলে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছ দুটি। হাজার হাজার ফুল ফুটেছে ঝুমকো জবার। সেই গাছ দুটির পাশে দুটি জ্যাকারাণ্ডা গাছ।

ঋজুদা বলল গাছদুটিকে দেখিয়ে, নিশ্চয়ই এ দুটি পরে কেউ লাগিয়েছে বুঝলি ! মানে, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর। ইংরেজরা পূর্ব-আফ্রিকারও একটি অংশের মালিক ছিল। তাই বহু ভাল ভাল গাছ তারা ভারতে এনে লাগিয়েছিল। ভারতের গাছও নিয়ে গিয়ে লাগিয়েছিল অন্যান্য দেশে। ভারতে লাগানো পূর্ব-আফ্রিকার গাছেদের মধ্যে ছিল আফ্রিকান টিউলিপ, কেসিয়া ও অ্যাকাশিয়া ভ্যারাইটির নানারকম গাছ এবং আরও অনেকই গাছ। এই জ্যাকারাণ্ডাও সম্ভবত সাহেবদেরই আনা। তবে এখন তো এর ফুল ফোটার সময় নয়। তাই শুধু পাতাই আছে ডালে ডালে।

জ্যাকারাণ্ডার সঙ্গে অ্যানাকোণ্ডার বেশ মিল না ?

পাণ্ডিত্যে আমিও কিছু কম যাই না, এমনই ভাব দেখিয়ে বললাম।

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, ধ্যুৎ। অ্যানাকোণ্ডা তো সাপ। দক্ষিণ আমেরিকার সাপ। তার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকার গাছের কী সম্পর্ক ?

ইচ্ছে হল ভট্‌কাই-এর মত বলি, ঐ হল। একই কথা।

ঐ দ্যাখ। ঋজুদা বলল।

তাকিয়ে দেখি, হেমন্তকাল হলে কি হয় এক জোড়া প্রকাণ্ড কালো গোখরো মন্দিরের দরজার কাছে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে লক্‌লকে জিভ বের করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের স্লিং কাঁধে ঝুলিয়ে দু-হাত জড়ো করে বললাম : জয় মা চণ্ডী।

ঋজুদা ধর্ম-টর্ম মানে না। তবে অন্যের বিশ্বাসে আঘাতও দেয় না। সাপেদের দিকে মনোযোগভরে চেয়ে রইল রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে। যদিও ঐ হেভি রাইফেল সাপ মারার পক্ষে অকেজো। হেভি বা লাইট কোনও রাইফেল দিয়েই সাপ মারা সুবিধের নয় আদৌ। কিন্তু মারামারি করতে হল না। সাপদুটি নিজে থেকেই সরে গেল মন্দিরের একেবারে ভিতরের অন্ধকারে। আমরা পায়ে পায়ে মন্দিরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে এবং জানালা দিয়েও সূর্যের আলো ঢুকছে।

ঋজুদা বলল, কোণারকের সূর্য মন্দিরের সঙ্গে কিন্তু আশ্চর্য মিল আছে এই মন্দিরের। যদিও খুবই ছোট। দেওয়ালে বা গায়ে কোনও অলঙ্করণও নেই। অথচ ওড়িশার রাজা লাঙুলা নরসিমাদের আমলে বানানো কোণারকের মন্দিরের সঙ্গে সূর্যের যেরকম বার ঘণ্টার সম্পর্ক সকাল-দুপুর-সাঁঝের, এর সঙ্গেও তাই। আমি জুতো খুলে প্রণাম করলাম।

ঋজুদা বলল, দ্যাখ খুশি করতে পারিস কি না ! ঠাকুরানীর দয়া যদি বাঘের ওপর থেকে শিকারির ওপরে একবার সরিয়ে আনতে পারিস তবে তোকে আর পায় কে ?

আমি বললাম, দেবীর দয়া হলে সবই হতে পারে। কাল সকালে আমি পুজোর পোশাকে আসব এখানে।

ঋজুদা বলল আপাতত দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে আয়। বলে আয়, যেন অপ্রসন্ন না হন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এগারটা বাজে প্রায়। কী করে যে সময় যায়। দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে এলাম। দেখি, ঋজুদা ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হঠাৎই আমার দিকে ঘুরে বলল, রুদ্র, বি কেয়ারফুল। বাঘ উপত্যকাতে যায়নি। আমাদের সাড়া পেয়ে পাঁচিল টপ্‌কে এই শিকার-গড়েই এসেছে।

আমি তাড়াতাড়ি কাঁধের রাইফেল হাতে নিয়ে বললাম, কী করে জানলে ? প্রমাণ ?

প্রমাণ নেই। আমার মন বলছে। প্রমাণও হয়ত এক্ষুনি পাওয়া যাবে। বলেই, যেখানে নরম ধুলোতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছিল সেদিকে ফিরে চলল ঋজুদা।

আমাকে বলল, তুই গার্ড দে, আমি একটু দেখি। বলে, নিজের রাইফেলটাকে ঘাড়ের ওপরে হেলান দিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে বাঘের পাগ-মার্কসগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল। বলল, অ্যাই দ্যাখ্।

এগিয়ে গিয়ে দেখি পুরনো দাগের ওপরে একেবারে টাটকা দাগ। সত্যিই বিরাট বাঘ। নদীর বালিতে বা বৃষ্টির পরের কাদায় অনেক সময়েই পায়ের চিহ্নকে বড় দেখায়। কিন্তু এই শিকার-গড়ের পাথুরে চত্বরে শক্ত জমির ওপরেও এই ছাপ এত বড় হয়ে পড়েছে যে বাঘটার প্রকাণ্ড সাইজ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকার কথা নয়। যে-সব গল্প কলকাতায় এবং এখানেও শুনেছি এই নিনিকুমারীর বাঘ সম্বন্ধে তাই যথেষ্ট ছিল। তার ওপরে তার প্রমাণ বহর দেখে তলপেট সত্যিই গুড়গুড় করে উঠল।

ঋজুদা আমার মনের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বলল, লার্জার দ্যা টাইগার, দ্যা মেরিয়ার। বড় টার্গেট হলে নিশানা নিতে সুবিধে, গুলি ঠিক জায়গায় লাগাতে সুবিধে। ভালই তো ! বাঘ যত বড় হয় শিকারির বুক তত ফোলে। বলেই, পায়ের দাগগুলো খুব ভাল করে আরও একবার নিরীক্ষণ করে বলল, বুঝলি রুদ্র, সব বাজে কথা। এই বাঘের সামনের ডান পায়ের থাবাতেই চোট আছে। দ্যাখ না ডানদিকের ওপরের ছাপ কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু কব্জিতে চোট থাকলে ছাপ অন্যরকম হত। হয়ত জখম হওয়ার পর নিনিকুমারীর বাঘ হাঁটার সময়ে ডান পা ফেলার আগে আহত থাবাটি গুটিয়ে নিত। তাই দেখে কেউ এই তত্ত্ব প্রচার করে দিয়েছিল। পরে কেউই আর তার সত্যাসত্য বিচার করতে যায়নি। শিকার আর শিকারিদের জগতে যত বড় বড় 'গুলেড়ু' আছে তেমন বাঘা বাঘা 'গুলেড়ু' আর 'তিড়িবাজ' খুব কম জগতেই আছে। গুলবাঘ ডেঞ্জারাস নয়। কিন্তু গুলবাজরা হাইলি ডেঞ্জারাস।

বলেই, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রাইফেলটা তুলে নিল হাতে।

আমি বললাম, তুমি তো আচ্ছা লোক। বলছ, বাঘ এই শিকারগড়ে এসেছে আর তুমি এখানে আড্ডাখানার মেজাজে কথা বলছ ?

ঋজুদা বলল, হুঁ। সেটাও স্ট্র্যাটেজি। বদল করেছি শুধু এইমাত্রই। যদিও এ সেয়ানা বাঘ রাইফেল বন্দুক চেনে। তবুও এমনই ভাব কর যেন আমরা মন্দির দেখতেই এসেছি।

বাঃ। মন্দির দেখতে এলে তো শিকার-গড়ের প্রধান ফটক দিয়েই ঢুকতাম। আমরা ঐ চার গাছের ছায়ায় পাথরের জগাখিচুড়িতে যেতে যাব কেন ওর লেজে লেজে ?

ভুল করে। ট্যুরিস্টরা পথ না ভুললে আর কে পথ ভুলবে ? তাছাড়া এ তো আর কনডাকটেড ট্যুরও নয় যে গাইড আছে ! চল্ আমরা গড়ের দেওয়ালে বসি। আমি

পাইপ খাই আর তুই গলা ছেড়ে গান গা।

গান ?

আমি চোখ কপালে তুলে আকাশ থেকে বললাম। ভাবলাম আমি কি চোঙা লাগানো গ্রামোফোন যে রেকর্ড চালালেই বেজে যাব ?

ইয়েস্। আমার অর্ডার। গান। কথা কম। গান।

যাঃ বাবাঃ। কী অন্যায়। বলে, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দেওয়ালে বসলাম।

ঋজুদা বলল, গ্রামের দিকে মুখ করে বোস্। গ্রামের লোকদেরও গান শোনানো দরকার। এই বাঘটাকে মারতে হলে ওদের প্রত্যেকের মন থেকে এই ঠাকুরানীর বাঘের মীথটাকে এক্সপ্লোড করতে হবে। কীরকম ভূতে-পাওয়া ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া হয়ে আছে মানুষগুলো দেখলি না। শরীরের শীত ছাড়ানো সোজা। মনের মধ্যে শীত ঢুকলে তা ছাড়ানো ভারী কঠিন। আর মানুষের মতই তো সব! বাঘটাও যে-সম্মানের সে যোগ্য নয় সেই সম্মান পেতে পেতে হয়ত অনেক মানুষেরই মত নিজেকেও ভগবান ভাবতে আরম্ভ করেছে। এবার বাঘ-ভগবানকে ভূত বানাবার ভার নিয়েছি আমরা। নে। তাড়াতাড়ি। গান।

কী গান ?

আঃ। দরকারের সময় দেরি করিস কেন ? গলা ছেড়ে গা না! তাড়াতাড়ি। বাঘ যেন শুনতে পায় সরে গিয়ে থাকলেও।

ঋজুদা এমনিতে যে-স্কেলে কথা বলে তার চেয়ে অনেকই উঁচু স্কেলে কথাকটি বলল।

'এলো যে শীতের বেলা' গাইব ? আমি শুধোলাম।

আরে ধ্যুৎ। ওসব গান তুই বালিগঞ্জের ড্রইংরুমে গাস। দেখছিস গান দিয়ে বাঘকে ভয় পাওয়ানোর ব্যাপার আর...। নজরুলের গানই বরং গা "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।" নইলে ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের কোনও গান ? "ও চিও চিও চিও চি। ও চিও চিও চিও চি ?" জানি না ?

জানি না।

তবে জানিসটা কি ?

"সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা" গাইব ?

ঋজুদা বলল, একদম না। দিল্লিওয়ালারা রবিঠাকুরের "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে"-কে সুপারসিড করে ইক্‌বাল-এর ঐ গান এখন ন্যাশনাল সঙ বলে চালাবার চেষ্টা করছে দেখছি। আই প্রোটেস্ট। 'সারে জহাঁসে আচ্ছা' গাইতে হবে না।

—তবে ? "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গাইব ?

—গা! গা! আমিও গলা দেব।

গলার শিরা ছিঁড়ে গেলেও তা আবার গিঁট দিয়ে বেঁধে নেওয়া যাবে এমনই মনোভঙ্গি নিয়ে আমি একেবারে তারাতে ধরলাম গান। সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদাও। যদিও আমাদের দুজনের কেউই বেসুরো গাই না, তবুও ঐ তারস্বরের দ্বৈতসঙ্গীতে শিকার-গড়-এর দানো-প্রেত প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই আঁতকে উঠল। শিকার-গড়ের চত্বর জুড়ে, নিচের উপত্যকায় আমাদের ডুয়েটের সঙ্গে অসংখ্য পাখি, হনুমান, ময়ূর, বার্কিং ডিয়ার তাদের ভয়ার্ত গলা মেলাল। কী ট্রেমেলো! ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্যাকোফনি' তাইই আর কী ? নিনিকুমারীর বাঘ যদি তখনও সে তল্লাটে থেকে থাকে এবং আড়াল থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করেও থাকে তবে তারও পিলে চমকে যাবার কথা। এমনই দুই

শিকারি এবং শিকারের এমন প্রক্রিয়া কোনও বাঘেরই চোদ্দপুরুষে কেউ দেখেনি। শোনে তো নিই! নিনিকুমারীর বাঘের দোষ কী ?

মানুষ, হনুমান, হরিণ, পাখ-পাখালি সকলের সম্মিলিত 'ক্যাকোফোনি' যখন থামল তখন ঋজুদা বলল, চল্ আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। আরও বেশি করলে শেষে বাঘ হার্ট-ফেল করেই না মরে। আর হার্ট-ফেল করে মরলে মৃত মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে তোর রাইফেল-হাতে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ছবিও ছাপা হবে না খবরের কাগজে।

আমি বললাম, কেন ? হার্টফেল করা বাঘের বুকে একটা গুলি ঠুকে দিলেই হবে। জানব তো আমরাই! দেখছেটা কে ? তা না হলে ভটকাই কি কলকাতা গিয়ে আর ওই পোড়ামুখ দেখাতে পারবে ? কেষ্টনগর সিটিতেও পারবে না।

তা ঠিক। সেটা একটা ভাবার মত কথা বটে! ঋজুদা হেসে বলল।

তারপরই বলল, চল্ আবার ঐ দিকে। বউটার হাতটা আর শাড়ির যতটুকু অবশিষ্ট আছে নিয়ে যেতে হবে। নইলে দাহ করতে পারবে না ওর আত্মীয়রা। আর শবদেহ বা তার কিছু অংশও দাহ না করতে পারলে তো তার আত্মা মুক্ত হবে না। শান্তিও পাবে না। এইরকমই বিশ্বাস হিন্দুদের।

তুমিও তো হিন্দুই, না কি ?

হ্যাঁ। আমিও। ঋজুদা বলল।

তবে ? তুমি তো ধর্ম মান না।

এইসব আলোচনা পরে কোনদিন করব। তাছাড়া এসব কথা বোঝার মত বয়সও তোর এখনও হয়নি।

আমি বললাম, আমরা ফটক দিয়ে যাচ্ছি আর বাঘ যদি দেওয়াল টপ্‌কে গিয়ে ওখানে অপেক্ষা করে থাকে অন্যদের জন্যে ?

করুক। তাইই তো চাই আমরা। চার চোখের মিল হলেই তো গুড়ুম। কিন্তু তা সে করবে না। অত কাঁচাছেলে সে নয়।

কেন ?

বলছি তোকে। বুদ্ধি নিনিকুমারীর বাঘও কিছু কম ধরে না আমাদের চেয়ে। তবে এই মুহূর্তে সে যে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওকে এইখান থেকে তাড়াব কাল। দেখবি। তারপর ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা। ফিরে ও আসবেই। তিনদিন পরেই আসুক, কী সাতদিন পর। আর তখন ওকে সারপ্রাইজ দিতে হবে। শিকারটা যতখানি শারীরিক সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার ব্যাপার তার চেয়ে একটুও কম মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। এবং প্রতিপক্ষ যত বেশি যোগ্য, যুদ্ধও তত আনন্দর। বিপদেরও বটে। বিপদটাই তো আনন্দ। কী বল্ ?

শিকার-গড় ফটক পেরোবার পর আর কোনো কথাবার্তা বললাম না আমরা। মুখে বললেও, ঋজুদা তো আর ভগবান নয়, তাই বাঘ যে ওদিকে যাবেই না একথা জোর করে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। নিঃশব্দেই আমরা গিয়ে আমাদের কাজ সমাধা করলাম। ঋজুদাকে ইশারাতে বললাম, কাটা হাতটা নিতে। আমি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ঐ গুহা থেকে রক্তে ভারী হয়ে-থাকা ছেঁড়া-শাড়ির যতটুকু ছিল ততটুকু নিয়ে এলাম। যখন ফিরছি, কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ যেন লক্ষ করছে আমাকে আড়াল থেকে। ঋজুদার কাছে এসে যখন পৌঁছলাম তখনও সেই মনে হওয়াটা গেল না। ঋজুদাকে বললামও। ঋজুদা বলল, মাঝে মাঝে পেছন দিকে নজর রেখে এগুতে। তারপর বলল,

বাঘ যদি আমাদের পিছু নেয় তো নিক না। কোনো কিছুই যে আগেকার মত নেই, আর থাকবেও যে না, তা তার জানা দরকার। পিছু নিলে খুশি হব আমি।

পাহাড়ের চড়াই ওঠা বরং সহজ, কিন্তু উৎরাই নামা কঠিন। বিশেষত পেছনে মানুষখেকো বাঘ অনুসরণ করছে তা জানার পর। আমাদের আসতে দেখেই ভট্‌কাই আর বালাবাবু জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এলেন এদিকে। আর দৌড়ে এল যে মানুষটির বৌকে বাঘে নিয়ে গেছিল সে। বৌয়ের কাটা হাত নিয়ে কী কান্না যে কাঁদতে লাগল শিশুর মত, তা চোখে দেখা যায় না। ভট্‌কাই আতঙ্কিত চোখে সেই নিপুণভাবে কাটা হাতের দিকে চেয়ে ছিল। ঋজুদা আমাকে বলল জিপে গিয়ে খুব জোরে জোরে হর্ন বাজা তো রুদ্র। এই ঘুমিয়ে-পড়া গ্রামকে জাগিয়ে দে। মানুষগুলোকে একটু নড়িয়ে দেওয়া দরকার।

আমি গেলাম হর্ন বাজাতে। ঋজুদা বালাবাবুকে ডেকে কাঁঠাল গাছের নিচে পাতা আমকাঠের তক্তার বেঞ্চে বসে কী সব শলা পরামর্শ করতে লাগল।

হর্ন শুনে ভট্‌কাই দৌড়ে এসে বলল, কী রে! বাঘ পালিয়ে যাবে না? কী করছিস কি?

বললাম, বাঘকে তাড়াবার বন্দোবস্তই হচ্ছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ।

—গান গাইছিলি কেন? তুই আর ঋজুদা? আমরা তো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাবলাম, আমিও এখানে বসেই গলা মেলাই তোদের সঙ্গে।

গ্রামের প্রধানকে বালাবাবু ডেকে আনলেন। ঋজুদা আর বালাবাবু তাকে সব ভাল করে বোঝালেন। আমি একটু একটু ওড়িয়া বুঝি। ভট্‌কাই কিছুই বুঝতে পারছিল না বলে কেবলই বলছিল, কী বলছে রে? কী বলল রে ঋজুদা? কী হবে রে?

বললাম, কাল দেখতে পাবি।

আঃ। কালের তো দেরি আছে। বলই না।

ঋজুদার কথা শুনে সকলেরই চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল। ওদের পক্ষে যেন একথা বিশ্বাস করাই অসম্ভব যে কাল সারা গাঁয়ের লোকে শিকার-গড়ে গিয়ে ভাল করে ঠাকুরানীর পুজো দেবে। প্রধান অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু হবে কী করে? এত মানুষের প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে?

আমি নেব। ঋজুদা বলল।

তুমি? একা? আর এই দুটি ছোট ছেলে?

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। আমি আর ওরাই নেব। যদি কারও গায়ে আঁচড়ও লাগে তার জন্যে আমরা দায়ী।

প্রধান অবিশ্বাসী গলায় বললেন, বড়লোকেরা ওরকম কথা অনেকই বলে। আমাদের চিরদিনই বলে এসেছে। রাজাও কম মিথ্যে কথা বলেননি। গরিবের প্রাণের দাম কে দেয়? কারও কিছু হলে আপনি কী করে প্রাণের দাম দেবেন?

ঋজুদা একটু ভাবল। তারপর বলল, কাল পুজো দিতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তবে তার পরিবারকে দশ হাজার টাকা দেবে। আর কেউ খণ্ডিয়া হলে পাঁচ হাজার।

খণ্ডিয়া কী রে? ভট্‌কাই শুধোল।

বললাম উন্‌ডেড। ইন্‌জিওরড়্।

ঋজুদার মুখে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটার কথা শোনার পর একাধিক লোকের মুখ দেখে মনে

হল তারা মরে বা আহত হয়েই ধন্য হতে চায়। অত টাকা কোনদিন একসঙ্গে হাতে ধরার কথা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল হবে কিনা এই চিন্তা যেন সকলেরই চোখে-মুখে।

প্রধান আবার প্রশ্ন করলেন, সাম্বপানি থেকে পুরোহিতকে না আনলে পুজো কে করবে ? রাজার মন্দির ! তাছাড়া ঠাকুরানী এখন বাঘের হয়ে গেছেন। আমরা পুজো দিলে উনি যদি আরও চটে যান আমাদের ওপরে ?

ঋজুদা একমুহূর্ত কী ভাবল। তারপর বলল, আমিই সকালে সাম্বপানি থেকে পুরোহিত নিয়ে আসব। তোমরা পুজোর অন্য সব বন্দোবস্ত করে রেখ। অনেক লোক লাগবে মন্দির আর মন্দিরের পথ পরিষ্কার করতে। সব জঙ্গল হয়ে আছে। কাল যত লোক মন্দিরে যাবে সকলের জন্যে শিকার-গড়েই খিচুড়ি রান্না হবে। সকলে ওখানেই ভোগ খেয়ে আসবে। মাংস আর খিচুড়ি। আমরা ঠিক সকাল আটটার সময়ে এসে পৌঁছব। আমাদের পাহারাতে সকলে যাবে। আবার আমাদের পাহারাতেই গ্রামে ফিরে আসবে।

বালাবাবু সকলকে সব বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন এই বাবু কলকাতা থেকে এসেছেন শুধু তোমাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে। এবং উনি বাঘের পেছনে দৌড়োদৌড়ি করে বাঘকে এই শিকার-গড়ে বা তার আশপাশেই মারতে পারবেন বলে মনে করছেন। তোমরা ওঁকে সাহায্য করো। কোথাও কোনও মানুষ বা জানোয়ার মারা যাওয়ার খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে কুচি-খাঁই পাহাড়ের নিচের বাংলোয় গিয়ে খবর দেবে।

ঋজুদা বালাবাবুকে বলল, কত চাল, ডাল, মশলা, আনাজ, মাংস হবে তার একটা হিসেব করতে হবে তাড়াতাড়ি। বলে, যে মানুষটির বৌয়ের কাটা হাত আমরা নিয়ে এলাম তাকে সঙ্গে নিয়ে জিপে করে চলে গেল নদীর দিকে শবের অবশিষ্টাংশ দাহ করার জন্যে। সঙ্গে সেই লোকটির ছোট ভাইও গেল। আমাকে আর ভট্‌কাইকে বলে গেল তোরা এখানে থাক। বালাবাবুদের সঙ্গে। আমি আসছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। লোকটার ছোট ভাইয়ের হাতে টাঙ্গি। জাল-কাঠ কেটে নেবে দাহ করার জন্যে নদীপারের জঙ্গলের মধ্যে থেকে।

ভট্‌কাই কোনদিনও গ্রাম দেখেনি। গ্রামের মানুষেরা যে গরিব তা ও জানত, কিন্তু এত গরিব, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না ওর। ওর মুখ-চোখ দুঃখে বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আমারও হত প্রথম প্রথম। তারপর সয়ে গেছে এখন। ভট্‌কাই চুপ করে বসে ছিল। পথের পাশের একটি বড় পাথরের ওপরে। আমিও কোনো কথা বলছিলাম না। বালাবাবু অত্যাচারিত, অবিশ্বাসী, ভয়ে কুঁকড়ে-থাকা গ্রামের মানুষদের একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঋজুদা আর আমার গুণপনার কথা বলছিলেন। বলছিলেন যে, এবারে নিনিকুমারীর বাঘের দিন সত্যিই শেষ হয়েছে। এদের কাছে বাঘের জারিজুরি টিকবে না।

একজন বালাবাবুকে বলল, তাহলে এতদিন এঁদের আনেনি কেন ? আমাদের গ্রাম আর লাগোয়া গ্রাম থেকেই তো বাঘ নিয়েছে তিরিশজন মেয়ে-পুরুষ। গরু ছাগলের তো শেষই নেই।

বালাবাবু দু'হাত নেড়ে বললেন, সে তো আমার ব্যাপার নয়। আমাদের ডি এফ ও সাহেবেরও নয়। তাছাড়া এঁরা তো ভারতবর্ষেই ছিলেন না। তারপর বললেন, তোমরা যদি নিজেরা এখন একটু সাহস না করো তবে উনি ফিরে যাবেন। তোমরা কি এইরকম মরার মতই বাঁচতে চাও চিরদিন, না যেমন করে বাঁচতে আগে তেমন করে ?

একটি মাঝবয়সী লোক বলল, আমাদের আবার বাঁচা। কেউ না কেউ তো আমাদের চিরদিনই খেয়েছে। কখনও রাজা, কখনও সুদখোর, কখনও ঠিকাদারবাবুরা। আর এখন খাচ্ছে বাঘে। ঐ সব খাদকদের খাওয়ার কথা সকলে জেনেও জানেনি। বাঘে খেলে রক্ত বেরোয়। সকলেই জানে তাই। নইলে বাঁচা মরায় আর তফাত কী আমাদের? পাঁচ বছর বাদে মাইক আর ঝাণ্ডা লাগানো জিপে করে পার্টির নেতারা ধবধবে পোশাক পরে আসেন একবার করে। হাতজোড় করে বলেন, "মা ভ্রাতা ভগিনীমান, মু ভোট পাঁই ঠিয়া হইছি আইজ্ঞা, তমমানে মত্তে ভোট দিয়ন্তু।" ভোট নেবার আগেই হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। ভোট পাবার পর সব ভোঁ-ভাঁ। এই তো চলল চল্লিশ বছর। আমার বয়স হল পঞ্চাশ বছর। দশ বছর থেকেই এই দেখে আসছি। আমার বাবা যেমন গরিব ছিল আমি তার চেয়েও অনেক বেশি গরিব হয়ে গেছি। নিনিকুমারীর বাঘকে যদি এ বাবুরা সত্যিসত্যিই মেরে দিয়ে যেতে পারেন তাহলে এর পরে আমরা ঐ মিথ্যেবাদী নেতাগুলোকে ধরব আর টিপে টিপে মারব। আমরা তো এই মিথ্যের বলি হয়েই জীবনটা কাটিয়ে গেলাম। অন্তত, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে....

আমি তাকিয়ে দেখলাম, মানুষটির দু'চোখে জল ছিল না। আগুনের হল্কা ছিল। পেট আর পিঠ এক হয়ে গেছে। অন্য সব লোকদেরও শরীরগুলো টিঙ্‌টিঙে কিন্তু পেটগুলো ফোলা ফোলা। ঋজুদা বলছিল খিদের জ্বালা সইতে না পেরে ওরা ভাতের সঙ্গে আফিঙের গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায়। শুধু নুন ভাত। তাও জোটে না। জুটলেও এক বেলা। বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। বাঘের জন্যে তাও বন্ধ। আফিঙ চূর্ণ খেয়ে খেয়ে পিলে বড় হয়ে যায়। বুড়োও হয়ে যায় তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সে।

ভট্‌কাই বলল, কলকাতায় বা কেষ্টনগরে আমাদের মধ্যে যারা খারাপও থাকি তারাও কত ভাল আছি এদের চেয়ে, না রে?

—হুঁ।

—দুস্‌স্‌। মনই খারাপ হয়ে গেল তোদের সঙ্গে এসে। আগে জানলে আসতাম না।

আমি কিছু বললাম না উত্তরে।

কিছুক্ষণ পরে দূরের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে জিপের এঞ্জিনের গোঙানি ভেসে আসতে লাগল।

ভট্‌কাই কান খাড়া করে বলল, কী রে! ঋজুদা কি ফিরে আসছে? এত তাড়াতাড়ি দাহ হয়ে গেল?

—দাহ আর কী! একটা তো হাত শুধু। আর রক্তে ভেজা শাড়ি। কতক্ষণ আর লাগবে।

—হুঁ। বলে, ভট্‌কাই যে পথে ঋজুদার জিপ আসবে সেই পথের দিকে চেয়ে রইল।

॥৩॥

বিশ্বল সাহেব আর বালাবাবু ঋজুদার কথামত সাম্বপানির রাজপুরোহিত থেকে শুরু করে পাঁঠা জোগাড় এবং খিচুড়ির বন্দোবস্ত একেবারে নিখুঁতভাবেই করেছিলেন। চণ্ডীমন্দির পরিষ্কার করে ধোয়ামোছাও হল। কতদিন পরে মন্দিরের পুজো হল কে জানে! ঝিংকুপানির মানুষেরা যেন নিজেদের চোখ-কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ভাবতেই পারছিল না যে এমন অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

পুজো ও খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে এল। হেমন্তর বেলা। তিনটে বাজতে না বাজতেই ঋজুদা গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে তাড়া লাগাল।

ফেরার সময়ে ঋজুদা এবং আমি গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে ফিরলাম না। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছিল। ঋজুদা গ্রামের প্রধানকে ডেকে বলল, কিচ্ছু হবে না। আমার দায়িত্ব। বাঘ এই মুহূর্তে নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। এই ভিড়ের মধ্যে আজ সে মানুষ ধরে নিজের চিন্তা বাড়াবে না। শিকারির হাঁচিও সে চেনে। সে এখানে এখন থাকলেও সে যে এখানে নেই এই কথাটাই প্রমাণ করতে সে ব্যস্ত হয়ে থাকবে।

যারা বনে মানুষ, বনেই যাদের জন্ম, বনের মধ্যেই যাদের বড় হয়ে ওঠা, বনই যাদের জীবনের সবকিছু তারা ঋজুদার মত শহুরে মানুষের এমন ভয়ডরহীন বেপরোয়া ভাব দেখে অবাক হল। নিজেদের হারিয়ে-যাওয়া সাহস যে তারা ফিরে পেলেও পেতে পারে এমন এক আশার ভাব তাদের চোখেমুখে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

ভট্‌কাই বলল, চল রুদ্র। এবারে আমরাও নামি।

কিন্তু ঋজুদা ভট্‌কাইকে বালাবাবুদের সঙ্গে কুচিলাখাঁই পাহাড়ের নিচের বাংলোতে ফিরে যেতে বলে বলল, আমি আর রুদ্র রাতটা এখানেই থাকব। কথাটা ভট্‌কাই-এর বিশ্বাস হল না।

ঋজুদা বলল, যা ! আর দেরি করিস না ভট্‌কাই। কাল একদম ভোরে এক ফ্লাস্ক গরম চা নিয়ে বালাবাবুর সঙ্গে ঝিংকুপানিতে চলে আসিস। রাতে ঘুমো গিয়ে আরাম করে।

আমি তাহলে এলাম কেন ? কী লাভ হল ছাই আমার এখানে এসে !

অত্যন্ত হতাশা আর বিরক্তির গলায় বলল ভট্‌কাই।

হবে হবে। লাভ হবে। অধৈর্য হোস না। এখন যা বলছি তা শোন। লক্ষ্মী ছেলে। ভট্‌কাইকে ক্ষান্ত করে বলল ঋজুদা।

আমার সঙ্গে একরকম ব্যবহার করছে ঋজুদা, যেন সমান সমান মানুষ আর ওকে ছেলেমানুষ বলে সবেতেই বাদ দিচ্ছে। এই ব্যাপারটাই ভট্‌কাই-এর আরও খারাপ লাগল। আর কিছু না বলে অন্যদের সঙ্গে সে নেমে গেল শিকারগড় থেকে ঝিংকুপানির গ্রামের দিকে।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, তুই গিয়ে বোস যে রক-শেলটারের মধ্যে বাঘ মৃতদেহের শেষাংশ রেখেছিল, তার বাইরে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকা কোনো বড় গাছের ওপরে। আর আমি থাকছি নবহতখানাতে। এখান থেকে শিকার-গড়ের চারধারেই নজর রাখা যাবে। গড়ের দেওয়াল আর তুই যেখানে বসে থাকবি সেই জায়গাতেও।

বলেই, আমার দিকে ফিরে বলল, কোনো ভয় নেই।

ওখানে দাঁড়িয়েই বললাম, কোন্ গাছটাতে বসব বল ?

ওদিকে ভাল করে চেয়ে থেকে ঋজুদা বলল, ঐ কুরুম গাছটাতেই বোস। চাঁরগাছটা বেশি ঝুপড়ি।

—কুরুম গাছটাও তো খুব ঝুপড়ি। ঐ গাছে বসে গুলি করব কী করে ? রাইফেলের সঙ্গে লাগানো টর্চও তো নেই। আগে জানলে...

—সে তো আমার রাইফেলেও নেই। ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, আজ বাঘকে যদি তুই দেখতেও পাস, তাহলে গুলি করিস না।

—কেন ?

—আমি চাই না যে তুই এই বাঘের মোকাবিলা করিস। আমি যদি দেখতে পাই তবে গুলি করব। অবশ্য শর্ট-রেঞ্জের মধ্যে পেলেই। এবং আমার যদি তোর সাহায্যের দরকার পড়ে তবে তুই সাহায্য করিস। কিন্তু গাছ থেকে না নেমে। মনে থাকে যেন। এমন একটা ডালে বসিস যেখান থেকে নিচের উপত্যকা আর নবহ্‌তখানা দেখা যায়। আমাকে অবশ্য দেখতে পাবি না। আমি থাকব নবহ্‌তখানার মধ্যের অন্ধকারে মিশে। যাঃ। আর কথা নয়। বেলা পড়ে গেছে। সাবধানে যাস। ঐ গাছে পৌঁছবার পথেই বাঘের সঙ্গে দেখা হতে পারে। খুব সাবধানে যাবি। কাল সকালে দেখা হবে। গুড লাক।

আমি এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, গুড হান্টিং।

ফটক দিয়ে নামলাম না। যে জায়গা দিয়ে গতকাল আমরা দুজনে উঠে এসেছিলাম সেই জায়গা দিয়েই নামলাম। গাছের ছায়ারা লম্বা হয়ে আসছে। ময়ূর ডাকছে উপত্যকা থেকে। হেমন্তের সন্ধ্যার সঙ্গে শীতের সন্ধ্যার অনেক তফাত। ভাল খারাপের কথা নয়। আলাদা আলাদা যে সেইটাই কথা। কিছুটা নামতেই মনে হল, রাত নেমে এসেছে। ঝুপ্‌ঝুপ্ করে ছায়ারা শব্দহীন দ্রুত পায়ে এসে আমায় ঘিরে ফেলল। একটা পেঁচা হুড়ম্-হাড়ুম করে ডাকতে ডাকতে কোটর ছেড়ে হেলিকপ্টারের মত সোজা উঠে গেল ওপরে। কালো পাতাদের চাঁদোয়া ফুঁড়ে। রাইফেলে দু' হাত ছুঁইয়ে আমি দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলাম ঋজুদার নির্দেশমত কুরুম গাছটার দিকে। ভীষণই ভয় করতে লাগল। ঋজুদার সঙ্গে অনেক বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছি আমি। মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা আমি ঋজুদার সঙ্গে আগেও করেছি বনবিবির বনেতে। আফ্রিকার জঙ্গলের "গুগুনোগুম্বারের দেশে" এবং "রুআহা" নদীর উপত্যকাতেও। কিন্তু সেই সব বিপদ সম্বন্ধে আগে জানা থাকলেও নিনিকুমারীর বাঘ-এর মত এতখানি জানা ছিল না। এই বাঘ যেন রূপকথারই কোনো দৈত্য। ঠাকুরানীর কৃপাধন্য। এই বাঘকে কব্জা করা বোধহয় কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। যারাই সেই স্পর্ধা দেখাবে তাদেরই মৃত্যু অনিবার্য। মনে স্বীকার করি আর নাইই করি, এরকম একটা ধারণা যেন কেমন করে ঢুকে পড়েছে আমার মনেও। নইলে ঋজুদা সঙ্গে থাকলে কোনো বিপদকেই বিপদ বলে ভাবিনি। মানুষের সঙ্গে বা জানোয়ারের সঙ্গে অবশ্যই লড়া যায়, তা তারা যতই ভয়াবহ বা হিংস্র হোক না কেন! কিন্তু লড়া যায় না ঈশ্বর বা ভূতের সঙ্গে।

একসময় নিজেরই অজান্তে সেই প্রায়ান্ধকারে গাছতলায় পৌঁছে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গাছে হেলান দিয়ে জুতো খুলে দুটো জুতোর ফিতেতে গিঁট মেরে রাইফেলের মত কাঁধে ঝুলিয়ে কুরুম গাছটাতে উঠে গেলাম। গাছটার গড়ন ঋজু। ভাল মোটা ডাল বেরিয়েছে বেশ ওপরে পৌঁছে। যাই হোক, যে ডাল বাইরে উপত্যকার দিকে ছড়িয়ে গেছে এবং যে ডাল থেকে আবার উপশাখা বেরিয়েছে, তেমন একটা মোটা ডাল বেয়ে এগিয়ে গিয়ে দুটো ডালের সংযোগের জায়গাতে ঘোড়ায় চড়ার মত বসলাম। গাছের নিচে রক-শেলটারের দিকে ঘন অন্ধকার। যদিও সূর্য ডুবতে এখনও আধঘণ্টার মত দেরি। রাতে যে চোখ একেবারেই চলবে না তা তখনই বোঝা গেল।

থিতু হয়ে বসে, স্লিংএ ঝোলানো রাইফেলটাকে পিঠ থেকে খুলে নিয়ে উরুর ওপরে রেখে জুতো দুটোকে একটা ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর চারদিকে চেয়ে কুরুম গাছটার সঠিক অবস্থান বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। চমৎকার দেখাচ্ছে এখন সমস্ত উপত্যকাটি। উপত্যকা পশ্চিমে। সূর্য চলেছে দিগন্তে। বোতল-সবুজ এবং শুঁয়োপোকা-রোমশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে এখুনি হারিয়ে যাবে রাঙাজবা সূর্য। কন্‌সর নদীর

আঁকাবাঁকা শাখার রুপোগলা জলে সেই রঙ লেগেছে ছোপ ছোপ। অগণ্য পাখির ডাকে কাকলিমুখর হয়ে উঠেছে নিনিকুমারীর বাঘের বাসভূমি। এখান থেকে শিকার-গড়ের নবহতখানাও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের বিদায়ী আলো এসে থামে আর গম্বুজে পড়ে আসন্ন সন্ধ্যার আগে পুরো শিকার-গড়কে থমথমে রহস্যে মুড়ে দিয়েছে। শিকার-গড় থেকে মুখ ফিরিয়ে আবারও উপত্যকার দিকে দুটো মদ্দা এবং সাতটি মাদিন শম্বর নদী পেরিয়ে ওদিক থেকে এদিকে এল সার বেঁধে। জলের আয়না ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। বিলিতি ক্যালেণ্ডারের ছবির মত দেখাচ্ছিল ঐ সন্ধের আকাশ, বন, নদী আর উপত্যকার মধ্যের নদী পেরুনো শম্বরদের।

কতক্ষণ চেয়ে ছিলাম জানি না। কিন্তু চোখ যেই ওদিক থেকে আবার ফিরিয়ে শিকার-গড়ের দিকে ফেললাম, কে যেন হঠাৎ আলোর সুইচটা নিবিয়ে দিল। অন্ধকার গিলে নিল সবকিছু। জেগে রইল শুধু পশ্চিমাকাশে দিগন্তরেখার কিছুটা ওপরে শান্ত স্নিগ্ধ সবুজ সন্ধ্যাতারাটি।

চাঁদ উঠতে এখনও অনেক দেরি। এখন এই কুরুম গাছের চতুর্দিকে এমনই গাঢ় অন্ধকার যে নিজের হাত পা-ই দেখা যাচ্ছে না। চোখের পাতা খুলতে গেলেও চাপ চাপ অন্ধকার। দু-চোখের সামনে থেকে তা সরাতে ফিনফিনে চোখের পাতাদের কষ্ট হচ্ছে। এখন অবশ্য চোখের কোনো ভূমিকাই নেই। কানদুটোই চোখের কাজ করছে। এবং নাকও।

সেই যে শম্বরের দলটিকে নদী পেরোতে দেখেছিলাম দিনান্তবেলাতে তাদেরও কোনো সাড়া শব্দ নেই। অথচ তারা যেভাবে নদী পেরোল তাতে মনে হল সোজাসুজি এলে তারা আমি যে কুরুম গাছে বসে আছি তাতেই এসে ধাক্কা খেত। শিকারগড়ের ফটকের কাছাকাছি একজোড়া পেঁচা কিঁচিকিঁচি-কিঁচির কিঁচি-কিঁচর করে ঝগড়া করতে করতে পুরো এলাকা সরগরম করে তুলছিল মাঝে মাঝে। মনে হচ্ছিল, তাদের ঝগড়া যেন এ রাতে শেষ হবার নয়। আর উপত্যকাতে নদীর ওপার থেকে একটি কপারস্মিথ পাখি ডেকে যাচ্ছিল অবিরাম। টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। তার সাথী সাড়া দিচ্ছিল নদীর ওপার থেকে। টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। সেই দূরাগত ডাক নদীর জলে ব্যাঙবাজির মত পিছলে উঠে নিনিকুমারীর বাঘের রাজ্যের এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতা যে কতখানি অমোঘ এবং জমাট তাই প্রমাণ করছিল।

ঝিংকুপানি গ্রামেও কোনো শব্দ নেই এখন। এমন পাহাড়ী জঙ্গলে পোয়া কিমি দূরেও কুয়ো থেকে কেউ জল তুললে সেই শব্দ পরিষ্কারই শোনা যায়। গ্রীষ্মবনের গাছ থেকে একটি পাতা খসলে সেই পাতা ঝরার শব্দও পটকার শব্দর মতই কানে বাজে।

ঝিংকুপানি গ্রাম সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসাড়। ঘুমিয়ে যেন কাদা হয়ে আছে। অনেকদিন পর তাদের সাহস ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আজ ঋজুদার কল্যাণেই জেগে উঠেছিল। কিন্তু রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। নিনিকুমারীর বাঘ একটা সাঙ্ঘাতিক মনের রোগও। সে রোগ অসুস্থ, বিবশ করেছে স্ত্রী-পুরুষ বড়-ছোট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই, এই কথাটা ঋজুদা যথার্থই বুঝেছে। এবং বুঝেছে বলেই তার মোকাবিলা করার আগে এই রাহুকবলিত মানুষদের মনের চিকিৎসায় লেগেছে। অসংখ্য অগণ্য সব গল্প-গাথায় তাদের প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিকতা বাদার ঝাঁঝির মত চাপা পড়ে গেছে। এই ত্রাস থেকে এখানের মানুষদের মুক্ত করতে পারলেই নিনিকুমারীর বাঘের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আধখানাই জেতা হয়ে যাবে।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে বসেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ গাছতলায় কী একটা আওয়াজ পেলাম। কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করলাম আওয়াজটা কিসের। পরক্ষণেই বিকট দুর্গন্ধে ভরে গেল পুরো জায়গাটা। হায়না! হায়না এসেছে বাঘের প্রস্তরাশ্রয়ে। জানে বোধহয় যে, এখানে মাঝে মাঝেই প্রসাদ থাকে তার জন্যে। এঁটো-কাঁটা খেতে যাদের আপত্তি নেই এবং এঁটো-কাঁটা খেয়েই যারা বেঁচে থাকে তারা উচ্ছিষ্টর খোঁজ তো রাখবেই।

হেমন্তের শিশির ভেজা বনকে কিছুক্ষণ দুর্গন্ধে কলুষিত করে হায়না চলে গেল। বাঘের ডেরার এলাকা পার হয়ে যাবার পর উপত্যকার দিকে নেমে যেতে যেতে হায়নাটা পাহাড়ী নদী চমকিয়ে ডেকে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ! হুঃ হাঃ। হাঃ হাঃ। যারা কখনও রাতের বনে আচমকা এ ডাক শোনেনি তাদের পক্ষে তার ভয়াবহতা ধারণা করাও মুশকিল।

হায়না চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ। কপারস্মিথ পাখিরা দূরের বনের নদীপারে ডেকে ডেকে থেমে গেছে। হেমন্তর বনের রহস্যময় রাতে এই পাখির ডাক বুকের মধ্যে এক ধরনের ছমছমানি তোলে। সমস্ত রাতকে এক মোহময় অপার্থিবতায় মুড়ে দেয় মুর্শিদাবাদী বালাপোষের মত। অন্ধকার এখন গাঢ়তর। বাঘের কোনো চিহ্নই নেই। অন্ধকারের মধ্যে শিকার-গড়ের শিলাবপু নক্ষত্রখচিত সবুজাভ আকাশ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাদুড়ের ডানার শপ্‌শপ্‌ আওয়াজ সেই পাথুরে নিস্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে মথিত করছে।

ঘুম পাচ্ছে আমার। সেই ভোরে উঠেছিলাম। তারপর অবেলাতে খিচুড়ি আর কষা মাংসের ভোজটাও বড় গুরু হয়ে গেছিল। চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে। কুরুম গাছের মোটা ডালে হেলান দিয়ে রাইফেলটাকে দুই উরুর ওপরে রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেই জানি না।

হঠাৎই যেন কানের কাছে বোমা ফাটল। গাছের প্রায় নিচেই দড়াম্‌ করে একটা কোট্‌রা আমাকে প্রায় হার্টফেল করিয়ে একবার ডেকেই হিস্টিরিয়া রোগীর মত বন-বাদাড় গাছ-পাহাড় ভেঙে ঝড়ের বেগে দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগল উপত্যকার নদীর দিকে। ডাকতে লাগল দৌড়তে দৌড়তে, বনের সব প্রাণীকে সাবধান করে দিতে দিতে। তার সেই ডাকের ওম্‌-এ এই শীতের রাতের অন্ধকারের ডিম ভেঙে যেন সাদা চাঁদ বেরল। ভিজে বনপাহাড় আস্তে আস্তে পাটিসাপটা রঙা হয়ে উঠতে লাগল। বাইরেটা একটু পরিষ্কার হতেই গাছতলার অন্ধকার আরও ঝুপড়ি হয়ে এল এবং আমার মন বলতে লাগল যে বাঘ গাছতলাতে এসে আমাকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করছে। বাঘকে খুব কাছে হঠাৎ না দেখতে পেলে কোটরা হরিণটা অমন পাগলের মত করত না। নিনিকুমারীর বাঘ কি গাছতলায় আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে? নাকি তার পাথুরে আশ্রয়ে বেড়ালের মত শুয়ে আমাকে নজর করবে, কে জানে? যখন এই সব ভাবছি গাছতলার নিবিড় অন্ধকারের তুমুল সন্দেহের শিকার হয়ে, ঠিক সেই সময়েই হুড়-দাড় আওয়াজ করে ঝিংকুপানির দিক থেকে সেই হারিয়ে যাওয়া শম্বরের দল ঘ্বাক্‌-ঘ্বাক্‌ করে ক্বচিৎ সংক্ষিপ্ত ডাক ডাকতে ডাকতে উপত্যকার দিকে নেমে যেতে লাগল। এতক্ষণে বুঝলাম যে তারা ঝিংকুপানির সীমানাতে কারও বিরিডালের ক্ষেতে গেছিল বিরি খেতে। বাঘের কথা কোটরার মুখে জানতে পেরেই হুড়মুড়িয়ে পালাচ্ছে এখন। তার মানে বাঘ যে আমার ধারে কাছেই আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভীষণই অস্বস্তি হতে লাগল

আমার। ভয়ও যে হল না তাও নয়। যে বাঘের গল্প শুনেই হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধোয় সে কাছে এলে আমা-হেন শিকারির অবস্থা যে শোচনীয় হবেই, তাতে আর সন্দেহ কি ?

.. কিন্তু বাঘের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল এই যে, কাছে এসেও সে যে এসেছে একথা জানান্ না দেওয়া। বনের প্রাণীরাও বোঝে অনেকই দেরিতে। এই সব ভাবছি যখন, ঠিক তখনই বাঘের গন্ধও পেলাম মনে হল। ঠিক কিনা জানি না। মনের ভুলও হতে পারে। নিনিকুমারীর বাঘের রাজ্যে অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে বসে, অন্ধকারের মধ্যে কান পেতে, অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে আমার মন আর মনে ছিল না। কিন্তু তারপর আর কিছুই ঘটল না। না কোনও শব্দ হল, না কোথাও নড়াচড়া। অনিশ্চয়তায় ভরা আশা আর আশঙ্কা করতে করতে একসময় এমনই হল যে কিসের আশা বা আশঙ্কা করছিলাম তাই ভুলে গিয়ে আবার ঢুলতে আরম্ভ করলাম ঘুমে। চাঁদ জেগে রইল একা। দূরের নদীর শব্দ জোর হতে লাগল বন নিস্তব্ধতর হতেই।

হঠাৎই শিকার-গড়ের চণ্ডীমন্দিরের ঘণ্টাগুলো দারুণ জোরে এলোমেলো ভাবে বেজে উঠল। প্রায় মিনিট দু-তিন আগে-পরে জোরে-আস্তে বেজে গেল পুবের আকাশে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। ভীষণই ভয় করতে লাগল আমার। নিনিকুমারীর বাঘ কি সত্যিই তবে ঠাকুরানীর বাঘ ? আমি, সাউথ ক্যালকাটার রুদ্র রায়ও কি ঝিংকুপানির হাড় জিরজিরে পেটফোলা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরই মত সেকেলে হয়ে গেলাম ?

চণ্ডীমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে বোধহয় দিন-পাখিরা সব জাগতে লাগল একে একে। হাজার গলার সুরে সুর মিলিয়ে তারা যেন শিকার-গড়ের চণ্ডীঠাকুরের আরাধনা শুরু করে দিল ! কী চিকন মিষ্টি অথচ জোরাল তাদের গলার স্বর। কে যেন এত বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন স্বভাবের বিভিন্ন স্বরের পাখিদের সৃষ্টি করেছিল জানি না। তবে তিনি যে হোন না কেন, তাঁর পায়ে প্রণাম জানালাম। বনে-পাহাড়ে রাত কাটালে এই সময়ে, রাত শেষ হয়ে ভোর আসার মুহূর্তটিতে মায়ের গলায় বহুবার শোনা রবীন্দ্রনাথের এই গানটির কথা মনে পড়ে আমার। আহা কী গান ! সমস্ত শরীর মনে কী যেন কি একটা হয় এই গানটা মনে করলেই !

“প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ৷৷
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ৷৷”

ঋজুদাকে নহবতখানা থেকে নামতে দেখলাম যখন তখনও সূর্য ওঠেনি, যদিও চারদিক পরিষ্কার হয়েছে। যতক্ষণ না গাছের নিচে ভাল করে নজর চলে ততক্ষণ অপেক্ষা করে একটু একটু করে নেমে শেষে গাছের নিচে এসে পৌঁছলাম। রক-শেলটারের দিকে তাকালাম। রাতের অন্ধকারে কত কিছুই কল্পনা করছিলাম। কত অবয়ব, কত বিপদ। বনের মধ্যে রাত কাটানোর পর সকাল যেন পৃথিবীর সব প্রসন্নতা নিয়ে এসে হাজির হয়।

সাবধানে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ জায়গা ছেড়ে এসে পরিষ্কার জায়গাতে দাঁড়ালাম ঋজুদার অপেক্ষায়। ঋজুদা গড়ের প্রধান ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছিল। আমাকে দেখে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নেমে এল। শুধোলাম, মন্দিরের ঘণ্টাগুলো ভোর হবার আগে অমন করে বাজল কী করে ?

ঋজুদা হাসল, উত্তর না দিয়ে।

বলল, গেস্ কর। ভেবে দ্যাখ কে বা কারা বাজাতে পারে।

সারা রাত গাছের ডালে ঘোড়সওয়ার হয়ে বসে থেকে আর অন্ধকারে চারদিকে নিনিকুমারীর বাঘ দেখতে দেখতে আমার মস্তিষ্ক তখন আর কাজ করছিল না। সারেন্ডার করে বললাম, জানি না।

ঋজুদা বলল, বাদুড়। ভোর হওয়ার আগেই তারা ফিরে এসে ঘণ্টাগুলো যে লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে, তাতে এসে ঝুলে পড়ল। তাই ঐ ঢং-ঢঙা-ঢঙ্। তারপরই নিজের মনে বলল, চল, তাড়াতাড়ি নামি নিচে। দেখি, ভট্‌কাই চা নিয়ে এল কিনা?

নিচে নেমে দেখলাম তখনও বালাবাবু জিপ নিয়ে আসেননি। তবে এসে পড়বেন এখুনি। ভোর তো এই হল সবে। গ্রামের মধ্যে থেকে শব্দ আসছে নানারকম। চারপাশে বনমোরগ, ময়ূর, তিতির, বটের হরিয়াল, ঘুঘু, নানারকম ফ্লাই-ক্যাচার আর মৌ-টুসকি পাখিদের সম্মিলিত ডাকে একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে পুরো অঞ্চল। আমরা গিয়ে যখন গাছতলায় বসলাম তখন গ্রামের ঘরগুলোর দরজা একে একে খুলছে। দু-একজন এসে আমাদের জিজ্ঞেস করল, কী হল রাতে?

ঋজুদা বলল, গ্রামের দিকে বাঘ কি এসেছিল কাল রাতে?

সকলেই বলল, না। কিন্তু আপনারা কী দেখলেন?

—কিছু না।

—তবে সারারাত কষ্ট করে গাছে বসে রইলেন কেন? কোনো মড়ি বেঁধে বসলেও না হয় কথা ছিল। জগবন্ধুর বৌয়ের শরীরের কিছু তো আর বাকি ছিল না।

ঋজুদা বলল, জায়গাটা সম্বন্ধে একটু ধারণা করার জন্যে বসেছিলাম। বাঘ যে এখানে নেই এবং আসবে না তা জেনেও। এ বাঘ তো যে-সে বাঘ নয়! ঋজুদা যখন এসব কথা বলছে, ঠিক তখনই আমরা যে পথ দিয়ে নেমে এলাম শিকার-গড় থেকে, সেই পথ দিয়ে একটা ছোটখাটো লোক হাতে একটা গরু চরাবার লাঠি নিয়ে প্রচণ্ড দৌড়ে, দৌড়ে না বলে উড়েই বলা ভাল, আমাদের দিকে নেমে আসছিল। ক্রমশই তার চেহারা বড় হতে লাগল। ততক্ষণে অন্যদিক থেকে দূরাগত জিপের এঞ্জিনের ক্ষীণ আওয়াজও শোনা যেতে লাগল।

কাছে আসতে দেখলাম লোক নয়, একটা দশ-বার বছরের ছেলে। গায়ে সাজিমাটির কাঁচা হলুদ রঙের একটা জামা, মাথায় ফেটে-যাওয়া গামছা। ছেলেটা হাঁপাচ্ছিল।

ঋজুদা বলল—কউটি আসিলুরে তু পিলা?

হাঁপাতে হাঁপাতে সে শিকার-গড় ফুঁড়ে তার তর্জনী নির্দেশ করে বলল, সুঝানি।

—হেল্বা কঁড়?

মা বাপ্পাটাকু সে বাঘ্‌টা কাল রাতবেলে আম্মো ঘর ভাঙ্গিকি নেই গলে।

বলেই, বাবু-উ-উ-উ বলে এক বুকফাটা আর্তনাদ করে ছেলেটি ঐ হিমপড়া লাল ধুলোর রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এমন সময় বালাবাবু আর ভট্‌কাই জিপ থামিয়ে মস্ত ফ্লাস্কে চা নিয়ে নেমে এল।

ঋজুদা ঐ ছেলেটাকে দু'হাতে তুলে ধরে জিপের সামনের সিটে বসাল। ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে সবচেয়ে আগে ওকে দিল।

ছেলেটিকে অমনভাবে দৌড়ে আসতে দেখে ঝিংকুপানির কিছু মানুষও এসে জিপ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। বালাসাহেব ওদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলে সব জেনে নিলেন।

ওদের সুঝানি গ্রাম ঠিক শিকার-গড়ের উল্টোপিঠে নয়, আরও গভীরে। সেখানে জঙ্গল অত্যন্ত গভীর। সে গ্রামে মাত্র আট-দশ ঘর মানুষের বাস। ওরা তামাক পাতা আর সর্ষের চাষ করে শুধু। ছেলেটার নাম যুধিষ্ঠির। তার বাবার নাম দশরথ। তার মত সাহসী, সৎ আর পরিশ্রমী মানুষ নাকি এ তল্লাটে ছিল না। এমন দুর্দিনেও যারা নিনিকুমারীর বাঘটে ডোন্টকেয়ার করে এসেছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। আর বাঘে কিনা শেষে তাকেই নিল। তাও তার ঘর ভেঙে।

বালাবাবু বললেন, আশ্চর্যের কথা স্যর, আজ অবধি ঐ সুঝানি গ্রামে কোনো কিল্ হয়নি।

ঋজুদা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছিল। আমারও মনে হচ্ছিল গোড়াতেই ঋজুদা একটু ওভার-কন্‌ফিডেন্ট হয়ে পড়ে নিনিকুমারীর বাঘকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তা দেয়নি। তার গুনাগার আমাদের গুনতে হবে।

ছেলেটাকে গরম চা আর কিছু খাবার খাইয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিলেন বালাবাবু। কিন্তু কোনো খাবারই সে ছুঁল না। বাচ্চা ছেলে, মাঝে মাঝেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠছিল। ওর মা মারা গেছেন দু' বছর আগে, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে।

ঋজুদা বালাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, সুঝানি গ্রামে জিপ চালিয়ে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ। নদী পেরিয়ে যেতে হবে।

—কত মাইল পড়বে? কতক্ষণ লাগবে যেতে?

—কাক-উড়ানে গেলে মাইল তিন কী চার, কিন্তু জিপে গেলে তো ঘুরপথে যেতে হবে। তা মাইল দশেক পড়বে।

—ওখানে গেলে আমাদের সাহায্য করার জন্যে মানুষজন পাব?

—না পাবারই কথা। ছোট গ্রাম।

—এ গ্রাম থেকে কয়েকজন কি যাবে আমাদের সঙ্গে?

বালাবাবু গ্রামের ভেতরে গিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা বলে এসে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, ঠাকুরানীর বাঘকে চটানো ঠিক হয়নি বলে এদের সকলের ধারণা। তখন কিছু না বললেও চণ্ডীমন্দিরে পুজো আর শিকার-গড়ের চত্বরে পিকনিক করাটা ঝিংকুপানির মানুষেরা মোটেই ভাল মনে নেয়নি। এ বাঘ ঠাকুরানীর বাঘ। একে ছোট করে দেখার জন্যে আপনাদের নাকি এখন অনেক শাস্তি পেতে হবে।

ঋজুদা পাইপটা থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, ম্যানইটার বাঘ পরপর দু'দিন এত কাছাকাছি গ্রামে মানুষ মারে এমনটা শুনিনি। দেখিওনি কখনও। ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এবারে আমার...

কী? আমি বললাম।

মে বী, মাই লাক ইজ রানিং আউট। চল যুধিষ্ঠির। আমাদের সঙ্গে জিপে ওঠ। আমরা তোর গ্রামে যাব।

যুধিষ্ঠিরের দু'চোখে কৃতজ্ঞতা আর প্রতিশোধের দীপ্তি ফুটে উঠল। বলল, আমার বাবা তিনদিন ধরে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিল। বাঘটা তো আমাকেও নিতে পারত?

ঋজুদা আর কথা না বাড়িয়ে নিজেই স্টিয়ারিঙে বসল। বালাবাবু আর যুধিষ্ঠির বসল সামনে। আমাদের পেছনে বসতে বলল ঋজুদা। তারপর জিপ স্টার্ট করে কিছুটা পেছনে গিয়ে বালাবাবুর নির্দেশে একটা বছরের পর বছর ধরে অব্যবহৃত পাতাচাপা পথে জিপ ঢোকাল।

—রাস্তা কেমন ?

—সাবধানে, আস্তে আস্তে চলুন। মাঝে দু জায়গায় রাস্তা কাটা ছিল। বুদ্ধি করে বেরোতে হবে।

আমার দু'চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছিল। ভট্‌কাই-এর কাঁধে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অব্যবহৃত পথ দিয়ে জিপটা এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখনও পথের ধুলো এবং গাছপালা শিশির ভেজা। চোখ বন্ধ করেই শুনতে পেলাম কঁক্ কঁক্ করে একদল বন-মুরগি ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেল পথ পেরিয়ে। ঋজুদার জিপ প্রায় তাদের গায়ের ওপর দিয়েই চলে গেল। তবে মুরগি সচরাচর গাড়ি চাপা পড়ে না। পোষা মুরগিও না। ভট্‌কাই আমার পেটে খোঁচা মেরে বলল, জাঙ্গল ফাউল। জাঙ্গল-ফাউল !

একবার খুলেই আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

মিনিট পনেরো সেকেণ্ড ও থার্ড গিয়ারে যাওয়ার পর নদীতে এসে নামল জিপ। নদী পেরোবে এবার। সামনের চাকা দুটো জলে নামল বালি মাড়িয়ে, তার পর স্পেশাল গিয়ার চড়াল ঋজুদা বিশেষ সাবধানতা হিসেবে। দরকার ছিল না কোনও। ফার্স্ট গিয়ারেই এই হাঁটু জল পেরিয়ে যেত জিপ অনায়াসে। মাঝনদীতে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল জিপ। ঋজুদা ব্রেক করেছিল। তাড়াতাড়ি চোখ মেললাম।

যুধিষ্ঠির বলল ঋজুদাকে, আউটিক্কে আগরু চালুন্ত। ভল্ব দিশিছি না এট্টু।

নদীটা পারই করে নিল ঋজুদা। তারপর ওপারে উঠে উঁচু ডাঙাতে দাঁড় করালো জিপটাকে। আমরা সবাই নামলাম। নদীর ডানপাড়ে খুব ঘন বাঁশজঙ্গল। ঘন সবুজ বাঁশপাতায় সকালের রোদ এসে পড়েছে। ভোরের ফিনফিনে কন্‌কনে হাওয়াতে বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে কট্‌কটি উঠছে। ছোট ছোট মৌটুসকি পাখি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক ফুলে ফুলে মধু খেয়ে। ছায়াচ্ছন্ন ঝোপে, লজ্জাবতীর ঝাড়ে, হুড়োহুড়ি উঠছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, বাঁশ জঙ্গলের বাঁ পাশে একটা শিমুল গাছের ডালে সার সার শকুন বসে আছে। ঋজুদা, যুধিষ্ঠির ও আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল বালাবাবুকে, জিপটা আপনি একটু এগিয়ে নিয়ে পথের দু'পাশের ফাঁকা জায়গা দেখে অপেক্ষা করবেন। আমরা আসছি।

ভট্‌কাই উৎসুক চোখে তাকাল ঋজুদার দিকে।

ঋজুদা ওর উৎসাহে জল ঢেলে বলল, তুই জিপেই যা।

আমরা তিনজনে এগিয়ে গেলাম। জিপটাও এগিয়ে গেল পথ ধরে। যদিও নামেই পথ। এ পথে মানুষজন বড় একটা চলে না আজকাল। পথের মধ্যে ডাল পাতা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। একটু এগোতেই নদীর বালিতে নিনিকুমারীর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেল একটা শম্বরের দলের পায়ের দাগের ওপরে। কাল রাতের দলটি। শকুনরা যেদিকে মুখ করে বসেছিল সেদিকে সাবধানে এগোতে লাগলাম আমরা। শম্বরের বাচ্চা একটি। বছরখানেক বয়স হবে। অর্ধেকটা খেয়েছে। কিন্তু তার গলার দাগ দেখেই বোঝা গেল যে তাকে মেরেছে একটি মাদী চিতা বাঘে। মাঝারি সাইজের চিতা। যেটুকু আছে তাতে সে রাতে ফিরবে। এখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রোদে শুয়ে আছে সে।

ঋজুদা যুধিষ্ঠিরকে বলল, জীবি। এটি দেখিকি কঁড় হেব্ব ?

চালুন্ত। স্বগতোক্তির মত বলল যুধিষ্ঠির।

ফিরে যেতে যেতে মড়ির কাছে চিতাটার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায় কিনা খুঁজলাম আমি। একটু পর পেয়েও গেলাম। নিনিকুমারীর বাঘের নদী পেরুনোর সঙ্গে এই চিতাটার হরকৎ-এর কোনো মিল নেই। চিতাটা এসেছে এ-পারের গভীর জঙ্গল থেকে। এসে শম্বরের দল যখন নদী পেরোয় তখন এই বাচ্চাটিকে ধরে। ঋজুদা ক্যানাইন দাঁতের দূরত্ব দেখে বুঝেছিল এ চিতা খুব বড় নয়। আমি থাবার দাগ দেখে বুঝলাম।

ঋজুদা শিস দিল। অনেকটা এগিয়ে গেছে ঋজুদা ও যুধিষ্ঠির।

ওদিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম নিনিকুমারীর বাঘ যদি শেষ রাতে নদী পেরিয়ে এ-পারে এসে থাকে তবে সুঝানি গ্রামে গিয়ে সে যুধিষ্ঠিরের বাবা দশরথকে ধরল কখন ?

আমি শুধোলাম ওর কাছে গিয়ে, কখন ধরেছিল বাঘ ? তোমার বাবাকে ?

—শেষ রাতে।

ঋজুদা বলল, তবু। ক'টার সময় আন্দাজ।

—এই তিনটে হবে।

—বাঘটাকে তুমি নিজে দেখেছিলে ?

—না বাবু। বাবা শেষ রাতে দরজা খুলে বাইরে গেছিল। হাতে কেরোসিনের কুপি নিয়ে। কাছেই গেছিল। বাড়ির সামনেই। জ্বরে কোঁকাচ্ছিল বাবা। আমি বললাম, সঙ্গে যাব ? বাবা বলল না, না। তুই শো। আমার জন্যে দু'রাত ঘুম হয়নি তোর।

বলেই, কেঁদে ফেলল যুধিষ্ঠির।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। এখান থেকে সকালের রোদ-পড়া শিকার-গড়কে কী সুন্দর দেখাচ্ছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এই জায়গা দিয়েই কাল আমরা গাছ থেকে শম্বরের দলকে নদী পেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। গাছ থেকে এই সুন্দর নদীকে অস্তগামী সূর্যর আলোয় কী বিধুর দেখাচ্ছিল, আর এখন সদ্য উদিত সূর্যর আলোকে কী সুন্দরই দেখাচ্ছে !

জিপে উঠে ঋজুদা শুধোল যুধিষ্ঠিরকে, বাবাকে যে নিনিকুমারীর বাঘে নিল তা তুমি জানলে কী করে ?

যুধিষ্ঠির বলল, বাবা বাইরে যাওয়ার পরই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজাটা ভেজিয়ে গেছিল বাবা। হঠাৎ আমার খুব শীত করতে লাগল। ঘরের মধ্যে আগুনও নিবে এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমি দেখি, ঘর অন্ধকার। বাবা নেই। দরজাটা খোলা। ফাঁক দিয়ে চাঁদের ঘোলাটে আলো এসে পড়েছে মাটির বারান্দায়। আমি টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে 'বাবা' বলে ডেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বাবা কোথাও নেই। ভাবলাম, হিসি করতে গিয়ে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে-টড়েই গেল। তাই ঘরে ফিরে আগুনটাকে নতুন কাঠ দিয়ে জোর করে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে আমি বাইরে গিয়ে আশপাশে বাবাকে খুঁজলাম। বাবাকে পেলাম না, কিন্তু যে জায়গায় বাঘ বাবার ঘাড় কামড়ে নিয়ে গেছিল বাবাকে, সেই জায়গায় ধস্তাধস্তির দাগ আর জানোয়ারের পায়ের দাগ ছিল। কুপিটা নিবে গেছিল। উল্টো হয়ে মাটিতে পড়ে ছিল।

—তুমি কী করলে তখন ? যখন দেখলে যে,...

—আমি চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের বললাম, আমার বাবাকে বাঘে নিয়ে গেছে। তোমরা সব ওঠো। আমরা খুঁজতে যাই। কিন্তু কেউ সাড়াও দিল না। ওদের দোষ নেই। আমরাও সাড়া দিতাম না পাশের ঘরের মানুষ নিলে। নিনিকুমারীর বাঘ তো শুধু বাঘ

নয়। সে যে ঠাকুরানীর বাঘ!

কিছুক্ষণ পর আমরা সুঝানি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে পৌঁছে মহা সমস্যা দেখা গেল। আমি আর ঋজুদা দুজনেই খুব ভাল করে যুধিষ্ঠিরের বাবাকে যেখানে বাঘে ধরেছিল তার চারপাশের নরম মাটির ওপরে পায়ের দাগ পরীক্ষা করলাম, কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘের পায়ের দাগ সেখানে ছিল না। ছিল একটা বুড়ো মদ্দা চিতা বাঘের পায়ের দাগ।

ঋজুদা ভট্‌কাইকে বলল, ভট্‌কাই! আর চা আছে নাকি?

ভট্‌কাই চা ঢেলে দিল সকলকে। নিজেও নিল। ততক্ষণে সুঝানি গ্রামের কয়েকজন লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। জিপের শব্দ শুনে বহুদূর থেকে তারা জমায়েত হচ্ছিল। বাচ্চাদের ও মেয়েদের দেখে মনে হল ওরা এর আগে কখনও জিপ গাড়ি দেখেনি।

লোকজন স্বাভাবিক কারণেই চিন্তিত। গ্রামের কোনো লোককে আগে কখনও মানুষখেকো বাঘে ধরেনি। তার ওপরে ঠাকুরানীর বাঘে। ঋজুদা যখন বোঝাতে গেল যে এটা বাঘ নয় চিতা, তখন ওরা সে কথা উড়িয়েই দিল। বলল, পায়ের দাগে কী আসে যায়? নিনিকুমারীর বাঘ নানারকম মূর্তি ধরে আসে। সে যে ঠাকুরানীর বাঘ!

ঋজুদা বলল, চল্ রুদ্র! ড্র্যাগ-মার্ক ফলো করে দেখা যাক। বোঝা যাচ্ছে এখানে একাধিক ম্যানইটার আছে। এই অঞ্চলের মানুষদের মনে নিনিকুমারীর বাঘ যে এখন ঠাকুরানীর স্নেহধন্য হয়ে গেছে তার ওপরেই সব দায়িত্ব চাপছে। একদিকে মানুষের মনের এরকম অবস্থা, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতাও এরা কেউই আর করবে বলে মনে হচ্ছে না। অন্যদিকে মানুষখেকো বাঘ আর চিতা। অবস্থা সত্যিই গোলমেলে। ভট্‌কাইকে এবারেও বালাবাবুর সঙ্গে থাকতে হল। অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে ভট্‌কাইয়ের এবারে আসাটা সত্যিই ঠিকঠাক হয়নি। মঘা কী অশ্লেষা কী বারবেলা কিছু একটা নিশ্চয়ই ছিল ভট্‌কাইয়ের যাত্রার সময়ে, নইলে এমন করে বেচারির যাত্রা নাস্তি হত না। কী যে ছিল তা ওর দিদিমার কাছেই খোঁজ নেওয়া যাবে কলকাতায় ফিরে। আপাতত কিছুই করণীয় নেই।

স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল কাছেই, একটা পাহাড়ী ঝর্নার ধারে। ঝর্নাটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে চিতার পায়ের দাগ, মৃত দশরথের শরীরের দাগ, ইতস্তত ছিটকে যাওয়া নুড়ি-পাথর আর বিধ্বস্ত সর্ষে গাছ দেখে মনে হল দশরথকে নিয়ে চিতাটা পড়ে গিয়েছিল এই ঝর্নায়। নিজের ইচ্ছেয় সে যদি ঝর্নায় নামত তার দাগ হত অন্যরকম।

ঋজুদাকে সে কথা বলতেই, ঋজুদা বলল ঠিক বলেছিস রুদ্র। আমিও লক্ষ করেছি। ব্যাপার কী ঠিক বুঝছি না।

ঝর্নাটার বুকে নরম সবুজ ঘাস গজিয়ে গেছে বর্ষার পর। দু' পাশে কমলা রঙের ফুল ফোটা পুটুস। তিক্ত কটু গন্ধ বেরুচ্ছে তখনও শিশিরে ভিজে-থাকা পাতাগুলি থেকে। প্রায় গজ পঁচিশেক নিচে ঝর্নার মধ্যে একটি দহমত আছে। অনেক বড় বড় পাথরের স্তূপ চারপাশে আর নিচটা মসৃণ। সূক্ষ্ম বালুকণাময় সেই দহের মধ্যে চিতাটা যুধিষ্ঠিরের বাবাকে রেখেছে পুটুস ঝোপের নিচে, যাতে শকুনের চোখ না পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য! শরীরের একটুও খায়নি সে। সেই জায়গাটাও ভাল নিরীক্ষণ করে এবং যে ভঙ্গিতে দশরথের শরীরটা পাকিয়ে মুচড়িয়ে পড়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে দশরথকে কামড়ে ধরে থাকা অবস্থাতেই চিতাটা ওপর থেকে সোজা হুড়মুড় করে গড়িয়ে এসে এই দহতে আটকে

গেছে।

মাচা বাঁধার মত গাছ কাছাকাছি নেই। এই দহের ওপরের দিকে সর্ষেক্ষেতের কোণে একটি মিটকুনিয়া গাছ আছে। আর ঝর্নার দহের হাত পনেরো-কুড়ি দূরে পাহাড়ের গা থেকে সোজা উঠে আসা একটি মস্ত কুসুম গাছ।

ঋজুদা আমাকে বলল যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আমি যেন যুধিষ্ঠিরের বাড়ি ফিরে যাই। দশরথের শরীরের কোনও অংশ আজ দেওয়া যাবে না। অসম্ভব না হলে পুরো শরীরই ও পাবে কাল দাহ করার জন্যে। যুধিষ্ঠিরের কোনো প্রতিবেশীর বাড়িতে কিছু খাওয়াদাওয়া করে নিয়ে তুই এখানেই ঘুমিয়ে নে। মাচা বাঁধতে হবে কুসুম গাছটাতে। আমার ধারণা এবং পায়ের দাগও তো তাই বললো ; চিতাটা উঠে আসবে নিচ থেকেই। ঝর্নার রেখা ধরে সে নিচেই গেছে। কিন্তু মানুষ ধরার পরও সে কেন যে একটুও খেয়ে গেল না, সেটাই রহস্য। যাই হোক, তুই ভট্‌কাইকে নিয়ে এসে ঐ কুসুম গাছের মাচাতে বসবি বিকেল বিকেল।

—আর তুমি ?

—আমি এখুনি বালাবাবুকে নিয়ে চলে যাব যেখানে নিনিকুমারীর বাঘ নদী পেরিয়েছে সেখানে। বালাবাবু আমাকে নামিয়ে দিয়েই আবার তোদের কাছে ফিরে আসবেন। কাল সকালে তোরা আবার আমাকে ঐ নদীর কোল থেকেই তুলে নিবি। কাল সারা দিনরাত বাংলোতে গিয়ে বিশ্রাম। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

—তোমার যাওয়াটা কি খুবই দরকার ?

—হুঁ। ঋজুদা বলল।

—মানুষখেকো চিতার অপেক্ষায় মাচার নিচে মরা-মানুষ নিয়ে গাছে বসাটা ভট্‌কাইয়ের অ্যাপ্রেন্টিসশিপগিরির প্রথম রাতের পক্ষে একটু বেশি ডোজ হয়ে যাবে না ?

—হলে হবে। জেনেশুনেই তো এসেছে। তাছাড়া ওর বয়সী ছেলেরা ভিয়েতনামের যুদ্ধ লড়েছে, আরব আর ইজরায়েলে আজও লড়ছে। মানুষ হতে হলে হবে। নইলে বাঘের পেটেই যাবে। এমন অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগই বা ওর বয়সী কলকাতার কটি ছেলে পায় ? ও খুব খুশিই হবে। তুই বেশি গার্জেনি করবি না ওর ওপর। তবে মাচায় নিয়ে যাবার আগে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিস।

ঐ জায়গা থেকে ফিরে আসার আগে ঋজুদা বলল কুসুম গাছটার দিকে চেয়ে, মাচাটা যেন মাটি থেকে কমপক্ষে হাত পনেরো উপরে হয়। ভট্‌কাইকে নিয়ে বসবি সে কথা মনে থাকে যেন ! আর ভুলে যাস না চিতা এবং বিশেষ করে মানুষখেকো চিতা নিঃশব্দে গাছে চড়তে পারে। খুব সাবধানে এবং অনড় হয়ে থাকতে হবে সারা রাত। মনে করিয়ে দিলাম।

ঝর্নাটা বেয়ে উঠে আসার সময়ে ঋজুদা বলল, কিল্ কিন্তু চিতাটা বয়ে আনেনি ওপর থেকে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, দ্যাখ ভাল করে কোথাও ড্র্যাগ-মার্ক আছে কি ?

—না।

—কিল নিয়ে একলাফেতেই ঐ দহতে পড়েছে। ইচ্ছে করে কেন পড়বে বুঝছি না। আর অনিচ্ছাতে পড়লেও কেন পড়ল তা ভাবার অবকাশ আছে। অনিচ্ছায় পড়ে থাকলে চিতার নিজের হাড়গোড়ও কিছু ভাঙার কথা।

ঝর্নাটা সর্ষেক্ষেতের যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে বালাবাবু, যুধিষ্ঠির এবং যুধিষ্ঠিরের চার-পাঁচজন প্রতিবেশী দাঁড়িয়েছিল। শব-এর জন্যেই। ঋজুদা তাদের নিরাশ করে

বলল, আজ শব দাহ্ করা সম্ভব নয়। কাল সকালে কোরো।

এই কথাতে তারা সকলেই একটু ক্ষুণ্ণ হল। প্রতিবেশীদের একজনের হাতে একটি গাদা বন্দুক ছিল। নিশ্চয়ই লাইসেন্স-বিহীন। লোকটা বলল, একুট মুরব্বির মত স্বরে, এ তো নিনিকুমারীর বাঘ নয়। এরা বললে কি হয়। এ সেই বড় চিতাটা। যাকে আমি প্রায় মেরেই ফেলেছিলাম সেদিন রাতে। গোয়াল ঘরে আমার গরু ধরতে এসেছিল। অত কাছ থেকে গুলি করলাম পুরো চার আঙুল বারুদ ঠেসে। তবুও পালালো। এই চিতাও যে ঠাকুরানীর চিতা তাতে সন্দেহ নেই কোনো। ঋজুদা লোকটার আপাদমস্তক দেখল। মুখে কিছু বলল না।

বালাবাবুকে বলল চলুন আমাকে নদীতে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। আর যা বলার রুদ্রকে বলেছি। কারও বাড়িতে আপনাদের ডাল ভাতের বন্দোবস্ত হয় কি না দেখুন ফিরে এসে। ফিরে এসে রুদ্রকে মাচাটা বাঁধতে একটু সাহায্য করবেন। আর বন্দুকধারী লোকটি সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করে রাখবেন তো!

কথাগুলো ঋজুদা ইংরিজিতেই বললো।

নিচে নেমে যুধিষ্ঠিরের বাড়ির মাটির বারান্দার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম আমি আর ভট্‌কাই। যুধিষ্ঠির আর গ্রামের সেই তিন-চারজন লোক আমাদের সামনে উবু হয়ে বসে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। বালাবাবু ঋজুদার সঙ্গে চলে যেতে যেতে ওদের একজনকে বলে গেল বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের তিনজনের জন্যে একটু খাবারের বন্দোবস্ত করে রাখতে। পয়সা পাবে।

লোকটি বিরক্ত মুখে নিজের মনেই বলল অতিথি নারায়ণ। কিন্তু আগের দিন কি আর আছে? না হয় কোনো ফসল, না বসে হাট ঠিক-ঠাক। ভাত, মসুরের ডাল, বিড়ি বড়া আর রম্ভাভাজা, এই খাওয়াব। তবে পয়সা-টয়সা নেব না। কোনদিনই নিইনি, আজও নেব না। পয়সার কথা বলে আমাদের অপমান করা কেন?

ভট্‌কাই থম্ মেরে ছিল। এই জঙ্গল পাহাড়, এই আশ্চর্য সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য, এবং তারই মধ্যে এই অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য, পরপর দু-দিন জঙ্গলের মানুষখেকো জানোয়ারের হাতে দুজন মানুষের প্রাণ যাওয়া, এসব দেখেশুনে ও স্তব্ধ হয়ে গেছিল। এখন আরও বেশি হল যখন যুধিষ্ঠিরের বাবা দশরথ ঐ পাহাড়ের ঝর্নার মধ্যের দহতে পড়ে আছে শুনেও এই মানুষেরা, এমনকি যুধিষ্ঠিরও একটুও উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলছে, এমনকি রঙ্গ-রসিকতাও করছে নিজেদের মধ্যে, কোমরের গেরুয়া রঙা বটুয়া থেকে পান বের করে সুপুরি কেটে তাতে চুন খয়ের ধীরে-সুস্থে লাগিয়ে তার মধ্যে গুণ্ডি দিয়ে জম্পেশ করে পান খাচ্ছে।

ভট্‌কাই-এর মনের কথা বুঝে আমি বললাম, এ সব হচ্ছে অকুপেশানাল হ্যাজার্ডস! বুঝলি! কলকাতায় প্রত্যেকদিন মিনিবাসে এবং প্রাইভেট বাসে চাপা পড়ে কজন লোক মারা যায় তার খবর কি আমরা রাখি? গ্রামের লোকেরাও বাঘের বা চিতার হাতে, বা সাপের কামড়ে যখন মরে, ভালুক বা বুনো শুয়োরের হাতে যখন ক্ষতবিক্ষত হয় তখন 'এ আর কী' গোছের ভাব নিয়ে ঘটনাগুলিকে দেখে।

—হুঁ।

ভট্‌কাই বলল।

—আজই তো তুই মাচাতে বসছিস। মানুষখেকো চিতার অপেক্ষায় মাচায় বসা কম শিকারির ভাগ্যেই ঘটে। আর তোর মেইডেন এক্সপিরিয়েন্সেই তা হয়ে যাবে।

কনগ্রাচুলেশান্‌স।

ভট্‌কাইকে খুব চিন্তিত ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরের আর্থিক অবস্থা এবং তার বাবার এই রকম বীভৎস মৃত্যু তাকে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও বেশি ব্যথিত করেছিল। যুধিষ্ঠিরদের সয়ে গেছে এসব। তার ঠাকুর্দা, তার বাবা এবং সে নিজেও এই জীবনকে নিয়েই খুশি থেকেছে। সুখী হতে যে এর চেয়েও বেশি কিছু দরকার এ সব কথা ভাবার অবকাশই হয়নি ওদের কখনও।

॥ ৪ ॥

বন্দুকধারী লোকটার নাম নন্দ। বয়স হবে চল্লিশ-টল্লিশ। জামাকাপড় দেখলে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন। মানে, যুধিষ্ঠির বা সুঝানি গ্রামের অন্যদের তুলনায়। তাছাড়া যার নিজের বন্দুক আছে, সে গাদা বন্দুকই হোক আর যাই হোক, সুঝানি গ্রামে সে যে বড়লোক, সে বিষয়ে অন্য কারও কোনও সন্দেহ ছিল না।

লোকটা কিন্তু আমাদের খাওয়াল না। যে লোকটা আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাটির ঘরে পাটি পেতে বসতে দিয়ে ঝকঝকে করে মাজা পেতলের থালাতে গরম গরম লাল ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত, কাঁচালঙ্কা কালো-জিরে দিয়ে রাঁধা মসুরের ডাল, কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর কাঁচকলা ভাজা আর কলাই ডালের বড়া ভাজা দিয়ে যত্ন করে খাওয়াল সে কিন্তু সত্যিই খুব গরিব। নন্দরা পয়সা জমাতে জানে। একটা টাকা বাঁচানো মানেই একটা টাকা রোজগার করা। বড়লোকদের মধ্যে অধিকাংশই এই রহস্য জানে এবং মানে। যে খরচ করে এবং নিজের স্বার্থ ছাড়াই খরচ করে, সেই মানুষের পক্ষে বড়লোক হওয়া বড়ই কঠিন।

ঘুমটা বেশ ভালই হয়েছিল। ঘড়িতে যখন সাড়ে তিনটে বাজে তখন বালাবাবু তুলে দিলেন আমাকে। পেতলের ঘটিতে করে চা বানাল কেউ আদা ও এলাচ দিয়ে। সেই চা ভাগাভাগি করে খেয়ে রওনা হলাম আমরা।

নন্দ মহান্তিও সঙ্গে চলেছে তার গাদা বন্দুক এবং একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ সঙ্গে নিয়ে। ঝর্না যেখানে সর্ষেক্ষেতে শুরু সেখানে মিটকুনিয়া গাছে একটা মাচা বাঁধিয়েছে সে। ওখানে পৌঁছে মাচাটা দেখে আমার পছন্দ হল না। জমি থেকে মাত্র দশ ফুট মত ওপরে দুটো বড় ডালের সংযোগস্থলে একটা বাঁশের মোড়াকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যুধিষ্ঠিরও সঙ্গে বসবে পিতৃহন্তার ওপরে প্রতিশোধ নিতে। আমি বারণ করা সত্ত্বেও শোনেনি কিছুতেই। সে নন্দ মহান্তির থেকে একটু পেছনের ডালে নিজেকে ডালের সঙ্গে গামছায় বেঁধে নিয়ে বসবে এবং নন্দ মহান্তির গাদা বন্দুকের ওপরে আলো ফেলবে। যুধিষ্ঠিরের বাড়িতেও বার তিনেক স্টেজ-রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছে তারা। ওরা দুজন পরে মাচায় বসবে। তার আগে বালাবাবু, গ্রামের একজন লোক আর যার বাড়ি আমরা খেলাম সে ঝর্নাতে নেমে এল আমাদের কুসুম গাছের মাচা অবধি পৌঁছে দিতে। বালাবাবু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। মাচাটা বেশ পোক্ত করেই বেঁধেছেন। চারটে কাঠের তক্তা লতা দিয়ে দুটো বড় ডালের সংযোগস্থলে বাঁধা হয়েছে।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ভট্‌কাই যেদিকে খাদ, সেদিকে বসবে। আমি যেদিকে গাছের ডাল পাহাড়ের দিকে, সেদিক। আমার রাইফেলের সঙ্গে ছোট টর্চ ফিট করা আছে ম্যাগাজিনের ওপরে। বুক পকেটে ব্যাটারি থাকে। মোটামুটি নিশানা হয়ে

গেলে রাইফেল-ধরা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টর্চের লাইটিং-মেকানিজম্ ছুঁলেই ব্যাক-সাইট ও ফ্রন্ট-সাইটে আলো পড়বে। পুরো ব্যারেলের ওপরেই পড়বে আলো। ফ্রন্ট-সাইটে রেডিয়াম পয়েন্ট আছে। অন্ধকারেও জ্বলে। আলো পেলে তো জ্বলবেই। তারার আলো এবং চাঁদের আলোতে অসুবিধে নেই। এই রাইফেল দিয়ে গুলি করতে খুবই সুবিধে।

ভট্‌কাইয়ের হাতে যে দোনলা বন্দুক তার সঙ্গে লাগানো ক্ল্যাম্পে তিন ব্যাটারির টর্চ ফিট করা আছে। উইনচেস্টারের টর্চ। এছাড়াও ব্যাগে আছে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। ঐ ব্যাগ দিনে বা রাতে যখনই আমরা শিকারে বেরুই না কেন সবসময়ই সঙ্গে যায়। আর জলের বোতল। ভট্‌কাই মাচায় কতখানি অনড় হয়ে যে বসতে হয় সে সম্বন্ধে অবহিত নয় বলেই জলের বোতল আনা সত্ত্বেও মাচায় বসে জল খাওয়া যে মানা সে কথা ওকে বলেছি। ঘুম ভাঙার পর নন্দ মহান্তিই ওর সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড মাস্টারমশাই বনে গিয়ে শিকারের এবং বিশেষ করে মাচানে বসার অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে।

মাচাতে আমাদের বসিয়ে দিয়ে বালাবাবুরা ফিরে গেছেন দুজনে। হল্লা-গুল্লা করে নয়, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে। রাতটা বালাবাবু ঐ লোকটার বাড়িতেই কাটাবেন। মানুষটা ভারী ভাল। নাম গগনবিহারী। বিকেল বিকেল এক হাঁড়ি মুগডালের খিচুড়িও রেঁধে রেখেছে তার লাজুক বৌ। বালাবাবু এবং তারা তো খাবেই, যদি ফিরে যেতে পারি তবে আমরাও ঐ খেয়েই ঘুমোব। মাচাটার মুখ হয়েছে ঝর্নার যেখানে শুরু, সর্ষেক্ষেতের মাঝে, সেদিকে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার অস্বস্তিকর লেগেছে। ঐ দিকে মুখ করে না বসে যুধিষ্ঠিরের বাবার মৃতদেহ যেখানে আছে সেদিকে মুখ করে বসেছি। ঋজুদা বলেছিল চিতাটার ডান দিক দিয়েই আসার সম্ভাবনা বেশি। আমারও তাই মনে হয়েছিল। ডানদিকে আমি নজর রাখব। ভট্‌কাইকে বলেছি বাঁ দিকটা দেখতে। ঝর্নার বুক বেয়ে চড়াই উঠে আসতে হবে তাকে বাঁদিক দিয়ে এলে। আর ডানদিক দিয়ে এলে উতরাই নেমে। কিন্তু ডানদিক দিয়ে এলে ঝর্নার ফাটলে পৌঁছবার আগেই তো নন্দ মহান্তির গাদা-বন্দুকের গুলি খাবে সে। এবং গুলি তার গায়ে লাগুক আর নাই লাগুক গুলির আওয়াজ হলে পর চিতা যে এ রাতের মত এ তল্লাটে থাকবে তা মনে হয় না।

ভট্‌কাইকে আমি বারবার বলে দিয়েছি যে ভুলেও যেন সে গুলি না করে। অনেকদিন দর্শক থাকতে হয়। তারপরই না হয় শিকারি হবে!

আলো আস্তে আস্তে পড়ে আসছে। পাহাড়ের গায়ে এবং পাহাড়তলি থেকে ময়ূর, বনমুরগি এবং নানারকম পাখি দিনশেষের ডাক ডাকছে। সুঝানি গ্রাম থেকে গাই-বলদের, পোষা মোরগের এবং কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। বাঁদিকে, ভট্‌কাই যেদিকে বসেছে; গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে অনেক দূরে এবং নিচে নদীর একটা বাঁকের একাংশ দেখা যাচ্ছে শুধু।

ঋজুদা এখন কোথায় কে জানে! সারাদিন কী করল? কী খেল? নিনিকুমারীর বাঘের দেখা পেল কিনা কে জানে? ঋজুদাকে এবারের মত সিরিয়াস এবং আপসেট হতে কখনও দেখিনি আগে। নাকি, না-বেরিয়ে-বেরিয়ে ঋজুদার যোগ্যতা এবং দক্ষতা কমে গেছে?

একটা ব্যাপারে খুব ভাল লাগছে। আমাদের কুসুম গাছের থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ। তাতে বাঁদরে ভর্তি। আমরা যখন মাচায় চড়তে আসি তখন

তারা আমাদের দেখে মহা লাফালাফি আর ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন কুসুম গাছের ঘন পাতার আড়ালে অলিভ-গ্রীন রঙের জামা পরে অনড় হয়ে বসে থাকাতে এবং বালাবাবুর গগনবিহারীকে নিয়ে চলে যাওয়া লক্ষ করে তারা এখন চুপ। খুব ভাল হয়েছে। ঝর্না বেয়ে চিতা যদি ওপরে উঠে আসে তবে বাঁদরদের নজর এড়িয়ে আসতে পারবে না। তাছাড়া বাঁদরদের আর গৃহপালিত কুকুরদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে চিতা। চিতাটা যদি কোনো কারণে যুধিষ্ঠিরের বাড়ির দিক দিয়ে আসে তবে গ্রামের কুকুরেরা হয়ত তাকে দেখলেও দেখতে পারে। বা গন্ধ পেতে পারে। কিন্তু মানুষ ধরার পরও সেই মানুষের বাড়ি বেয়ে সে যে কেন আসবে তা জানি না। তাছাড়া দশরথকে মারার পর এতদূর বয়ে নিয়ে এসেও একটুকরো মাংসও যে কেন খেল না এটা ভেবেই ভারী অবাক লাগছে।

একদল হরিয়াল একটু আগে শন্ শন্ করে উড়ে গেল পাহাড়ের মাথার ওপর দিকে। তাদের ঘন সবুজ উড়াল ডানাগুলো যেন মুছে দিল তখনও যেটুকু আলো বাকি ছিল পশ্চিমের আকাশে। পুরো অন্ধকার তখনও হয়নি বাইরে। তবে আমরা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঝর্নার খোলের দহতে বসে আমি এবং কুসুম গাছের ছায়ায়, তাই অন্ধকার নেমে এসেছে এখানে।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। একটা তক্ষক ডাকতে লাগল আমাদের পেছন থেকে। তার দোসর সাড়া দিয়ে বলল, ঠিক ! ঠিক ! ঠিক ! সুঝানি গ্রামের মধ্যে কোনো শিশু অতর্কিতে জোর গলায় কেঁদে উঠল। অর মা তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে কান্না বন্ধ করল বলে মনে হল। যেখানে দিন-দুপুরেই প্রাণ-সংশয় হয় সেখানে রাতে তো কথাই নেই।

সাতটা বাজল। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে আকাশভরা তারা দেখা যাচ্ছে। নানারকম মিশ্র গন্ধ উঠছে রাতের বনের গা থেকে। বাদুড় উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে ডানায় সপ্ সপ্ করে। ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসতে লাগল একটানা পাহাড়তলি থেকে। পাহাড়তলির দিকে তাকিয়েছি, ঠিক সেই সময় বাঁদরগুলো সমস্বরে ডেকে উঠল। ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল পাগলের মতো। খুব আস্তে আস্তে বড় টর্চটা দেখিয়ে দিলাম আমি ভট্‌কাইকে। বলা আছে ওকে যে আমি ওর হাঁটুতে আঙুল ছোঁয়ালে ও টর্চটা জ্বালাবে। যদি আদৌ দরকার হয়। আর ও যদি কিছু দেখে, কোনও নড়াচড়া, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর কোনও স্তূপ তবে ও-ও যেন আমার হাঁটুতে আঙুল ছোঁয়ায়।

উৎকর্ণ উন্মুখ হয়ে ঐ দিকে খুব আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরালাম আমি। না, দেখা কিছুই যাচ্ছে না। সব অন্ধকার। কোনও শব্দও নেই। বাঁদরদের চিৎকার চেঁচামেচি কিন্তু আরও জোর হয়েছে। এমন সময় পাহাড়তলি থেকে একটি কোটরা হরিণ ডেকে উঠল ভয় পেয়ে। খুব জোরে। ব্বাক্ ব্বাক্ ব্বাক্ করে।

হঠাৎই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল কেউ যেন কোনো ভলিবল ড্রপ করাতে করাতে ঝর্নার বুক বেয়ে উঠে আসছে খুব আস্তে আস্তে। শব্দটা একবার ঝর্নার একদিকের দেওয়ালে লাগছে অন্যবার অন্যদিকের। ব্যাপারটা যে কী হতে পারে কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঁদরগুলো এমনই ভয় পেয়েছে যে মনে হচ্ছে ডাল ফস্‌কে দু-একটা পড়েই যাবে নিচে। এদিকে শব্দটাও এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কোনো মাতাল লোক মদটদ খেয়ে এলোমেলো হাতে ভলিবল থাবড়াতে থাবড়াতে এগিয়ে আসছে আমাদের

দিকে।

যুধিষ্ঠিরের বাবা দশরথের মৃতদেহ যেখানে পড়ে আছে সে জায়গাটা পুটুস ঝোপে গভীর অন্ধকার। কিন্তু সে জায়গায় কোনো জানোয়ারকে পৌঁছতে হলে ওপরে ও নিচে হাত দশেক ন্যাড়া জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে। জানোয়ারটা যে কী, তা এখনও বুঝতে পারছি না। কারণ কোনো জানোয়ারেরই চলার এমন হরকৎ সম্বন্ধে আমার কোনরকম অভিজ্ঞতাই ছিল না। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। বিপদের প্রকৃতি জানা হয়ে গেলে আর ভয় থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণই ভয়। ঋজুদা ঠিকই বলে, অজ্ঞতাই ভয়ের জনক।

জানোয়ারটা কুসুম গাছের নিচে চলে এসেছে। বাঘ বা চিতা মড়িতে আসে ভোজবাজির মত। চারচোখ মেলে চেয়ে থাকলেও তারা চোখ এড়িয়ে যায়। জঙ্গলে এত শব্দ করে চলাফেরা করে শুধু শুয়োর আর ভাল্লুক। হরিণ জাতীয়রাও অবশ্য করে। তাহলে এ কোন্ কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার যে মানুষকে মেরে রাতের দুই প্রহর আর সারা দিন ফেলে রেখে এখন এমন করে তাকে খেতে আসছে।

যে জানোয়ারই হোক না কেন, ভেবেছিলাম কিল্-এর কাছে এসে থামবে। আশ্চর্য! দেখি, মড়ি যেখানে আছে সে জায়গাটা পেরিয়ে সে আরও উপরে উঠে গেল। রাইফেলের টর্চ বা ভট্‌কাইয়ের জিম্মাতে রাখা বড় টর্চও জ্বালাতে পারছি না। আলো দেখলেই জানোয়ারটা আর এই তল্লাটে থাকবে না। এক লাফে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আলো জ্বালা যাবে তখনই যখন মোটামুটি নিশানা নেওয়া হয়ে গেছে।

এবার জানোয়ারটার যেন হুঁশ হল। চার পাঁচগজ এগিয়ে গেছিল সে ওপরের দিকে, এবার ফিরল। কিন্তু ফিরল যেন বহু কষ্ট করে। যখন ন্যাড়া জায়গাটুকু সে পেরোয় তখন জানোয়ারটা যে চিতাই সে বিষয়ে অন্ধকারেও আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার চলন দেখেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। ঝর্নার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ঘুরতেই যে তার খুব কষ্ট হল তা বুঝতে পারলাম। তার চলন যেন সুন্দরবনের স্যাঁতস্যাঁতে কাদায় বুকে হেঁটে চলা কুমীরের মত। এবার সে ফিরে আসছে। সহজে গুলি করা যায় এখন। কিন্তু ঋজুদা প্রথমদিন থেকে শিখিয়ে এসেছে, বাঘ বা চিতা তোর দিকে সোজাসুজি মুখ করে থাকলে গুলি না করারই চেষ্টা করিস। অবশ্য নেহাত উপায় না থাকলে অন্য কথা। কারণ হিসেবে বলেছিল যে, গুলি খেয়েই সামনে লাফ মারার প্রবণতা থাকে নাকি তাদের। কিন্তু আমার গুলি খেয়ে চিতা এবং বড় বাঘকেও আমি সোজা ওপরে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকেরই মত লাফিয়ে উঠতে দেখেছি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে তাদের পেটে গুলি লেগেছিল। পরে কখনও ঋজুদার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এখন অন্য কিছুই ভাবার সময় নেই।

চিতাটা যখন পুটুসের ঝোপের কাছে এসে থামল এবং ডানদিকে শরীরটাকে ঘোরালো তখনই আমি খুব আস্তে রাইফেল কাঁধে তুলে সেফ্‌টি-ক্যাচটি নিঃশব্দে "অন্" করে টর্চের মেকানিজম্-এ রাইফেলে রাখা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সামান্য চাপ দিলাম। আলোর ছোট বৃত্ত গিয়ে পড়ল প্রায় বাঘেরই মত বড় মস্ত চিতার পিঠ আর ডান বাহুর সংযোগস্থলে। আর সুইচ টেপার আগেই ট্রিগারের ফাস্ট প্রেসার দিয়েছিলাম। এবারের বাকিটুকু দিলাম তর্জনীর দুই করের মধ্যের নরম অংশ দিয়ে। এক লাফ মেরে চিতাটা ঝর্নার দেয়ালে সোজা গিয়ে ধাক্কা খেলো এবং সম্ভবত আছড়ে পড়ল যুধিষ্ঠিরের বাবা দশরথের মৃতদেহরই ওপরে। ভট্‌কাইকে বলতে হয়নি। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই ও বড়

টর্চটা জ্বেলে ঐখানেই ফেলে রাখল। পুটুসের ঝোপ আন্দোলিত হল কিছুক্ষণ। তারপর অতর্কিত মৃত্যুর আগে অনেক জানোয়ারই যেমন নিজের সঙ্গে নিজে স্বল্পক্ষণ কথা বলে তেমন করে কথা বলল চিতাটা। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

বাঁদরগুলো যে এতক্ষণ সমানে ডেকে যাচ্ছিল তা শোনার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। চিতা স্থির হয়ে এলে বাঁদরদের ডাক মাথা গরম করে দিল। ভট্‌কাই বাঁদরদের বাড়ি, সেই তেঁতুল গাছের দিকে একবার আলোটা ঘুরিয়ে যেন নীরবে বলে দিল আমরা তোমাদের উত্তরসূরি। কেন মিছে গোল করছ?

ঝর্নার ওপর থেকে নন্দ মহান্তি হেঁকে বলল, "কড় আঁইজ্ঞা? গুলি বাজিলা কি?"

অর্থাৎ কি হল স্যার? গুলি কি লাগল?

আমিও চেঁচিয়ে বললাম, "বাজিলা আঁইজ্ঞা। সেঠি টিক্কে রহিকি তেব্বে আসন্তু এঠি।"

মানে ওখানে একটু থেকে তারপরে আসুন।

ভট্‌কাইকে বললাম, তোর বন্দুকের দুটো কার্টিজ ছুঁড়ে মার তো। দেখি সে নড়েচড়ে কিনা!

ভট্‌কাই আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, কনগ্র্যাচুলেশনস্! তোর এলেম আছে।

বললাম, কী করছিস। ছাড় ছাড়।

মনে মনে খুশিই হলাম। বন্ধু যদি বলে এলেম আছে, তবে কার না ভাল লাগে?

দুটো লেথাল বল হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারল ভট্‌কাই চিতাটার গায়ে। তবুও যখন সে নড়ল না তখন উৎসাহে ডগমগ হয়ে ও বলল, নামছি আমি।

আমি বললাম দাঁড়া। আমি আগে নামব। ভুলে যাস না যে আমরা নিনিকুমারীর বাঘের রাজত্বে আছি। এবং সে অক্ষতই আছে।

আমরা নিচে নামতে না নামতেই ওপর থেকে চামড়ার পাম্পশুর খচরমচর শব্দ করতে করতে নন্দ মহান্তি তার গদার মত গাদা বন্দুক উঁচিয়ে নেমে এল। পেছনে পেছনে উৎসাহী যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির অধীর হয়ে বলল, "মু মো বাপ্পকু টিক্কে দেখিবি। মো বাপ্পকু!"

বেচারি যুধিষ্ঠির! বাবার মৃতদেহ আর কীই বা ও দেখবে? দশরথের মৃতদেহের ওপরেই চিতাটা এমনভাবে পড়েছিল যে মৃতদেহটা দেখাই যাচ্ছিল না প্রায়। আমি রাইফেল নিয়ে পাহারাতে দাঁড়ালাম। ভট্‌কাই, নন্দ মহান্তি আর যুধিষ্ঠির চিতাটার লেজ আর পেছনের পা ধরে টেনে সরিয়ে ন্যাড়া জায়গাটাতে চিৎ করে ফেলল। চামড়াও রাতারাতি এখানেই ছাড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিতাটাকে চিৎ করে ফেলার পর ভট্‌কাই তার বড় টর্চ এনে জ্বালতেই আমি চমকে উঠলাম। কী বীভৎস চেহারা! বেচারির দুটি চোখই অন্ধ। শুধু তাইই নয়, সামনের ডানদিকের থাবাটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। মুখে নাকে চোখে রক্ত জমে ভূতের মত দেখাচ্ছে। বেচারির পেটটা একেবারে পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে। খেতে পায় না বহুদিনই। এখন প্রাঞ্জল হল কেন সে দশরথের শব নিয়ে নালায় নামবার সময় পড়ে গেছিল, আর কেনই বা কুমীরের মত এঁকেবেঁকে ধাক্কা খেতে খেতে সে মড়িতে আসছিল।

নন্দ মহান্তি বলল, এ বাঘ তো আমার। প্রথম গুলি তো আমিই করেছিলাম। রক্ত

এখনও লেগে আছে।

আমি কিছু বললাম না। দায়িত্বজ্ঞানহীন নন্দ মহান্তির গাদা বন্দুক দিয়ে মারা কামারবাড়িতে বানানো নানারকম লোহার গুলি চিতাবাঘটার চোখে মুখে পায়ে এবং বুকেও লেগে তাকে একেবারে অসহায় করে তুলেছিল। এই চিতা এবং যুধিষ্ঠিরের বাবার মৃত্যুর জন্যেও নন্দ মহান্তিই দায়ী। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ঠিক করলাম, আমি কিছু বলব না এখন। ঋজুদাকেই বলব কাল। তারপর ঋজুদা এর যে বন্দোবস্ত করার তা করবে। বেচারি যুধিষ্ঠির। চিতাবাঘ উপলক্ষ মাত্র।

গুলির শব্দ শুনে গগনবিহারী ও চার-পাঁচজন লোক হ্যারিকেন লণ্ঠন বর্শা এবং টাঙ্গি নিয়ে এসে হাজির। নিনিকুমারীর বাঘ এ গ্রাম থেকে কোনদিনও মানুষ নেয়নি। আর এই নিরুপায় চিতাটা যে কেন দশরথকে মেরেছিল তাও ওদের বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমি ভাবছিলাম, কতখানি বেপরোয়া এবং ক্ষুধার্ত হলে চিতাটা এরকমভাবে মড়িতে ফেরে। ঝর্নার রেখা ধরে ভট্‌কাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। চিতাটা ঝর্নার নিচ থেকে উঠে আসেনি। পাহাড়ের আধাআধি একটা গুহা আছে। তার সামনে নরম ধুলো। এখন অবশ্য শিশির ভিজে রয়েছে। চিতাটা ঐ গুহাতেই সারা দিন শুয়েছিল। সে যে বুক ঘষে ঘষে এদিকে ওদিকে ধাক্কা খেতে খেতে বেরিয়েছে গুহা থেকে, তার চিহ্নও দেখা গেল। সম্ভবত নন্দ মহান্তির গুলিতে ওর চোখেরই মত কান দুটোও গেছিল নষ্ট হয়ে। নইলে অতটুকু দূর থেকে সে সকালে আমাদের এখানে আসা, দুপুরে মাচা বানানো, বিকেলে এসে মাচায় বসা—এই সবই দেখতে বা শুনতে পেত।

ভট্‌কাই খুব বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করল একটা। বলল, এই যদি তার অবস্থা, এতই যদি তার ক্ষিদে তবে যুধিষ্ঠিরের বাবাকে ধরে সর্ষে ক্ষেতে এসে খেল না কেন?

আমি বললাম বাঃ। দারুণ প্রশ্ন। তারপর বললাম, সংস্কার। সংস্কার আর অভ্যাসের বশে, জন্মগত সাবধানতার অভ্যাসের বশে মড়ি নিয়ে আসছিল লুকিয়ে রাখা এবং লুকিয়ে খাবার মত জায়গায়। কিন্তু ঝর্নার মুখ থেকে এই তিরিশ চল্লিশ ফিট দশরথকে সুদ্ধ নিয়ে পড়ে যাওয়ায়, আমার মনে হয় ওর নতুন করে চোট লেগেছিল। পুরনো ক্ষতর মুখগুলো সব খুলে গেছিল নতুন করে। রক্তক্ষরণও হয়েছিল। তাছাড়া গাদা বন্দুকের লোহাগুলো তার মস্তিষ্কের মধ্যে কী ঘটিয়েছিল তাই বা কে জানে। বোঝাই যাচ্ছে যে পুরোপুরি 'ডেজ্‌ড' রাহুগ্রস্ত অবস্থায় ছিল বেচারি। কী করছে, কোথায় যাচ্ছে কিছুই বোঝার মত মানসিক অবস্থাও ওর ছিল না। চোখ কান হাতের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

ভট্‌কাই বলল, সারা দিনের মধ্যে তো ও এসে খেতে পারত। খেল না কেন?

তাও হয়ত সংস্কার। চিতারা শিকার ধরে রাতে। খায়ও রাতে। দিন রাতের তফাতটা বোঝার মত কোনো ক্ষমতা ওর নিশ্চয়ই ছিল।

ফিরে গিয়ে দেখি নন্দ মহান্তি মহা সমারোহে তার চিতার চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি ভট্‌কাই আর গগনবিহারী এবং অন্য একজনকে নিয়ে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এবং টাঙ্গি দিয়ে কেটে ঝর্নার একটু নিচে একটু সমতল জায়গাতে যুধিষ্ঠিরের বাবার চিতা সাজালাম।

চিতায় আগুন ধরাবার সময় যুধিষ্ঠির একবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আমি ওকে হাত ধরে নিয়ে এসে পাথরে আমার পাশে বসালাম। ভট্‌কাই একমুঠো লাল আর হলুদ পুটুস ফুল ছিঁড়ে এনে চিতায় দিল। হু হু করে চিতা জ্বলতে লাগল। পুটপাট করে আগুন

নিজের মনে নিজের কথা বকতে লাগল। সেই কথার তোড়ে নন্দ মহান্তির দম্ভভরা প্রলাপ চাপা পড়ে গেল।

ঋজুদাকে বলে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে লোকটার বন্দুকটা বাজেয়াপ্ত করাতে হবে আর যুধিষ্ঠিরকে জমি টমি ক্ষতিপূরণ দেওয়াবার ব্যবস্থাও করতে হবে। নন্দ মহান্তির টাকাকড়ি তো কিছু কম নেই। সেই তো আসল খুনী ! আসলে খুন করেছে দশরথকে। চিতাটা উপলক্ষ মাত্র। বেচারি দশরথ ! বেচারি চিতা !

ঋজুদা কন্‌সর-এর শাখা নদীর ধারে একটা বড় পাথরের উপরে শুয়েছিল মুখের উপর টুপি চাপা দিয়ে। বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। জিপটা কাছাকাছি যেতেই উঠে বসল। মুখময় দু'দিনের দাড়িতে গালটা সবুজ দেখাচ্ছিল। নাকের নিচটাও।

আমরা জিপ থেকে নামতেই বলল, হ্যালো মিস্টার ভট্‌কাই। কেমন লাগলো প্রথম রাত মাচাতে ?

ভট্‌কাই সকাল থেকেই উত্তেজিত হয়েছিল। উত্তেজনা চরমে ওঠায় তুতুলে বলল দা-দা-দা-রুণ।

বাঃ। ফাস্টক্লাস। এমনি করেই হবে। মাউন্টেনীয়াররা কি বলেন জানিস ? কখনও পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাতে নেই। নিচে দাঁড়িয়ে পবর্তশৃঙ্গে তাকালে মনে হয় ওখানে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়। কেউ তাকানও না তাঁরা। পরের পাটি কোথায় ফেলবেন শুধু সেদিকেই নজর যাবে তাঁদের এমনি করেই এবং পায়ের পর পা ফেলে একসময় তাঁরা শৃঙ্গে পৌঁছন। তোরও হবে। রুদ্র পারে, তিতির পারে, আর তুই পারবি না কেন ? তবে সবকিছুই পারার আগে শিক্ষানবিশ থাকতে হবে। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন সেই শিক্ষানবিশীর সময়কাল। এইটা মনে রাখলেই হবে। তারপর বলল, নে, এখন উঠে পড় জিপে। সোজা কুচিলাখাঁই পাহাড়ের নিচের বাংলোতে যাবো আমরা। ভাল করে চান করে জমিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ঘুম।

জিপে উঠতে উঠতে ভট্‌কাই বলল, কতক্ষণ ?

যতক্ষণ না ভাঙে।

ফার্স্টক্লাস !

ভট্‌কাই বলল, রাত-জাগা চোখ ছোট করে।

ঋজুদা বলল, তোদের ব্যাপারটা কি হল ?

আমি বললাম বিস্তারিত।

ভট্‌কাই বলল, আর নিনিকুমারীর বাঘ ?

আছে।

দেখা হল ?

দূর থেকে।

তারপর ?

পরে। ঘুমভেঙে উঠে পাইপে আচ্ছা করে তামাক ঠুকে বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করে ধোঁয়া দিয়ে তারপর তাকে কব্জা করার বুদ্ধি বের করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং !

বাংলোয় পৌঁছে চান করে ফেনাভাত, ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ আর খাঁটি গাওয়া-ঘি দিয়ে পেট পুরে খেয়ে আমরা সকলেই ঘুম লাগিয়েছিলাম। ফেনাভাতটা জব্বর রেঁধেছিল জগবন্ধুদাদা।

ঘুম যখন ভাঙল তখন শেষ বিকেল। ময়ূর ডাকছে, মুরগী ডাকছে, কুচিলা-খাঁইরা ঘুমোতে যাবার আগে শেষ রাউন্ড ঝগড়া করে নিচ্ছে।

ভট্‌কাই তখনও ঘুমোচ্ছিল। বিকেল হলেই ঝপ করে শীত বেড়ে যায়। ওর কম্বলটা সরে গেছিল কাঁধ থেকে। কম্বলটাকে ভাল করে গুঁজে দিয়ে আমি বারান্দায় এলাম। দেখি ঋজুদা রাইফেল পরিষ্কার করছে চায়ের কাপ পাশে রেখে। আমি সকালে ফিরেই করেছিলাম। ঋজুদাও সবসময় তাই করে। এক রাউণ্ড ফায়ার করলেও করে। বুঝলাম, খুবই ক্লান্ত ছিল। সেজন্যেই পারেনি।

চা খাবি না?

বলে আসছি—জগবন্ধুদাদাকে।

ভট্‌কাইকেও তুলে দে। ওর জন্যেও চা দিতে বলে আয় গিয়ে।

আমরা যখন আবার এলাম বারান্দাতে বেলা প্রায় মরে এসেছে। বাংলোয় হাতাতে বড় বড় ঘাসের গায়ে বার্কিং-ডিয়ারের গায়ের রঙের মত সোনালি নরম রোদ এসে লেগেছে। পাখিদের কলকাকলীতে ভরে উঠেছে চারদিক। এক জোড়া লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিল্ (ভালিয়া-খাঁই) গ্লাইডিং করে ভেসে যেতে যেতে কুচিলা খাঁই পাহাড়ের বুকের ভাঁজে হারিয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, চল্ ভেতরে গিয়ে বসি। দরজাটা বন্ধ করে দিস রে ভট্‌কাই। খিল তুলে দিস।

তোমাকে বলতে হত না। যে কাণ্ড চিতায় ঘটাল তা জানার পর নিনিকুমারীর বাঘকে আর বিশ্বাস করি!

হো হো করে হেসে উঠল ঋজুদা।

বলল, অ্যাই তো জ্ঞানচক্ষু খুলছে আস্তে আস্তে।

ভট্‌কাই বলল, আমরা তোমাকে নদীর পারে ছেড়ে যাবার পর কী হল বল ঋজুদা।

তা শোনার আগে রাতে খাওয়া দাওয়ার কি হবে একটু দেখেশুনে আয়। কী খাবি, না বললে হয়ত "বরাদ্দ" হয়নি বলে কিছুই না রেঁধেই বসে থাকবে বশংবদ জগবন্ধু। বশংবদ হওয়া ভাল কিন্তু এতখানি বাবুমুখাপেক্ষী হওয়া আবার খারাপ। কী বলিস?

বলতে বলতে জগবন্ধুদা এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

ঋজুদা বলল, ভাল্ব হেব্বা। রাতবেল্বে খাইবা-পিবা পাঁই কঁড় করিবা?

আপনমানে যা কহিবে আইজ্ঞাঁ।

ঘরু অছি কঁড়?

সব্বু অছি। নাই কঁড়? কুকুড়া অছি, ডিম্ব অছি, অমৃতভাণ্ড অছি, আলু পিঁয়াজ। আউ ক্ষীরভি অছি। দুই ঢাব্ব ক্ষীর পঠাই দেইথ্‌লে বিশ্বল সাহেব।

ক্ষীর খাব! ক্ষীর! বলে, মহা আবদারে নড়েচড়ে বসল ভট্‌কাই।

ঋজুদা হেসে ফেলল ভট্‌কাই-এর কথা শুনে।

ভট্‌কাই লজ্জিত হয়ে বলল, হাসছ যে!

ঋজুদা বললো, ক্ষীরের পুতুল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ওড়িয়াতে দুধকেই বলে ক্ষীর।

তাই?

অবাক হয়ে বলল ভট্‌কাই। এখানে ঢালে করে দুধ পাঠানো বিশ্বল সাহেব তাহলে বল্লমে বেঁধে কি পাঠান দেখা যাক। ওরে বোকাটা। ঢাল নয়। ওড়িয়াতে ঢাব্ব মানে

ঘটি। হিন্দি, লোটা। বুঝলি ?

"অ।" তাই বলো! আমি ভাবি, ঢালে করে ক্ষীর পাঠানোই বুঝি শিকার-গড় রাজ্যের কায়দার মধ্যে পড়ে।

এখন খাবি কি তা বলেছো ? সিম্পল পদ। জগবন্ধু বেচারিরও তো আমি না ফেরায় চিন্তায় চিন্তায় দু' রাত ঘুম হয়নি। স্বয়ং পালের গোদাকে ম্যানইটার ইট করে কিনা সে তো চিন্তারই কথা!

ভট্‌কাই বলল, কুক্কুড়া মানে কি কুকুর ?

ঋজুদা বলল, এবারে তুই ফাজলামি করছিস। সংস্কৃত 'কুক্কুট' শব্দের মানে জানিস তো ?

সংস্কৃতে পাঁচ নম্বর পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সংস্কৃতর কথা আমাকে বোলো না।

নর নরৌ নরাঃ, মর মরৌ মরাঃ!

ভট্‌কাই মাথা নিচু করে বলল।

তুই ছেড়ে দেওয়াতে মহাকবি কালিদাসের ভাষার ক্ষতি কিছুই হয়নি। কুক্কুট মানে মুরগী। সে কুক্কুট থেকেই কুক্কুড়া। ওড়িয়া তদ্ভব শব্দ।

তাহলে কুক্কুড়ার ঝোল আর ধান্যই হোক।

আমরা আবারও হেসে ফেললাম। আমি বললাম, ভাতকে ওড়িয়াতে ভাত্বই বলে।

তাছাড়া ধান্য কি ভাত ?

মান্য করলেই ভাত।

ভট্‌কাই বলল।

সঙ্গে একটু আলুভাজাও হবে নাকি রে রুদ্র ?

হোক। আমি বললাম।

ভট্‌কাই বলল তার সঙ্গে একটু পেঁয়াজকলি ভাজা হলেও মন্দ হত না।

ঋজুদা বলল, দুধ যখন আছে এবং ভট্‌কাই যখন ক্ষীরের এত ভক্ত তখন দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীরও করতে বলে দিচ্ছি।

বরাদ্দ হেব্বা। এর্ব্বে যাইকি চঞ্চল রান্ধিবা। বুঝিলে জগবন্ধু ?

হ্ আইজ্ঞা।

বলে জগবন্ধু চলে যাচ্ছিল।

ঋজুদা পিছু ডেকে বলল, বেশি করে কোরো জগবন্ধু যাতে বালাবাবুর, তোমার ও আমাদের সকলেরই পেট ভরে। বালাবাবু করছেন কি ?

বালাবাবু শুই পড়িলানি।

খাইবার টাইমরে ডাকিবা তাংকু।

আইজ্ঞা।

ভট্‌কাই বলল, ওড়িয়া ভাষাটা ভারী মিষ্টি। তাছাড়া বাংলার সঙ্গে তফাতও বেশি নেই।

নেই-ই তো। ওড়িয়া ভাষাই শুধু নয়, ওড়িয়া মানুষরাও খুব মিষ্টি। ভদ্র, শিষ্ট, প্রকৃত বিনয়ী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন।

বাঙালীরা ওড়িয়া বলতে পারে না অথচ প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ওড়িয়া বাংলা পড়তে তো পারেনই, বলতেও পারেন বাঙালীদেরই মত।

আমি বললাম।

সেটা ওঁদের গুণ। আমাদের দোষ। বাঙালীদের যে কতগুলো ফালতু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে না, সেই কমপ্লেক্স-এর জন্যেই জাতটা ডুবতে বসল। আমাদের মত এমন উদার জাত যেমন কম, তেমন এমন কূপমণ্ডুক জাতও নেই।

ঋজুদা বলল।

এটা আবার কি শব্দ বললে ঋজুদা ? কূপমণ্ডুক ? এটাও কি ওড়িয়া শব্দ।

ভট্‌কাই বলল।

তোকে নিয়ে মুশকিলেই পড়লাম রে মহামূর্খ।

ঋজুদা হাসতে হাসতে বলল।

তারপর বলল, কূপমণ্ডুক সংস্কৃত শব্দ। কূপ মানে কুঁয়ো। আর মণ্ডুক হল ব্যাঙ। মানে, কুঁয়োর ব্যাঙ। কুঁয়োর মধ্যে থেকে যেটুকু আকাশ দেখা যায় সেইটুকুই তার পৃথিবী। তার বাইরেও যে কিছু আছে এ কথা সে ধারণাতেও আনতে পারে না।

তা বললে হবে কেন ? বাঙালীরা যত বাইরে যায় প্রতি বছর, ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যের লোকে যায় না। কি ? যায় ?

ভট্‌কাই বলল।

তা ঠিক। তবে শারীরিকভাবে বাইরে গিয়ে তীর্থস্থান বা সুন্দর সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলেই তো হবে না, নিজেদের মনে অন্যদের সম্বন্ধে সত্যিকারের ঔৎসুক্য জাগাতে তো হবে। বেড়াবার আসল লক্ষ্য সেটাই হওয়া উচিত। আসলে, তুই যাই বলিস আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ঔৎসুক্য কিছুই রাখি না, আর রাখি না বলেই আজ আমাদের এত দুরবস্থা।

ভট্‌কাই বলল, এবারে বলো ঋজুদা।

ঋজুদা বলল, তোরা তো আমাকে নামিয়ে চলে গেলি। আমিও ধীরে সুস্থে পায়ের দাগ দেখে এগোলাম। যতই এগুতে থাকি বন ততই নিবিড় হয়। কী বলব তোদের, এত জঙ্গলে ঘুরলাম, এরকম জঙ্গল দেখিনি। মাইলখানেক শুধুই চাঁর গাছ। মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। পুরো জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর গন্ধ চারিদিকে। কখনও আস্তে আস্তে উঠে গেছে জমি, কখনও নেমে গেছে। পাহাড়ের মতন নয়, শাড়ির ভাঁজের মত। চাঁর গাছের জঙ্গল পেরনোর পরই একেবারে উদোম টাঁড়। আর তার মধ্যে মধ্যে কালো টিলা। টিলাও বলব না, অনেকটা, বুঝলি রুদ্র, আফ্রিকার কোপ্‌জের মত। ঐ টাঁড়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবার পর আর বাঘের পায়ের দাগ পেলাম না। যেন মন্ত্রবলে মুছে দিয়েছে কেউ। টাঁড়ের অন্য প্রান্তে কোনো গ্রাম আছে বলে মনে হল। কারণ দূরে সরষেক্ষেত দেখা যাচ্ছিল। হলুদ প্যাস্টেল-কালারে কেউ যেন ছবি এঁকেছে। এই সময়ে সরষে গাছে ফুল আসার কথা নয়। অবাক লাগল দেখে। সারা রাত ঘুমোইনি। চোখে ভুল দেখছি কি না কে জানে! নিজেকেই বললাম। তারপর ঠিক করলাম একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা লাগবে। ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর টাঁড় পেরিয়ে ওদিকের জনপদের দিকে যাওয়া যাবে ধীরে-সুস্থে। তখনও সামনে সারা দিন পড়ে আছে। জুতো দু'পাটি নিচে খুলে রেখে মোজা পায়ে একটা মস্ত চাঁর গাছে উঠে দুটো কেঁদো ডালের মধ্যে ইজিচেয়ারের মত জায়গা দেখে ডালের একটি খোঁচাতে স্লিংসুদ্ধ রাইফেল আর টুপিটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে আরামে গাছের ডালের খোঁদলে পিঠ দিয়ে লম্বা হলাম। রোদ এসে পড়েছিল গায়ে, পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে। আরামে চোখ বুঁজে এল। অনেক ঘুম জমেছিল চোখের পাতায়।

যদি পড়ে যেতে ?

রসভঙ্গ করে ভট্‌কাই বলল।

পড়তাম না রে। গাছে একবার ঘুমনো রপ্ত করলে তোর আর বিছানাতে শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছেই করবে না!

আমি বললাম, তারপর ?

তারপর যা হল, বললে হয়ত তোরা বিশ্বাস করবি না। আমার নিজেরও এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী হল বল না!

ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা পড়ে এসেছে। আমার কোনও তাড়া ছিল না। বিশেষ কিছু করারও ছিল না। এদিকে এসেছিলাম বাঘের 'বিট' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে। বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা যে হবে তা আদৌ ভাবিনি। সে কারণেই হয়ত অমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

উঠে বসে সামনে তাকিয়ে যা দেখলাম তা এককথায় অপূর্ব। বছরের এই সময়ে ঝড় বৃষ্টি হয়ই না বলতে গেলে। কিন্তু ঘনমেঘে পুবের আকাশ ঢাকা। তখনই যেন সন্ধে নেমে এসেছে। মাঝে মাঝে কড়কড় শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর সেই দিনমানের মেঘ অন্ধকার আর বিদ্যুৎ হলুদ সর্ষেক্ষেতের উপরে যে কী চমৎকার এক ছবির সৃষ্টি করেছে তা কী বলব! অত মেঘ কিন্তু শিগগির যে বৃষ্টি হবে তা মনে হচ্ছে না। শিরশির করে হাওয়া দিচ্ছে। এক দল তিতির টাঁড় থেকে চরতে চরতে বেরিয়ে এসে একটি 'কোপজে'-এর আড়ালে চলে গেল। কালি তিতির বা ব্ল্যাক পাট্রিজ ডাকতে লাগল একটি 'কোপজে'-এর ওপার থেকে। একঝাঁক হরিয়াল উড়ে এল চাঁর বনে। হয়ত রাত কাটাবে বলে। মোহিত হয়ে বসে প্রকৃতির ঐ অপূর্ব সাজ দেখতে দেখতে আমার হঠাৎ আবার হাই উঠতে লাগল। কে যেন জোর করে আমাকে ঘুম পাড়াতে লাগল। সারা দিন ঘুমোবার পরও যখন আমার একটুও ঘুম আসার কথা নয় তখনই ঘুমে আমার দু' চোখের পাতা একেবারে বুঁজে এল। গাছ থেকে নেমে নদীতে মুখ ধুয়ে যে টাঁড়ের দিকে যাব, সে ইচ্ছেও অচিরেই উবে গেল।

—তারপর ? ভট্‌কাই বলল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ঋজুদা। পাইপ খেল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। চাঁর গাছেদের তলায় গাঢ় গভীর অন্ধকার। বালির উপরে উপরে নদী বয়ে যাবার ফিসফিস শব্দ রাত নামাতে জোর হয়েছে এখন। প্রথমে ঘুম ভেঙে আমি কোথায় আছি, কী করছি তা মনেই করতে পারলাম না কিছুক্ষণ। শুনেছি, মানুষ বুড়ো হলে এরকম হয়। কিন্তু বুড়ো হওয়ার তো দেরী আছে এখনও অনেক। কিছুক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পর সবে ঘুম ভাঙা চোখে অন্ধকার বেশ খানিকটা সয়ে এল। পশ্চিমাকাশে সবজে নীল আগুনের বড় টিপের মত শান্ত হয়ে জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারা। মেঘ কেটে গেছে কখন কে জানে। দূরের সর্ষেক্ষেত আর টাঁড়ের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে আসছে। অথচ সেটা পুব দিক। বছরের এই সময়ে নির্মেঘ আকাশ আর পরিষ্কার আবহাওয়ায় পুবদিক থেকে হাওয়া আসাটা খুবই আশ্চর্যের। কিন্তু যেদিক দিয়েই আসুক না কেন শীত করতে লাগল বেশ। এদিকে ওদিকে ছড়ানো জড় পদার্থ কোপজেগুলোর মধ্যের ফাঁক-ফোকর-গুহায় এখন প্রাণ জেগে উঠছে। নানারকম রাত পাখির ডানা ঝাপটানো,

অস্ফুট মৃদু এবং তীব্র স্বর, টাঁড়ের জমিতে ইঁদুর খরগোসের দৌড়াদৌড়ির শব্দ মিলে মিশে রাতের শব্দমঞ্জরী রাধাচূড়ার স্তবকের মত দুলছে কানের কাছে। তার একটু পরই প্রায় আমার গাছের নিচেই হাড়-কামড়ানোর কড়কড়-কটাং আওয়াজে ভীষণ চমকে উঠলাম আমি। নিচটা এতই অন্ধকার যে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে বাঘে বা চিতায় কোনো কিছু খাচ্ছে। এই চাঁরবনে শম্বরদের দলটা কাল ঢুকেছিল বটে, কিন্তু আমি এখানে ঐ দলটা ছাড়াও গেম-ট্র্যাকে বাঘের এবং এক জোড়া কোট্‌রার পায়ের দাগ দেখেছি।

জার্কিনের জিপ টেনে দিয়ে কলার তুলে দিলাম নিঃশব্দে। তারপর টুপি আর রাইফেলটা গাছের খোঁচ থেকে নিতে গিয়ে নিলাম না। ব্যাপারটা যে কি তা আগে না বুঝে নড়াচড়া করাটা ঠিক হবে না। টর্চ জ্বালতে পারছি না, যদি নিনিকুমারীর বাঘ হয়? কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। এবং এবারে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর জানোয়ারের অবয়বও দেখতে পেলাম। বেশ বড়। নড়াচড়ার কায়দা দেখে মনে হল বাঘ। কিন্তু কোন্ বাঘ?

সামান্যক্ষণ ভেবে নিয়ে ঠিক করলাম যে বাঘই হোক নিনিকুমারীর বাঘের রাজত্বে একটি নিরপরাধ বাঘকে মেরে ফেললেও যেমন গর্হিত অপরাধ হবে না যদি বাঘের পেটে যাওয়া হতভাগ্য মানুষদের সংখ্যার কথা মনে রাখি।

খুব আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে গাছের খোঁচ থেকে টুপি এবং রাইফেলটাকে নিলাম। টুপিটা মাথায় দিয়ে কান অবধি টেনে নামিয়ে দিলাম। তারপর রাইফেলটাকে খুব আস্তে আস্তে দু-হাতে ঘুরিয়ে বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে আনলাম। বাঘটা কী খাচ্ছে জানি না। তবে আওয়াজ শুনে মনে হল ছোট কোনো জানোয়ার। এ জানোয়ারের শরীরে মাংস কম। যে জানোয়ারই হোক বাঘ একে কিছুক্ষণ আগেই ধরেছে। গতকালের মড়ি হলে পচা দুর্গন্ধ বেরত।

জার্কিনের পকেটে টর্চ ছিল। কিন্তু টর্চ জ্বালাবার জো ছিল না। রাইফেলের ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো পেনসিল টর্চের সুইচ ছিল ব্যারেলের সমান্তরালে লাগানো পাতলা লোহার পাতে। রাইফেলটার নলকে অন্ধকারেই যথাসম্ভব টার্গেটের দিকে ঘুরিয়ে নিশানা নিয়ে তর্জনী দিয়ে ফার্স্ট-প্রেসার দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের মাথা ছুঁইয়ে টর্চের লোহার পাতের সুইচে চাপ দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড প্রেসার দিলাম ট্রিগারে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাইফেলের আওয়াজ বাজপড়ার আওয়াজের মত শোনাল এবং এই চাঁর জঙ্গলে এবং সামনের টাঁড়ে যে কতরকম পাখির বাস তা বোঝা গেল তাদের সম্মিলিত চিৎকারে। ট্রিগারে সেকেন্ড প্রেসার দেওয়ার সময়ে ঐ ক্ষীণ আলোতে বাঘকে দেখেছিলাম এক ঝলক। তাড়াতাড়ি রাইফেলটা কোলে শুইয়ে জার্কিনের পকেট থেকে টর্চ বের করে এবারে নিচে আলো ফেললাম। দেখি বাঘ নেই। একটি যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে। তার গালের একদিক, সেদিকের চোখ এবং নাকটি খেয়েছে বাঘে। পাছার মাংস। কান এবং শরীরের অন্যান্য নরম জায়গাগুলো। একটি পা। রক্তে আর লাল ধুলোয় মাখামাখি ফর্সা মরা মানুষটাকে বীভৎস দেখাচ্ছে। থুতনি ঠোঁট খেয়ে নিয়েছে বলে দাঁতের পাটি দুটিকে মনে হচ্ছে কঙ্কালের দাঁত বুঝি। মড়ি আছে কিন্তু বাঘ নেই। আমার গুলি বাঘকে মিস করে যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখানে একটি খোঁদল হয়ে গেছে। সফ্ট-নোজ্‌ড গুলি। খাব্‌লা খাব্‌লা ধুলো তখনও বাষ্পের মত উড়ছে সেই খোঁদলের ওপর, কিন্তু বাঘ নেই।

বাঘ নেই এবং বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি জেনেই আমি সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে রাইফেলটার কুঁদো আর ম্যাগাজিনের সংযোগস্থলে ভালবাসায় পোষা প্রিয় কুকুরের ঘাড়ে যেমন আদরের হাত রাখে তার মালিক তেমনই আদরে আর বিশ্বাসে হাত রাখলাম। দুটো চোখ, দুটো কান আর নাকের দুটো ফুটো দিয়ে যতকিছু দেখা, শোনা ও শোঁকা সম্ভব তাই দেখার শোনার ও গন্ধ নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু রাত নীরব। গাছের নিচের সুন্দর ধবধবে ফর্সা মৃত যুবকের মতই গা ছম্‌ছম্‌ করা নীরব। গুলির শব্দর প্রতিধ্বনি দীর্ঘ চাঁর গাছেদের আর "কোপজে"দের আর হুহু-হাওয়া টাঁড়ে ল্যাব্রাডর গান-ডগ্‌-এর মত দৌড়ে বেড়িয়ে এখন থেমে গেছে।

আধঘণ্টা কেটে গেল। কোনো শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই কোথাওই।

আধঘণ্টা যে কেটে গেছে তা ঘড়ি দেখে বুঝিনি। আন্দাজে বুঝেছি। নিশ্চল হয়ে বসে অন্ধকার বনে সময়ের জ্ঞান থাকে না যেমন থাকে না হাইওয়েতে জোর গাড়ি চালালে গাড়ির বাইরে তাকিয়ে গতিবেগের। তাই অভিজ্ঞরা বলেন রাতের জঙ্গলে ঘড়ি এবং হাইওয়েতে স্পীডোমিটারে চোখ রেখে চলতে হয় সবসময়।

হঠাৎ একঝাঁক শকুন উড়ে এল টাঁড়ের দিক থেকে। রাতের বেলা শকুন ফাঁকা জায়গা এবং দিনমানে খেতে শুরু করা মড়ির উপরে ছাড়া দেখিনি কখনও আগে। বড় বড় ডানায় সপ্‌ সপ্‌ ভুতুড়ে আওয়াজ করে তারা মড়ির উপরে না পড়ে আমি যে গাছে বসেছিলাম তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। ওদের বড় বড় ডানা নেড়ে স্বচ্ছন্দে ওড়ার মত জায়গা ছিল না সেখানে তবু ওরা যেন দুঃস্বপ্নের শকুন, কোনো বাধাই ওদের কাছে যেন বাধা নয়, এমনি করে উড়তে লাগল। আমার সত্যি ভীষণ ভয় করতে লাগল। হিচকক্‌-এর "দ্য বার্ডস" বলে একটা ছবি দেখেছিলাম অনেকদিন আগে। দেখার পর বহুদিন ঘুমোতে পারিনি রাতে ভাল করে। সেই ছবিটির কথা মনে এল। কিছুক্ষণ আমাকে ভয় দেখিয়ে তারা ফিরে গেল।

তারপরই হায়না ডেকে উঠল টাঁড়ের দিক থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হুঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে।

হায়নার ডাক তো জীবনে প্রথম শুনলাম না। কিন্তু কেন যেন ভয়ে গা ছমছম করে উঠল। তারপরই মনে হল বাঘটা ফিরে এসে আবার খাওয়া শুরু করেছে। খাওয়ার শব্দও কানে এল। গুলি করার পরও মানুষখেকো বাঘ মড়িতে ফিরে এল ? কী রকম !

একমুহূর্ত ভেবে আমি আবার রাইফেল তুললাম ফার্স্ট-প্রেসার দিতে দিতে এবং সেই কালো মূর্তির ঘাড় আর বুকের সংযোগস্থলে নিশানা নিয়ে সুইচে আঙুল ছুঁইয়ে দেখে নিয়েই চকিতে গুলি করলাম। রাইফেল ফেলে রেখে, বড় টর্চ জ্বালাতেই দেখি বাঘ নেই। আগের গুলিটি যেখানে লেগেছিল তারই পাশে আর একটি খোদলের সৃষ্টি হয়েছে। বাঘ ধারে কাছে কোথাওই নেই। গুলির শব্দর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই কলকাকলীর ঐকতান। প্রতিধ্বনি, শিকারি কুকুরের মত আবার দৌড়াদৌড়ি। তারপরই গ্রামের নদীপারের শ্মশানেরই মত নিস্তব্ধতা। শকুন-শিশুর বুক চমকানো চিৎকারে যে নিস্তব্ধতা চমকে চমকে ওঠে শুধু।

তারপর ?

ভট্‌কাই বলল।

তারপর আরও আধঘণ্টা চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর আবার মনে হল বাঘ ফিরে এসেছে। মনে হল না, সত্যিই এসেছে। এবারে একটু সময় দিলাম তাকে। অন্ধকারে যখন তার অন্ধকারতর চেহারা বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছি তখন আবার রাইফেল তুললাম। মাত্র

পনের-ষোল ফিট উপর থেকে যে শিকারী পরপর ছ'বার প্রায়-অনড় হয়ে থাকা বাঘের মত বিরাট জানোয়ারের গায়ে গুলি লাগাতে না পারেন তাঁর শিকার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, বাঘের গায়ে গুলি লাগাতে যতটা মার্কসম্যানশিপ-এর দরকার হয় তার চেয়ে বেশি দরকার হয় সাহসের। তোমার একথা মানিনা তাই আমি।

তারপর কী হল ? ভট্কাই আবার শুধোলো।

রাইফেল তুলেছি, নিশানা নিয়েছি। আলোটা টিপতে যাব। আলোটার কোনো দোষ ছিল না, রাইফেলের ব্যাক সাইডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফ্রন্ট সাইডের রেডিয়ামে লাগলে টার্গেট পরিষ্কার দেখাচ্ছে সে বারবারই নির্ভুলভাবেই। দোষ হচ্ছে অন্য কিছুর। শিকারীরই। আলোটা জ্বালতে যাব বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে ঠিক সেই সময়েই একটা মস্ত বাদুড় ঝপ করে উড়ে এসে আমার মাথার টুপির উপরের দিকে ঠোকর মেরে একগাদা বদগন্ধ ছড়িয়ে চলে গেল এবং ততক্ষণে ঐ ঝামেলাতে আমার রাইফেলের ব্যারেল অনেকটাই উঁচু হয়ে যাওয়ায় গুলিটা সামনের গাছে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল কোলে নামিয়ে বড় টর্চটা জ্বাললাম।

তারপর ?

তারপর আর কি ? এমনি করেই রাইফেলের ব্যারেল ও ম্যাগাজিনের যে কটি গুলি পোরা ছিল তা শেষ হয়ে গেল। তখন আমি সত্যি ভয় পেয়েছি। মন বলছে ও বাঘের পিছনে ঘুরে কাজ নেই। আমার অবস্থাও বহু অন্য শিকারীদের মতই হবে। তাছাড়া তোদের দুজনকেই কাল ভোরেই কলকাতা ফেরত পাঠাব। এ বাঘ সত্যিই ঠাকুরানীর বাঘ। জিম-করবেট্-এর টেম্পল-টাইগারের মত। শিকার-গড়-এর দেবী এঁকে কোনো আশীর্বাদে অমর করে দিয়েছেন।

তারপর ? আমি বললাম।

ভোররাতে বোধহয় অজানিতেই ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। গাছের ডালে প্রথম ভোরের পাখিদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। তখনও আলো ফোটেনি।

সকাল হবার পরে কি দেখলে ?

সকাল চিরদিনই বনে জঙ্গলে সব অবিশ্বাস, ভয়, কুসংস্কার, আড়ষ্টতা ভেঙে দেয়। যেই ভোরে একটু করে আলো ফুটতে থাকে তারপর সেই আলো ক্রমশই ছড়িয়ে যেতে থাকে, তীব্রতর হতে থাকে, মনের ওপর থেকে সবরকম আচ্ছন্নতা কুয়াশারই মত কেটে যেতে থাকে। আলো একটু স্পষ্ট হলে, যখন নদীর জল দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে চারপাশ তখন আমি খুব সাবধানে নামলাম। বেশি সাবধানতার দরকার ছিল এইজন্যে যে রাইফেলে আর গুলি ছিল না একটিও। গাছতলায় নেমে চারদিক তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে, যেখানে মড়ি পড়েছিল, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। নীল রঙের বড় বড় মাছি পড়েছে তাতে। তারা সংখ্যায় এত এবং এত জোরে ডানা ভন্-ভন্ করছে যে মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে আসা কোনো ছোট প্রপেলার প্লেনের শব্দ শুনছি। মড়ির গায়ে ছিটেফোটা মাংস লেগে আছে এখানে ওখানে। চেটে পুটে খেয়ে গেছে বাঘ। এবং পায়ের দাগ স্পষ্টই বলছে যে বাঘ বিভিন্ন নয়, একটিই বাঘ এবং নিঃসন্দেহে নিনিকুমারীর বাঘ।

বাঘ যে নিনিকুমারীর বাঘ সে সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হলাম তখন ব্যাপারটা যে ভৌতিক-টৌতিক নয় সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠা গেল। তখন ভাল করে গাছটার চারধার ঘুরে বাঘের আসা-যাওয়ার পায়ের খোঁজ করলাম। দেখা গেল, রাতে যা ভেবেছিলাম তা নয়। প্রথমবার বাঘটা টাঁড়ের দিক দিয়েই এসেছিল মানুষটাকে নিয়ে।

সে কেন যে অতখানি টাঁড় পেরিয়ে আসতে গেল, কেন ঐখানে বসেই খেল না তার একমাত্র উত্তর, ভেবে দেখলাম নদীর কাছাকাছি থাকার ইচ্ছা এবং চাঁর গাছেদের গভীর নির্জন ছায়ার আড়ালের সুবিধা। কিন্তু এসেছে যদিও টাঁড়-এর দিক থেকেই প্রতিবার গুলি হবার পরই সে আমার পিছন দিকে, মানে আমি যেদিকে মুখ করে বসেছিলাম তার বিপরীত দিকে নদীর পাশে একটি প্রকাণ্ড চাঁর গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। আবার একটু পরে বেরিয়ে এসেছে। এবং খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চলে গেছে কাল ভোরে তাকে তার পায়ের চিহ্ন আমরা যেখানে দেখেছিলাম সেইখানেই নদী পেরিয়ে শিকার-গড়ের দিকে। সেটা অবশ্য জেনেছিলাম তোরা জিপ নিয়ে আসার একটু আগে।

এতক্ষণ তুমি কী করছিলে?

তোরা হলেও যা করতিস। প্রথমেই টাঁড় পেরিয়ে সর্ষেক্ষেতের দিকে এগোলাম। উদ্দেশ্য দুটি। কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় কিনা এবং ঐ গ্রামে এর আগেও গেছে এমন মানুষ নিয়েছে কিনা। অন্য কথায় ঐ গ্রাম নিনিকুমারীর বাঘের রেগুলার বীট-এর মধ্যে পড়ে কিনা?

আসলে গ্রাম বলে যা ভেবেছিলাম তা নয়। পৌঁছে দেখি, ঐ 'কোপ্‌জে'র মত পাহাড়গুলোর আড়ালে মাত্র চার পাঁচ ঘর লোকের বাস। তারাই ঐ সর্ষে বুনেছে। তারা নাকি বামরার এক মহাজন, যার তেলকল আছে; তার কাছ থেকেই প্রতি বছর দাদন দিয়ে সর্ষে বোনে তারই জমিতে এবং সুদের খরচ বাদ দিয়ে পাইকারি হারে তাকেই পুরো সর্ষে বিক্রি করে দেয়। তাতে তাদের যা আয় হয় তার চমৎকার সাক্ষী তাদের চেহারা এবং অবস্থা। তবু তারা আমাকে মুড়ি আর গুড় খাওয়াল। এবং যা শুনলাম, বাঘ তাদের দিকে এর আগে আর কখনই আসেনি। নিনিকুমারীর বাঘের এলাকাতে বাস করেও তাদের কোনো ভয় ছিল না কারণ প্রথম এক বছর তারা নিয়মিত মাচা বেঁধে ঐ চাঁর বনেই দিনেরাতে পাহারা রাখত বাঘ টাঁড়ের দিকে আসে কিনা তা দেখার জন্যে। কিন্তু বাঘ কখনই এদিকে আসেনি। কজন মাত্র লোক থাকে, হয়ত সে জন্যেই আসেনি। যাই হোক গতকাল শেষ বিকেলে ওদের একজন "ঝাড়া দেইবাকু" অর্থাৎ বড় বাইরে করবার জন্যে যখন একটি টিলার আড়ালে "ঢাল" ভর্তি জল নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল বাঘ তখন তাকে নিঃশব্দে ধরে। এবং ওখানে বসেই কিছুটা খায়। লোকটি অন্ধকার হবার পরও ফিরে না আসাতে ওরা বুঝতে পেরে দুয়ার-বন্ধ করে রাতটা কাটায়। আমি যখন গিয়ে পৌঁছই তখনই ওরা সদলবলে তাদের সঙ্গীর খোঁজে বেরচ্ছিল। একজন রওয়ানা দিচ্ছিল শহরে। সেখানে বামরার মহাজনের গদীতে খবর দেবে বলে, যাতে অন্ত্যেষ্টির জন্যে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। সে সাহায্যের উপরেও সুদ কষা হবে। সুদ-এর চেয়ে বড় মানুষখেকো বাঘ ভারতবর্ষের বনাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে আর নেই।

আমি ওদের বললাম যে, মড়ির সামান্যই অবশিষ্ট আছে এবং আমিই দিয়ে যাচ্ছি ওদের। ওরা প্রথমে নিয়ে গেল আমাকে টিলার দিকে। সেদিক থেকে ড্র্যাগ-মার্ক-এর দাগ যে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। মানুষটিকে কোমরের কাছে কামড়ে ধরে নিয়ে এসেছে বাঘ চাঁরবনে, তার দু-হাত আর দু-পা হেঁচড়েছে মাটিতে—তারই ঘষটানোর দাগ। মাঝে মাঝে মানুষটিকে নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম নিয়েছে। শিকার-গড়ে যখন বাঘটিকে দেখি তখন মনে হয়েছিল বাঘটি ল্যাংড়া নয়। কিন্তু দীর্ঘপথ তার পায়ের দাগ লক্ষ্য করে আজ বোঝা গেল যে ক্ষতটি তার কাফ্‌মাস্‌লের কাছে। কখনও কখনও আরাম পাওয়ার জন্যে সে পা-টি তুলে তুলে চলে। কখনও স্বাভাবিক ভাবে চলে। অভিজ্ঞ

শিকারীরা এবং শিকার-গড়-এর স্টেটের অভিজ্ঞ শিকারীরাও যে কি করে ভাবলেন বাঘের পায়ের কব্জীতে নিনিকুমারীর রাইফেলের চোট হয়েছিল তা এখনও বোধগম্য হল না।

আমি বললাম, হয়ত পা চুঁইয়ে রক্ত পড়াতেই এমন ভেবেছিলেন ওঁরা।

ঋজুদা বলল, হয়ত থাবাতেও চোট পেয়েছিল তখন, এখন তা সম্পূর্ণ শুকিয়ে এবং জুড়ে গেছে। প্রকৃতির নিরাময়ের রকমটাই আলাদা!

তারপর?

ভট্‌কাই বলল।

তারপর আর কি? ওরা মড়ির অবশিষ্টাংশ উঠিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেটির ছোট ভাই এসেছিল। ঐ অবস্থায় তার স্ত্রীকে না দেখানোর পরামর্শ দিয়ে ওদের একশটি টাকা শ্রাদ্ধের জন্যে দিয়ে আমি নদীপারেই দাহ করে ফিরে যেতে বললাম ওদের। কিন্তু ওরা কথা শুনল না। বলল, ওর বৌ শেষ দেখা না দেখলে কষ্ট পাবে।

জানি না। ওদের সঙ্গে আমি একমত নই। শেষ দেখা সব সময়ই সুন্দরতম দেখা হওয়া উচিত। যখন বিখ্যাত মানুষেরা মারা যান, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, সাহিত্যিক তাঁদের যে নাকে তুলো গোঁজা ফোলা-মুখের ছবি কাগজে ছাপা হয় তা আমার বীভৎস লাগে। মৃত মানুষের হাস্যময় ছবিই সব সময় ছাপা উচিত। যে চেহারাটি চোখে লেগে থাকে, প্রিয়জনের কাছে, অনুরাগীদের কাছে, সেই চেহারাটিকেই শোকের দিনে মনে করা উচিত।

ঠিক বলেছ।

আমি আর ভট্‌কাই বললাম, সমস্বরে।

তারপর?

তারপর আর কি? ওদের সাবধানে থাকতে বললাম। ওরা গ্রামে ফিরে গেল মৃতদেহ নিয়ে। আর আমি নদী পেরিয়ে, বাঘ যে নদী পেরিয়ে শিকার-গড়-এর দিকেই গেছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তোদের জন্যে শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমি বললাম, জানো ঋজুদা। পাহাড়ের উপরে যে গুহা আছে, যার পাশের গাছে আমি সেদিন বসেছিলাম, সেখান থেকে নদীর ঐ জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়। শম্বরদের দলকে আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম নদী পেরিয়ে আসতে। তোমাকেও বাঘ দেখে থাকবে হয়ত।

তবে আমি যে শিকার-গড়ের দিকে যাইনি তাও সে দেখেছে। দেখেছে, জিপে করে তোদের সঙ্গে ফিরে গেছি।

তোমার গুলিহীন রাইফেল নিয়ে ঐ ভাবে শুয়ে থাকাটা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ হয়েছে।

যেখানে অন্য বিবেচনার উপায় নেই। মানে চয়েস নেই, সেখানে উপায় কি?

গ্রামের লোকদের ঐ রাতের শকুন আর বাদুড়ের কথা বলেছিলে? গুলির পর গুলি মিস হওয়ার কথা?

হ্যাঁ।

ওরা কী বলল?

ওরা কিছুই বলল না। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ওসব নিয়ে ভাবলে আমাদের চলবে না। কালকেই ঐ বাঘের একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

কী করে করবে?

কাল বলব। এখন, বালাবাবুকে একবার ডাক ত'। কথা আছে।

ভট্‌কাই গিয়ে বালাবাবুকে ডেকে আনল।

ঋজুদা বলল, কাল খুব ভোরে আপনার একবার বিশ্বল সাহেবের কাছে যেতে হবে জিপ নিয়ে। আমি একটি চিঠি দিয়ে দেব। সাতটার মধ্যে ফিরে আসবেন এখানে। আমরা কিন্তু তার আগেই হেঁটে শিকার-গড়ের দিকে এগিয়ে যাব। বিশ্বল সাহেব আপনার সঙ্গে এক কোম্পানি আর্মড পুলিস দেবেন। তাঁদের ট্রাকও এখানে কুচিলাখাঁই বাংলোতে রেখে যাবেন এবং আপনার জিপও। তারপর গোলমাল না করে বা কথাবার্তা না বলে নিঃশব্দে শিকার-গড়ে ওঠার আগে গ্রামেরও আগে যে মস্ত মহানিমগাছ আছে সেখানে এসে পৌঁছোবেন। তার নিচে আমরা অপেক্ষা করব। তারপর যেমন বলব তেমন হবে। পুলিসদের এবং আপনারও হয়ত সারা দিন খাওয়া হবে না কাল। কিন্তু কিছু করার নেই।

বালাবাবু একমুহূর্ত কী ভাবলেন। তারপর বললেন, চিঠিটা ?

লিখে দিচ্ছি।

বলেই, ভট্‌কাইকে বলল, দ্যাখ গিয়ে জগবন্ধুর রান্না হল কী না। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। জগবন্ধু যেন ভোর চারটেতে আমাদের চা দেয় এবং আমার জন্যে চানের গরম জল।

ঠিক আছে।

বলেই ভট্‌কাই উঠে চলে গেল।

ঋজুদা বলল বালাবাবুকে, আপনাকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি রুদ্রকে দিয়ে। আপনিও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন আমাদের সঙ্গেই। কালকে অনেক কাজ।

আমরা যখন কুচিলাখাঁই পাহাড়ের নিচের বাংলো থেকে বেরোলাম তখন পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে। তখনও পুলিসের গাড়ি আসেনি। এলে আমরা শব্দ পেতাম। ঋজুদা বলেছিলো হেঁটে যাবে কিন্তু জিপ নিয়েই রওয়ানা হলো দেখলাম। কেন প্ল্যান বদলালো জানি না।

জিপ চালাচ্ছে আজকে ভোরে ঋজুদাই। রাইফেলটা আমাকে ধরতে দিয়েছে। হাঁটুর মধ্যে এবং ঋজুদার রাইফেল দুটোকে চেপে আমি দু' হাতে ধরে আছি দুটোকে। ভট্‌কাই বসেছে আমার আর ঋজুদার মধ্যে।

শিকার-গড়ের এবং চারপাশের শিকারীদের খবর দেওয়া যায়নি এত কম সময়ে। তাই ঋজুদা আর্মড পুলিসের কোম্পানির সাহায্য চেয়েছে। ব্যাপারটা যে ঠিক মনঃপূত হয়নি তা ঋজুদার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমার তো হয়ই নি।

ভারতবর্ষে পুলিসরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারে যতখানি দড় ততখানি দুশমনদের ওপর গুলি ছুঁড়তে নয়। পথের গুণ্ডা বদমাইশদের নিশানা নিয়ে গুলি করলে সে গুলি হয় ফুটপাথের নিরীহ পথচারী নয়ত দোতলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো কৌতূহলী মহিলার গায়ে গিয়েই লাগে। পুলিসদের বিশেষ করে আর্মড পুলিসদের নিশানা ঠিক কেন যে থাকে না তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বালাবাবুকে ঋজুদা যে মহানিমগাছের কথা বলে দিয়েছিল সেই প্রাচীন গাছের নিচে আমরা জিপ দাঁড় করালাম। সবে ভোর হয়েছে। ঘাস পাতায় সূর্যের নরম সোনালি আঙুলের ছোঁয়া লাগছে সবে। পাখিদের কলকাকলি, ঘাসফড়িঙের তিরতিরে স্বচ্ছ ডানা, শিশিরভেজা মাঠে কান-উঁচু খরগোশের হন্তদন্ত হয়ে এসে নিজের প্রায়-অদৃশ্য গর্তে অদৃশ্য

হয়ে যাওয়া, এই সব দেখছি চুপ করে বসে। একদল বনমুরগি রোদ পোয়াচ্ছে আর ধান খুঁটে খাচ্ছে। গাঢ় বেগুনি, সবুজ, লাল, হলুদ আর সোনালি রঙ ঝিলিক মারছে সকালের নরম রোদে। একটা কোটরা হরিণ, বাদামী দেখাচ্ছে এখন তার গায়ের রঙ, চলে গেল আস্তে আস্তে হেঁটে তার লেজের সাদা পতাকা নাড়তে নাড়তে। দেখতে পায়নি সে আমাদের। আমাদের আজকে বোধহয় কেউই দেখতে পায়নি। নিনিকুমারীর বাঘও আশা করি দেখতে পাবে না।

ঋজুদা জিপ থেকে নেমে, একটা কাঠি ভেঙে নিয়ে পথের ভেজা ধুলোয় ম্যাপ এঁকে আমাদের প্ল্যানটা বোঝাল। বলল, বাঘ যে নদী পেরিয়ে সকালে বা শেষ রাতে শিকার-গড়ে ফিরে এসেছে তা তো কাল দেখাই গেছে। আজও সে শিকার-গড় থেকে বেরিয়ে কোনো দিকে যাবে। কোন্ দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ? এ পর্যন্ত দেখা গেছে নদী পেরিয়েই সে যায় প্রতিবারে। তারপর নদীর ওপারের ডাইনে বাঁয়ের পথ ধরে বড় বড় গ্রামের দিকে যায়। একটা কথা খুবই আশ্চর্যের যে আমরা আসার আগে সে কিন্তু গড়ের পায়ের কাছের সাম্বপানি গ্রামে অথবা ঐ সর্ষেক্ষেতের গ্রাম থেকে একজনও মানুষ নেয়নি। তার মানে হচ্ছে যে সে দূরে গিয়ে শিকার-গড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে যদি না পারে সেই ভয়েই হয়ত ইদানীং কাছাকাছি গ্রাম থেকে মানুষ নেওয়া শুরু করেছে।

ভট্‌কাই বলল, কিন্তু ঋজুদা, সাম্বপানির প্রথম মানুষ, মানে সেই বউটাকে তো বাঘ আমরা এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়েছিল ! তখনও তো বাঘের আদৌ জানার কথা নয়, যে আমরা এসেছি ! তুমি তার পরেই তো চণ্ডীমন্দিরে পুজো দেওয়ালে, শিকার-গড়ের নহবৎখানাতে রাত কাটালে। তাই না ?

তা ঠিক। ঋজুদা চিন্তান্বিত গলায় বলল।

তারপর বলল, আমি যা ভাবছি তা পুরোপুরি ভুলও হতে পারে। কিন্তু কিছুই না করে বসে থাকলে তো চলবে না। তাছাড়া এই বাঘকে রাতে মোকাবিলা করার অসুবিধা আছে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই একে যা করার করতে হবে।

হেসে বললাম, তুমি ভূত-ভগবানকে ভয় পাও ? নতুন কথা শুনছি !

পাইপ ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ঋজুদা বলল, অন্ধকার বনে বা মানুষখেকো বাঘের নখে ভয় নেই। ভয়টা আমার মনেই। যে কোনো কারণেই হোক পরশু রাতের ঘটনায় আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম। সে সব ঘটনার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা বোঝার সময় এখন নেই। যা কিছুই রোধ করার, প্রতিবিধান বা প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল না বা এই মুহূর্তে নেই তার সবকিছুকেই আমি ঘৃণা করি। সেই দৃশ্য অথবা অদৃশ্য শক্তিকে, সে শক্তি ভুতুড়ে অন্ধকারই হোক, কোনও দেবীর কৃপাধন্য মানুষখেকো বাঘই হোক বা ক্ষমতান্ধ কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দলই হোক, তাকে ছিন্নভিন্ন, নির্মূল না করা পর্যন্ত আমার ঘুম হয় না।

আমি রুটির মধ্যে তরকারি পুরে ঋজুদাকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নাও।

ঋজুদা বলল, তোরা খা। আমি তোদের ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝিয়ে দিই ভাল করে। আমি আর ভট্‌কাই রুটি তরকারি খেতে লাগলাম।

ঋজুদা বলল, নিনিকুমারীর বাঘ শিকার-গড়েই আছে। দিনমানে শিকার-গড়ের সমস্ত জঙ্গল ঝেঁটিয়ে হাঁকা করে তাকে তাড়িয়ে পাহাড় জঙ্গলের আড়াল থেকে নামিয়ে নদী পার করাতে হবে। রাস্তাটা যেখানে নদীকে কেটে গেছে বাঘ ঠিক সেইখান দিয়েই নদী

পেরোয়। নদী তো বাঁকও নিয়েছে ঐখানে। অতখানি ফাঁকা জায়গা আর কোথাওই নেই। তাকে মারা গেলে ওখানেই যাবে। নইলে বাঘ নিয়ে কপালে দুর্ভোগ আছে অনেক।

আমি বললাম, বাঘ যদি বিটারদের লাইন ক্রস করে বিপরীত দিকে চলে যায় ? কাউকে আহত করে ? নদীর দিকে সে যদি আদৌ না যায় ?

ঠিক বলেছিস। তেমন সম্ভাবনা আছে বলেই আমি বিটিং-এর ঢাক-ঢোল বা শিঙা ব্যবহার করছি না। সাধারণ হাঁকাওয়ালাও নয়। আর্মড পুলিসের কোম্পানি শিকার-গড়ের বাঁদিকে বেড়া তৈরি করবে অর্ধচন্দ্রাকারে। তারপর ত্রিশ সেকেন্ড পর পর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুরো গড় এবং গড়ের সামনে-পেছনের দিকে চিরুনি অভিযান চালিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অত লোক আর অত রাইফেলের গুলির আওয়াজ একসঙ্গে শুনে বাঘ স্বভাবতই অচেনা জঙ্গলে না নিয়ে তার চেনা জঙ্গলের দিকেই যাবে। নদী পেরোতে পারলেই তো ডান দিকে বাঁদিকে তার দীর্ঘদিনের পরিচিত শিকারভূমি। এবং নদী পেরোবার সময়ই তাকে মারতে হবে।

তোমার এই অঙ্ক যদি না মেলে ? ভট্‌কাই বলল।

ঋজুদা বলল, আমি আর ভট্‌কাই থাকব নদীর ওপারে। আর রুদ্র থাকবে পুলিসের সঙ্গে যারা বিট্ করবে। বাঘ বিটার-লাইন ক্রস করতে পারে। তাই বিটারদের সঙ্গেও একজন অভিজ্ঞ শিকারী থাকা দরকার। www.pathagar.net

'অভিজ্ঞ' কথাটায় আমার নাকের পাটা ফুলে গেল।

ভট্‌কাই আওয়াজ দিল। বলল, বাবাঃ ! অভিজ্ঞ শিকারী রুদ্র রায় ?

আমি বললাম, তুমি এবার খেয়ে নাও ঋজুদা। চা খাবে তো ?

তাড়া করে লাভ নেই ? আর্মড পুলিসের লোকেরা জানে যে সারাদিন তাদের খাওয়া নেই। তাই তারাও জম্পেশ করে আর্লি ব্রেকফাস্ট করেই আসছে। তাছাড়া বেচারাদের কারবার চোর-ডাকাত নিয়ে। নিনিকুমারীর বাঘকে অ্যারেস্ট করতে হবে শুনেই তো অনেকের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে বেচারিরা চাকরি করে। খামোখা মানুষখেকো বাঘের খাদ্যই বা হতে যাবে কেন তারা ?

নাও, খাও। আমি বললাম।

॥ ৫ ॥

আমরা যখন চা খাচ্ছি তখন খচর-মচর করে বুট-পায়ে রুট-মার্চের শব্দ শুনতে পেলাম। ডাবল্-ফাইলে ওরা হেঁটে আসছে কাঁচা লাল মাটির পথ ধরে। দূর থেকে লম্বা খাকিরঙা কোনো প্রাগৈতিহাসিক অজগর সাপের মত মনে হচ্ছে সেই অশেষ সারিকে। বুটের ঘায়ে ঘায়ে উড়ছে লাল ধুলো। কম্যাণ্ডারের নাম বলভদ্র নায়েক। সপ্রতিভ, উৎসাহী, সাহসী ভদ্রলোক। সুদর্শনও। প্রথম আলাপেই পরিষ্কার বাংলায় ঋজুদাকে বললেন, আপনাকে নিয়ে লেখা অনেক বই পড়েছি বাংলায়। ঋজু বোসকে কে না চেনে ?

ঋজুদাও পরিষ্কার ওড়িয়াতে বলভদ্রবাবুকে বললেন, জয়ন্ত মহাপাত্রর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। উৎকলমণি গোপবন্ধুর আমি একজন বড় ভক্ত এবং বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্য ও কবিতার কিছু খোঁজ আমিও রাখি।

বলভদ্রবাবু খুশি হলেন। বললেন, আমি আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলি, আর

আপনি বলুন ওড়িয়াতে। দুজনেরই প্র্যাকটিস হবে।

ভাল কথা। ঋজুদা বলল। তারপর বলভদ্রবাবুকে বিস্তারিত বোঝাল প্ল্যানটা। কথা শুনে মনে হল, উনিও শিকার করেছেন একসময়। পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিলেন আমাদের সঙ্গে চা খেতে খেতেই।

ঋজুদা বলল, আমাদের জিপটা আজ এখানেই থাকবে। গতকালই বিশ্বল সাহেবের লোক রাতের বেলা জিপে করে সাম্বপানিতে এসে খবর দিয়ে গেছে যেন আজ কেউ শিকার-গড় এবং সাম্বপানির আশপাশের জঙ্গলে পাহাড়ে কোনো কাজেই না যায়। গ্রামেই যেন থাকে। যদি যায়, তাহলে নিনিকুমারীর বাঘের ভয় ছাড়াও পুলিসের রাইফেলের গুলিও লেগে যাবার আশঙ্কা আছে।

আমরা সকলে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। ঋজুদা ভট্‌কাইকে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা পথ আমাদের সঙ্গে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল, পাহাড়ের উৎরাই ভেঙে নিচে নদীতে গিয়ে পৌঁছবে বলে। যাবার সময় ঋজুদা তার অ্যালার্ম-দেওয়া রোলেক্স হাত ঘড়িটা দেখিয়ে বলভদ্রবাবু আর আমাকে বলল, ঠিক দশটায় সময়ে আপনারা গুলি করতে করতে বিটিং আরম্ভ করবেন। দশটার আমি পজিশন নিয়ে নিতে পারব আশা করি নদীর ওপাশে।

গুড হান্টিং, বলে ঋজুদা নেমে গেল ডানদিকে, নিচে।

ভট্‌কাই বাঁ হাত তুলে বিগলিত মুখে বলল, ওকে। বেস্ট অফ লাক্ রুদ্র রায়। হড়-বড় কোরো না। মেজাজ ও বুদ্ধি ঠাণ্ডা রেখ।

আমি চাপা গলায় বললাম, ফাজিল।

আমরা রওনা যখন হলাম তখন সাড়ে সাতটা বাজে। শিকার-গড়ের দুর্গের বেশ খানিকটা পেছনে, সাম্বপানি গ্রাম ছাড়িয়ে একটা কল্পিত লাইন বরাবর রাইফেলধারী পুলিসেরা ছড়িয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতে সেমি-অটোমেটিক রাইফেল। হ্যাভারস্যাকে লোড-করা গোটা ছয়েক অতিরিক্ত ম্যাগাজিন। অতখানি পথ যদি গুলি করতে করতে নামতে হয় তাহলে অনেক গুলি তো লাগবেই!

সাড়ে নটা নাগাদ স্টার্টিং-পয়েন্টে পৌঁছে গিয়ে পুলিসদের বিশ্রাম নিতে বলে বলভদ্রবাবু একটা বড় পাথরের ওপর বসে পানের ডিবেটা নিজের হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে বললেন, চলবে নাকি ?

আমি খাই না। কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্তে অনেকেই অনেক কিছু করে। বলভদ্রবাবু কখন যে ভালবেসে একটি গুণ্ডিমোহিনী আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা খেয়াল না করেই মুখে পুরে দিয়েছি। চমৎকার লাগছে চিবোতে। প্রথম ঢোকও গিলে ফেলেছি ভাল করে বোঝার আগে। এবং তারপরই দারুণ মাথা ঘুরতে শুরু করায় সব ফেলে দিলাম থুঃ থুঃ করে।

বলভদ্রবাবু ওয়াটার বট্‌ল থেকে জল খাওয়ালেন। বললেন, আগে তো বলবেন যে গুণ্ডি খান না। আর গুণ্ডি বা জর্দা না খেলে পান খেয়ে লাভই বা কী ? ঘাসপাতা খেলেই হয়।

আমি চুপ। রাইফেলটা পাশে রেখে শুয়ে পড়লাম। ওপরের গাছে বড়কি-ধনেশ ডাকছে। কুচিলা-খাঁই। হ্যাঁক্কো-হ্যাঁক্কো হক্কো-হক্কো। বড় আওয়াজ করে পাখিগুলো। যেমন করে জলহস্তীরা, আফ্রিকায়। জন্তু-জানোয়ার পাখ-পাখালির মধ্যেও কিছু কিছু প্রজাতি বড় বাচাল হয়। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। দূরে একটি ক্রো-ফেজেন্ট ডাকছে। মাথার ওপর দিয়ে শন্‌শন্ আওয়াজ করে উড়ে গেল একঝাঁক হরিয়াল কোনো

ফলভারাবনত বট বা অশ্বত্থ গাছের দিকে। কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকছে। বড় শান্তি এখন চারিদিকে। দশটা বাজলেই এই শান্তি বিঘ্নিত হবে অগণ্য রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষে।

দশটা বাজতে দু' মিনিট বাকি। আমি উঠে বসলাম। মাথাটা তখনও ঘুরছিল। বললাম, আমি আপনার কিছুটা পেছনে থাকব। যদি এই অসমসাহসী বাঘ এত রাইফেলের গুলির শব্দ অগ্রাহ্য করে বিটারদের লাইনের উল্টোদিকে আসে তখন তার মোকাবিলা করতে পারব।

মনে মনে বললাম, এত রাইফেলধারী পুলিসের সামনে সামনে গিয়ে তাদের গুলি খেয়ে মরতে আদৌ রাজি নই আমি।

বলভদ্রবাবু বললেন, ঠিক আছে।

দশটা বাজতেই যেন কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ শুরু হল। সব পুলিস বলভদ্রবাবুর সঙ্গে থেমে থেমে গুলি করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল ঝোপ-ঝাড় ভেঙে। সমস্ত জঙ্গল-পাহাড় সচকিত হয়ে উঠল। অসংখ্য প্রজাতির অগণ্য পাখি, হনুমান ও হরিণের ডাকে ও দ্রুত দৌড়োদৌড়ির শব্দে বন সরগরম হয়ে উঠল। আমি রাইফেল রেডি পজিশনে ধরে ওদের পঁচিশ-তিরিশ হাত পেছনে। পৌনে এগারটার সময়, শিকার-গড় পেরিয়ে পুলিসের বেষ্টনী পাহাড় ধরে নামতে লাগল। আমি একবার গড়ের নিচের সেই ছায়াচ্ছন্ন গুহায় সাবধানে গিয়ে পৌঁছলাম। নাঃ। বাঘ কাল রাতে এখানে আসেনি। তারপর গড়ের ভাঙা দেওয়াল টপকে নহবতখানার কাছে পৌঁছে খুবই সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলাম। বাঘের টাটকা পায়ের দাগ আছে এখানে। রাতে শুয়ে থাকার দাগও স্পষ্ট ধুলোর ওপরে। পুলিসের গুলির শব্দ শুনেই বাঘ নহবতখানা ছেড়ে চত্বর পেরিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে। আজ কিছু একটা ঘটবে। ঋজুদার অনুমান পুরোপুরি ঠিক। বাঘ যদি নদী পেরোতে যায় তবে আজই তার জীবনের শেষ দিন।

গতি বাড়িয়ে পুলিসদের ধরবার চেষ্টা করলাম। ঋজুদার এক গুলিতে নিনিকুমারীর বাঘ যদি ধরাশায়ী না হয় তখন বিটারদের লাইন ক্রস করে সে আবার শিকার-গড়েই ফিরে যাবার চেষ্টা করবে হয়ত। আহত মানুষ যেমন বাড়ি ফেরার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে, আহত হিংস্র জানোয়ারও মরার সময় মরতে চায় তার প্রিয় বিশ্রামস্থলে, গুহায় বা অন্য কোথাও ফিরে গিয়েই। তাদের ঠিকানা থাকে।

বেলা তখন ঠিক বারোটা, তখন পুলিসের লাইন এবং আমিও, নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ঋজুদাকে বা বাঘকেও কোথাওই দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত ঋজুদা নদীর পারের কতগুলো বড় পাথরের আড়ালে বসে আছে। ভট্কাই কোথায় কে জানে। আমার ভয় হচ্ছে আনাড়ি ভট্কাই, ঋজুদা গুলি করার আগে বাঘকে দেখতে পেয়ে তার বন্দুক দিয়ে গুলি না করে দেয়। তাহলে যে কী হবে তা ঈশ্বরই জানেন।

নদী যখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তখন আমি বলভদ্রবাবুকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামতে বললাম।

ইনি রুমাল নেড়ে, সিজ-ফায়ারের নির্দেশ দিলেন। প্রায় নিরবচ্ছিন্ন এবং শয়ে-শয়ে গুলির শব্দ হঠাৎ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা নেমে এল জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতে। নদীর বয়ে-যাওয়ার কুলকুলানি শব্দ হঠাৎ স্পষ্ট হলো একটা মাছরাঙার ভয়-পাওয়া কর্কশ চিৎকার দূরে চলে যাওয়ার পর নদীর কুলকুল আওয়াজই একমাত্র শব্দ হয়ে কানে আসতে লাগল। নিনিকুমারীর বাঘ নদী আর আমাদের বেষ্টনীর মধ্যে এমন কোনো আড়ালে লুকিয়ে আছে যে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওপার থেকে ঋজুদা

কি তাকে দেখতে পাচ্ছে ? এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ লালচে উল্কার মত বাঘ একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল ছেড়ে দু-লাফে নদীর জলে গিয়ে পড়ল এবং সে আরেকটি লাফেই নদীর ওপারের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছবে। বাঘ জলে পড়তেই গদ্দাম করে বন্দুকের আওয়াজ হল ওপার থেকে। রাইফেলের নয়, বন্দুকের আওয়াজ। ভয়ার্ত চোখে চমকে তাকিয়ে দেখি, ভট্‌কাই একটি সেগুন গাছের ডালে বসে ফোটাকার্তুজের জায়গায় অন্য কার্তুজ ভরছে। বাঘ ভট্‌কাইকে দেখেছিল বোধহয়। তাই নদী পেরচ্ছিল না।

এত্ত রাগ হল যে কী বলব ! বাঘের গায়ে গুলি লেগেছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু বাঘ মুহূর্তের মধ্যে কোমরে এক মোচড় দিয়ে জলের মধ্যে জল-ছিট্‌কে ঘুরে গেল আমাদের দিকে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঋজুদা কোথায় আছে বোঝা গেল না এবং কোনো গুলিও হল না ঋজুদার রাইফেল থেকে। বাঘটা সটান লাফিয়ে উঠল ওপরে গোল হয়ে ধনুকের মত। বুঝলাম পেটে গুলি লেগেছে। বাঘ জলে পড়তেই নদীর জল ছিটকাল। ঝিকমিক করে উঠল জল সকালের রোদে হাজার হীরের মত।

বাঘ জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেবেছিলাম ঋজুদা গুলি করবে। ঋজুদা কোথায় আছে তা না জেনে এদিক থেকে গুলিও করতে পারছি না আমি। তাছাড়া বাঘ মারার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, বাঘ যদি বিটার্স লাইন ভাঙে, তবেই।

এবারে বাঘ সংহার মূর্তিতে আমাদের দিকে তেড়ে এল রক্তে জল লাল করে। না গুলি করল ভট্‌কাই, না ঋজুদা। যে-কোনো স্বাভাবিক বাঘ হলে সে ঋজুদার অবস্থান লক্ষ করে আক্রমণ করত।

বাঘটা তার আশ্রয়ের দিকে ফিরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল। পুলিসেরা কেউই শিকারি নয়। ওঁদের বাঁচাবার জন্যে আমি বাঘের দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম হাত দশেক। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে দ্রুত দৌড়ে আসা বাঘ আমার কাছাকাছি আসতেই তার বুক লক্ষ্য করে গুলি করলাম। আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। কিন্তু বাঘ আর এক লাফ মারল। এবারে এমন প্রলয়ঙ্করী গর্জন করল সে, যে মনে হল গাছ পড়ে যাবে। সেই গর্জনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। আমার দু' চোখের দৃষ্টি, মস্তিষ্কের সব ভাবনা আচ্ছন্ন করে বাঘ মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এল আমার ওপরে। দ্বিতীয় গুলিটা সে শূন্যে থাকতেই করলাম, কিন্তু বাঘ এসেই পড়ল আমার ওপরে। পড়ে গেলাম। ওপরে বাঘ। আমার ডান বাহুতে কে যেন হাজার মন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল একটা। পরক্ষণেই কানের তালা ফাটিয়ে দিয়ে একটা রাইফেলের গুলি হল আমার বাঁ কানের কাছে ছ' ইঞ্চি পাশে।

তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই।

॥৬॥

এখন সকলেই কুচিলা খাঁই বাংলোর বারান্দাতে। আমি শুয়েছিলাম ইজিচেয়ারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল সারা শরীর। এখুনি রওনা হয়ে চলে যাব। আমারই চিকিৎসার জন্যে।

চিৎকারে কারও কথাই শোনা যাচ্ছে না। বিশ্বল সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, বলভদ্র

সাহেব, ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি, অনেক জিপ, প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। আর সমুদ্রর মত গর্জন করছে অসংখ্য মানুষ। উল্লাসের গর্জন। কিছু কানে যাচ্ছে আমার, কিছু যাচ্ছে না। ঘোরের মধ্যে আছি। মরে যাব কি ?

ঋজুদা বলভদ্রবাবুকে দেখিয়ে বললেন, ইনি তোকে বাঁচিয়েছেন। ঐরকম ঝুঁকি নিয়ে তোর ওপরে পড়া বাঘের কানে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে গুলি না করলে তোর বাঁচার কোনো আশা ছিল না। আমি ঘোরের মধ্যেই হাসবার চেষ্টা করে বলভদ্রবাবুকে বললাম, থ্যাংক উ্য।

তারপর বললাম, তুমি কোথায় ছিলে ? কী করছিলে ঋজুদা ? তুমি গুলি করলে না কেন ?

ঋজুদা আমার বাঁ কাঁধে হাত দিয়ে বলল, পরে বলব।

তাকিয়ে দেখলাম, রাস্‌কেল ভট্‌কাই। চোখদুটো চোরের মত। লজ্জায় আমার দিকে তাকাতেও পারছে না।

আমি ক্ষমা করে দিলাম। দোষটা ওর নয়। ঋজুদার ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।

তারপর ভাবলাম, আসল দোষ তো আমারই, ওকে আমি যদি ঋজুদার ঘাড়ে জোর করে না চাপাতাম তবে তো....

অ্যাম্বুলেন্সে আমাকে তুলল ওয়ার্ডবয়রা। ইজিচেয়ারে শুইয়ে স্যালাইনের নলের আর রক্তের নলের ছুঁচ লাগানো হল হাতে। অ্যান্টিসেপ্‌টিক-এর তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। কে যেন বলল, তাড়াতাড়ি কর। গ্যাংগ্রিন সেট করে যাবে নইলে। হাত কেটে বাদ দিতে হবে। আমার ডান হাত। যে হাত দিয়ে আমি লিখি। দু' চোখ ভরে এল জল।

অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দিল। ঋজুদা আমার পাশে বসে। অন্য পাশে নার্স। অগণিত মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস পেছনে ফেলে অ্যাম্বুলেন্স এবং জিপ ও গাড়ির কনভয় এবারে নির্জন পথে এসে পড়ল। অ্যাম্বুলেন্সের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশে ঝকঝক করছে প্রথম শীতের রোদ্দুর। গাছ গাছালি ঝুঁকে পড়েছে দু' পাশ থেকে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তবু নিনিকুমারীর বাঘ যে শেষপর্যন্ত মরল, এই আনন্দেই হয়ত বেঁচে যাব।

এখুনি কি মরতে হবে আমাকে ? আরও কত বন-পাহাড়ে যাবার ছিল! আরও কত বিপদের মুখোমুখি হওয়ার ছিল। কত অভিজ্ঞতা বাকি রয়ে গেল। একটাই তো জীবন!

মায়ের মুখটা ভেসে এল চোখের ওপরে।

যন্ত্রণার জন্যে বোধহয় ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন কটা বাজে, কী বার কিছুই বোঝার উপায় ছিল না।

চোখ খুলেই দেখলাম ঋজুদা আর ভট্‌কাই বসে আছে আমার পায়ের দিকে, দুটো চেয়ারে। আমি চোখ খুলতেই ভট্‌কাই মুখ ভ্যাট্‌কাল।

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে নে। জখম সামান্যই। বাঘ আসলে তোর গুলি খেয়েই মরে গেছিল। তোর ডান কাঁধে থাবার একটা অংশ শুধু লেগেছিল। অবশ্য বাঘের থাবা বলে কথা। বলভদ্রও গুলিটা করেছিল মোক্ষম মুহূর্তে। ওর সঙ্গে আগে মোলাকাৎ হলে আমাদের সুবিধা হত।

নার্স ঘরে এলেন। বললেন, আমাকে দাঁত মাজতে, মুখ ধোয়াতে এসেছেন। তারপর ড্রেসিং করে ব্রেকফাস্ট দেবেন। ঋজুদারা গতকাল থেকে এখানেই আছে সার্কিট

হাউসে। বামরা হয়ে এসেছি আমরা ঝাড়সুগুদাতে।

বাথরুম সেরে ব্রেকফাস্টও খেয়ে নে। আমরাও আসছি ব্রেকফাস্ট সেরে। ঋজুদা বলল। আমরা থাকলে তোর বেড প্যান নিতে অসুবিধে হবে।

আমি বললাম, নিনিকুমারীর বাঘ তাহলে ভট্‌কাই-এরই হল!

ঋজুদা হাসল। বলল, হিংসে হচ্ছে?

—না। আমি বললাম।

ভট্‌কাই বলল, আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়েই ফিরে আসছি।

আমার খুব খুশি খুশি লাগছিল। সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে। হাসপাতালের হাতায় বড় একটা নিম গাছ। নানা পাখি কিচিরমিচির করছে তাতে। হেমন্তর রোদ ঝিলমিল করছে পাতায় পাতায়। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গেছিলাম। এখনও চোখ খুললেই বাঘের মুখটা দু-চোখ জুড়ে ভেসে উঠছে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ফাঁক অতি সামান্যই। এমন করে না জানলে সে কথা হয়ত কখনই বুঝতাম না।

নার্স আমার ড্রেসিং করতে করতেই সুপারিনটেণ্ডিং সার্জনের সঙ্গে ঋজুদা আর ভট্‌কাই ফিরে এল। সঙ্গে আরও তিন-চারজন ডাক্তার, মেট্রন। ডাক্তারদের মধ্যে একজন আমাকে ইনজেকশন্ দিলেন। নার্সের কাছ থেকে চেয়ে ওষুধের লিস্ট, টেম্পারেচারের চার্ট দেখলেন মেট্রন। সুপারিনটেণ্ডিং সার্জন বললেন, দিন পনেরো থাকতে হবে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে দিন। বেস্ট অফ লাক।

ওঁরা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি ঋজুদাকে শুধোলাম, সার্জন বেস্ট অফ লাক বললেন কেন?

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে একবার কাশল, তারপর চেয়ার টেনে বসল। ভট্‌কাইও চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল যাতে আমার চোখে চোখ না পড়ে। বুঝতে পারলাম কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। কোনো কথা গোপন করতে চাইছে ঋজুদারা আমার কাছ থেকে। ঋজুদার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধোলাম, কলকাতার খবর সব ভাল?

মাথা হেলিয়ে ঋজুদা বলল, ভাল।

তারপর আবার পাইপ টানতে লাগল।

ভট্‌কাইকে বললাম, কনগ্র্যাচুলেশনস ভট্‌কাই। কাগজে তোর ছবি বেরয়নি? শিকারে এসে রংরুট শিকারি অ্যাকাউন্ট-ওপেন করল বিভীষিকা-জাগানো মানুষখেকো বাঘ দিয়ে!

ভট্‌কাই টাগরায় জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ করে শব্দ করল একটা। বলল, ব্যাপারটা গুব্‌লেট হয়ে গেছে। যা ভাবছিস তা নয়।

বিছানাতে উঠে বসতে গেলাম উত্তেজিত হয়ে এবং উঠতে গিয়েই বুঝলাম যে ডানহাতের চোটটা বেশ ভালই। কত টিস্যু, নার্ভ আর ফিলামেন্ট যে ছিঁড়েছে তা ডাক্তাররাই জানেন! আবার শুয়ে পড়লাম। নার্স বললেন, ওঠাউঠি একদম চলবে না। ঘা শুকোতে তাহলে সময় বেশি লাগছে। বাঘের থাবা খেয়ে মানুষ বাঁচে না। আপনার বরাত ভাল।

ঋজুদা সায় দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ভাল। কোনো সন্দেহ নেই।

নার্স বললেন, আমি একটু আসছি।

—হ্যাঁ। আমরা আছি তো।

—দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। তারপর আপনাদের চলে যেতে হবে। আমি

পেশেন্টকে ঘুমের ওষুধ দেব।

নার্স চলে যেতেই ঋজুদা বলল, ভট্কাই অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছে বাঘ দিয়েই, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘ মারা পড়েনি।

আবারও আমি উঠে বসতে গেলাম এবং আবারও শুয়ে পড়লাম।

বললাম, কী বলছ! আমি যে নিজের চোখে দেখলাম বাঘের পায়ের দাগ, শিকার-গড়ের নহবতখানাতে তার শুয়ে থাকার চিহ্ন।

—ঠিকই দেখেছিস।

—তবে?

মনে হয়, নিনিকুমারীর বাঘ নহবতখানা থেকে নেমে শিকার-গড় ছেড়ে বিটারদের লাইনের সমান্তরালে হেঁটে তাদের নজরের বাইরে চলে গেছিল তারপরেই। এরকম ধূর্ত বাঘ খুবই কমই দেখেছি।

—তবে ঐ বাঘটা কোথা থেকে এল?

—এল। তবে কোত্থেকে তা বলতে পারব না। তোকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল যে তার খবর আর নিতে পারিনি। আগে কুচিলাখাঁইয়ের বাংলোতে ফিরি। তারপর আবার তার খোঁজ নেওয়া যাবে।

—এ কী পি. সি. সরকারের ম্যাজিক নাকি?

—প্রায় সেরকমই ব্যাপার।

ঋজুদা বলল।

এদিকে সবাই যে ভাবল নিনিকুমারীর বাঘ মারা পড়েছে। লোকেরা যে অসাবধানী হয়ে যাবে। বাঘ তো পটাপট মানুষ মারবে।

মেরেছে।

মুখ নিচু করে ঋজুদা বলল। তুই এরকম আহত না হলে প্রথমেই বাঘটাকে পরীক্ষা করতাম ভাল করে। বাঘের দিকে তাকাবার সময়ই পাইনি তখন। আর সে তো বাঘ ছিল না, ছিল বাঘিনী। প্রথমবার তখন কাভার ব্রেক করে নদীতে ঝাঁপাল, আর ভট্কাই গুলি করে দিল হড়বড়িয়ে, তখনই আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল যে, সাইজে নিনিকুমারীর বাঘের মত হলেও এ বাঘিনী, বাঘ নয়। কিন্তু তোর অবস্থা দেখে তো বাঘের কাছে যাওয়ার সময়ই পেলাম না আর।

তুমি গুলি করলে না কেন?

ঋজুদাকে শুধোলাম আমি।

ভট্কাই উত্তেজিত হয়ে বলল, গুলি ফুটল না। করেছিলো রে গুলি, ঋজুদা।

—বলিস কি?

ঋজুদা বলল, তাই। অনন্তবাবু নিজে গুলি দিয়েছিলেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানির গুলি ফোটেনি কখনও এমন হয়নি। সে গুলির ক্যাপে স্যাঁতলাই পড়ে যাক আর পেতলের ক্যাপ কালোই হয়ে যাক। কিন্তু ফুটল না। ডাবল ব্যারেল রাইফেল নিয়ে গেছিলাম সেদিন। জানিসই তো! একটা ব্যারেলের গুলিও ফায়ার হল না!

আমার মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। বললাম, ঠাকুরানীর বাঘ তাহলে কি সত্যি?

—যাই ঘটে থাকুক, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। বিশ্বল সাহেবকে বলে কলকাতায় লোক পাঠিয়েছি চিঠি দিয়ে, একেবারে ফ্রেশ গুলি নিয়ে আসার জন্যে। অনন্তবাবুকে সব

ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখেছি।

ঋজুদা বলল।

ভট্‌কাই বলল, জিম করবেট-এর বইয়েতেও তো "টেম্পল টাইগারের" কথা আছে। জিম করবেটও কি মিথ্যেবাদী ?

তা বলে আমাদেরও কি এসব আনক্যানি ব্যাপার বিশ্বাস করতে হবে ?

ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বিশ্বাস না করতে হলেই খুশি হব। তবে কী জানিস ? বনে-জঙ্গলে প্রান্তরে-পাহাড়ে কখনও কখনও অনেক ঘটনা ঘটে, পৃথিবীর সব জায়গাতেই, যার ব্যাখ্যা বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে করা যায় না। কলকাতার চোখ ধাঁধানো আলোয় রাস্তায় বা বাড়িতে বসে এই সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা, যাই বলিস, সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা এইরকম পরিবেশে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, জিম করবেট-এর মত, তাঁদের কথা চট করে মিথ্যে বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

এটা হয়ত পুরোই কাকতালীয় ব্যাপার। আমি বললাম।

কোয়াইট লাইক্‌লি। আমারও তাই মনে হয়। তবে ব্যাপার যাই হোক, আমি নিনিকুমারীর বাঘের শেষ না দেখে ফিরছি না। হয় বাঘের শেষ, নয় আমার।

বল, আমাদের। ভট্‌কাই মুরুব্বীর মত বলল।

আমি থাকতে তোদের কিছু হলে তো কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাতে পারব না।

ভট্‌কাই বলল, 'সবে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ।'

বড় ফাজিল হয়েছে। এখন কিছু বলাও যায় না। বাঘের গা থেকে রক্ত ঝরিয়েছে ও-ই প্রথম। বাঘ শিকারি তো হয়েছে! কিন্তু এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ মানুষখেকো বাঘ শিকারে ভাবাই যায় না।

ভাবলাম আমি।

ঋজুদা যেন আমার মনের কথা বুঝেই বলল, তবে ভট্‌কাইকে তার বাঘের চামড়া সমেত পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতাতে। ওর পুরস্কার যেমন পেয়েছে, শাস্তিও ওকে পেতে হবে। শিকার এবং মানুষখেকো বাঘ শিকার যে ছেলেখেলা নয় তা ও এখনও বুঝতে পারেনি। তুই না ভাল হয়ে ওঠা পর্যন্ত ও অবশ্য আমার সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু জঙ্গলে যাবে না। বাংলোতেই থাকবে।

ভট্‌কাই-এর মুখ কালো হয়ে গেল। মুখ নামিয়ে নিল ও। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, বিশ্বাস কর রুদ্র, আমি কিন্তু গুলি করিনি।

একথা ঋজুদাকেও বলেছি। ঋজুদা বিশ্বাস করেনি।

—তবে কে করেছে ? তুই গুলি করিসনি মানে ?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

বিশ্বাস কর, কে যেন আমার পেছন থেকে দু'হাতে আমার হাতের বন্দুক তুলে ধরে আমার আঙুল দিয়ে ট্রিগার টানিয়ে দিল। আমি কিছু জানবার আগেই।

গুল্‌ মারিস না। আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, ভট্‌কাই বড় হলে ভারতীয় রাজনীতিক হবে। সিচুয়েশনের এমন অ্যাডভান্টেজ রাজনীতির লোক ছাড়া আর কেউই নিতে পারে না।

এমন সময় নার্স এসে বললেন, এবার তো আপনাদের উঠতে হবে।

আমিও ভাবছিলাম, এবার ঋজুদারা গেলেই ভাল। একে শরীরের এইরকম অবস্থা,

তার ওপর যা শুনলাম তাতে মাথা একেবারে ভোঁ ভোঁ করছে। এখন সত্যিই ঘুমের দরকার।

ঋজুদা উঠল।

বলল, চলি রে! ঝাড়সুগুদাতে থেকে তোর দেখাশোনা করতে পারলে ভাল হত কিন্তু ওদিকে তো অবস্থা সঙ্গীন। ভট্‌কাইকে তোর দেখাশোনাতে রেখে যেতে পারতাম কিন্তু ওকে হয়ত দরকার হতে পারে। ডঃ মহাপাত্রকে সবই বলা আছে। বলছেন, পনের দিন। কিন্তু আর দশদিনের মধ্যেই হয়ত তুই কুচিলাখাঁই বাংলোতে ফিরে যেতে পারবি। ডঃ মহাপাত্রের মেয়ে তোকে বই-টই পড়তে দেবে। ভারী স্মার্ট মেয়ে। এবারে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। বই-টই পড়ে, ঘুমিয়ে গায়ে জোর করে নে। অনেক খাটনি আছে পরে।

আমি বললাম, তুমি ইতিমধ্যেই নিনিকুমারীর বাঘকে মেরে দেবে না তো?

প্রার্থনা কর, তাই যেন হয়। এখান থেকে মানে মানে ফিরে যেতে পারলে কাজ শেষ করে, অ্যাডভেঞ্চার করার সুযোগ জীবনে অনেকই আসবে। তবে কী হবে শেষ পর্যন্ত জানি না। তবে ওড়িশা সরকারের বিভিন্ন স্তরের আমলারা যে সম্মান ও সহযোগিতা আমাদের দেখালেন ও দিলেন তার কথা মনে রেখেই আমাদের "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"-তে বিশ্বাস করতেই হবে। "নিনিকুমারীর বাঘ" নিয়ে ওড়িশা বিধানসভায় ও দিল্লি সংসদেও প্রশ্ন উঠেছে।

চলি রে রুদ্র।

ভট্‌কাই বলল।

ঋজুদা দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, সব বন্দোবস্তই করা আছে। ঠিক সময়মত গাড়ি করে ওঁরা নিজেরাই তোকে পৌঁছে দেবেন। চীফ-সেক্রেটারি নিজে যেখানে যেখানে বলবার বলে দিয়েছেন। কলকাতায় তোর মায়ের সঙ্গে আমি গতকাল রাতে কথা বলেছি। তুইও একটু ভাল হলে এখান থেকেই কথা বলতে পারিস। আমি বলে গেলাম।

মা জানে?

হ্যাঁ।

কী বলল মা?

বলল, রুদ্রকে বোলো ঋজু, যেন খালি হাতে না ফেরে! বাঘ মেরে যেন ফেরে। আমার একমাত্র সন্তান ও। কিন্তু ওকেও একদিন মরতে হবে। মৃত্যু অমোঘ। কিন্তু হার নয়। হেরে যাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেকই বেশি সম্মানের।

তাই?

ইয়েস্।

ভট্‌কাই বলল। আমিও কথা বলেছি।

আমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে এল।

গর্ব? নিজের জন্যে? না মায়ের জন্যে। বুঝলাম না।

॥ ৭ ॥

আমি যখন সুস্থ হয়ে কুচিলাখাঁই বাংলোতে ফিরে গেলাম ততদিনে নিনিকুমারীর বাঘ আরও তিনজন মানুষ খেয়েছে। একজন মেয়ে এবং দুজন ছেলে। ঋজুদার কাছে খবর এসেছিল অনেক দেরিতে। তিনটে গ্রামের দূরত্বই কুচিলাখাঁইয়ের বাংলো থেকে অনেক

দূরে। জিপ যাওয়ার রাস্তাও নেই। তাছাড়া দেরিতে খবর পাওয়ার ফলে সেসব জায়গাতে গিয়ে কোনও লাভ হত না।

প্রথম দিন রাইফেল এবং বন্দুক ছুঁড়ে দেখলাম যে ঠিকমত হোল্ড করতে পারছি কি না। হঠাৎ এক ঝট্‌কাতে তুলে নিয়ে গুলি করতে গেলে হাতে লাগছে কি না ?

ঋজুদা বলল, তুই তোর ডান কাঁধের ওপরে একটা মাফলার ভাঁজ করে রেখে তার উপরে চামড়ার জার্কিনটা পরে নে। তাহলে ব্যথা করবে না। তাই করে সত্যিই ভাল ফল হল।

বিশ্বল সাহেব এসেছিলেন বিকেলে। তাঁর সঙ্গেও অনেক পরামর্শ হল।

ঋজুদা বলল, যা বুঝছি তাতে বাঘের কিল্‌-এর অপেক্ষায় থাকলে আর চলবে না। আমাদেরই বাঘকে খুঁজে বের করতে হবে। সাম্বপানি থেকে খবর এসেছে যে বাঘ আর শিকার-গড়ে আসেনি তারপর। সে ডেরা বদলেছে। এবং ডেরা বদলেছে বলে তাকে এখন খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হবে। সুতরাং দুটো ন্যাপস্যাকে গুলি, ছুরি, টর্চ, জলের বোতল, কিছু শুকনো খাবার, চিঁড়ে গুড় আর চা চিনি নিয়ে আমাদের বেরতে হবে। জঙ্গলেই থাকতে হবে। খাবার ফুরিয়ে গেলে জঙ্গলের মধ্যে যদি গ্রাম পাওয়া যায় তবে সেখানে ডালভাত যা জোটে তা খেয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে হবে। ঐভাবে ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনও ফ্রেশ কিল পাওয়া যায় অথবা অন্যভাবে বাঘের মুখোমুখি হওয়া যায়, তাহলে একটা চান্স পেলেও পাওয়া যেতে পারে। "অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ডিফেন্স"—এই পলিসি নিতে হবে আমাদের। ভট্‌কাই থাকবে এই বাংলোতে। বলভদ্রবাবু আমাদের জিপে করে যতখানি সম্ভব এগিয়ে দিয়ে যে গ্রাম অবধি জিপ পৌঁছয় সেখানেই থাকবেন ক্যাম্প করে। বিশ্বল সাহেবকে বলে তাঁর ছুটির বন্দোবস্তও করে নিয়েছে ঋজুদা। তারপর দেখা যাবে কী হয় !

আগামীকাল ভোরে হেভি ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

ভীমগদা বলে একটা গ্রাম আছে কুচিলাখাঁইয়ের উত্তরে। মাইল পনেরো পথ। সেইখানে পৌঁছে জিপ ছেড়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকব। শেষ কিল্‌ যেখানে হয়েছে সেখান থেকে ভীমগদা গ্রাম মাইল পাঁচেক দক্ষিণে। উত্তরে আমাদের হেঁটে যেতে হবে সেই পাঁচ মাইল। প্রয়োজনে রাতটা ভীমগদাতেই কাটাব। যদি জঙ্গলে থাকার কোনও অসুবিধে থাকে।

রাতে পেট ভরে মুগের ডালের খিচুড়ি খাওয়া হল। দারুণ রেঁধেছিল জগবন্ধু। সঙ্গে আলু ও বেগুন ভাজা, শুকনো লঙ্কা ভাজা। খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে জবজবে করে মাখা খিচুড়ি।

ভট্‌কাইকে যে সত্যিই বাংলোতে থাকতে হবে একথা ও তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ঋজুদা বলল, ভাবিস না যে আমরা যখন বাঘের খোঁজে বনজঙ্গল তোলপাড় করব তখন বাঘ তোর সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবে না। সাবধানে থাকবি। বন্দুক লোড করে সবসময় হাতের কাছে রাখবি। রাতে দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ করে শুবি। বলভদ্রবাবু রোজ একবার করে এসে তোর খোঁজ নিয়ে যাবেন আর আমাদের জন্যে কিছু টাটকা ডিম, তরি-তরকারি নিয়ে যাবেন। যদি আমরা ঘুরতে ঘুরতে ভীমগদাতে চলে আসি তাহলে ভালোমন্দ খেয়ে একটু মুখ বদলানো যাবে।

শেষ রাতের দিকে জোরে বৃষ্টি এল। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। ভোরবেলা দরজা খুলে

দেখি নানারঙের ঝরাপাতা আর মরা পাখিতে চারধার ছেয়ে গেছে। শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। বাংলোর টালির ছাদে চটাপট করে শব্দ শুনেছিলাম সে জন্যে।

চান করে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বলভদ্রবাবুও সঙ্গে এলেন। বালাবাবু রইলেন অন্য জিপটা নিয়ে ভট্‌কাইয়ের লোকাল গার্জেন হিসেবে।

পথটা শুধুই চড়াইয়ে চড়াইয়ে উঠেছে। সকাল নটাতে কন্‌কনে হাওয়া জার্কিনের কলার তুলে দেওয়া সত্ত্বেও কান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ঝকমক্ করছে নীল আকাশ। পাহাড়ী বাজ উড়ছে ঘুরে ঘুরে। ঋজুদার পাইপের টোব্যাকোর গন্ধটা শীতের বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতির গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। একটা শুরান্টি হরিণ দৌড়ে পথ পেরল। তারপরই একদল চিতল হরিণকে দেখা গেল পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টি ভেজা ঘাস খাচ্ছে পট্‌পট করে ছিঁড়ে। চলন্ত জিপ দেখেও তারা পালাল না। মুখ তুলে চাইল শুধু।

গ্রামটার নাম ভীমগদা কেন?

বলভদ্রবাবু বললেন এখানে নাকি ভীমের গদা পড়েছিল। মন্দিরও আছে একটা। ভীম-মন্দির। যখন বাঘের উপদ্রব ছিল না তখন প্রতি বছর চৈত্র মাসে এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসত চৌঠা বৈশাখ। যাত্রা হত। রুপোর গয়না, পেতলের বাসন-কোসন, ঝাঁটা, চাদর, ধুতি, শাড়ি, জামা, শুলগুলা আর পোড়পিঠার দোকান বসত। দেখবার মত। এখন বাঘটা এই পুরো অঞ্চলের মানুষদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, আমোদ-প্রমোদ, সাধ-আহ্লাদ সব মাটি করে দিয়েছে।

গ্রামটা একটা পাহাড় চুড়োয়। গোটা পনেরো ঘর। সজনে গাছ। আম। কাঁঠাল। হলুদ সর্ষে ক্ষেত। মাটির দেওয়ালে লাল হলুদ আর সাদা রঙের নানারকম ছবি। এখানকার বাসিন্দারা জাতে খড়িয়া। সুন্দর বলে এদের খুব নামডাক আছে। যেমন ছেলেরা, তেমনই মেয়েরা। তবে তাদের মূল বাস অনেক দূরে। বছর পঞ্চাশ আগে একটি দম্পতি এসে ঘর বানিয়েছিল এখানে। কোনো সামাজিক অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মূল বাস থেকে। তাদেরই ছেলে মেয়ে বউ জামাই নিয়ে এ গ্রাম। এখন আর খাঁটি খড়িয়া নেই তারা। ছেলেদের বৌ আর মেয়েদের জামাই এসেছে অন্য গোষ্ঠী থেকে।

পাহাড় চুড়োয় পৌঁছে বলভদ্রবাবু মোড়লকে ডেকে বাঘের খোঁজখবর নিলেন। মোড়ল বলল, বাঘ পরশু রাতে খুব ডাকাডাকি করছিল। তবে সে বাঘ নিনিকুমারীর বাঘ কি না তা বলতে পারবে না। এখন সব বাঘই সমান ভয়ের এদের কাছে।

একজন বলল, গাঁয়ের গরু মোষ যে বাথানে থাকে তার কাছে এসেছিল বাঘ। মোষেদের ক্রুদ্ধ গর্জনও শোনা গেছিল। প্রায় আধঘণ্টা ডাকাডাকি করে তারপর বাঘ ফিরে গেছিল। বাথানের মধ্যে ঢোকার সাহস পায়নি। তাছাড়া বাথানের কাছে গিয়ে আমরা দেখলাম যে মোটা মোটা ডবা বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া খুবই শক্ত পোক্ত করে। বাঘের পায়ের দাগ হয়ত দেখা যেত কিন্তু গত রাতের বৃষ্টিতে সব ধুয়ে মুছে গেছে। ওরা কিছু আনাজের চাষ করেছিল পাহাড়ের পেছনের ঢালে। তারও ক্ষতি হয়েছে খুব শিলাবৃষ্টিতে। তার ওপরে এই অসময়ের শিলাবৃষ্টি। লোকগুলো খুবই মনমরা হয়ে বসেছিল।

পাহাড় চুড়োয় দাঁড়িয়ে পরশু রাতে আসা বাঘ কোন্‌দিকে গেছিল তার একটা আন্দাজ দিল মোড়ল। আমাদেরও এখন ওদের মতই অবস্থা। কোনো বাঘকেই তাচ্ছিল্য করার উপায় নেই। যে কোনো বাঘের হদিস পেলেই যাচাই করে দেখতে হবে সে নিনিকুমারীর

বাঘ কি না।

পাইপে নতুন করে তামাক ভরে নিয়ে ঋজুদা বলল, চলি বলভদ্রবাবু। কোনো খবর থাকলে জানাবার চেষ্টা করবেন। বাঘকে পেলে আর আমাদের ডাকার অপেক্ষায় থাকবেন না। কে মারলো সেটা বড় কথা নয়। এই বাঘ মারা পড়াটাই সবচেয়ে জরুরী।

উনি মাথা নাড়লেন।

ঋজুদা বলল, চল্ রে রুদ্র।

ন্যাপস্যাকটা পিঠে বেঁধে নিয়ে রাইফেল কাঁধের ওপর শুইয়ে এগোলাম ঋজুদার সঙ্গে।

আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পেছনের উপত্যকাতে নেমে চললাম। পিটি-টুই, পিটি-পিটি-পিটি-টুই আওয়াজ করে একটি টুই পাখি, সবুজ টিয়ার বাচ্চার মত, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে। পাখিটার নাম আমি দিয়েছি টুই। আসল পাখিটা যে কি তা ঋজুদার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

পাহাড়ের এই ঢালে বেশিই হরজাই গাছের জঙ্গল। ঝোপ ঝাড়। অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা। কিছুক্ষণ হল জলের ঝরঝরানি শব্দ কানে আসছিল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মাঝামাঝি নামতেই হঠাৎ চোখে পড়ল জলপ্রপাত। কাল সারা রাতের বৃষ্টিতে নতুন করে জোরদার ঢল নেমেছে তাতে। প্রপাতটি প্রায় শ-দুয়েক ফিট উপর থেকে পড়ছে। চওড়াতেও নেহাত কম নয়। নিচে একটি দহর মত সৃষ্টি করেই নদী হয়ে বয়ে গেছে কনসরে গিয়ে মিলবে বলে। প্রপাতের নিচের খাদে গভীর জঙ্গল। বড় বড় ডবা বাঁশের ঝাড়। নলা বাঁশ ও কন্টা বাঁশও আছে। একই জায়গায় যা সচরাচর দেখা যায় না। বহু প্রাচীন, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক জংলি আম এবং কাঁঠালের গাছ। প্রায় আধ বর্গমাইল জায়গাতে জঙ্গল এখানে এতই ঘন যে একেবারে চন্দ্রাতপের মত সৃষ্টি হয়েছে। নানা পাখির ডাক ভেসে আসছে প্রপাতের শব্দকে ছাপিয়ে।

ঋজুদা বলল, আশ্চর্য! এরা তো কেউই আমাদের এ জায়গাটির কথা বলল না। অথচ এই এলাকাতে এই প্রপাত এবং প্রপাতের নিচে জঙ্গলটি নিঃসন্দেহে একটি আশ্চর্য ল্যান্ডমার্ক। বাঘের থাকার আইডিয়াল জায়গাও বটে!

আমি বললাম, আমাকে বলেছিল।

কে?

ভট্‌কাই।

ভট্‌কাই? জানল কি করে ও?

ওকে জগবন্ধুদা বলেছিল।

কী বলেছিল?

বলেছিল ভীমগদা পাহাড়ের পেছনের ঢালে একটি মস্ত প্রপাত আছে এবং নিচের ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে হাতিডিহ।

কি?

হাতিডিহ। হাতিদের থাকার জায়গা। ওখানে নাকি মা-হাতিরা এসে বাচ্চা হওয়ার সময়ে থাকে।

আমরা কথা বলতে বলতেই হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে হাতির বৃংহণের শব্দ ভেসে এল। প্রপাতের আওয়াজ ছাপিয়ে পাখিদের মিশ্রস্বর ডুবিয়ে প্রচণ্ড জোরে হাতি বারবার বৃংহণ করতে লাগল। মনে হল, কোনো বাচ্চা ছেলে দানবের মত দেখতে কোনো মার্সিডিস

ট্রাকের সীটে উঠে অনেকক্ষণ ধরে মার্সিডিস-এর এয়ার-হর্নটি টিপে রয়েছে।

ঋজুদা একটু আশ্চর্য হল। বলল, এই ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এমন একটি জায়গা যে আছে সে কথা বালাবাবু, বলভদ্রবাবু এবং বিশ্বলবাবুরা জানালেন না কেন আমাকে ?

জানাননি, তার কারণ আছে। ওঁরা নিজেরা জানলে তবে না জানাবেন। জগবন্ধুদার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে ভীমগদাতে তাই তার যাতায়াত ছিল এখানে। ভীমগদার মানুষেরাই শুধু জানে এই প্রপাতের কথা। প্রপাতটির নাম হচ্ছে বাঁশপাতি। নদীর নামও তাই। আর খাদের গহন উপত্যকার নাম হাতিডিহ্। ভট্‌কাইকে জগবন্ধুদাই বলেছিল। হাতিডিহ্ এবং বাঁশপাতি নদীর কাছেও কোনো মানুষ আসে না। এসব পবিত্র স্থান। ঈশ্বরের স্থান। বাঁশপাতির নদীর জলে ভীমগদার কোনো লোক পা দেয় না। ভীম নাকি এ প্রপাতের নিচের দহতে গণ্ডূষ ভরে জল পান করেছিলেন একসময়।

ঋজুদা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কোন্ সময় ?

তা আমি জানি না।

ঋজুদা চাপা গলাতেই ধমক দিয়ে বলল, আমাদের দেশের বন-পাহাড়ের গাঁ-গঞ্জের লোক না হয় যা খুশি তাই বিশ্বাস করতে পারে। তা বলে তুইও বিনা প্রশ্নে, বিনা যাচাইয়ে যা শুনবি তাই বিশ্বাস করে নিবি ?

আমি লজ্জিত হলাম।

তারপর বললাম, রামায়ণ সিরিয়ালের যা এফেক্ট হবে দেখবে। এবার শহরের লোকেরাও সব বিশ্বাস করবে।

রামায়ণ মহাভারত থেকে শেখারও অনেক আছে। কিংবদন্তী ও কল্পনাটা বাদ দিয়ে শেখারটুকু শিখলে ক্ষতি কি ? তাছাড়া এই যে পুষ্পকরথ, নানারকম সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব বাণ, এসব তো আজকের দিনে সত্যি হয়েছে। নানা আকারের নানা সাইজের জেট প্লেন, নানা ধরনের মিসাইলস্ এসব তো আর কল্পনার নয়। আমাদের দেশ হয়ত এক সময় রাশিয়া, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানি এবং চীন থেকে অনেকই এগিয়ে ছিল এইসব ক্ষেত্রে। কে বলতে পারে ! www.pathagar.net

আমি বলতে গেলাম....

ঋজুদা বাধা দিয়ে বলল, জায়গাটা একটু ইনভেস্টিগেট করে আসি। বলেই, নামতে লাগল উৎরাই বেয়ে। এদিক দিয়েই তাও নামা যায় ওদিকে একবারেই খাড়া নেমেছে পাহাড়। নানা লতা গুল্ম অর্কিডে ছাওয়া তার গা। মাঝে মাঝে লাল ক্ষতর মত দগদগে পাথর দেখা যাচ্ছে। লৌহ-আকর।

ঋজুদা বলল, দ্যাখ্ কোন্ সময়ে কেউ হয়ত এখানে ওপেন-পিট মাইনিং করে লোহা বের করতে চেষ্টা করেছিল।

আমি বললাম লৌহ আকর তো এমনিই খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে, ম্যাঙ্গানিজও তাই, কয়লা বা অভ্রখনির মত তো সুড়ঙ্গ বা ইনক্লাইন মাইন করতে হয় না।

লজ্জা পেয়ে ঋজুদা বলল, ঠিক বলেছিস। আমি ভুল বলেছিলাম।

ঋজুদার এই একটা মস্ত গুণ। কখনই দোষ করলে অস্বীকার করে না। জীবনে যারা বড় হয় তাদের সকলেরই বোধহয় এই গুণটি থাকে।

সবাধানে নিচে নামতে লাগলাম আমরা। ওদিকে হাতির বৃংহণ শব্দ বেড়েই চলতে লাগল কিছুক্ষণ যতির পর। এবং সেই যতি কিন্তু একেবারে নির্ভুলভাবে দেওয়া হচ্ছিল।

ঋজুদা বলল, আশ্চর্য ? এমনটি কখনও শুনিনি কোনো জঙ্গলেই। তবে একথা ঠিক

এমন ঘটনার কথা বছর তিরিশ আগে বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে বাবার আনা একজন আফ্রিকান হোয়াইট হান্টারের লেখা বইতে পড়েছিলাম। উনি জাম্বেসী নদী, লেক নিয়াসা এই সব অঞ্চলে শিকার করতেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল "গাই মলডুন।" রাল্ফ থমসন বলে একজন শিল্পীর আঁকা চমৎকার সব ছবিও ছিল সেই বইটিতে। বইটির নাম "দ্যা ট্রাম্পেটিং হার্ড"। তার মধ্যে একটি অধ্যায় ছিল "আ ক্রোজলি গার্ডেড সিক্রেট" হাতি-মায়েদের লুকিয়ে থাকার জায়গা ছিল তা। আফ্রিকানরাও কিন্তু বিশ্বাস করতো। এই অন্ধকার গা-ছমছম পবিত্র জায়গা থেকে হাতিদের বৃংহণ শুনলে তারা ভাবত কোনো আধিভৌতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রামের মানুষ রুদ্ধশ্বাস-ভয়ে অপেক্ষা করত কখন ঐ অবিরত গর্জন থামে। কোনো বাড়িতে রান্না হত না। ছেলেমেয়রা ভয়ে খেলত না উঠোনে কি ধূলিমলিন পথে। গাঁয়ের মুরগিগুলো পর্যন্ত কঁক্ কঁক্ করতে ভুলে যেত।

আমি বললাম, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে চল। হাতির দল যদি থাকে ওখানে তো আমাদের দেখতে পাবে সোজা গেলে।

ঋজুদা বলল, চল্ তাই। তবে সম্ভবত হাতির দল ওখানে নেই। আছে কয়েকটি মেয়ে হাতি যারা মা হবে। একটি দুটি বুড়ি হাতিও থাকতে পারে সঙ্গে। তারা ধাইমা।

আমি বললাম, নিনিকুমারীর বাঘ ফেলে তুমি এখন হাতিদের মায়েদের দিকে চললে?

ঋজুদা বলল, নিনিকুমারীর বাঘ তো আমাদের তার বাড়ির নাম্বার বা রাস্তার নাম দিয়ে যায়নি। জঙ্গলে যখন তখন যা কিছু ঘটতে পারে। কোথায় যে কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। বাঘ যে হাতির বাচ্চা খেতে খুব ভালবাসে তা বুঝি জানিস না? অমন নধর মাংস। গাব্‌লু-গুব্‌লু। শুঁড়ও তখনও নরমই থাকে। হাতির বাচ্চা হচ্ছে বাঘের রসগোল্লা।

তাই?

হ্যাঁ। সাবধানে দেখে নাম। পড়ে যাবি পা হড়কে। পাথর ঘাস সব যে ভিজে আছে এখনও।

কিছুটা নেমেই ঋজুদা নিবে-যাওয়া পাইপটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল এমনভাবে, যাতে হাওয়া কোনদিকে তা বোঝা যায়। হাওয়া ওদিক থেকেই এদিকে আসছিল।

ঋজুদা বলল, বাঁচা গেল। হাতিদের দৃষ্টিশক্তি তেমন ভাল না। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি সাঙ্ঘাতিক ভাল।

যতই আমরা নেমে সেই বাঁশপতির নদীর উপত্যকার কাছাকাছি আসতে লাগলাম ততই বন ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল। আদিম সব গাছ। কস্‌স্, মিট্‌কুনিয়া নিম, জংলী আম এবং কাঁঠাল। নানারকম জ্বাল-কাঠ।

এদিকে হাতির বৃংহণ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল।

ঋজুদা বলল, খুব সাবধানে চল। আড়াল নিয়ে নিয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন আমরা নদীটা পেরিয়ে প্রায় নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে ঢুকলাম, এদিকে বাঁশের বনও ছিল নানারকম; আগেই বলেছি; তখন মনে হল সামনে একটা গভীর গোলাকৃতি খাদ আছে। জঙ্গলে ভরা এবং অন্ধকার। এক এক পা করে আমরা খাদের ধারের কাছে গিয়ে লেপার্ড-কলিং করে এগোতে থাকলাম। নিঃশব্দে। ঋজুদা আমার আগে ছিল। হঠাৎ ডান হাতটা পেছনে প্রসারিত করে প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই আমাকে আঙুল দিয়ে ইশারা করল। অতি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি ছ'টি হাতি গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাতিকে। এবং তারা পালা করে শুঁড় সামনের দিকে

সমান্তরাল রেখায় সোজা তুলে ডাকছে। মধ্যের হাতিটিও মাঝে মাঝে ডাকছে। আমাদের দেশে তো বটেই আফ্রিকাতেও এমন হাতির ডাক শুনিনি। ডাক শুনেই নাড়ি ছেড়ে যাবার উপক্রম হল।

অনেকক্ষণ আমরা তাদের ভাল করে দেখার পর আবার বুকে হেঁটে হেঁটে পেছোলাম। পেছিয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে উঠে আমরা সন্তর্পণে হাতিডিহকে পেছনে ফেলে এগোলাম।

বাঁশপাতি নদী পেরনোর পর ঋজুদা বলল, এরকম দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি তবে গাই মালডুনের বইয়ে এরই কাছাকাছি এক দৃশ্যের কথা ছিল। প্রকৃতির বুকের মধ্যে যে কতরকমই রহস্যই থাকে!

হাতিগুলোর একটারও দাঁত ছিল না কিন্তু। একটার ছিল ছোট দাঁত।

সবকটিই যে মাদী হাতি।

একটার যে দাঁত ছিল!

ওটিও মাদী। মাদী হাতিরও তো দাঁত থাকে। ভুলে গেছিস।

বাঁশপতি নদীকে ডাইনে রেখে আমরা নিনিকুমারীর বাঘের পায়ের দাগের জন্যে মাটিতে নজর রেখে চলতে লাগলাম। এ যেন খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা। এমনভাবে যেতে যেতে যে বাঘের পায়ের দাগ কখনও পাব তা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। অথচ তা ছাড়া করারও কিছু ছিল না।

চল্ পাহাড়টা পেরিয়ে ওপারে যাই।

চলো। বলে, আমরা আবার পাহাড় চড়তে লাগলাম।

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে দুজনেরই হাঁফ ধরে গেল। কতগুলো রক্-শেলটার ছিল সেখানে। ভীমবৈঠকার মত। তারই একটার নিচে বসা গেল। বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছিল সেই রক-শেলটারের ভেতর থেকে। আমার মনে হল গন্ধটা বাঘের গায়ের। বাদুড়ের বাসা থাকলেও অমন গন্ধ বেরোয়। কিন্তু সেখানে বাদুড় দেখলাম না।

ঋজুদা বলল আমরা ঘণ্টা তিনেক হল জিপ ছেড়েছি। মনে হচ্ছে কত যুগ হল। একটু চায়ের বন্দোবস্ত করতে পারিস? আমি আমার ন্যাপস্যাক্ নামিয়ে রেখে তার ওপর রাইফেলটা শুইয়ে রেখে কিছু খড়কুটো পাওয়া যায় কী না দেখতে যাব এমন সময় ঋজুদা বলল, রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে যা।

কয়েক গজ গেছি। শুকনো পাতা ও কাঠকুটো কুড়োচ্ছি আর আমার টুপির মধ্যে ভরছি নিচু হয়ে হয়ে। রাইফেলটা কাঁধে ঝোলানোই আছে। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল আমাকে যেন কেউ আড়াল থেকে দেখছে। মনে হতেই, আমি স্থির হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের মধ্যে রাইফেলটাকে হাতে নিলাম এবং ঠিক সেই সময় পাঁচ ছটা বনমুরগি ভীষণ ভয় পেয়ে আমার সামনে ডানদিকে ঘড়ির কাঁটা তিনটেতে যেখানে থাকে, সেই কোণ থেকে কঁক্কঁক্ করে একসঙ্গে উড়ে গেল। বড় বড় দাড়িওয়ালা হলদেটে বুড়ো প্রকাণ্ড একটা রামছাগল যেন মুখটা এক ঝলক একটা অর্জুন ঝোপের আড়াল থেকে আমাকে দেখিয়েই ছায়ার মত সরে গেল। আমি রাইফেল আনসেফ্ করে আস্তে আস্তে সেদিকে এক পা এক পা করে এগোলাম। পাতাপুতা খড়খুটো ভরা টুপিটা ওখানেই পড়ে রইল।

যেখানে মুরগিগুলো ছিল সেখানে পৌঁছে দেখলাম চারটে ডিম। কিন্তু সেই রামছাগলের মত জিনিসটা কি তা খোঁজার চেষ্টা করছি যখন দু'চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতম করে

তখন দেখলাম যে একটি বাইগবা গাছের আড়ালে আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড একটি বাঘের পেছন মিলিয়ে গেল। ঋজুদাকে খবরটা দেবার জন্যে পেছন ফিরতেই দেখি ঋজুদা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চা খাওয়া মাথায় উঠল আমাদের। আমি যথাসম্ভব নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে গিয়ে আমার রাক-স্যাক আর টুপিটা ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে নিয়ে এসে দেখি যে ঋজুদা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি ঋজুদার পেছনে এগোলাম।

ঋজুদা কিন্তু ঐ বাইগবা গাছটা অবধি গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়াতেই প্রায় তিনশো গজ দূরে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। দেখি শকুন উড়ছে চক্রাকারে।

ঋজুদা বলল, চল্ ফিরে যাই। ঠাকুরানী যখন আন্ডাই সাপ্লাই করলেন তখন ওমলেট আর চা খেয়ে নিয়েই যা করার তা করা যাবে।

ফিরতে ফিরতে আমি বললাম, কি করবে?

ঋজুদা বলল ওমলেট আর চা খেয়ে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি এখানেই এই শেলটারে রেস্ট করব কারণ সারা রাত জাগতে হবে হয়ত আমাদের।

ব্যাপারটা কী হতে পারে আমি অনুমান করতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছু বললাম না।

ঋজুদাকে শুধোলাম, তুমি আমার পেছনে এলে কি করে?

ঐ মুরগিগুলোর কঁক্ককানি শুনেই। ওদের ভাষায় কোনও অস্পষ্টতা ছিল না।

চা-টা বেশ ভালই বানিয়েছিলাম বেশি করে কনডেন্সড মিল্ক ঢেলে। আর ওমলেটও বানিয়েছিলাম ছোট সস্প্যানটাতে। লঙ্কা বা পেঁয়াজ ছিল না। শুধুই নুন।

ঋজুদা বলল, একটু চিঁড়ে ছেড়ে দে মধ্যে। লোকে চিকেন-ওমলেট খায় আমরা চিঁড়ে-ওমলেট খেলাম।

ঘড়িতে যখন সোয়া তিনটে তখনই ঋজুদা বলল, চল্ ওঠা যাক।

দুজনে আস্তে আস্তে পাহাড়টার ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম যেদিকে শকুনদের উড়তে দেখেছিলাম সেদিকে। কাক-উড়ানে চাইলে দূরত্ব বোঝা যায় না। উৎরাই অথবা চড়াইয়ে নামা ওঠার সময়ে পাথর ও কাঁটাঝোপ, খাদ ও খাড়া পাড় এড়িয়ে নামতে নামতে বা এগোতে এগোতে বোঝা যায় যে পথ কত দূরের।

ঘাড়ে রোদ পড়ছিল পেছন থেকে। বেশ আরাম লাগছিল। সমতলের একটু আগে পাহাড়ের ঢালের শেষভাগে এসে ঋজুদা ফিস্ ফিস্ করে বলল, তুই বাঁদিকের ওই পাথরটার আড়াল নিয়ে বসে সামনে নজর রাখবি। আমি ডান দিক দিয়ে ঘুরে জায়গাটাতে পৌঁছচ্ছি।

ঋজুদা ডানদিকে সরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি রাইফেল ডান ঊরুর উপরে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলাম। একটা পাথরে হেলান দিয়ে এবং শরীরটাকেও ঐ পাথরটার যতখানি সম্ভব আড়ালে রাখা যায় তাই রেখে। ঋজুদা চলে যাবার পরই লক্ষ করলাম যে আমি যেখানে বসে আছি তার হাত দশেক দূর দিয়ে একটা গেম-ট্র্যাক বা জানোয়ার চলা পথ বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেছে। মনে হল ডানদিকে গিয়ে পথটা মিলেছে বাঁশপাতি নদীতে।

ঋজুদাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হেমন্তর বিকেলের বনের স্তব্ধ ছায়া ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। হেমন্ত আর শীতের বেলা কিশোরীর কানের দুলের মত। কখন যে হঠাৎ পড়ে যায়, এক মুহূর্ত আগেও বোঝা যায় না। যাঁরা তা পড়তে দেখেছেন তাঁরাই শুধু

জানেন।

আমার পেছনে একটা কুচিলা-খাঁই। গাছে বসে আরও অনেকগুলো কুচিলা-খাঁই বা গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিলস্ হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হঁক্কো হঁক্কো হঁক্কো করে ডানা ঝটপট করতে করতে নড়েচড়ে বসে ঝগড়া করছে। সামনের ঢাল থেকে মাঝে মাঝে শকুনের ঝগড়ার আওয়াজ আসছে। শকুনরা এখন আর গাছে নেই। তার মানে বাঘ ধারেকাছে নেই মড়ির। কী মেরেছে বাঘ, তা কে জানে। শকুনদের আওয়াজ আসছে আমি যেখানে বসে আছি সে জায়গার বেশ দূর থেকে।

বসে আছি। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছি খুব আস্তে আস্তে। আলো কমে আসছে। ঋজুদার কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে জায়গামতো পৌঁছল কিনা কে জানে!

হঠাৎই আমার বাঁদিকে কোনো জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ হল। পাথরের আড়ালে বসে থাকায় আমার বেশ কাছে না এলে জানোয়ারটাকে দেখা যাবে না। তবে বাঘ বা হরিণ জাতীয় কোনো জানোয়ার বোধহয় নয়। পাথুরে জমিতে শোনা আওয়াজটা অন্যরকম। কিন্তু বেশ ওজন আছে জানোয়ারটার। আওয়াজটা জোর হতে হতে আওয়াজকারী আমার চোখের সামনে এল। মস্ত বড় একটা দাঁতালো শুয়োর। এত বড় দাঁতাল কমই দেখেছি। উচ্চতাতেও সে প্রায় বাঘের মত। আমাকে দেখতে পায়নি। হাওয়া আসছে উপত্যকা থেকে যদিও, তাকে যদি হাওয়া আদৌ বলা যায়। এই হাওয়াতে ঋজুদার পাইপের ধোঁয়াই সরে। একটুও ধুলোবালি বা রুমাল নড়ে না। প্রশ্বাসের চেয়েওহালকা হাওয়া। শুয়োরটা চলে গেল।

একটু পরে আবার শব্দ। অন্য কোনো জানোয়ার আসছে। এও বাঘ অথবা হরিণ জাতীয় নয়। এবং এও শুয়োরের চেয়ে ছোট জানোয়ার। আওয়াজ শুনে মনে হল বড় সাপ অথবা বেজি। অথবা শজারু কী গুরান্টি বা মাউস-ডিয়ারও হতে পারে। যখন পাথরের আড়ালে থাকা আমার সামনে সে এল তখন দেখলাম একটি মাঝারি আকারের শজারু। কাঁটাগুলো শোয়ানো আছে।

সেও নিজের মনে চলে গেল।

ঠিক তখনই হঠাৎই শকুনরা যেখানে অদৃশ্য হয়ে (কিন্তু অশ্রাব্য হয়ে নয়) ছিল সেখানে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পরক্ষণেই বড় বড় ডানাতে সপ্ সপ্ আওয়াজ করতে করতে তাদের বিচ্ছিরি দগদগে ঘা-এর মত লাল লম্বা গলা উঁচিয়ে পড়ি কি মরি করে তারা চারদিকের গাছে উঠে পড়ল। সেসব গাছে পাতা কম। একটা বাজ-পড়া পত্রশূন্য সাদা মসৃণ শিমুল গাছ ছিল। তাতেই উঠল বেশি। যেন বিনা পয়সার হোয়াইট-স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখবে।

ঋজুদাকে দেখে উড়ল কি ? না অন্য কিছু দেখে ? বাঘ দেখে ? কে জানে ?

শকুনদের হুড়োহুড়ি করে ওড়ার পরই সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পেছনের রক-শেলটারের চারদিকে ঝাঁটি-জঙ্গল থেকে ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। সন্ধ্যে নামতে আর দেরি নেই খুব। ঘড়িতে দেখলাম সোয়া পাঁচটা বেজে গেছে। কী করে এতক্ষণ সময় যে কাটল বোঝাও গেল না।

শকুনদের ঝাঁপাঝাঁপির আওয়াজের আড়ালে অন্য একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ যেন চাপা পড়ে গেল মনে হল। আওয়াজটা কিসের এবং আদৌ কোনো আওয়াজ কিনা, তাও ঠিক বোঝা গেল না।

হেমন্ত এবং শীতের সন্ধ্যের মধ্যে এক ধরনের ভয়াবহতা থাকে। বিশেষ করে বনে-পাহাড়ে। মনে হয় নিজের জারিজুরি আর চলবে না। বনের হাতে বাঁধা দিতে হবে নিজেকে নিঃশর্তে। তবে পাহারাদারেরা হাত পা-বেঁধে কোনো অন্ধকার পুরীর উতলা রাজকন্যার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তা অন্ধকারের চররাই জানে। আর মিনিট পনেরর মধ্যেই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠবে। পশ্চিমাকাশে ধ্রুবতারাটা ইতিমধ্যেই পোল্‌ভল্ট চ্যাম্পিয়নের মত অন্য সব তারাদের মাথা ছাপিয়ে উঠে মৃদু সবুজ জার্সি পরে জ্বল জ্বল করছে। তারাটা দেখা যাচ্ছে একটা গেণ্ডুলি গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কত রকম পাখি যে ডাকছে থেকে থেকে। কেউ একা, কেউ দোকা ; কেউ দল বেঁধে। এই ওদের সন্ধ্যারতি। অন্ধকার থাকতে আবার আলোর স্তব করে সূর্যকে পথ দেখিয়ে ধরায় আনবে ওরা।

হঠাৎই আমার পেছন থেকে, যেদিকে রক-শেলটার, সেদিক থেকে একটা হায়না বুক কাঁপিয়ে ডেকে উঠল হাঁ হাঁ হাঁ করে। ডাকটা চমকে দিয়ে গেল।

এবারে ঝোলা থেকে টর্চটা বের করার সময় হয়েছে মনে হল। ঋজুদা যাওয়ার সময় এখানে বসে থাকতে বলে গেল অথচ সন্ধ্যে হলে কী করব বলে গেলো না। হয়ত ভেবেছিল, সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই ফিরে আসতে পারবে।

সূর্য ডোবার পরও অনেকক্ষণ পশ্চিমাকাশে আলোর আভা থাকে। সূর্য তখনও ডোবেনি। আলো থাকবে আরও আধঘণ্টা মত। কী করছ ভাবছি, ঠিক এমন সময় শকুনদের ঝাপটা-ঝাপ্‌টির আওয়াজ যেখান থেকে হয়েছিল সেইখান থেকে ঋজুদার রাইফেলের গদ্দাম আওয়াজ পেলাম।

গুলির শব্দ শুনেই মনে হল গুলি পাহাড়ে বা পাথরে বা মাটিতে পড়েছে। যার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া তার গায়ে রাইফেলের স্ট্রাইকিং পিনের শব্দ আর গুলি যেখানে লাগে তার শব্দ একসঙ্গে কানে এলে অনেক গুলি বিভিন্ন টার্গেটে ছুঁড়তে ছুঁড়তে সকরেলই এ সম্বন্ধে এক ধরনের ধারণা গড়ে ওঠে।

অধীর আগ্রহে আর উত্তেজনায় আমি তৈরি হয়ে বসে রইলাম। গুলি যদি ঋজুদা নিনিকুমারীর বাঘকেই করে থাকে এবং তা ঋজুদা মিস্ করে থাকে আর নিনিকুমারীর বাঘ এই গেমট্র্যাক ধরেই দৌড়ে আসে তবে আমার গুলি খেয়ে তাকে গেমট্র্যাকের উপরেই শুয়ে পড়তে হবে। আমার দশ হাত সামনে দিয়ে যাবে অথচ আমার গুলি খাবে না এরকম অতিথিপরায়ণতা ঋজুদা আমাকে শেখায়নি।

কিন্তু ঋজুদার গুলি আবারও মিস হল কেন ?

এত সব ভাবনা কিন্তু ভেবে ফেললাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। এবং যেমন ভেবেছিলাম, গুলির শব্দর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের প্রায় নিঃশব্দ-শব্দ শুনতে পেলাম গেম-ট্র্যাকের কাঁকরের উপরে। তবে দূরে। কিন্তু কয়েকটা লাফের পরই নিস্তব্ধ হয়ে গেল সে শব্দ। একেবারে মৃত্যুর মত নিঃস্তব্ধতা। বাঘ গতি পরিবর্তন করেছে।

আমি ভাবছি তার গায়ে ঋজুদার গুলি লাগেনি। কিন্তু আমার তো ভুলও হতে পারে!

আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে অত্যন্ত ভয়মেশানো উত্তেজনা নিয়ে পেছনে তাকালাম আমি। আর পিছনে তাকিয়েই আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। যে পাথরে পিঠ দিয়ে আমি বসেছিলাম সেটা সোজা উঠে গেছে পৌনে তিন থেকে তিন মিটার। তার উপরে কিছুটা পাথর সমান। বাঘ যদি নিঃশব্দে আমার পিছনে এসে ঐ পাথর থেকে লাফিয়ে পড়ে তো আমি বোঝার আগেই সে আমার ঘাড়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ধরবে।

পিছনটা দেখে নিয়ে সামনে তাকাতেই গেম-ট্র্যাকে আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে হাত ছুঁইয়ে বসে রইলাম আমি। এমন জানোয়ারের শব্দ কখনও শুনিনি। সাবধানী পায়ে সে আসছে। থেকে থেকে। এসে গেল। এসে গেল। তর্জনীটিকে এমন জায়গায় রাখলাম যাতে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তা ট্রিগার টানতে পারে।

পরক্ষণেই আঙুল নামিয়ে নিলাম। ঋজুদা!

ঋজুদার রাইফেলটি কাঁধে ঝোলানো, আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়াল। বলল, চল্ ফিরে যাই। কলকাতায় ফিরে যাব। এই ভৌতিক ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই আর। চার মিটার দূর থেকে দিনের আলোয় ধীরে সুস্থে এইম নিয়ে মারা গুলি বাঘের বুকে লাগল না, লাগল বাঘ টপকে গিয়ে পিছনের পাথরের চাঁই-এ। আমি কি আনাড়ি? একবার নয়, দু'বার নয়, এতবার! না না আমি শিকারী। ওঝা নই। আমার দ্বারা এইসবের পিছনে লেগে থাকা আর সম্ভব নয়।

হতাশায় এবং নিজের উপর ঘেন্নায় গজগজ করতে করতে ঋজুদা আমার পাশে বসে পড়ে পাইপ ভরতে লাগল পাথরটাতে হেলান দিয়ে। যে পাথরে আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম, এতক্ষণ, সেই পাথরে।

বাঘটা এ দিকেই তো আসছিল! মনে হল পায়ের শব্দ শুনলাম। নিনিকুমারীর বাঘই। অ্যাবসল্যুটলি স্যুওর। নইলে তো গুলি খেয়ে সে বাঘ ওখানেই পড়ে থাকত। বাঘ যেদিকেই থাক আমি আর ইন্টারেস্টেড নই। আবার দেখতে পেলেও আমি মারব না।

ঋজুদা বসে পড়ল বলেই আমি ঋজুদার দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ালাম। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে। ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বড় একটা টান লাগালো। গোল্ডব্লক তামাকের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল জায়গাটা।

আমি কিন্তু রাইফেল কাঁধে নিইনি। ডানহাতেই ধরা ছিল। ঋজুদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ভিতর থেকে, আমার ভিতর থেকে কে যেন বলল এই! এই! এই!

টুপি পরা ছিল আমার। এক-ঝটকায় মাথা তুলেই দেখি বাঘ যেখান থেকে আমার উপর লাফাতে পারে বলে ভেবেছিলাম ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে নিচে। সামনের হাঁটু দুটো ভাঁজ করছে আস্তে আস্তে। এইবার লাফাবে।

ধুত্তোর! নিনিকুমারীর বাঘের আজ এস্পার কি ওস্পার। এইরকম কিছু দাঁতে দাঁত চেপে বলেই আমি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে রাইফেল এক ঝটকাতে তুলেই গুলি করলাম। আমার বাঁহাত এসে পড়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নলে লাগানো হোল্ডিংকে সাপোর্ট করার জন্যে। ততক্ষণে বাঘও লাফিয়েছে কিন্তু লাফাবার আগে আমার রাইফেলের গুলি গিয়ে লেগেছে তার গায়ে।

লাফাবার সময়ে তার আমাদের ধরার চেয়ে তার নিজের পালানোর ইচ্ছেটাই প্রবলতর ছিল বলে মনে হল। নইলে, সে আমাদের টপকে ঐ গেমট্র্যাকের দিকে মাটিতে নামত না। বাঘের লাফানোর সঙ্গে সঙ্গেই গোড়ালির ওপরে আমি ঘুরে গিয়েছিলাম। এবং সে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আমাদের দিকে চার্জ করে আসার আগেই আমার দ্বিতীয় গুলি গিয়ে তার গলায় লেগে শ্বাসনালী ছিঁড়ে ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। লাঠি-খাওয়া সাপের মত সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তার স্পর্ধা-ভরা মাথা ধুলোয় লুটিয়ে। তারপর কাঁপলো কিছুক্ষণ

থর্‌থর্‌ করে। আমি বোল্ট টেনে রিলোড্‌ করে আরেকটা গুলি করতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা পিছন থেকে বললো গুলি নষ্ট করিস না, রুদ্র।

এত কাণ্ড যে ঘটে গেল, ঋজুদা কিন্তু তার পাশে শুইয়ে রাখা রাইফেলে হাত পর্যন্ত ছোঁয়ায়নি। তার বাঁ হাতটা ছিল মাথার পিছনে বালিশের মত করে রাখা। আর ডানহাত ছিল পাইপে।

ঋজুদা ডাকল। এদিকে আয়।

কাছে যেতেই আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে টেনে আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে টুপিটা এক উড়নচাঁটিতে ফেলে দিয়ে মাথার চুল টেনে আদর করে আমার মুখটা নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে ঘষে দিল।

বললাম, দোষ আমার নয়।

—কার ?

—তোমার ?

—মানে ?

ভট্‌কাই কিন্তু এসে অবধিই তোমাকে বারবার বলেছিল যে একটা পুজো দাও ঠাকুরানীর কাছে। ওর সব ইনফরমেশান আসে একেবারে হর্সেস মাউথ থেকে। ওর ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্কের কোনও তুলনা নেই। ও আমাকে কিন্তু বলেছিল যে, এই বাঘ মারলে মারবো আমি কি তুই। ঋজু বোসের নো চান্স্‌।

কেন ? ঋজুদা খুব অবাক হয়ে শুধোলো।

ঠাকুরানী ঋজু বোসের উপর প্রচণ্ড চটিতং। রাইট ফ্রম দ্যা বিগিনিং।

ওকে কে বলল ?

ঋজুদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সে কী আর বলেছে আমাকে! ভট্‌কাই বলে, কক্ষনো সোর্স অফ ইনফরমেশান্‌ ডাইভালজ্‌ করবি না। করলেই তো তোর ইম্পর্ট্যান্স কমে গেল।

তা এখন কী করতে বলবে আমাকে মিঃ ভট্‌কাই ?

এখন বলবে যথাশীঘ্র এই জায়গা থেকে কেটে পড়। বাড়ি ফিরে গ্র্যান্ড স্কেলে সত্যনারায়ণের পুজো দিতে হবে ছাদে। সিন্নির বেলা খরচে কোনোরকম কার্পণ্য করলে চলবে না কিন্তু।

ঋজুদা উঠে পড়ে হাসল, বলল, তথাস্তু। তারপর বলল, বের কর টর্চ।

হ্যাঁ! এও যে নিনিকুমারীর বাঘ, তারই বা ঠিক কি ?

না। এবারে কোনো ভুল হয়নি মনে হয়। একটা কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েকে খাচ্ছিল বাঘটা। বোধহয় দুপুরের দিকেই কাছাকাছি কোনো বসতি থেকে মেরেছে।

টর্চটা জ্বেলে দেখলাম বাঘের মুখ গোঁফ দাড়ি সব রক্তে লাল হয়ে আছে।

ঋজুদা বলল, ইয়েস। এই সেই কালপ্রিট্‌।

তারপরই বলল, আকাশের দিকে রাইফেলের নলের মুখ করে তোর ম্যাগাজিন খালি করে দে তো। যে গ্রামের মেয়ে, তাদের আসা দরকার। আর চল্‌ ওখানে গিয়ে বড় করে আগুন করতে হবে একটা। নইলে ওরা জানবে কী করে, যে আমরা কোথায় আছি ?

চলো। বলে, আমি এগোলাম।

চলতে চলতে আমার বাঁশপাতি নদীর পাশের সেই হাতির দলটির কথা মনে হচ্ছিল।

হাতি মায়েদের বাচ্চার কী হল ?

ঋজুদা বলল, কিল্-এর একেবারে কাছে যাওয়ার দরকার নেই। কাছাকাছি পাথর-টাথর দেখে বসার জায়গা ঠিক করে আগুন কর। সারারাত থাকতেও হতে পারে এখানে। শেয়ালে হায়নায় মেয়েটাকে টানাটানি যাতে না করে সেটুকু দূর থেকে দেখলেই চলবে শুধু। আগুনটা করতে হবে একটু উঁচু জায়গাতে, যাতে সেখান থেকে মৃত নিনিকুমারীর বাঘ এবং মেয়েটি এই দুজনের উপরেই নজর রাখা যায়। আশা করি তোর গুলির শব্দ শুনেই গ্রামের লোকেরা বুঝবে কী ঘটেছে।

গুলি করলি না! কী রে!

এই করছি। বলেই চারটি গুলি করে আমি ম্যাগাজিন খালি করে দিলাম।

তারপর রাতের অন্ধকারে আমি আর ঋজুদা এগিয়ে চললাম।

আমরা অবশ্য একা ছিলাম না। ততক্ষণে চাঁদও এসে জুটেছিল। এবং এই অঞ্চলের অগণ্য অসহায় মানুষের আশীর্বাদ।

গ্রন্থ-পরিচয়

গুগুনোগুম্বারের দেশে। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৮৯। পৃ. [৪] + ১৩০। মূল্য ১৪·০০।

প্রথম সংস্করণ—জুলাই ১৯৮১।

উৎসর্গ ॥ সোহিনীর বন্ধু অর্জুনকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ অনুপ রায়।

অ্যাল্‌বিনো। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯০। পৃ. ১০৪। মূল্য ১৫·০০।

প্রথম সংস্করণ— জানুয়ারি ১৯৮৩।

উৎসর্গ ॥ নবনীতা দেবসেন বন্ধুবরেষু।

প্রচ্ছদ ॥ সুধীর মৈত্র

রুআহা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৯৮। পৃ. ১৭৫। মূল্য ২৫·০০।

প্রথম সংস্করণ—১ বৈশাখ ১৩৯২।

উৎসর্গ ॥ আরুশার ছোট্ট বন্ধু নীয়েরে সাটোকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ অনুপ রায়।

অঙ্গসজ্জা ॥ বিজন ভট্টাচার্য

"ছেলেবেলা থেকেই আফ্রিকা সম্বন্ধে খুবই উৎসুক ছিলাম, যেমন সব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছেলেমেয়েরই থাকে। তাইই যখন বড় হয়ে পেশার কাজে আফ্রিকা এবং সেশেল্‌স আইল্যান্ডস্-এও যাবার সুযোগ হল তখন যাঁদের কাজে যাচ্ছিলাম তাঁদের বললাম, জঙ্গল দেখিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে।

যখন [বিভিন্ন] জায়গাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি...আমার গাড়ির ড্রাইভার-কাম-গাইড রুআহা ন্যাশনাল পার্ক-এর কথা বলে।... রুআহার গল্প নিয়েই রুআহা।..."—পটভূমি

নিনিকুমারীর বাঘ। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৮৯। পৃ. ১২৫। মূল্য ১৫·০০।

প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়